বিভূতি-রচনাবলী

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অষ্টম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৩
চতুর্থ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৭৪

উপদেষ্টা পরিষদ :

আচার্য স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রী কালিদাস রায়

ডঃ স্থকুমার সেন

শ্রী প্রমথনাথ বিশী

শ্রী জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রী গজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : শ্রী তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও বংশীধর সিংহ কর্তৃক বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত

॥ সূচীপত্র ॥

ভূমিকা	...	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	৵০
উপন্যাস			
স্নেহঘান	...	...	১—২০০
গল্পগ্রন্থ			
উপলখণ্ড	...	...	১—১০০
বিধু মাষ্টার	...	...	১—১০০
ছায়াছবি	...	...	১—৫৬

ভূমিকা

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ গিরীন্দ্রশেখর বসু একবার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, লেখকরা যত চরিত্রই সৃষ্টি করুন না কেন—তা তাঁর নিজেরই চরিত্রের বা মনের এক একটা দিক। নিজেদের মানসিক গঠনের বাইরে কিছু কল্পনা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। **Authors always re-create themselves.** সুতরাং—একথা যদি সত্য বলে মানতে হয়, আর মানাই উচিত—বিভূতিভূষণের রচনাকে বুঝতে হ'লে আগে সে মানুষটাকে বোঝা দরকার।

বিভূতিভূষণ অবশ্য তাঁর রচনাতে কোথাও এ সত্য অস্বীকার করেন নি। লেখকরা সাধারণত নানারকম প্যাঁচ কষে নিজেদের সৃষ্ট চরিত্রের আড়ালে আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন—যাতে তাঁকে এদের মধ্যে থেকে চিনে নিতে না পারা যায়, এইটেই হয় তাঁদের প্রধান লক্ষ্য, কিন্তু বিভূতিভূষণ সে চেষ্টা আদৌ কোথাও করেন নি। আরণ্যকের সত্যচরণ তো সোজাসুজিই তিনি—সে ছাড়াও কাল্পনিক চরিত্রের ক্ষেত্রেও তিনি পরিষ্কার ধরা দিয়েছেন। তাঁর অপু লেখকের নিজের চরিত্রের যতগুলি দোষ ও গুণ—আশা আকাঙ্ক্ষা—কল্পনা ভ্যানিটী দুর্বলতা নিয়েই গড়ে উঠেছে—শিশু থেকে বড় হয়েছে। শিশুর মতো উৎসুক ও সরল, জ্ঞানপিপাসু, সাংসারিক জ্ঞানবর্জিত, বেহিসেবী, যে নির্দোষ মিথ্যা কথা বলতে ভালবাসে, যার নানারকম ছোটখাটো ভ্যানিটী আছে (তার মধ্যে রূপের গর্ব বা নিজের রূপ সম্বন্ধে উচ্চধারণা প্রধান), নারী-হস্তের সেবার প্রতি যার লোভ দৈহিক আকর্ষণের থেকে অনেক বেশী প্রবল, নারীর কল্যাণীরূপই যাকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে—এমনি একটি মানুষই তাঁর উপন্যাসে গল্পে বার বার দেখা দিয়েছে—তা কে জানে পথের পাঁচালী, অপরাজিত আর কে জানে বিপিনের সংসার, দৃষ্টিপ্রদীপ, অথৈজল, ইছামতী!

অবশ্য কিছু কিছু বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা যে না করেছেন তা নয়—কেদার-রাজার লম্পট বেশ্যাসক্ত রমণীলোভাতুর চরিত্র দেখানোর চেষ্টা করেছেন, বিপিনের সংসারের বিপিন প্রথম যৌবনে ফুর্তি ক'রে পৈতৃক সম্পত্তি উড়িয়েছে কিন্তু এ সব আত্মগোপনের ক্ষীণ প্রচেষ্টা নিতান্তই ছেলেমানুষীতে পর্যবসিত হয়েছে, আসল মানুষটি আসল চরিত্রের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মৃৎশিল্পীরা যেমন একই ছাঁচের মুখে লক্ষ্মী সরস্বতী শীতলা সব মূর্তিই তৈরী করেন—বিভূতিভূষণের কলমে গড়া মূর্তিদের মধ্যেও আদলটা একই থেকে গেছে। মূর্তির ক্ষেত্রেও যেমন এতে কোন অসুবিধা হয় না—বিভূতিভূষণের রচনার ক্ষেত্রেও তেমনি কোন অসুবিধা হয় নি, আদল বা মুখের ছাঁচ এক হ'তে পারে—তবু মূর্তিতে মূর্তিতে তফাৎ আছে বৈকি!

এর ব্যতিক্রমের মধ্যে আছে হাজারী ঠাকুর। তবু খুব একটা ব্যতিক্রম কি? লক্ষ্মীর ছাঁচে মুখটা তৈরী করে তাতে সিঁথে-চেরা চুল ও গোঁফ লাগিয়ে কার্তিক করলে যা দাঁড়ায়, তাই নয় কি? অশিক্ষিত রাঁধুনী বামুন—যার আশা আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই সীমিত, তার স্বভাবকে

স্বাভাবিক করতে গেলে যেটুকু তফাৎ করতে হয় সেইটুকুই করেছেন লেখক—কিন্তু মূল আদলটায় বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে কি? সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ দরিদ্র বা নিম্নমধ্যবিত্ত, অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালবাসা, তাদের দারিদ্র্য-জর্জর জীবন-যাত্রার প্রতি লোভ। হ্যাঁ, আমি ইচ্ছে ক'রেই এই শব্দটা ব্যবহার করছি—এই জীবনের প্রতি একটা লোভই ছিল তাঁর—নস্ট্যালজিয়া ছিল। দরিদ্র সংসারের কষ্টে সংগৃহীত আনাজে রান্না ডাঁটা-চচ্চড়ি, ডুমুর কি থোড়-ছেঁচকি, কি স্বল্প তেলে পোড়া-পোড়া-করে-ভাজা পাকা কাঁচকলা তাঁর কাছে ধনীর গৃহের কালিয়া পোলাওর থেকে বেশী লোভনীয় ছিল। বাল্যে অভাবের মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন বলেই তাঁর সুখাদ্যের দিকে আকর্ষণ হয়ত একটু বেশী ছিল—পথের পাঁচালীর 'সুধাঘ্রাণরুচি লুচির' সৌরভ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস অপুর নয়, লেখকের নিজেরই অন্তরের কথা—তাঁর সুখাদ্য-লোলুপতা নিয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে যথেষ্ট পরিহাসও করতেন, কিন্তু তবু আমি জানি, তাঁর কাছে এসব সুখাদ্য প্রিয় হ'লেও প্রিয়তর ছিল দরিদ্রের অতিকষ্টে অতি-যত্নে রান্না করা আপাত-সামান্য খাদ্যসামগ্রী! এর মধ্যে যে আন্তরিকতা সেইটেই তাঁর কাছে বেশী মূল্যবান ছিল।

নিম্নবিত্তদের প্রতি সহানুভূতি বা ভালবাসাই তাঁর সৃষ্ট কাহিনী—গল্প বা উপন্যাসের বড় কথা। শুধু তাই বা কেন, তাঁর দিনলিপি—যার মধ্যে তিনি নিজের সত্তায় ধরা দিয়েছেন, তাতেও এই ভালোবাসাটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। সাধারণ মানুষদের প্রতি ভালবাসা আর ঈশ্বর-বিশ্বাস। কিন্তু শেষোক্ত কথায় আরও পরে আস্‌ছি।

ধনী-দুহিতা উচ্চশিক্ষিতা লীলার প্রতি প্রেম—অথবা বলা যায় অপুর প্রতি লীলার প্রেম—রোমান্সের রাজ্যে লেখকের দ্বিধা-জড়িত সসঙ্কোচ পদক্ষেপ। সেই জন্যেই তা পূর্ণ-মুকুলিত হতে পারে নি। অন্তরঙ্গতা? তাও কি, রানুদি বা লীলাদি—কি অতসীর সঙ্গে যতটা স্বাভাবিক, সহজ, স্বতস্ফূর্ত—ততটা? না। অপর্ণার সঙ্গে প্রণয় সম্পর্ক যত মধুর—এই অপর্ণা যদি ধনীকন্যা হ'ত তাহলে ততটা হ'ত কিনা সন্দেহ। জানি না এই অপর্ণার সঙ্গে তাঁর প্রথমা স্ত্রী গৌরীর কোন সাদৃশ্য আছে কিনা, মানে চরিত্রগত—অথবা সবটাই কল্পনা, তবে পরবর্তী কালে শুনেছি সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী—সুন্দরী শিক্ষিতা বলেই তাঁর অপছন্দ হয়েছিল।

এই ব্যাপার সর্বত্রই কিন্তু। যেমন জীবনের ক্ষেত্রে তেমনি তাঁর সাহিত্যেও। দৃষ্টিপ্রদীপের আখড়ার মোহান্তকন্যা মালতী—যে পরে আখড়ার সর্বময়ী কর্ত্রী হ'ল—রূপে গুণে চরিত্রের দৃঢ়তায় শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মতো বাঞ্ছনীয়া, তার প্রতি জিতুর প্রেমের ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তুলতেও চেয়েছেন লেখক, কিন্তু জিতুকে সেখানে বাঁধা যায় নি শেষ পর্যন্ত। ছোট-বৌঠাকরুনের মতো মেয়েও জিতুর সহানুভূতি পেয়েছে, কিন্তু প্রেম পায় নি—পেয়েছে অতি সাধারণ ঘরের মেয়ে হিরন্ময়ী। সহানুভূতিও ঢের বেশী পেয়েছে তার বৌদি—দীনদরিদ্র ঘরের মেয়ে। বই শেষ করতে গিয়ে বোধ হয় লেখকের মনে হয়েছে মালতীর প্রতি অবিচার করা হয়ে গেল—তাই সর্বশেষ পরিচ্ছেদে একটা উচ্ছ্বাস দিয়ে বই শেষ করেছেন, অবিচারের ওপর একটু রঙের তুলি বুলিয়েছেন।

ঐশ্বর্য বা উচ্চশিক্ষাই শুধু নয়—কোন আড়ম্বর বা সমারোহই পছন্দ ছিল না বিভূতি-ভূষণের। সাধারণ দরিদ্র মানুষের ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষা ছোট ছোট আশা তাঁর কাছে অনেক বেশী মূল্যবান ছিল। যে কারণে তিনি দেশ থেকে কলকাতা আসার সময় সযত্নে পরিচিত ভদ্রলোকদের পরিহার ক'রে ট্রেনের ভেণ্ডার কামরায় উঠে অনায়াসে সব্‌জীওলাদের কাছে বিড়ি চেয়ে খেতেন, তাদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনে ভ্রমণের দুটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন, সেই কারণেই তিনি 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' গল্পে কাশীবাসিনী নিষ্ঠাবতী সেই ভদ্রমহিলাটির প্রতি অত অকরুণ হ'তে পেরেছেন। সাধারণ ঘরোয়া বৃদ্ধা দ্রবময়ীর দরিদ্র ঘরের সামান্য ফলফুলুরী গাছপালা গোরুর প্রতি আকর্ষণের জন্যেই বৃদ্ধাটি তাঁর কাছে অসামান্যা, ঐ পণ্ডিত অতিরিক্ত 'ভক্তিমতী' নীরজার থেকে বেশী আপন ও শ্রদ্ধেয়া।

তাই বলে বৈষয়িক আসক্তিও তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এই সব বদ্ধ-জীবদের কথা লিখতে বসলেই তাঁর লেখনী ব্যঙ্গে ক্ষুরধার হয়ে উঠত। কেবলরাম কুণ্ডু থেকে শুরু ক'রে 'কবি কুণ্ডু মশাইয়ের' সেই আড়তদার, যার বড় দুঃখ যে কিছু হজম হয় না—কাউকেই রেহাই দেন নি তিনি।

'দেবযান' বইটি বিভূতিভূষণের সমস্ত রচনার মধ্যে একেবারে দলছাড়া গোত্রছাড়া। এই-ই প্রথম একটা কাল্পনিক কৃত্রিম অবাস্তব পৃষ্ঠপট নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্তও তাঁর প্রিয় জগৎকে এ থেকে বাদ দিতে পারেন নি, তাঁর নিজস্ব জীবন-দর্শনকেও না। বহু তথাকথিত বিদগ্ধ লেখক আছেন যাঁরা বই পড়ে বই লেখেন, যাঁরা পৃথিবীকে দেখেছেন অপরের অভিজ্ঞতা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে বিভূতিষণ এ দলের লেখক ছিলেন না কোন কালেই। কিন্তু ব্যতিক্রম দিয়েই নাকি নিয়ম প্রমাণিত হয়—দেবযানও তাঁর সেই ব্যতিক্রম।

বিভূতিভূষণের প্রথম জীবনের জ্ঞান-পিপাসা ও কৌতূহল—সীমাবদ্ধ বলব না—প্রবলতর ছিল দুটি বিষয়ে, উদ্ভিদবিদ্যা ও জ্যোতিষতত্ত্ব। প্রকৃতির প্রতি তাঁর যে অনুরাগ—শৌখিন নয় তাও, বন্যপ্রকৃতি—আশ-শ্যাওড়া, ঘেঁটুফুল, তিৎপল্লা, বনসিম, কেঁয়োঝাঁকা প্রভৃতি অখ্যাত অনাদৃত বনফুলের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রেমের মতোই আবেগময়—এই অনুরাগই তাঁকে সমগ্রভাবে উদ্ভিদতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট করেছিল। বিভূতিবাবু যত রকম উদ্ভিদের ল্যাটিন নাম জানতেন, তত্ত্ব এই বিদ্যার কোন অধ্যাপকেরও মুখস্থ থাকে কিনা সন্দেহ। জ্যোতিষতত্ত্ব সম্বন্ধে আগ্রহ ও কৌতূহলও অত্যন্ত প্রবল ছিল তাঁর। অসীম অনন্ত বিশ্বের রহস্য তাঁকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করত। বহু রাত্রির বিনিদ্র প্রহর আমাদের কেটেছে তাঁর সঙ্গে আলোচনায়—সে সময় লক্ষ্য করেছি, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর রহস্যের কথা বলতে বলতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন, তখন যেন নিজেকেই নিজে বলতেন, বোঝাতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সেখানে বাহুল্য হয়ে পড়ত।

এই অনন্ত বিশ্বের রহস্য উপলব্ধি করতে করতেই, সম্ভবত যতই এ রহস্যে প্রবেশ করেছেন

ততই মুগ্ধ বিস্মিত—শেষ পর্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, মনে হয়েছে এই ধারণাতীত বিপুল (?—কোন্ সংজ্ঞা দেওয়া যায় একে ?) বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা কে, যাঁর ইচ্ছায় ও নির্দেশে সীমাহীন পরিধিহীন বিশাল নীহারিকা এই লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র, কোটি কোটি তারকাপুঞ্জের জন্ম দিচ্ছে অথচ যে সব নক্ষত্রের মধ্যেও অযুত অযুত যোজনের ব্যবধান ! মন আপনিই বার বার নত হয়েছে তাঁর চরণে।

এবং এই ঈশ্বর-বিশ্বাসই ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি প্রেমে পর্যবসিত হয়েছিল।

এ প্রেম যত দৃঢ় হয়েছে, ততই পার্থিব সমস্ত কামনা বাসনা লোভ থেকে তাঁর মন সরে এসেছে। তার চেয়েও বড় কথা—অভিমান-শূন্য হ'তে পেরেছেন। তাঁর কোন প্রধান রচনাকে কেউ নিন্দা করলে অনায়াসে হেসে 'চ্যান করুক গে যাক্' বলে উড়িয়ে দিতে পেরেছেন। বোধ করি চোদ্দটি তালি দেওয়া কেড্‌স্ জুতো পায়ে দিয়ে তাঁর জন্যে বিশেষ-ব্যবস্থায়-প্রেরিত গাড়িতে উঠে সভাপতিত্ব করতে যেতে পেরেছেন ; কয়েক হাজার টাকার নোট কীটদষ্ট হয়েছে, হাজার দুই-তিন টাকার চেক তারিখ পেরিয়ে বাতিল হয়ে গেছে, সে ঘটনাকে স্মিতহাস্যে পরমুহূর্তেই মন থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছেন ; তাঁর আমলে টাকার অনেক মূল্য ছিল তবু পঁয়তাল্লিশ টাকা বেতনের ইস্কুল মাস্টারের পকেটে সাতশ টাকার নোট সাত মাস পড়ে থেকেছে—সেটা তুলতে বা কাকেও বলতে মনে পড়ে নি।

জ্যোতিষতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের মতো আরও একটি বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ছিল, সেটা হচ্ছে পরলোকতত্ত্ব। এ বিষয়ে বিস্তর পড়াশুনো করেছেন, যখনই যেখানে কোন বই বা প্রবন্ধের সন্ধান পেয়েছেন—তা সংগ্রহ ক'রে পাঠ করেছেন, ফলে কৌতূহল নেশায় পরিণত হয়েছে। মানুষের মৃত্যুর পরও তার সেই বিশেষ আত্মার অস্তিত্ব থাকে, সে আত্মার সঙ্গে এই পৃথিবীর যোগাযোগ থাকে, এবং কেউ কেউ আবার জন্মান্তর গ্রহণ করে—এটা তিনি সম্ভবত বিশ্বাস করতেন। 'সম্ভবত' বলছি এই জন্যে যে, এই জিনিসগুলো ঠিক কেউ নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে পারে কিনা সন্দেহ আছে। শুনেছি যে বিখ্যাত নাস্তিক হার্বার্ট স্পেন্সার, ঈশ্বর যে নেই সারা জীবন এই সত্যটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সেই ব্যক্তিই মৃত্যুকালে 'যদিই ঈশ্বর থাকেন তো' তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন। বিভূতিবাবুও আমাদের কাছে যে পরিমাণ উৎসাহ সহকারে বিভিন্ন পুঁথিপত্র নজিরের সাহায্যে পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন—তাতে মনে হয় তাঁর নিজের মনে একটু সন্দেহের বীজ কোথাও থেকেই গিয়েছিল। যা মানুষ তর্কাতীতভাবে সত্য বলে জানে তা প্রমাণ করার জন্যে এত কাণ্ড করে না। আর, এ সন্দেহ তো স্বাভাবিকও।

সে যাই হোক, জ্যোতিষতত্ত্ব আলোচনা এবং পরলোকতত্ত্বে ও ঈশ্বরে বিশ্বাস এই তিনেরই ফলশ্রুতি—'দেবযান' গ্রন্থের সৃষ্টি। তাঁর ডায়েরী পড়লে জানা যায় যে দেবযানের পরিকল্পনা বহুদিন থেকেই বীজাকারে তাঁর মাথায় ছিল, হয়ত সেই 'পথের পাঁচালী' রচনার আমল থেকেই, শুধু—বোধ করি ভাল ক'রে ভেবে-চিন্তে লিখবেন বলেই--দীর্ঘকাল ভাবনার মধ্যে এই কল্পনাটাকে জীইয়ে রেখেছিলেন, অথবা অন্য অপেক্ষাকৃত সহজ রচনার তাগিদেই এই রচনা

ক্রমাগত পিছিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত বর্তমান নিবন্ধকারের নির্বন্ধেই তিনি এই রচনায় হাত দেন।

কারও কারও মতে—তার মধ্যে বিভূতিবাবুর ভক্তরাও আছেন অনেকে—এই বই লেখা তাঁর উচিত হয় নি। এ তাঁর মতো লেখকের অনুপযুক্ত, এ বই লিখে তিনি নাকি হাস্যাস্পদ হয়েছেন।...

আমি সামান্য ব্যক্তি, তবু ভরসা ক'রে ইতিপূর্বেও প্রতিবাদ করেছি, এখনও করছি। আমার মতে এ বই তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি।

কল্পনার বিশালতা ও বৈচিত্র্য ছাড়াও এর মধ্যে তিনি যে কারিগরির পরিচয় দিয়েছেন তা এক মহান লেখকের পরিণত লেখনী ছাড়া সম্ভব হ'ত না। কী অনায়াসেই তিনি এর মধ্যে স্বর্গমর্ত্যকে মিলিয়েছেন, সম্পূর্ণ বাস্তব ও বিশ্বাসযোগ্য ভাবে। কত সহজে দুটি সুরকে একই যন্ত্রে ধরেছেন! মৃত্যুর পরেও মানুষের মানসতা বদলায় কিনা এ সত্য প্রমাণ করা সম্ভব নয় কিন্তু লেখক যে ছবিগুলি এঁকেছেন—যেমন পুষ্পর প্রেমের একনিষ্ঠতা এবং যতীনের দোলাচল-চিত্ততা, কেবলরাম কুণ্ডুর ক্যাশবাক্সর পাশে বসে থাকা, রামলালের স্ত্রীলোক অন্বেষণ—তাতে পাঠকদের এ মত সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করতে কোন অসুবিধা থাকে না। যতীন জীবিতকালে যা ছিল মরার পরও তাই, অত্যন্ত দুর্বলচিত্ত, যখন পুষ্পর কাছে থাকে তখন একরকম, পুষ্প সরে গেলেই পৃথিবী ও অবিশ্বাসিনী স্ত্রী আশা তাকে দুর্বার আকর্ষণে টানে, সে স্থির থাকতে পারে না। আশা তাকে ত্যাগ ক'রে এসেছিল, খবর নিতে গেলে দেখা করে নি—এক লম্পটের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে মা ছেলে-মেয়ে সব ছেড়ে অকূলে ভেসেছে—তৎসত্ত্বেও—হয়ত বা সেই জন্যেই—আশার প্রতিই তার আকর্ষণ সমধিক। পুষ্পকে সে ভালবাসে—কিন্তু পুষ্প তার মানসতার অনেক ঊর্ধ্বে, ওকে যেন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পায় না যতীন। আশা তার মানসিক স্তরের মানুষ, আশাকে তাই কামনা করা যায়, সম্ভোগ করার কথা কল্পনা করা যায়। যে কারণে 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যকে ঘরে আনা যায় না, সে সরোবর, তাতে মন সাঁতার কাটতে পারে কিন্তু ঘর করার জন্যে কেটির মতো ঘড়ায় তোলা জল দরকার—সেই কারণেই পুষ্পকে ভালবাসলেও ঘর করার জন্যে, কামনা করার জন্যে আশাকে দরকার।

এই বইতেও বিভূতিবাবুর সেই দরিদ্র সংসারের প্রতি লোভই যতীনের মনোভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মোক্ষ নয়—জন্মান্তর-গ্রহণেই তার আগ্রহ বেশী, কোলাবলরামপুরের দুঃখিনী মা, যে নিজেই খেতে পায় না, কলাইয়ের ডাল; মোচা-ছেঁচকি ও কাঁচকলা ভাজা যার রাজভোগ—গেরস্থালী বলতে যার সম্বল ময়লা কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর ও মাটির হাঁড়িকুড়ি—তার কোলেই পুনরায় জন্ম নিয়ে সুখেদুঃখে বড় হয়ে উঠবে, বড় হয়ে রোজগার করে ভাঙ্গাবাড়ি সারাবে, সজনেতলায় পাকা রান্নাঘর করে দেবে, মাকে দুল গড়িয়ে দেবে, তার সেবা করবে—যতীনের এই ইচ্ছাই প্রবল। তার মনে হয়, 'পুষ্প তাকে যতই টানুক, উচ্চস্বর্গের উপযুক্ত নয় সে। মাটির পৃথিবী তাকে স্নেহময়ী মায়ের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় শত বন্ধনে। তার মনে

অনুভূতি জাগায় এই সংসারের শত শত সুখ দুঃখ, আশাহত অসহায় নরনারীর ব্যথা।' যতীনের এ মনোভাব লেখকের নিজেরই।

'তাই এই মাত্র অন্ধকারে কাছারীর পথ দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ভাবছিলাম, ভগবান আমি তোমার অন্য স্বর্গ চাই না—তোমার দেবলোক পিতৃলোক বিষ্ণুলোক—তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্রজগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদের জন্যে রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস, এই ফুলফল, এই সুখদুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়াজগতের মধ্যে দিয়ে বার বার যেন আসাযাওয়ার পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়।' (স্মৃতির রেখা)

'এই পঞ্চাশ ষাট বছরের এবারকার মতো জীবনেই কি সারা জীবন ফুরিয়ে গেল? এই দুপুর, এই প্রথম বসন্তের আবেশ, এই নীল আকাশ, এই বাঁশের শুকনো পাতা ও খোলার আহ্বান, তেলাকুচোলতার দুলুনি—এসব যে বড় ভাল লাগে।' (স্মৃতির রেখা)

'কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্বের এক বিস্মৃত অতীতের সেসব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ি ফিরে মায়ের হাতে বেলেরপানা খাওয়া মধুময় অপরাহ্নটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্নের নিদ্রা ভেঙ্গে পাপিয়ার সে মনমাতানো ডাক, গ্রাম্য নদীটির ধারে শ্যাম তৃণদলের উপর বসে বসে কত গান গাওয়া, কত আনন্দকল্পনা, এক বৈশাখের রাত্রিতে প্রথম বর্ষণসিক্ত ধরণীর সেই মৃদুসুগন্ধ যা তার নববিবাহিতা তরুণী পত্নীর সঙ্গে সে উপভোগ করেছিল?' (স্মৃতির রেখা)

কে জানে এই জন্মের এই জীবনের প্রতি লোভ ও নস্ট্যাল্‌জিয়াই তাঁকে পরজন্মে বিশ্বাসী করেছিল কি না। আবার ফিরে আসবেন, পাঁচশো বছর পরে হোক কি তিন হাজার বছর পরেই হোক, একদিন আবার অন্তত এমনি এক পল্লীবধূর ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে সামান্য সাধারণ জীবনের রসাস্বাদ করবেন—এ আশ্বাস অবলম্বন না করলে বোধ করি হাঁপিয়ে উঠতেন—তাই নিজের গরজেই সেই আশাটিকে আঁকড়ে ধরেছিলেন হয়ত—

'আমি এই যাওয়া-আসার স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই। আবার যে আসতে হবে তার পর, তাও আমি জানি।...আবার বহুদূর জন্মান্তরে হয়তো ফিরতে হবে। পাঁচশো বছর পরের সূর্যের আলোকে একদিন অসহায় অবোধ শিশু-নয়ন দুটি মেলবো। পাঁচশো বছর পরের পাখীর গান, ফুলবন, জ্যোৎস্না আবার আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবে। কোন্ অজানা দেশের অজানা পর্ণ-কুটিরে কোন অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত ছায়াঝোপের তলে মাঠে বনে মুগ্ধ শৈশব কাটিয়ে—অনাগত মা-বাবার স্নেহের সুধায় মানুষ হবো।' (স্মৃতির রেখা)

এদিক দিয়ে লেখকও হয়ত ছিলেন ঘোর বদ্ধ-জীব, এই জীবনের আসক্তিতেই বদ্ধ।

বিভূতিভূষণের আর একটি জীবনশর্ত ছিল—গতি।

অচল অনড় স্থাণু জীবন তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। অনেক দেখব, কেবল ঘুরে বেড়াব, আরও দেখব, আরও। দেশ বিদেশ, বিশ্ব—এই ছিল বাল্যকাল থেকে তাঁর

স্বপ্ন, তাঁর ধ্যান। সেই স্বপ্ন-কল্পনা তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে তাঁর কল্পিত চরিত্রের স্বভাবে—তাঁর নিজের জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে।

ছেলেমেয়েদের অটোগ্রাফের খাতায় চিরদিন তিনি একই motto লিখে গেছেন—'গতিই জীবন, গতির দৈন্যই মৃত্যু'। তাঁর পথের পাঁচালীও শেষ হয়েছে সেই অসীম পথের ইঙ্গিত দিয়ে—'পথ আমার চলে গেল সামনে, সামনে, শুধুই সামনে···দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডী এগিয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে ···চল এগিয়ে যাই।'

তাঁর দিনলিপিতেও এই এগিয়ে চলার সুর পাই বার বার :

'মানুষকে শুধু চলতে হবে, চলাই তার ধর্ম। পথের নেশা তোমাকে আশ্রয় করুক। যুগে যুগে তোমাকে আসতে যেতে হবে—পথের বাঁকে বাঁকে ডালি সাজিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে—অনন্ত জীবনপথে কতবার তুমি তাদের পাবে, আবার পেছনে ফেলে চলে যাবে—আবার পাবে।···চরন্ বৈ মধু বিন্দতি।···জীবনে অনন্তকে চিনতে হবে···গতির মধ্যে দিয়ে অনন্তের স্বরূপ চোখে ধরা দেবে। হে জীবন পথের পথিক, পথের ধারে ঘুমিয়ে পড়ো না।

'নির্জন গ্রহের নির্জন পর্বতে যুগ যুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার কথা মনে পড়ে···সম্মুখে তার বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানে নি।'

'অশান্ত প্রাণ-পাখী আর মানে না—সব দিকের বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ, উদাস, অনন্ত, অকূল নীলব্যোমে মুক্তপক্ষে ওড়বার জন্যে ছটফট করছে—উড়তে চায় উড়তে চায়—পরিচিত বহুবার-দৃষ্ট একঘেয়ে গতানুগতিক গণ্ডীর মধ্যে আর নয়,······হয়তো দূরে দূরে কত শ্যামসুন্দর অজানা দেশ সীমা—তুহিন শীতল ব্যোমপথে দেবলোকের মেরু পর্বত। আলোর পক্ষে ভর দিয়ে শুধু যেখানে পাওয়া যায়, অন্যভাবে নয়।······জীবনটাকে বড় করে উপভোগ করো, খাঁচার পাখীর মতো থেকো না।'

[উপরের উদ্ধৃতিগুলি 'স্মৃতির রেখা' গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত]

লেখকের এই মানসব্যক্তিত্ব, এই আশা ও আকূতিই দেবযানের পথিক দেবতা হয়ে দেখা দিয়েছে। যে দেবতা লক্ষ লক্ষ আলোক-বর্ষ ধরে শুধুই ঘুরে বেড়াচ্ছেন :

'দেবতা তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতে লাগলেন।···কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি বেরিয়েছেন বিশ্বভ্রমণে। কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রজগৎ, কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ মানসগতিতে ভ্রমণ করেছেন। আলো বা বিদ্যুতের যেখানে পৌছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে—সে সব সুদূর নক্ষত্রমণ্ডলী পার হয়েও লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অঞ্চলে চলে গিয়েছেন। তখনও দেখেছেন বহু দূরে আর এক অজানা বিশ্বের সীমা মহাশূন্যের প্রান্তে আবছায়া দেখা যায়। আবার সে বিশ্বেও পৌছেচেন···আবার দূরে দেখতে পেয়েছেন আর এক রহস্যময় অজ্ঞাত বিশ্বের ক্ষীণ সীমান্তবর্তী ক্ষীণালোক তারকামণ্ডলী।' (দেবযান ১ম সংস্করণ ৩৯ পৃঃ)

এছাড়াও আর একটি জিনিস আছে দেবযানের মধ্যে, ধর্মাচরণ ও উপাসনা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণা। সাধারণ অনুষ্ঠান-সর্বস্ব ধর্মাচরণে বিশ্বাসী ছিলেন না তিনি। প্রেম

ভক্তিতে তাঁর আস্থা ছিল বেশী; সেদিক দিয়ে তিনি বৈষ্ণব ছিলেন। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে তাঁর ক্ষেমদাস বার বার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন তাই, পাঠক তথা পুষ্পকে বার বার নিয়ে গেছেন আচার্য রঘুনাথ দাসের কল্পনাসৃষ্ট আশ্রমে, নিয়ে গেছেন বৃন্দাবনে—গোঁপালমন্দিরে।

(বৃন্দাবনের প্রধান মন্দির যদিও গোপালমন্দির নয়—গোবিন্দর মন্দিরই। লেখক সম্ভবতঃ বৃন্দাবনে যান নি, গোপালমূর্তির প্রতি তাঁর নিজের আকর্ষণই গোপালমন্দির কল্পনা করিয়েছে। বৃন্দাবনের যা প্রধান দর্শন—গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, বঙ্কুবিহারী, কৃষ্ণচন্দ্র, শৃঙ্গার বট, বংশীবট, নিকুঞ্জবন, রাধাবল্লভ, রাধারমণ—সব কটিতেই বংশীধারী কৃষ্ণমূর্তি আছেন। সম্ভবত লেখকের পুত্রাকাঙ্ক্ষাই ভগবানকে গোপালমূর্তিতে কল্পনা করতে চাইত। পুরীতে একটি মঠ দর্শন করতে গিয়ে গোপালমূর্তি দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, বর্তমান নিবন্ধ-লেখককে বলেছিলেন, 'আমার বড্ড ইচ্ছে করছে ওর গালে আস্তে একটি চড় মারি।' সময় পেলেই এই মঠে যেতেন গোপালমূর্তি দর্শন করতে।)

অবশ্য এ ব্যাপারে মনে হয় লেখকের চিন্তার কিছু অস্বচ্ছতা আছে। জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের মধ্যে পড়ে তিনি যেন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন, ঠিক কোনটিকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করবেন তা স্থির করতে পারেন নি। এই দ্বিধা, চিন্তার এই অস্বচ্ছতা, তাঁর পরবর্তী প্রধান উপন্যাস ইছামতী গ্রন্থেও দেখতে পাওয়া যায়। ইছামতীর ভবানী বাঁড়ুয্যে লেখকেরই পরিণত মানসমূর্তি। ভবানীর তিন স্ত্রী গ্রহণও যদি তাঁর মানসিক চিন্তারই কিছুটা বহিঃপ্রকাশ বলি, খুব বোধহয় অসমসাহসিক ভাষণ হবে না। অবধূত সন্ন্যাসী নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু যখন সংসারাশ্রম নির্দেশ করেন তখন নিতাই একই সঙ্গে দুটি বোনকে বিয়ে করেন। ভবানী বাঁড়ুয্যেও সন্ন্যাসী ছিলেন, পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করতে এসে একই সঙ্গে তিনটি বোনকে বিবাহ করে ফেললেন, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ভবানীচরিত্র সৃষ্টি করার সময় নিত্যানন্দের কথাই তাঁর মনে ছিল।

কিন্তু বিভূতি বাঁড়ুয্যেও দীর্ঘকাল অবিবাহিত (বিপত্নীক বলা উচিত নয়—এতই অল্পদিনের প্রথম বিবাহিত জীবন) ভবঘুরে জীবন যাপন করার পর সাতচল্লিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন। কে জানে, নিজের বিবাহের সময় জীবনসঙ্গিনী বাছবার প্রশ্নে মেয়েদের তিনটি মূর্তি—সেবিকা, গৃহিণী ও নর্মসহচরী—তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাঁকে চিন্তিত ও দ্বিধাগ্রস্ত ক'রে তুলেছিল কিনা, কোনটি তাঁর জীবনে শান্তি এনে দেবে স্থির করতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন কিনা! অথবা সেই সময়কার সমাজ-জীবন দেখাবারই নিছক প্রচেষ্টা এটা। কিম্বা বিশুদ্ধ রসিকতা।

আমরা অবশ্য আলোচনা করছিলাম দার্শনিক অস্বচ্ছতার কথা। কিন্তু তবু মনে হয় এ বইতে লেখক প্রেমভক্তির দিকেই আরও বেশী ক'রে ঝুঁকেছেন। যিনি ভাবছেন—

'আজ নিভৃত নিস্তব্ধ রাতে তাঁর অন্তর অমৃতময় হয়েচে বলে তাঁকে বার বার মনে হতে লাগল। রহস্যময়ও বটে মধুরও বটে। মধুর ও রহস্যময় ও বিরাট ও সুন্দর ও বড় আপন

সে দেবতা। একমাত্র দেবতা, আর কেউ নেই। যিনি অনন্ত অস্পর্শ অব্যয় অরস ও অগন্ধ, অনাদি ও অনন্ত, তাঁর অপূর্ব আবির্ভাবে নৈশ আকাশ যেন থম থম করচে।'

'ভবানী বাঁড়ুয্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবেন, কোন মহাশিল্পীর সৃষ্টি এই অপরূপ শিল্প, এই শিশুও তার অন্তর্গত। এই বিপুল কাকলীপূর্ণ অপরাহ্ণে, নদীজলের স্নিগ্ধতায় শ্রীভগবান বিরাজ করছেন জলে স্থলে উর্ধ্বে অধে, দক্ষিণে উত্তরে, পশ্চিমে পূর্বে। যেখানে তিনি সেখানেই এমন সুন্দর শিশু অনাবিল হাসি হাসে, অমন সুন্দর বসন্তবৌরী পাখীর হলুদরঙের দেহের ঝলক ফুটে ওঠে।···তাঁর বাইরে কি আছে? জয় হোক তাঁর।'

তিনিই আবার বলছেন—

'কেবল থাকবেন তিনি। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে অপরিবর্তনীয়, সমস্ত গতির মধ্যে স্থিতিশীল তিনি। ঈশ্বর, ব্রহ্ম, জ্যোতিঃস্বরূপ, এ মানুষের মনগড়া কথা। সেই জিনিস যা এমন সুন্দর অপরাহ্ণে, ফুলে, ফলে, বসন্তে, লক্ষ লক্ষ জন্মমৃত্যুতে, আশায় স্নেহে, দয়ায় প্রেমে আবছায়া ধরা পড়ে, জগতের কোন ধর্মশাস্ত্রে সেই জিনিসের স্বরূপ কি তা বলতে পারে নি,·· তবু মনে হয় তিনি যত বড় হোন, আমাদের সগোত্র। আমার মনের সঙ্গে এই শিশুর মনের সঙ্গে সেই বিরাট মনের কোথায় যেন যোগ আছে। ভগবান যে আমাকে সৃষ্টি করেছেন শুধু তা নয়—আমি তাঁর আত্মীয়—খুব আপন ও নিকটতম সম্পর্কের আত্মীয়। কোটি কোটি তারার দ্যুতিতে দ্যুতিমান সে মুখের দিকে আমি নিঃসঙ্কোচে ও প্রেমের দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবার অধিকার রাখি, কারণ তিনি যে আমার বাবা।'

জ্ঞানী ভবানী বাঁড়ুয্যের পক্ষে প্রেম-ভক্তিতে এর থেকে বেশী বিহ্বল হওয়া সম্ভব নয়।

'দেবযান' প্রসঙ্গে 'ইছামতী'র উল্লেখ হয়ত একটু অবান্তর হয়ে পড়ল, তবে এই দুই বইয়ের মধ্যে সামান্য একটু যোগসূত্রও আছে। আমার বিশ্বাস—'দেবযান' লেখার পরও লেখক নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, তাঁর মনে হয়েছে যে সব কথা এখনও বলা হয় নি—তাই 'ইছামতী'র গ্রাম্য পৃষ্ঠপটে ভবানী বাঁড়ুয্যেকে তথা লেখকের মানসমূর্তিকে টেনে এনেছেন।

এই খণ্ডে যে তিনটি গল্পগ্রন্থ স্থান পেয়েছে 'উপলখণ্ড', 'বিধু মাষ্টার' ও 'ছায়াছবি', তার মধ্যে 'ছায়াছবি' লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত। যে গল্পগুলি এদিক ওদিক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল—যে সম্বন্ধে তিনিও অতটা সচেতন ছিলেন না বোধহয়—সেইগুলিই প্রধানত তাঁর আত্মীয় শ্রীমান চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যমে সংগৃহীত ও ছায়াছবি নামে প্রকাশিত হয়। এর গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখ্য এক 'মরফোলজী'—বাকীগুলি পড়লে মনে হয় কিছুটা অবহেলায় অনাদরে লেখা—নিতান্তই পত্রিকা-সম্পাদকদের কড়া তাগিদে, সময়াভাবের মধ্যে দ্রুত লিখতে হয়েছে। এক আধটি গল্পে—যেমন 'অভ্রের অনিদ্রা'—তাঁর বৈশিষ্ট্য বা মুদ্রাদোষগুলিরও চিহ্ন দেখা যায় না।

কিন্তু 'উপলখণ্ড' তা নয়। এর বেশির ভাগ কাহিনীতে বিভূতিভূষণের পরিণত লেখনীর ছাপ আছে। বিশেষ ক'রে 'আহ্বান' গল্পটি বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির অন্যতম বলেই গণ্য হবে চিরকাল। গ্রন্থপঞ্জী-লেখক বলেছেন এমন একটি স্ত্রীলোককে তিনি জানতেন; কেউ কেউ বলেন হিন্দু-মুসলমান-সম্প্রীতি বৃদ্ধির জন্যই বিশেষ ভাবে এটি লেখা—তবে কল্পনাই হোক আর সত্যই হোক, রচনাটি যে প্রথম শ্রেণীর গল্প হয়ে উঠেছে তাতে সন্দেহ নেই। বিভূতিভূষণের সহজাত মানবতা-বোধ ও দরিদ্র সরল সাধারণ মানুষদের প্রতি ভালবাসা এতে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। এই কাহিনী অবলম্বন করে পরে একটি পূর্ণাঙ্গ সার্থক চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়েছিল।

'একটি ভ্রমণ কাহিনী' তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-বোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। একটা কথা বলা এক্ষেত্রে বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই গল্পটির বীজচিন্তা আমাদের সামনেই পরিকল্পিত হয়। মিত্র-ঘোষের সুহৃদগোষ্ঠীর মধ্যে সেই সময়টা প্রায়ই বিদেশ ভ্রমণের জল্পনা হ'ত, কাগজ কলম নিয়ে বসে নানা হিসাব ও ফর্দ হ'ত প্রত্যেক দিন। বেশির ভাগ সে ভ্রমণই কল্পনাতে থেকে যেত শেষ পর্যন্ত। একদিন এমনি এক আলোচনার মধ্যে—এই শেষ অবধি না যাওয়ার কথা নিয়ে কে একজন বিদ্রূপ করাতে বলে উঠলেন, 'ঠিক হয়েছে, আমি একটা গল্পের প্লট পেয়ে গেলাম "একটি ভ্রমণ কাহিনী" বলে একটা গল্প লিখব।'

এইভাবেই একদিন এক বন্ধুপত্নীর সঙ্গে কৌতুক প্রসঙ্গে তিনি 'তাঁর ভালো মনোহরপুর খারাপ মনোহরপুর' কল্পনা করেন।

উপলখণ্ডের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিচিত্র কাহিনী হল—'নস্থমামা ও আমি'। এতে বিভূতিভূষণের সমস্ত ভঙ্গী বজায় থেকেও এটি ভিন্ন স্বাদের গল্প হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তারাশঙ্করের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় যে পুরুষটি মেয়ে সেজে ঘুরে বেড়ায়—সেও নিজেকে পরিচয় দেয় নসুবালা বলে।...

এই গ্রন্থের শেষ গল্প 'আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা' আর একটি কৌতুক-রসের গল্প। ফিল্মস্টারদের দেখার জন্য ভীড় ও মারামারি দেখেই এই ধরনের গল্প লেখার কথা মনে আসে। একদিন এমনি এক ভীড়ের প্রসঙ্গেই তিনি প্রথম বলেছিলেন, "অথচ দেখুন এর মধ্যে এখানে যদি স্বয়ং আইনস্টাইনও এসে দাঁড়ান, কেউ পুঁছবে না!" তার অল্প কদিন পরেই এই গল্প লেখা হয়।

মোটের ওপর 'উপলখণ্ড' তাঁর কয়েকটি সার্থক—এবং নিজস্ব বিশিষ্ট ভঙ্গীর গল্প-সঙ্কলন।

অখ্যাত, অপেশাদার লেখক, যাদের রচনারি কোন দিন পাঠকদের চোখের আলো পড়ল না, যারা কি লিখছে, কী তার মূল্য তাও বোঝে না—তাদের প্রতি মাঝে মাঝে কোথাও সস্নেহ কৌতুক কি সপ্রশ্রয় বিরক্তি প্রকাশ করলেও—তাদের সেই নিষ্ঠা ও সাহিত্যপ্রীতিকে বিভূতিবাবু আন্তরিক শ্রদ্ধার চোখেই দেখতেন। 'বিধু মাষ্টার' গ্রন্থের 'কবি কুণ্ডু মশায়' সেই মনোভাবেরই এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'বেচারী' ও 'অসমাপ্ত' দুটিই লেখকের টিপিক্যাল গল্প। 'অভিশাপ' বিভূতিবাবুর লাইন ছাড়া, এ ধরনের গল্প তিনি লিখতেন না, হয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা

হিসেবেই লিখতে শুরু করেছিলেন। 'সুলোচনার কাহিনী' লেখকের নিজের প্রিয় গল্প ছিল, গল্প হিসেবেও এটি এবং 'সুহাসিনী মাসিমা' উল্লেখযোগ্য। এ ধরনের কাহিনী যে-গল্প হয় তা বিভূতিবাবু ছাড়া কেউ ভাবতেও পারত না। 'মূলো—র‍্যাডিশ—হর্স র‍্যাডিশ' তাঁর তামাশা-প্রিয়তার নিদর্শন। যার কথাবার্তা বা আচরণে বিরক্ত হতেন—তার সম্বন্ধেও লেখকের মনে একটু স্নেহের স্থান থাকত—এই-ই বিভূতিবাবু। 'বাক্স-বদল' নিতান্ত সাধারণ কাহিনী এবং অতি পুরাতন 'ট্রিক'—দৈব-যোগাযোগের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এই ধরনের কাহিনী বিভূতিবাবু ছাড়া আর কারও হাতে গল্প হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। বিভূতিবাবুর অনাড়ম্বর রচনাকৌশল, যা পড়লে একবারও মনে হয় না যে তিনি কোন গল্প লেখার চেষ্টা করছেন—অথচ যে সম্বন্ধে তিনি অতি সচেতন ছিলেন (যাঁরা তাঁকে অসচেতন-শিল্পী বলেন—Unconscious artist—তাঁরা বিভূতিবাবুকে কিছুই বোঝেন নি), তা ছিল বিভূতিবাবুর ব্রহ্মাস্ত্র, সেইখানেই বিভূতিবাবু সিদ্ধ শিল্পী। সে ধরনের লেখা আর কেউ এ দেশে আজ পর্যন্ত লেখেন নি, অন্য দেশে লিখেছেন বলেও জানি না, নাটকীয়তা না থাকা সত্ত্বেও মনে গভীর দাগকাটার মতো গল্প। এই শ্রেণীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গল্প হ'ল 'তুচ্ছ' (৭ম খণ্ড রচনাবলী দ্রষ্টব্য)।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

দেবযান

১

সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে…

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

২

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥

—ভগবদ্গীতা

৩

But Mind, Life and Matter, the lower trilogy, are also indispensable to all cosmic beings not necessarily in the form or with the action and conditions which we know upon earth or in this material universe, but in some kind of action however luminous, however puissant, however subtle. For Mind is essentially that faculty of super-mind which measures and limits, which fixes a particular centre and views from that the cosmic movement.

SRI AUROBINDO'S
The Life Divine, Vol.I.

৪

Beyond these subtle physical planes of experience and the life-worlds there are also mental planes to which the soul seems to have an internatal access...but it is not likely to live consciously there if there has not been a sufficient mental or soul development in this life...

৫

We know that he creates images of these superior planes which are often mental translations of certain elements in them and erects his images into a system, a form in actual worlds; he builds up also desire-worlds of many kinds to which he attaches a strong sense of inner reality.

Vol. III. p. 77.

৬

We arrive then necessarily at this conclusion that human birth is a term at which the soul must arrive in a long succession of rebirths and that it has had for its previous and preparatory terms in the succession the lower forms of life upon earth...

৭

"God is Love and object of Love. Divine Love is not a thing of God : it is God Himself. God needs us just as we need God. This universe is the mere visible tangible aspect of Love and of the need of love."

HENRI BERGSON

কুড়ুলে-বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটের সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেচে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ী এদেশের লোক কখনো দেখেনি! পুকুরের ধারে নহবৎ-মঞ্চে নহবৎ বসেচে, রং-বেরঙের কাপড় ও শালু দিয়ে হোগলার আসর সাজানো হয়েচে। খুব জাঁকের বিয়ে।

রাত সাড়ে ন'টা। রায়সাহেবের বাড়ীর বড় নাটমন্দিরে বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়েচে। তারা সকলেই কলকাতার বাবু, কুড়ুলে-বিনোদপুরের মত অজ-পাড়াগাঁয়ে যে তাঁদের শুভাগমন ঘটেছে, এতে রায়সাহেব কৃতার্থ হয়ে গিয়েচেন, বার বার বিনীতভাবে বরযাত্রীদের সামনে এই কথাই তিনি জানাচ্ছিলেন। সভামণ্ডপ থেকে নানারকম শব্দ উত্থিত হচ্ছিল।

—ও কি পালমশায়, না-না—মাছের মুড়োটা ফেললে চলবে না—

—ওরে এদিকে একবার ভাতের বালতিটা (অর্থাৎ পোলাওএর বালতি—পোলাওকে ভাত বলাই নিয়ম, তাতে সভ্যতা, সুরুচি ও বড়মানুষী চালের বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়) নিয়ে আয় না—এঁদের পাত যে একেবারেই খালি—সন্দেশ আর দুটো নিতেই হবে—আজ্ঞে না, তা শুনবো না—বাটাছানার না হলেও পাড়াগাঁয়ের জিনিসটা একবার চেখে দেখুন দয়া করে—

ওদিকে যখন সবাই বরযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত, নাটমন্দিরের সামনের উঠানে একপাশে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি সাধারণ লোক খেতে বসেচে। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র—সে অন্য লোকদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বজায় রেখে একটু কোণ মেরে বসেচে। বসলে কি হবে, এদের দিকে পরিবেশনের মানুষ আদৌ নেই—ফলে এরা হাত তুলে খালি-পাত কোলে বসে আছে।

ব্রাহ্মণযুবকের নাম যতীন। পাশের গ্রামের বেশ সৎ বংশের ছেলে। বয়েস তার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। লোকটি বড়ই হতভাগ্য। বেশ সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া ভালই জানে, এম্-এ পর্যন্ত পড়ে গান্ধীজীর নন্-কো-অপারেশনের সময় কলেজ ছেড়ে বাড়ী আছে। বিবাহ করেছিল, কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে, আজ কয়েক বৎসর তার স্ত্রী তার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেচে। এখানে নিজেও আসে না, ছেলেমেয়েদেরও আসতে দেয় না। যতীনের বাপ-মা কেউ জীবিত নন—সুতরাং বড় বাড়ীর মধ্যে ওকে নিতান্তই একা থাকতে হয়, তার ওপর ঘোর দারিদ্র্যের কষ্ট। একজনের খরচ, তাই চলে না।

ভরসারাম কুণ্ডুর ছোটভাই ওদের পাতের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো—আরে এই যে যতীন, পাচ্চ-টাচ্চ তো সব? ওরে কে আছিস্ এদিকে পাতে লুচি দিয়ে যা—

যতীনের মনটা খুশি হোল। এতক্ষণ সত্যিই তাদের এখানে দেখবার লোক ছিল না।

আয়োজন খুব বড় বটে কিন্তু পরিবেশন করবার ও দেখাশুনো করবার লোকের অভাবে সাধারণ নিমন্ত্রিতদের অদৃষ্টে বিশেষ কিছু জুটচে না।

আহারাদি শেষ হয়ে গেল। এখুনি পুকুরের ধারে বাজি পোড়ানো হবে, কলকাতা থেকে বরপক্ষ ভাল বাজি এনেচে, এসব পাড়াগাঁয়ে অমন কেউ দেখেনি। বাজি দেখবার জন্যে পুকুরের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়েচে। যতীনও তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

হুস্ শব্দে একটা হাউই আকাশে উঠে গিয়ে প্রায় নক্ষত্রের গায়ে ঠেকে ঠেকে তারপর লাল নীল সবুজ ফুল কেটে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে লাগল।

দলের অনেকে চীৎকার করে উঠলো, আগুন লাগবে। আগুন লাগবে।

দু-চারবার এ রকম তারাবাজি উঠলো নামলো, কারো ঘরের চালে আগুন লাগলো না দেখে উদ্বিগ্ন লোকদের মন শান্ত হোল।

তারাবাজি একটার গায়ে একটা হুস্ করে আকাশে উঠছিল, আর যতীন আশ্চর্য হয়ে সে দিকে চেয়ে দেখছিল একদৃষ্টে উর্ধ্বমুখে। বহুদিন ধরে সে পাড়াগাঁয়ে নিতান্ত দুরবস্থায় পড়ে আছে, অনেকদিন ভাল কিছু দেখে নি। কলকাতার সে ছাত্রজীবন এখন আর মনে পড়ে না যেন—সে সব যেন গত জন্মের কাহিনী।

সুতোরগাছির মেঘনাথ চক্কত্তি ওকে দেখে বল্লে—এই যে যতীন। আজ রায়সাহেবের বাড়ী খেলে নাকি? তোমার নেমন্তন্ন ছিল; তা তোমাদের বলতে সাহস করে—কই আমাদের বলুক দিকি? ছোট জাত তিলি-তামাল, না হয় দুটো টাকাই হয়েচে, তা বলে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে বাড়ীতে!…তোমরা গিয়ে গিয়ে নিজেদের মান খুইয়েচ তাই তোমাদের বলতে সাহস করে—ছিঃ—

যতীন যখন বাড়ী পৌঁছলো তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বাঁশবনের মধ্যে সুঁড়ি পথ পেরিয়ে ওর পৈতৃক আমলের কোঠা। অনেকগুলো ঘরদোর, বাইরে চণ্ডীমণ্ডপ, তবে এখন সবই শ্রীহীন। একটা ধানের বড় গোলা ছিল, অর্থকষ্টে পড়ে গত মাঘমাসে সে সাড়ে সাত টাকায় গোলাটা বিক্রী করে ফেলেচে। গোলার ইটে-গাঁথুনি-সিঁড়ি ক'খানা মাত্র বর্তমান আছে।

আলো জ্বেলে নিজের বিছানাটা পেতে নিয়েই সে আলোটা নিভিয়ে দিলে—তেলের পয়সা জোটে কোথা থেকে যে আলো জ্বালিয়ে রাখবে। অন্ধকার শূন্য বাড়ীতে একা বসলেই মনে পড়ে আশালতার কথা।

আশালতা কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে? বিয়ের পরে প্রথম পাঁচ বছরের কথা মনে হোলে তার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। এই ধরনের কত শ্রাবণ-রাত্রিতে ঐ ছাদে সে কত নিভৃত আনন্দ-মুহূর্তের কাহিনী এই বাড়ীর বাতাসে আজও বাজে, কত মিষ্টি কথা, কত চাপা হাসি, কত সপ্রেম চাহনি।

মনে পড়ে তারা দুজনে একসঙ্গে তারকেশ্বর গিয়েছিল একবার, তখন যতীনের বড় ছেলেটি

আট মাসের শিশু। যাবার আগের দিন রাত্রে আশা রাত একটা পর্যন্ত জেগে খাবার তৈরী করলে। বল্লে, তোমায় কোথাও বাজারের খাবার খেতে দেবো না। নানারকম অসুখ করে যা-তা খাবার খেলে। তার চেয়ে তৈরী করে নিলুম, সস্তাও হবে কেনা খাবারের চেয়ে। ওখানে গিয়ে বাবার প্রসাদ খেলেই চলবে, পথে এই যা করে নিলুম এতেই কুলিয়ে যাবে।

পথে দুষ্টুমি করে যতীন সব খাবার খেয়ে ফেলেছিল নৈহাটি যাবার আগেই, আশাকে ঠকাবার জন্যে। নৈহাটি স্টেশনে খাবার খেতে চাইলে আশা অপ্রতিভ হয়ে পড়লো, খাবার একটুকরোও নেই। যতীন হেসে বল্লে—কেমন, বাজারের খাবার কিনতে হবে না যে বড়! এখন কি হয়?

হয়তো অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই পরের পাঁচ ছ'মাস তাদের দুজনকে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা জুগিয়েছিল।—মনে আছে সেই নৈহাটি স্টেশনের কথা? কি হয়েছিল বল তো?

—যাও যাও, পেটুক গণেশ কোথাকার! আমি কি করে জানবো যে—ইত্যাদি ইত্যাদি···

আহা, প্রথম যৌবনের স্বপ্নে রঙীন্ রাগ-সাগরের লীলাচঞ্চল বীচিমালার সে কত চপল নৃত্য! কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে, মিশিয়ে গিয়েচে, অতলতলে তলিয়ে গিয়েচে সে সব দিন—তার ঠিকানা নেই, খোঁজ নেই, খবর নেই।

সেই আশালতা আছে তার বাপের বাড়ীতে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি দেয়নি যে তার স্বামী বেঁচে আছে না মরেচে। সেও শ্বশুরবাড়ী যায় না; একবার বছর-তিনেক আগে গিয়েছিল, নিতান্ত না-থাকতে পেরে। আগে থেকে একখানা চিঠি গিয়েছিল যে সে যাচ্চে।

দুপুরের আগে সে গিয়ে পৌঁছুলো। অনেক আগ্রহ করে গিয়েছিল। শাশুড়ীঠাকরুণ রান্না-ঘরের দাওয়ায় বসে কুটনো কুটছিলেন, তাকে দেখে যেন ভূত দেখলেন। যতীন গিয়ে তাকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই তিনি উদাসীন সুরে বল্লেন—থাক্ থাক্ হয়েচে, তারপর, এখন কি মনে করে এখানে?

—এই সব দেখাশুনো করতে এলাম। ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে? কোথায় সব?

—ঐ যে বাইরের দিকে খেলা করচে—ডেকে দিচ্চি।

যতীন স্ত্রীর কথাটা লজ্জায় উল্লেখ করতে পারলে না।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করলে। তাদের মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে যতীনের মনে হোল তারা কি একটা যেন ঢাকচে। ছেলেমেয়েও সব পর হয়ে গিয়েচে, ওর কাছে বড় একটা ঘেঁষতে চায় না আর। ছোট মেয়েটা তো তাকে দেখে নি বল্লেই হয়, আশা যখন চলে এসেছিল তখন খুকীর বয়েস এক বছর মাত্র।

খাওয়া-দাওয়ার সময়েও আশাকে দেখা গেল না। তার ঘরেও নয়। ওর মনে ভয় হোল, আশা বেঁচে আছে তো? লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে---ওদের মা কোথায়? দেখচি নে যে?

শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বল্লেন—সে এখানে নেই বাপু। সে আজ দিন-দশেক হোল গিয়েচে তার

দিদির শ্বশুরবাড়ী বারাসতে। তারা অনেকদিন থেকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করছিল, তা আমি বলি যাক বাপু দুদিন একটু বেড়িয়ে আসুক। জীবনে তো তার সুখের সীমে নেই।

. যতীন ভীষণ নিরাশ হোল। সে যে কত কি মনে ভেবে এসেচে, আশাকে বলবে - চল আশা, যা হবার তা হয়ে গিয়েচে—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চলো। কাকে নিয়ে কাটাই বলো তো তুমি যদি এমন করে থাকবে?

তারপর শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে—কবে আসবে?

—আসা-আসির এখন ঠিক নেই। এ মাসে তো নয়ই, পুজোর সময় পর্যন্তও থাকতে পারে। এখানে রাঁধবার লোক নেই, বুড়োমানুষ এতগুলো লোকের ভাতজল করচি দুবেলা, প্রাণ বেরিয়ে গেল।

শেষের কথাটি যে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত, যতীনের তা বুঝতে দেরি হোল না। বিকেলের দিকেই সে ভগ্নমনে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। পথে তার খুড়তুতো শালী আন্না, দশ বছরের মেয়ে, অশথ-তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে কাছে এসে বল্লে—দাদাবাবু, আজই এলেন, আজই চল্লেন যে! রইলেন না?

—না, সব দেখাশুনো করে গেলুম। তা ছাড়া তোর দিদি তো এখানে নেই, অনেকদিন পরে এলুম, প্রায় বছর দুই পরে, দেখাটা হোল না।

আন্না কেমন এক অদ্ভুত ভাবে ওর দিকে চাইলে—তারপরে এদিক ওদিক চেয়ে সুর নিচু করে বল্লে—একটা কথা বলবো দাদাবাবু, কাউকে বলবেন না আগে বলুন!

যতীন বল্লে—না, বলছি নে। কি কথা রে আন্না?

—দিদি এখানেই আছে, কোথাও যায় নি। আপনার আসবার খবর পেয়ে চৌধুরীদের বাড়ী ওর সই-মার কাছে লুকিয়ে আছে। জ্যাঠাইমা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে আপনার কাছে এসব কথা না বলতে।

যতীন বিস্মিত হয়ে বল্লে—ঠিক বলচিস্ আন্না!

পরেই বালিকার সরল চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে এ প্রশ্ন নিরর্থক। সে দৃষ্টিতে মিথ্যার ভাঁজ ছিল না।

যতীন চলে আসচে, আন্না বল্লে—আজ থেকে গেলেন না কেন দাদাবাবু?

—না, থাকা হবে না আন্না। বাড়ীতে কাজকর্ম ফেলে এসেচি বুঝলি নে?

আন্না আবার বল্লে - দিদিকে একবার চুপি চুপি বলে আসবো যে আপনি চলে যাচ্ছেন, যদি দেখা করে? যাবো দাদাবাবু?

বালিকার সুরে করুণা ও সহানুভূতি মাখানো। সে ছেলেমানুষ হলেও বুঝেছিল যতীনের প্রতি তার শ্বশুরবাড়ীর আচরণের রূঢ়তা। বিশেষ করে তার নিজের স্ত্রীর।

যতীন অবিশ্যি রইল না, চলেই এল।

চলে এল বটে, কিন্তু যে যতীন গিয়েছিল, সে যতীন আর আসে নি। মনভাঙা দেহটা কোনো রকমে বাড়ীতে টেনে এনেছিল মাত্র।

তারপর দীর্ঘ তিন বছর কেটে গিয়েচে। একথা ঠিক যে, সে রকম বেদনা তার মনে এখন আর নেই, থাকলে সে পাগল হয়ে যেতো। সময় তার ক্ষতে অনেকখানি প্রলেপ বুলিয়ে জ্বালা জুড়িয়ে এনেচে। কিন্তু এমন দিন, এমন রাত্রি আসে যখন স্মৃতির দংশন অসহ্য হয়ে ওঠে।...

তবুও নীরবে সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া আর উপায় কিছু তো নেই। এই ক'বছরের মানসিক যন্ত্রণায় ওর শরীর গিয়েচে, মন গিয়েচে, উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই, অর্থ উপার্জনের স্পৃহা নেই, মান-অপমান বোধ নেই।

যে যা বলে বলুক, দিন কোনো রকমে কেটে গেলেই হোল। কিসে কি এসে যায়? তেলি-তামলির বাড়ী নেমন্তন্ন খেলেই বা কি, রবাহূত অনাহূত গেলেই বা কি, লোকে নিন্দে করলেই বা কি, প্রশংসা করলেই বা কি। কিছু ভাল লাগে না—কিছু ভাল লাগে না।

২

যতীনের পৈতৃক বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়। পূর্বপুরুষেরা এক সময়ে মনের আনন্দে ঘরদোর করে গিয়েচেন। এখন এমন দাঁড়িয়েচে যে সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না। পূর্বদিকের আলসেটা কাঁঠালের ডাল পড়ে জখম হয়ে গিয়েচে বছর দুই হোল। মিস্ত্রী লাগানোর খরচ হাতে আসে নি বলে তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রয়েচে।

গত ত্রিশ বৎসরের কত পদচিহ্ন এই বাড়ীর উঠানে। বাবা...মা...বউদিদি...মেজদিদি... পিসিমা...দুই ছোট ভাই...আশা ·খোকা-খুকীরা...

কত ভালবাসতো সবাই...সব স্বপ্ন হয়ে গেল...কেউ নেই আজ...

সে শিক্ষিত বলে আগে গ্রামের লোক তাকে খুব মেনে চলতো। এখন তারা দেখেচে যে শিক্ষিত হয়েও তার এক পয়সা উপার্জন করবার শক্তি নেই, এতে এখন সবাই তাকে ঘৃণা করে। তার নামে যা-তা বলে।

আশা যখন প্রথম প্রথম বাপের বাড়ী গিয়েছিল, তখন লজ্জা ও অপমান ঢাকবার জন্যে যতীন গাঁয়ে সকলের কাছে বলে বেড়াতো—শাশুড়ী-ঠাকরুণের হাতে অনেক টাকা আছে—কোন্ দিন মরে যাবেন, বয়েস তো হয়েচে। এদিকে বড় মেয়ে প্রায়ই মার কাছে থাকে, পাছে টাকার সবটাই বেহাত হয়ে যায় তাই ও বল্লে—ছাখো, এই সময়টা কিছুদিন মার কাছে গিয়ে থাকি গে। নইলে কিছু পাবো না।

এই কৈফিয়ৎ প্রথম প্রথম খুব কার্যকরী হয়েছিল বটে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল, এখন লোকে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কেউ বলে, অনেকদিন হয়ে গেল, এইবার গিয়ে বৌকে নিয়ে এসো গে যতীন। শাশুড়ীর টাকার মায়া ছেড়ে দাও, বুড়ী সহজে মরবে না।

পিছনে কেউ বলে—এই মোটর গাড়ীর শব্দ ওঠে ছাখো না! যতীনের বৌ টাকার পুঁটুলি নিয়ে মোটর থেকে নেমে বলবে—এই নাও পাঁচ হাজার টাকা। তোমার টাকা তুমি রাখো। কি করবে করো—আমি খালাস হই তো আগে! এই ধরো পুঁটুলিটা।

তা ছাড়া আরও কত রকমের কথা বলে—সে সব এখানে ব্যক্ত করবার নয়।

এই সমস্ত ব্যঙ্গ-অপমান যতীনকে বেমালুম হজম করে ফেলতে হয়। সয়ে গিয়েচে, আর লাগে না—মাঝে মাঝে কষ্ট হয় মানুষের নিষ্ঠুরতা বর্বরতা দেখে। একটা সহানুভূতির কথা কেউ বলে না, কেউ এতটুকু দরদ দেখায় না—কি মেয়ে, কি পুরুষ। সংসার যে কি ভয়ানক জায়গা, দুঃখে কষ্টে না পড়লে বোঝা যায় না। দুঃখীকে কেউ দয়া করে না, সবাই ঘৃণা করে।

মানুষ হয়ে মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারতো না যদি একটু ভেবে দেখতো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের চিন্তার বালাই নেই তো!

এসব ভেবে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এসব সে গায়ে মাখে না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের অপমান। এর পরেও সে লোকের বাড়ীতে ভাত চেয়ে খায়। কোনদিন লোকে দেয়, কোনদিন দেয় না—বলে, বাড়ীতে অসুখ, রাঁধবার লোক নেই—বড়ই লজ্জিত হোলাম ভাই…ইত্যাদি।

যতীনের বাড়ীর পেছনে খিড়কির বাইরে ছোট্ট একটু বাগান আছে, তাতে একটা বড় পাতিলেবুর গাছ আছে। যেদিন কোথাও কিছু না মেলে, গাছের লেবু তুলে সে বিনোদপুরের হাটে বিক্রী করতে নিয়ে যায়, আম কাঁঠালের সময় গাছের আম কাঁঠাল মাথায় করে হাটে নিয়ে যায়। এতেও লোকে নিন্দে করে—শিক্ষিত লোক হয়ে ভদ্রসমাজের মুখ হাসাচ্চে। রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডু কেন তার বাড়ীর কাজকর্মে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করতে সাহস না করবে?

এক সময়ে বড্ড বই পড়তে ভালবাসতো সে। অনেক ভাল ভাল ইংরিজি বই ছিল, সংস্কৃত বই ছিল তার ঘরে—কতক নষ্ট হয়ে গিয়েচে, কতক সে-ই বিক্রী করে ফেলেচে অভাবে পড়ে। এইসব নির্জন রাত্রে বইগুলোর জন্যে সত্যি মনে কষ্ট হয়।

এইরকম নির্জন রাত্রে বহুদিন আগেকার আর একজনের কথা মনে পড়ে। সে স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে অনেকদিন। ভুলেও তাকে গিয়েছিল, কিন্তু আশা চলে যাওয়ার পরে তার কথা ধীরে ধীরে জেগে উঠেচে।

গত পাঁচ বছরে যতীন অনেক শিখেচে। মানুষের দুঃখ বুঝতে শিখেচে, নিজের দুঃখে উদাসীন হয়ে থাকতে শিখেচে, জীবনের বহু অনাবশ্যক উপকরণ ও আবর্জনাকে বাদ দিয়ে সহজ অনাড়ম্বর সত্যকে গ্রহণ করতে শিখেচে।

বর্ষার শেষে যতীন পড়ল অসুখে। একা থাকতে হয়, এক ঘটি জল দেবার মানুষ নেই। মাথার কাছে একটা কলসী রেখে দিত—যতক্ষণ শক্তি থাকতো নিজেই জল গড়িয়ে খেত—যখন না থাকতো শুয়ে চিঁ চিঁ করত। গাঁয়ের লোক একেবারেই যে দেখেনি তা নয়, কিন্তু সে নিতান্ত দায়সারা গোছের দেখা। তারা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে যেতো—হয়তো ছেলেমেয়ের হাতে দিয়ে কচিৎ এক বাটি সাবুও পাঠিয়ে দিতো—সেও দায়সারা গোছের। সে দেওয়ার মধ্যে স্নেহ ভালবাসার স্পর্শ থাকতো না।

অনেকে পরামর্শ দিত—ওহে, বৌমাকে এইবার একখানা পত্র দাও। তিনি আসুন—না

এলে এই অবস্থায় কে দেখে, কে শোনে, কে একটু জল মুখে দেয়। আমাদের তো সব সময় আসা ঘটে ওঠে না, বুঝতেই তো পারো, নানারকম ধান্ধাতে ঘুরতে হয়। নইলে ইচ্ছে তো করে, তা কি আর করে না?···ইত্যাদি।

এ কথার কোনো উত্তর সে দিত না।

৩

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি যতীন সেরে উঠলো। যার কেউ নেই, ভগবান তাকে বোধ হয় বেশিদিন যন্ত্রণা ভোগ করান না। হয় সারান, নয় সারাবার ব্যবস্থা করেন। বৈকালের দিকে নদীর ধারের মাঠে সে বেড়াতে গেল। একটা বড় জায়গায় একটা বড় বাবলা কাঠের গুঁড়ি পড়ে। চারিদিক ঘিরে সেখানে বনঝোপ। পড়ন্ত বেলায় পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করচে, কেলে-কোঁড়া লতায় শরতের প্রথমে সুস্নিগ্ধ ফুল ফুটেচে, নির্মেঘ আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল।

গাছের গুঁড়িটার ওপর সে দেহ এলিয়ে দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় রইল। শরীর দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে বা বসতে কষ্ট বোধ হয়।

ওর মনে একটা ভয়ানক কষ্ট···বিশেষ করে এই অসুখটা থেকে ওঠবার পরে। মনটা কেমন দুর্বল হয়ে গিয়েচে রোগে পড়ে থেকে। নইলে যে আশালতা অত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেচে তার সঙ্গে, রোগশয্যায় পড়ে সেই আশালতার কথাই অনবরত মনে পড়বে কেন। শুধু আশালতা··· আশালতা···

না, চিঠি সে দেবে না—দেয়ও নি। মরে যাবে তবুও চিঠি দেবে না। মিথ্যে অপমান কুড়িয়ে লাভ কি, আশালতা আসবে না। যদি না আসে, তার বুকে বড় বাজবে, পূর্বের ব্যবহার সে খানিকটা এখন ভুলেচে, স্বেচ্ছায় নতুন দুঃখ বরণ করার নির্বুদ্ধিতা তার না হয়। সে অনেক দুঃখ পেয়েচে, আর নয়।

সব মিথ্যে··· সব ভুল···প্রেম, ভালবাসা সব দুদিনের মোহ। মূর্খ মানুষ যখন মজে, হাবুডুবু খায়, তখন শত রঙীন কল্পনা তাতে আরোপ ক'রে প্রেমাস্পদকে ও মনের ভাবকে মহনীয় করে তোলে। মোহ যখন ছুটে যায়, অপস্রিয়মাণ ভাঁটার জল তাকে শুষ্ক বালুর চড়ায় একা ফেলে রেখে কোন্ দিক দিয়ে অন্তর্হিত হয় তার হিসেব কেউ রাখে না।

এই নিভৃত লতাবিতানে, এই বৈকালের নীল আকাশের তলে বসে সে অনুভব করলে জগতের কত দেশে, কত নগরীতে, কত পল্লীতে কত নরনারী, কত তরুণ, কত নবযৌবনা বালিকা প্রেমের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে আজ এই মুহূর্তে কত যন্ত্রণা সহ্য করচে। নিরুপায় অসহায় নিতান্ত দুঃখী তারা। অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রে তাদের দুঃখ দূর করা যায় না। কেউ তাদের দুঃখ দূর করতে পারে না। এই সব দুঃখীদলের সেও একজন। আজ পৃথিবীর সকল দুঃখীর সঙ্গে সে যেন একটা অদৃশ্য যোগ অনুভব করলে নিজের ব্যথার মধ্যে দিয়ে।

দারিদ্র্যকে সে কষ্ট বলে মনে করে না। কেউ তাকে ভালবাসে না, এই কষ্টই তাকে যন্ত্রণা

দিয়েচে সকলের চেয়ে বেশি। আশা যদি আবার আজ ফিরে আসে—পুরোনো দিনের আশা হয়ে ফিরে আসে—সে নতুন মানুষ হয়ে যায় আজ এই মুহূর্তে। দশটি বছর বয়েস কমে যায় তার।

যাক, আশার কথা আর ভাববে না। দিনরাত ঐ একই চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠেচে। সে পাগল হয়ে যাবে নাকি?

হঠাৎ সে দেখলে হাউ হাউ করে কাঁদচে।

একি ব্যাপার! ছিঃ ছিঃ—নাঃ, সে সত্যিই পাগল হবে দেখচি। যতীন কাঠের গুঁড়িটা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে ব্যস্তভাবে পায়চারি করতে লাগলো। নিজেকে সে সংযত করে নিয়েচে—আর সে ও কথাই ভাববে না। যে গিয়েচে, ইচ্ছে করে যে চলে গিয়েচে, তাকে মন থেকে কেটে বাদ দিতে হবে—হবেই। কেটে বাদই দেবে সে।

যতীন বাড়ী ফিরে এল। অন্ধকার বাড়ী, অন্ধকার দোর। ভাঙা তক্তাপোশের ওপর তার রাজশয্যা তো পাতাই আছে। সে কেউ ঝাড়েও না, পাতেও না, তোলেও না। অন্ধকারের মধ্যে শয্যায় দেহ প্রসারিত করে শোবার সময় একবার তার মনে হোল—সেই আশা কেমন করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারলে!

সেই রাত্রেই যতীনের আবার খুব জ্বর হোল। হয়তো এতখানি পথ যাতায়াত করা, এত ঠাণ্ডা লাগানো দুর্বল শরীরে তার উচিত হয় নি। পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল—কেউ খোঁজখবর নিলে না। দুপুরের পর বোষ্টমদের বৌ ওদের উঠোনে তাদের পোষা ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলা পর্যন্ত ঘরের দোর বন্ধ দেখে বাড়ী গিয়ে খবর দিলে। সে সকালের দিকে আরও দুবার এদিকে কি কাজে এসে দোর বন্ধ দেখে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে সন্ধ্যার কিছু আগে তার জ্বর কমলে সে নিজেই দোর খুললে। কিন্তু এক পাও বাইরে আসতে পারলে না। বিছানায় গিয়েই শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণায় তার জিব শুকিয়ে গিয়েচে। কাছাকাছি কারো বাড়ী নেই যে, ডাকলে শুনতে পাবে। বেশি চেঁচানোরও শক্তি নেই।

সকালে কেউ দেখতে এল না। এর একটা কারণ ছিল। যতীনের বাড়ী ইদানীং বড় একটা কেউ আসতো না। এক ছিলিম তামাকও যেখানে খেতে না পাওয়া যাবে, পাড়াগাঁয়ে সে-সব জায়গায় লোক বড় যাতায়াত করে না। কাজেই দুদিন কেটে গেল, যতীনের ঘরের দোর বন্ধ রইল, কেন লোকটা দোর খুলছে না, এ দেখবার লোক জুটলো না। পরের দিন অনেক বেলায় বোষ্টম-বৌ আবার ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলায় যতীনের দোর বন্ধ দেখে ভাবলে—যতীন ঠাকুর কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্চে আজকে!…বেলা দশটা বাজে এখনও সাড়া-শব্দ নেই! বেলা বারোটার সময় একবার কি ভেবে আবার এসে দেখলে তখনও দোর বন্ধ। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলে না। পাড়ার মধ্যে খবরটা বল্লে।

পাড়ার দু-চারটা ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের যুবক এসে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

—ও যতীন-দা, এত বেলায় ঘুম কি, দোর খুলুন—ও যতীন-দা—

কেউ সাড়া দিলে না। আরও লোকজন জড় হোল—দোর ভাঙা হোল।

যতীন বিছানায় মরে কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ মরেচে কে জানে, দুঘণ্টাও হতে পারে, দশঘণ্টাও হতে পারে।

তখন সকলে খুব দুঃখ করতে লাগলো। বাস্তবিকই কারো দোষ ছিল না। যতীন লোকটা আজকাল কেমন হয়ে গিয়েছিল, লোকজনের সঙ্গে তেমন করে মিশতো না, কথাবার্তা বলতো না বলে লোকেও এদিকে বড় একটা আসতো না। সুতরাং যতীনের আবার অসুখ হয়েচে, এ খবরও কেউ রাখে না।

নবীন বাঁড়ুয্যে বল্লেন—আহা, ভবতারণ-দা'র ছেলে! ওর বাবার সঙ্গে একসঙ্গে পাশা খেলেচি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে। লোকটা বেঘোরে মারা গেল। তাই-কি আমি জানি ছাই যে এমনি একটা অসুখ হয়েচে (বাস্তবিকই তিনি জানতেন না), আমার স্ত্রী আর আমি এসে রাত জাগতাম। আর সে বৌটিরই বা কি আক্কেল—ছ'বছরের মধ্যে একবার চোখের দেখা দেখলে না গা—হঁ্যা?

সকলে একবাক্যে যতীনের বৌ-এর উদ্দেশে বহু গালাগালি করলে।

যতীনের মৃতদেহ যখন শ্মশানে সৎকারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হোল, তখন বেলা দুটোর কম নয়।

৪

যতীন হঠাৎ দেখতে পেলে তার খাটের পাশে পুষ্প দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসচে।...

পুষ্প! এক সময় পুষ্পের চেয়ে তার জীবনে প্রিয়তর কে ছিল?

দুজনে—

নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠার পাটে
কত খেলেচি ফুল ভাসায়ে জলে—

সেই পুষ্প।

নৈহাটির ঘাট নয়—সাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। নৈহাটির আরপারে। সেখানে ছেলেবেলায় তার মাসীমার জীবদ্দশায় সে কতবার গিয়েচে। এক এক সময় ছ'মাস আটমাস মাসীমার কাছেই সে থাকতো। মাসীমার ছেলেপুলে ছিল না, যতীন ছিল তার চক্ষের মণি। তারপর মাসীমা মারা গেলে, মেসোমশায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন, সাগঞ্জ-কেওটাতে মাসীমার বাড়ীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল ওর কাছে।

বুড়োশিবতলায় পুরোনো মন্দিরের কাছে ছিল ওর মাসীমার বাড়ী আর রাস্তার ওপাশেই ছিল পুষ্পদের বাড়ী। পুষ্পর বাবা শ্যামলাল মুখুয্যে বাঁশবেড়ের বাবুদের জমিদারিতে কি কাজ করতেন। পুষ্প ছিল ভারি সুন্দরী মেয়ে—তার হাসি—সে হাসি কেবল পুষ্পই হাসতে পারতো।

দোষের মধ্যে পুষ্প ছিল অত্যন্ত গর্বিত মেয়ে। তার বিশ্বাস ছিল তার মত সুন্দরী মেয়ে এবং তার বাবার মত সম্ভ্রান্ত লোক গঙ্গার ওপারে কোথাও নেই।

ধীরে ধীরে পুষ্পের সঙ্গে ওর আলাপ হয়, ধীরে ধীরে সে আলাপ জমে। ও তখন তেরো বছরের ছেলে, পুষ্প তেরো বছরের মেয়ে। সমান বয়স হোলে কি হবে, বাচাল ও বুদ্ধিমতী পুষ্পের কাছে যতীন ভেসে যেত। পুষ্প চোখে-মুখে কথা কইতো, যতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার গর্বিত সুন্দর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইত। মস্ত অশ্বত্থগাছ যে পুরোনো ঘাটটার ওপরে, যেটার নাম সেকালে ছিল বুড়োশিবতলার ঘাট, ওই ঘাটে কতদিন সে ও পুষ্প একা বসে গল্প করেচে, জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানের দিন পাঁপরভাজা কিনে ঘাটের রানার ওপর বসে দুজনে ভাগ করে খেয়েচে। কেমন করে যে সেই রূপ-গর্বিতা বালিকা তার মত সাদাসিধে ধরনের বালককে অত পছন্দ করেছিল, অত দিনরাত মিশতো, নিত্য তাদের বাড়ী না গেলে অনুযোগ করতো—এ সব কথা যতীন জানে না, সে সব বোঝবার বয়েস তখন ওর হয়নি।

দু-দশ দিন নয়, দেড় বছর দুবছর ধরে দুজনে কত খেলা করেচে, কত গল্প করেচে, কত ঝগড়া করেচে, পরস্পরের নামে পরস্পরের গুরুজনের কাছে কত লাগিয়েচে, আবার দুজনে পরস্পরে যেচে সেধে ভাব করেচে—সে কথা লিখতে গেলে একখানা ইতিহাসের বই হয়ে পড়ে।

মাসীমার মৃত্যুর পরে কেওটায় পথ বন্ধ হোল। বছরখানেকের মধ্যে পুষ্পও বসন্ত হয়ে মারা গেল। দেশে থাকতে পুষ্পর মৃত্যুসংবাদ মেসোমশায়ের চিঠিতে সে জেনেছিল। তারপর তেরো বছর কেটে যাওয়ার পরে ছাব্বিশ বছর বয়সে যতীন বিবাহ করে। বাল্যের তেরো বছর—বহুদিন। পুষ্প তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েচে। তারপর আশালতার সঙ্গে নবীন অনুরাগের রঙীন দিনগুলিতে পুষ্প একেবারে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু চাপা পড়ে যাওয়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিস নয়। মানুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ, এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। সে কক্ষ সেই অতিথির হাসিকান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনও যে কক্ষ সে একবার অধিকার করেছে সে তারই এবং তারই চিরকাল। আর কেউ সে কক্ষে কোনো দিন কোনো কালে ঢুকতে পারে না। সে যদি আর ফিরেও না আসে কখনো, চির-দিনের জন্যই চলে যায়—এবং জানিয়ে দিয়েও যায় যে সে ইহজীবনের মতই চলে যাচ্ছে—তখন তার সকল স্মৃতির সৌরভ সুদ্ধ সে ঘরের কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়—তারই নাম লেখা থাকে সে দোরের বাইরে। তার নামেই উৎসর্গীকৃত সে ঘর আর-কারো অধিকার থাকে না দখল করবার।

পুষ্পের ঘরের কবাট বন্ধ ছিল—চাবি দেওয়া, বাইরে ছিল পুষ্পের নাম লেখা। হয়তো চাবিতে মরচে পড়েছিল, হয়তো কবাটের গায়ে ধুলো মাকড়সার জাল জমেছিল, হয়তো এ ঘরের সামনে অনেক দিন কেউ আসে নি, কিন্তু সে ঘর দখল করে কার সাধ্য? আশালতা সে ঘরে ঢোকেনি—আশালতার ঘর আলাদা।

সেই পুষ্প।

যতীন অবাক্ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল। প্রথমেই যে কথাটা ওর মনে উঠলো সেটা এই যে, পুষ্পের সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পরে যে বহু বছর কেটে গিয়েচে—তেরো বছর পরে সে বিয়ে করে আশাকে, বিয়ে করেচেও আজ দশ বছর—এই দীর্ঘ, দীর্ঘ তেইশ বছর পরে কেওটার বুড়ো.শিবতলার ঘাটের সেই রূপসী মেয়ে বালিকা পুষ্প কোথা থেকে এল? যে বয়সে তারা দুজনে—

নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠার পাটে
খেলা করেছিল ফুল ভাসায়ে জলে—!

বুড়োশিবতলার ঘাটের প্রাচীন সোপানশ্রেণীর ওপরে বাঁকাভাবে অস্তসূর্যের আলো এসে পড়েচে—ঘাটের রানায় শেওলা জমেচে, ঠিক ওপারে হালিসহরে শ্যামাসুন্দরী ঘাটের মন্দিরেও পড়েচে রাঙা আলো, কিন্তু সেটা পড়েচে পশ্চিমদিক থেকে সোজাভাবে গিয়ে, এখনও সেই প্রাচীন পাখীর দল ডাকচে বড় অশ্বত্থগাছটার ডালে ডালে, সাদা পাল তুলে ইলিশ মাছ ধরা পুরোনো জেলেডিঙির সারি চলেছে ত্রিবেণীর দিকে···যতীন বসে পুষ্পের সঙ্গে গত বারোয়ারীতে যাত্রায় দেখা কি একটা পালার গল্প করচে তেইশ বছর পরেও পুষ্প এখনও সেই রকমটি দেখতে রয়েচে কেমন করে?

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল—পুষ্প তো নেই! সে তো বহুকাল মরে গিয়েচে। ব্যাপার কি, সে স্বপ্ন দেখচে না কি? পুষ্প কিন্তু এগিয়ে এসে হাসিমুখে বল্লে—অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখচো কি? চিনতে পেরেচ? বল তো আমি কে?

যতীন তখনও হাঁ করে চেয়েই আছে। বল্লে—খুব চিনেচি। কিন্তু তুই কোথা থেকে এলি পুষ্প? তুই তো কত কাল হোল—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে—মরে গিয়েচি, অর্থাৎ তোমার হাড় জুড়িয়েছিল—এই তো? কিন্তু তুমিও যে মরে গিয়েচ যতুদা? নইলে তোমার আমার দেখা হবে কেমন করে? তুমিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়েচ অর্থাৎ পটল তুলেচ।

যতীনের হঠাৎ বড় ভয় হোল। এ সব কি ব্যাপার? তার জ্বর হয়েছিল খুব, সে কথা মনে আছে। তারপর মধ্যে কি হয়েছিল তার জানা নেই। বর্তমানে বোধ হয় তার জ্বরের ঘোর খুব বেড়েচে, জ্বরের ঘোরে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখছে। তবুও সে এতকাল পরে পুষ্পকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশি হোল। স্বপ্নই বটে, বড় মধুর স্বপ্ন কিন্তু!

পুষ্প কিন্তু ওকে ভাববার অবকাশ দিলে না। বল্লে—পুরোনো দিনের মত দুষ্টুমি কোরো না যতুদা। এখন তুমি ছেলেমানুষটি নেই। এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে, থাকতে পারচি না—এখন এসো আমার সঙ্গে।

সে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি? সে তো কিছুই বুঝতে পারচে না। যাবে কোথায় চলে সে? পুষ্পই বা আসে কোথা থেকে? অথচ সে তো এই তার পুরোনো ঘরেই রয়েচে, ঐ তো

চুণবালি খসা দেওয়াল, ঐ তো উঠোনের পেঁপে গাছটি, ঐ পৈতৃক আমলের গোলার ভাঙা সিঁড়ি।

পুষ্পকে সে বল্লে—তুই কি করে জানলি আমার অসুখ করেচে? প্রশ্ন করলে বটে, অথচ যতীন সঙ্গে সঙ্গে ভাবলে, আশ্চর্য! কাকে একথা জিজ্ঞেস করচি? পুষ্প, যে তেইশ বছর আগে মারা গিয়েচে, তাকে? অদ্ভুত স্বপ্ন তো! এমনধারা স্বপ্ন তো সত্যিই জীবনে কোনদিন দেখি নি!

পুষ্প বল্লে—কি করে জানলুম? বেশ কথাটি বল্লে তো যতুদা! তোমার এই ঘরে তোমার কাছে আমি বসে নেই পরশু তোমার জ্বর হওয়ার দিন থেকে? দিন রাত্তি অনবরতই তো তোমার শিয়রে বসে।

—বলিস্ কি পুষ্প! আমার শিয়রে তুই বসে আছিস দুদিন থেকে? পুষ্প, একটা কথা বল্ তো—আমি পাগল হয়ে যাই নি তো জ্বরের ঘোরে?

—সবাই ও-রকম কথা বলে যতুদা। প্রথম প্রথম যারা আসে, তাদের বারোআনা ওই কথাই বলে। তারা বুঝতে পারে না তাদের কি হয়েচে। তুমিও জ্বালালে যতুদা।

কথা শেষ করে পুষ্প এসে হাত ধরে খাট থেকে নামিয়ে নিতেই যতীন বেশ সুস্থ ও হাল্‌কা অনুভব করলে নিজেকে। তারপর কি মনে করে খাটের দিকে একবার চাইতেই সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খাটের ওপর তার মত একটা দেহ নির্জীব অবস্থায় পড়ে। ঠিক তার মত চোখ মুখ - সবই তার মত।

পুষ্প বল্লে—দাঁড়িও না যতুদা—এসো আমার সঙ্গে। কেমন, এখন বোধ হয় বিশ্বাস হয়েচে? বুঝলে এখন?

পুষ্প তো ঘরের দরজা খুললে না? তবে তারা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো কি করে! এখনও রাত আছে। অন্ধকার রয়েচে, মাথার ওপরে অগণ্য তারা জ্বলচে, নবীন বাঁড়ুয্যের বাড়ীর দিকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করচে। অথচ এই ঘন অন্ধকার রাত্রে সে চলেচে কোথায়? কার সঙ্গেই বা চলেচে? এখনও কি সে স্বপ্ন দেখচে?

পুষ্প বল্লে—এখন বিশ্বাস হোল যতুদা? দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে এলাম দেখলে না?

—কি করে এলাম?

—ইটের দেওয়াল এখন তোমার আমার কাছে ধেঁায়ার মত। আমাদের এ শরীরে পৃথিবীর জড় পদার্থের স্পর্শ লাগবে না। আর একটা মজা তোমায় দেখাবো, পায়ে হেঁটে যেও না, মনে ভাবো যে উড়ে যাচ্চি—

যতীন মনে মনে তাই ভাবলে। অমনি সে দেখলে তার দেহ রবারের বেলুনের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলেচে। দুজনে চললো, পুষ্প আগে, যতীন তার পেছনে। কোথায় যাচ্চে, যতীন কিছুই জানে না।

সে অনেক কথা ভাবছিল যেতে যেতে। এত অদ্ভুত ঘটনা তার জীবনে আর কখনো হয়নি।

স্বপ্নে কি এমন সব ব্যাপার ঘটে ? স্বপ্ন যদি না হয় তবে কি সে পাগল হয়ে গেল ? তাই বা কেমন করে হয়, তবে পুষ্প আসে কোথা থেকে ? কিম্বা সবটাই মনের ধাঁধা—hallucination ?

না—একেই বলে মৃত্যু ?

এরই নাম যদি মৃত্যু হয় তবে লোকে এত ভয় করে কেন ? কেউ তো কখনো তাকে বলেনি যে মৃত্যুর পরে মানুষ জীবিত থাকে—বরং তার মনে হচ্চে সে আরও বেশি জীবন্ত হয়েচে—বেঁচেই বরং রোগের যন্ত্রণায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ যতীন দেখলে যে সে এক নতুন দেশে এসেচে—দেশটা পৃথিবীর মতই। তাঁর পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে—কিন্তু তাদের সৌন্দর্য অনেক বেশি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সূর্য দেখা যায় না—অথচ অন্ধকারও নেই—ভারি চমৎকার এক ধরনের অপার্থিব মৃদু আলোকে সমগ্র দেশটা উদ্ভাসিত। গাছপালার পাতা ঘন সবুজ, নানাধরনের ফুল, সেগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরী।

এক জায়গায় এসে পুষ্প থামলো।

একি ! এ তো সেই পুরোনো দিনের কেওটা-সাগঞ্জের বুড়োশিবতলার ঘাট। ঐ গঙ্গা। ঐ সেই প্রাচীন অশ্বথ গাছটা। ঐ তো বুড়োশিবের ভাঙা মন্দিরটা। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে গোধূলির সময় মেঘলা আকাশে যেমন একটা অদ্ভুত হল্‌দে আলো হয়, ঠিক তেমনি একটা মৃদু, তাপহীন, চাপা আলো গাছপালায়, গঙ্গার জলে, বুড়োশিবের মন্দিরের চুড়োয়। ওকে ঘাটের সোপানে একা বসিয়ে পুষ্প কোথায় চলে গেল। যতীন চুপ করে বসে অদ্ভুত আলোকে রঙীন গঙ্গাবক্ষের দিকে চেয়ে রইল। বাল্যের শত সুখের, শত আনন্দস্মৃতির রঙ্গস্থল সেই পুরোনো জায়গা—ঐ তো ওপারে শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, শ্যামাসুন্দরীর মন্দির। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, কোনো দিকে আর কোনো লোকজন নেই। এতখানি সুবিস্তীর্ণ স্থান একেবারে নির্জন। কেউ কোথাও নেই সে ছাড়া !

এমন সময়ে অশ্বথ গাছের তলায় সেই প্রাচীন পথটা দিয়ে পুষ্পকে আসতে দেখা গেল। তাঁর খোঁপায় কি একটা ফুলের মালা জড়ানো।

যতীন বল্লে—এ কোথায় আন্‌লি পুষ্প ? বুড়োশিবতলার ঘাট না ? এ কি সাগঞ্জ-কেওটা ?

পুষ্প যে সত্যিই দেবী, যতীন তার দিকে চেয়ে সেটা এবার ভালভাবেই বুঝতে পারলে। এমন গাঢ়যৌবনা, শান্ত আনন্দময়ী মূর্তি মানবীর হয় না—কি রূপই তার ফুটেচে। কি জ্যোতির্ময় মুখশ্রী ! যতীন অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

পুষ্প বল্লে—না যতুদা—এ স্বর্গ। সকলের স্বর্গ তো এক নয় ! ··

তারপর মৃদু হেসে সলজ্জ সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—এ আমাদের স্বর্গ—তোমার আর আমার স্বর্গ।

যতীনকে পুষ্প একটা ছোটখাটো সুন্দর বাড়ীতে নিয়ে গেল। সে বাড়ী ইট-কাটের তৈরী নয়, যেন মনে হোল এক ধরনের মার্বেল পাথরে তৈরী, কিন্তু মার্বেল পাথরও নয় সে জিনিস। বাড়ীর চারিধারে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের মাঠ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। পুষ্প বল্লে—এসব আমার তৈরী। জানো আমি এদেশে এসেচি আজ আঠারো বছর, তোমার অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে বসে আছি। পৃথিবীতে কেওটার গঙ্গার ঘাটের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু ছিল না। এখানে এসে কল্পনায় তাই সৃষ্টি করেচি। এখানে যার যা ইচ্ছে কল্পনায় গড়ে নিতে পারে। এই বাড়ীও আমার কল্পনায় তৈরী।

যতীন বল্লে—কেমন করে হয়?

—এদেশের বস্তুর ওপর চিন্তার শক্তি খুঁব বেশী! পৃথিবীর বস্তুর মত এখানকার বস্তু নয়। আরও অনেক সূক্ষ্ম—অন্য ধরণের, সে পরে নিজেই টের পাবে। চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতে তোমাকেও শিখতে হবে—সৃষ্টি করতে হোলে পৃথিবীতেও যেম্নি চিন্তার দরকার, এখানে তার চেয়েও বেশি দরকার। চিন্তার শক্তিকে যে বাড়াতে পেরেছে, ইচ্ছামত চালাতে পারে, সে এদেশের বড় কারিগর। কিন্তু এও যে বস্তু, সে বিষয়ে ভুল নেই; পৃথিবীর মানুষ যাকে চেনে, সে বস্তু নয়—তা হোলেও বস্তুই।

—আমার বাবা-মা কোথায় পুষ্প?

—এখনই আসবেন। অসুখের সময় তোমার মা আর আমি তোমার শিয়রে বসে থাকৃতাম। তাঁরা অন্য জায়গায় থাকেন। পৃথিবী থেকে তোমাকে আনতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সন্তানের মরণের দৃশ্য তাঁদের দেখতে কষ্ট হবে ভেবে আমিই তাঁদের যেতে বারণ করি। তোমার পৃথিবীর দেহটা বড্ড খারাপ দেখতে হয়ে গিয়েছিল মরণের আগে—মা গো, ভাবলে ভয় করে।

যতীন বল্লে—আর তোমাদের দেখলে আমার ভয় হচ্চে না? তোমরা যে ভূত, সেটা খেয়াল আছে?

পুষ্প বল্লে—সে তো তুমিও।

যতীন বল্লে—এদেশে আর সব লোক গেল কোথায় পুষ্প? এখানে কি তুমি আর আমি দুটি প্রাণী? তোমার বাবা-মা কোথায়?

পুষ্প হেসে বল্লে—এটা তৃতীয় স্তরের ওপরের অঞ্চল। তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েচ বলে এখানে আসতে পেরেচ—আর এসেচ আমি এখানে তোমায় ডেকেচি, ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেচি তোমার দুঃখের দিনের অবসানের জন্যে। সে সব কথা তুমি কি জানো? নইলে সাধারণ লোক মরার পরে এ জায়গায় আসতে পারে না। আমার বাবা এখনও মরেন নি, খুব বুড়ো হয়েচেন, কালনায় আছেন, আমাদের দেশে। মা অনেক বছর স্বর্গে এসেচেন বটে, কিন্তু তিনি অন্য জায়গায় আছেন। এ স্তরের নিয়ম এই যে তুমি যদি ইচ্ছে করো তুমি

কাউকে দেখতে পাবে না, কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। তুমি আমি এখন নির্জনে খানিকটা থাকতে চাই—কতকাল তোমায় দেখিনি, তোমার সঙ্গে কথা বলিনি—আমি চাইনে যে এখানে এখন কেউ আসে।

কথা শেষ করে পুষ্প একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে চেয়ে কি যেন দেখলে। তারপর বল্লে—চলো তোমায় পৃথিবীতে একবার নিয়ে যাই। তোমার মৃতদেহটা শ্মশানে দাহ করচে। তোমার দেখা দরকার।

পুষ্প যতীনের হাত ধরলে, পরক্ষণেই স্বর্গ গেল মিলিয়ে। তাদের গ্রামের শ্মশানে যতীন দেখলে সে আর পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে। চিতার ধূম জিউলি গাছটার মাথা পর্যন্ত ঠেলে উঠেচে।

যতীন হেসে বল্লে—দেখচিস্ পুষ্প, পুণ্যাত্মার চিতার ধোঁয়া কতদূর উঠেচে!

পুষ্প বল্লে—আমি না থাকলে পুণ্যাত্মাগিরি বেরিয়ে যেত।

তাদের পাড়ার ছেলে-ছোক্‌রার দল মৃতদেহ এনেচে। বুড়োদের মধ্যে এসেচেন নবীন বাঁড়ুয্যে। তিনিই মুখাগ্নি করেচেন। সকলেই আশালতাকে কি ক'রে খবরটা দেওয়া যায় সেই আলোচনা করচে।

যতীন হঠাৎ বলে উঠলো—পুষ্প, আশালতাকে একবার দেখবো। নিয়ে যাবি? ওর বড্ড সর্বনাশ করে গেলাম, ওর জন্যে ভারি মন কেমন করচে।

পুষ্প বল্লে—ভাবো যে তুমি আশালতাদের বাড়ী গিয়েচ। বেশ মনকে শক্ত করে ভাবো।

আশালতা স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ কিছুই জানে না, সে দুপুরে খাওয়ার পরে আঁচল পেতে ঘুমুচ্ছে। তাকে সে অবস্থায় নিশ্চিন্ত-মনে মাটির ওপর ঘুমুতে দেখে দুঃখে ও সহানুভূতিতে যতীনের মন পূর্ণ হয়ে গেল। আহা, হিন্দুর মেয়ে, স্বামী অভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে কি অসহায় অবস্থাতেই পড়লো!.. আজ হয়তো বুঝতে পারবে না—কিন্তু একদিন বুঝতেই হবে। মায়ের পাশে ছোট মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল, খোকা পাড়ায় কোথায় খেলতে গিয়েচে। এই বয়সে পিতৃহীন হোল—সত্যি, কি দুর্ভাগা ওরা!

পুষ্প ওসব ভাবনা যতীনকে ভাবতে দিলে না। বল্লে—চলো যাই, পৃথিবীতে বেশিক্ষণ থাকা নিয়ম না।

আশালতাকে আঁচল পেতে মাটিতে ঘুমুতে দেখে পর্যন্ত যতীন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। তার আদৌ ইচ্ছা নেই স্বর্গে যেতে। তার মন আর কোথাও যেতে চায় না। পুষ্প বল্লে—যতীনদা, তুমি এত ভালবাসো আশাকে! ওর মত হতভাগিনী মেয়েও দেখিনি, ও তোমাকে বুঝলো না। সত্যি কষ্ট হয় ওর জন্যে, কিন্তু তুমি এখানে থেকে ওর কোনো সাহায্য করতে পারবে না। চলো যাই।

গতির বেগে পৃথিবীটা কোথায় মিলিয়ে গেল। শুধু মেঘ—সাদা মেঘ চারিদিকে। ওদের পায়ের তলায় বহুদূরে কোথায় অভাগিনী আশালতা মেঝেতে আঁচল পেতে নিশ্চিন্তমনে ঘুমুতে লাগলো।

যতীন বাড়ী ফিরে এসে দেখলে একটি মহিলা তার জন্যে অপেক্ষা করচেন। প্রথমে দূর থেকে তার মনে হোল এঁকে কোথায় সে দেখেচে—কিন্তু মহিলাটি যখন ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, তখন তার চমক ভাঙ্‌লো।

—বাবা মণ্টু, বাবা আমার! আমার মানিক!…

—মা, তুমি?

যতীন মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। বাহান্ন বছর বয়সে তার মায়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু এখন তাঁর মুখে বার্ধক্যের চিহ্নমাত্র নেই। তাই বোধহয় সে মাকে চিনতে পারেনি প্রথমটা।

—বাবা কোথায় মা?

যতীন কথা শেষ করে ঘরের দোরের দিকে চাইতেই বাবাকে দেখতে পেলে। পঞ্চাশ বছর বয়সে যতীনের বাবা মারা গিয়েছিলেন—এ চেহারা তত বয়সের নয়। এ দেশে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোক নেই? যতীন বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি এগিয়ে এসে ওকে আশীর্বাদ করলেন। বল্লেন—তোমার এখনও আসবার বয়েস হয়নি বাবা, আর কিছুদিন থাকলে বিষয়-সম্পত্তিগুলোর একটা গতি করতে পারতে। মাখন রায়ের জমিটা কত শখ করে খরিদ করেছিলাম কাছারীর নীলেমে, সেটা রাখতে পারলে না বাবা? আর বেচ্‌লে বেচ্‌লে ওই শশধর চক্কত্তি ছাড়া আর কি লোক পেলে না?

যতীনের মা বল্লেন—আহা বাছা এল পৃথিবী থেকে এত কষ্ট পেয়ে, তোমার এখন সময় হোল পোড়া বিষয়ের কথা নিয়ে ওকে বকতে? কি হবে বিষয় এখানে? কি কাজে লাগবে মাখন রায়ের জমি এখানে আমায় বুঝিয়ে বলো তো শুনি?

যতীনের বাবা বল্লেন—তুমি মেয়েমানুষ, বিষয়ের কি বোঝ? তুমি সব কথার ওপর কথা বলতে আসো কেন? মাখন রায়ের জমা—

পুষ্প ঘরে ঢুকতে যতীনের বাবা কথা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। যতীনের মা বল্লেন—পুষ্পকে চিনতে পেরেছিলি তো মণ্টু?

যতীন বল্লে—খুব।

—ওর মত তোকে ভালবাসতে আর কাউকে দেখলুম না। এই আঠারো-উনিশ বছর ও এখানে এসেচে, এই বাড়ীঘর সাজিয়ে তৈরী করে তোরই অপেক্ষায় বসে আছে। পুষ্প তোকে এনেচে বলেই তৃতীয় স্তরে আসতে পেরেচিস, নইলে হোত না। আর উনি এখনও দ্বিতীয় স্তরে পড়ে রইলেন। বিষয়-সম্পত্তিই ওঁর কাল হয়েচে। এসেচেন আজ ষোল বছর, বিষয়ের কথা ভুলতে পারলেন না, সেই ভাবনা সর্বদা। এত করে বোঝাই, এত ভাল কথা বলি, ওঁর চোখ সেই পৃথিবীর জমিজমার দিকে। কাজেই ওপরে উঠতে পারচেন না কিছুতেই—

যতীনের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খানিকটা চুপ করে রইলেন। তারপর স্নেহের দৃষ্টিতে পুষ্পের দিকে চেয়ে বল্লেন, উন্নতি করেচে আমার পুষ্প মা। এ রকম কেউ পারে না। এত অল্প দিনে ও যেখানে আছে এখানে আসা যায় না। ওর পবিত্র একনিষ্ঠ ভালবাসা এখানে এনেচে ওকে।

কত উঁচু জাতির লোকের সঙ্গে ওর আলাপ আছে, দেখিস্ এখন। তাঁরা যখন আসেন, আমি থাকতে পারিনে তাঁদের সামনে।

যতীন বল্লে—মা, তুমি কোন্ স্তরে আছ?

—আমি ওঁর সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরে থাকি। ওঁকে ছেড়ে আসি কেমন করে? ওঁকে এত করে বলি, কানে কথা যায় না। ঐ দেখলে না, এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না, বিশেষত পুষ্পের সামনে উনি দাঁড়াতে পারেন না, ওর তেজ উনি সহ্য করতে পারেন না।

পুষ্প লজ্জায় রাঙা হয়ে বল্লে—কি যে বল মা!···তারপর সে ঘরের বাইরে চলে গেল। যতীনের মা বল্লেন, না মণ্টু, সত্যি বলচি শোন। তুমি নতুন এসেচ, তোমার পক্ষে এখন বোঝা অসম্ভব যে পুষ্প কত উঁচুদরের আত্মা। ও যে-সব উচ্চস্তরে যায়, সেখানে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে এসে। তোমার জন্যে ও এখানে কষ্ট করে থাকে, নইলে এর অনেক উঁচুতে ওর জায়গা। আর কী ভালবাসার প্রাণ ওর, সেই কবে ছেলেবেলায় সাগঞ্জ-কেওটাতে থাকতে তোকে ভাল লেগেছিল, জীবনে সেই ওর ধ্যান জ্ঞান। তোকে আর ভুলতে পারলে না। তুই বৌমার ব্যাপারে পৃথিবীতে কষ্ট পেতিস, পুষ্পর এখানে কি কান্না! ওর মত আত্মার পৃথিবীতে যেতে কষ্ট হয়, কিন্তু তোমার জন্যে সদাসর্বদা ও সেখানে যেতো। ওকে দেখতে পাওয়া পুণ্যের কাজ।

সম্মুখের এই সুন্দর আকাশ, ঐ কলস্বনা ভাগীরথী, অদ্ভুত রঙের বনানী, অপরিচিত বন-লতার সর্বাঙ্গ ছেয়ে সে সব অপরিচিত বনপুষ্পরাজি, এই শান্তি, এই রূপ—এও যেমন স্বপ্ন—পুষ্পের কথা, পুষ্পের ভালবাসাও তেমনি স্বপ্ন। তার জীবনে সে শুধু নিজেকে ভুলিয়ে এসেচে সুখ পেয়েচে বলে, কিন্তু সত্যিই কোনো জিনিস পায়নি কখনো—আজ মৃত্যুপারের দেশে এসে তার সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেচে একথা তার বিশ্বাস হয় না। কোন্টা স্বপ্ন, কোন্টা বাস্তব, তার কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ী, না এই স্বপ্নলোক?···আশালতা, না পুষ্প?···

যতীনের মা বল্লেন—তাঁরা ওকে বড় ভালবাসেন, মাঝে মাঝে অনেক ওপরে নিয়ে যান, তাঁদের রাজ্যে। আমি ওর মুখে সে সব গল্প শুনেচি, ইচ্ছে হয় এখুনি যাই, কিন্তু আমাদের অনেক বছর কেটে যাবে সে রাজ্যে পৌঁছুতে, তবুও পৌঁছুতে পারবো না। সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে যারা আসে তারা এত নিম্নস্তরের জীব যে, এই তুমি যে দেশে আছ, এ-ই তাদের কাছে উচ্চ স্বর্গ। অন্য সব উচ্চস্তরের কথা বাদই দাও।

একটা আশ্চর্য চাপা আলো আকাশের এক কোণ থেকে এসে পড়লো। সমস্ত স্থানটা অল্পক্ষণের জন্যে নীল আলোয় আলো হয়ে উঠলো—আবার তখনি সেটা মিলিয়ে গেল। একটা ঠাণ্ডা, নীলোজ্জ্বল আলোর সার্চলাইট যেন দু-সেকেণ্ডের জন্যে কে ঘুরিয়ে দিলে।

যতীন বল্লে—ও কিসের আলো মা?

—আমি কিছু বলতে পারবো না বাবা। এ সব দেশের ব্যাপার ভারি অদ্ভুত, চন্দ্র-সূর্যির দেশ এ নয়। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আমি কি করে জানবো কিসে থেকে কি হয়। দেখি চোখে এই পর্যন্ত। কেন ঘটে, কিসের থেকে ঘটে, সে সব যদি জানবো তবে তো জ্ঞানী

আত্মা হয়ে যাবো। পুষ্পও জানে না, পুষ্প মেয়েমানুষ, ও ভালবাসায় বড় হয়ে এখানে এসেচে, জানে নয়। ও-সব কথার উত্তর সে দিতে পারবে না। আচ্ছা, এখন আসি মণ্টু। নতুন সবে কাল এসেচ, ক্রমে কত কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখবে, কত কি নিজেই জানতে পারবে। সময় ফুরিয়ে যাবে না, সময় এখানে অফুরন্ত, অনন্ত।

যতীনের মা চলে গেলেন।

৬

যতীন একদিন পুষ্পকে বল্লে—কত দিন হয়ে গেল এখানে এসেচি বলতে পারিস পুষ্প? এখানে তো দিনরাত্রির কোনো হিসেব পাইনে।

পুষ্প বল্লে—পৃথিবীর অভ্যেস দূর হতে এখনও তোমার অনেক দিন লাগবে যতুদা। এখানে দিনরাত্রির কোনো দরকার যখন নেই, তখন ঘাড় দেখা অভ্যেসটা ছেড়ে দাও। সময় যে অফুরন্ত, অনন্ত, যতদিন সেটা অনুভব না করবে, ততদিন মুক্তি হবে না। মনের দ্বিধা, সংকীর্ণ ভাব দূর না হোলে মুক্তি সম্ভব নয়, যতুদা।

—কি ধরনের মুক্তি?

—কি জানি, আমি এ সব বড় বড় কথা জানিনে, তোমায় আবার আমি কি বোঝাবো যতুদা, তুমি আমার চেয়ে কম বোঝো?

—বাজে কথা বলে আমায় ভোলাতে চাস্ নে পুষ্প। আমি অনেক কিছু জানতে চাই, আমাকে শেখানোর ব্যবস্থা করে দিবি? কত কি যে জানতে চাই তার ঠিক নেই। কে আমায় বলে দেবে বল্ তো!

—আছে, লোক আছে। তোমায় নিয়ে যাবো একদিন সেখানে। খুব উঁচু এক আত্মা আমায় বড় স্নেহ করেন। আমার স্তরে আসতে তাঁর কষ্ট হয়। তাই আমিই যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তুমি যাবে একদিন? আমি গুরুদেব বলি তাঁকে। বৈষ্ণব সাধু।

—কিন্তু আমি সে সব উচ্চস্তরে কি করে যাবো পুষ্প? মোটে সেদিন পৃথিবী থেকে এসেচি—তোমার দয়ায় তাই এত উঁচু স্তরে আছি, এর চেয়েও উঁচুতে কি ভাবে যাবো?

—যাওয়া ঠিক কঠিন নয়, কিন্তু থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ। যাতে যেতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করবো।

—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি পুষ্প, আমার এখনও একটা সন্দেহ হয়, এ সব স্বপ্ন নয় তো?

—যাও, পাগলামি কোরো না যতুদা। তোমার একথার উত্তর অন্তত একশো বার না দিয়েচি তুমি আসা পর্যন্ত? দেখবে আর একটা জিনিস, দেখাবো? অবশ্যি তোমায় সেখানে আজ যেতেই হবে।

—কি সেটা?

—আজ তোমার শ্রাদ্ধের দিন। তোমার ছেলে নিন্টু কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করচে। পিণ্ডদানের সময় তোমায় গিয়ে হাত পেতে পিণ্ড নিতে হবে।

ছেলের কথা শুনে যতীন অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। নিন্টু, আহা দুধের বালক, তাকে কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হচ্চে!···সে যে বড় করুণ দৃশ্য!

যতীন বল্লে—আমি যাবো না সেখানে।

পুষ্প হেসে বল্লে—ঐ যে বলছিলাম, তুমি এ জগতের ব্যাপার কিছুই জানো না। সে ছেলে-মানুষ, যখন কচি হাতে ছলছল চোখে তোমার নামে পিণ্ড দেবে, সে এমনি আকর্ষণ, তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার সাধ্য কি তুমি না গিয়ে থাকো? খুব ভালবেসে যে টানবে, তার টান এ জগতে এড়ানো যায় না। পৃথিবীর স্থূল দেহে স্থূল মন বাস করে—এখানে তা নয়। এখানে মন আপনা-আপনি বুঝতে পারবে কোন্‌টা সত্যিকার ভালবাসা, বুঝে সেখানে যাবে। আচ্ছা তুমি ব'সো, আমি একবার দেখে আসি ওদিকে কি হচ্চে।

পৃথিবীর হিসাবে মিনিট-দুই সময়ও তারপর চলে যায় নি, পুষ্প হঠাৎ কোথায় চলে গেল এবং ফিরে এসে বল্লে—ওখানে এখন সকাল সাতটা। শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু হয়েচে। নিন্টু কিন্তু এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। যতীনের আগ্রহ হোল জিজ্ঞেস করে—আশা কি করচে। সে ভয়ানক ব্যাকুল হয়েচে আশার খবর জানবার জন্যে। কত দিন খবর পায় নি। আশা কেঁদেছিল, চোখের জল ফেলেছিল তার মৃত্যুসংবাদে?

জানবার জন্যে সে মরে যাচ্চে, কিন্তু লজ্জা করে পুষ্পকে এসব কথা বলতে। যতীন বুড়ো-শিবতলার ঘাটের রানায় চুপ করে বসে রইল। সামনে কুলু-কুলু-বাহিনী গঙ্গা, নীল আকাশের তলা দিয়ে একদল পাখী উড়ে এপার থেকে ওপারে যাচ্চে। ঘাটের ওপরে বৃদ্ধ বটের শাখার নিবিড় আশ্রয়ে একটা অজানা গায়ক-পাখী অতি মধুর স্বরে ডাকচে। যতীনের মন আজ অত্যন্ত বিষণ্ণ। আশা খুব কেঁদেছিল? আশাকে সে বড় নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে এসেচে—স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীপুত্রকে সুখে রাখা, তার অভাবে তারা কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা করা। সে অকর্মণ্য স্বামী; নিজের কর্তব্য পালন করার শক্তি তার ছিল না। আশাকে সে সুখী করতে পারেনি একদিনও।

পুষ্প এসে বল্লে—বৌদিদির কথা ভেবে যে সারা হোলে, যতুদা!

তারপর সস্নেহে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। বৌদির কাছে নিয়ে যেতাম—কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে বেশি যোগাযোগ এখন তোমার পক্ষে ভাল নয়। তা ছাড়া তুমি তার কোনো উপকারও করতে পারব না এ-অবস্থায়।

—কোথায় নিয়ে যাবি পুষ্প?

—অনেক উঁচু এক স্বর্গে। নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে, তোমরা বুঝতে পারবে না। মনে করলেই সেখানে যাওয়া যায় না। তোমার যাওয়া সম্ভব হবে শুধু আমি নিয়ে যাবো বলে। তুমি কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে সকল রকম চিন্তা মন থেকে তাড়াও।

—তা আমি পারব না পুষ্প। তোর বৌদি বড় অভাগিনী, তার কথা ভুলতে পারবো না।

—দয়া বা সহানুভূতি তোমায় নামাবে না, ওপরে ওঠাবে। তাই ভেবো যতুদা, কিন্তু সাবধান, বিষয়-সম্পত্তির কথা যেন ভেবো না—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হবে। এসো আমার সঙ্গে।

দুজনে শূন্যপথে নীলাভ শূন্য-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চললো। ডাইনে বাঁয়ে অগণিত তারালোকে, মৃদু নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো জীবনপুলক ওদের মুক্ত দেহে এনেচে শিহরণ, প্রাণে মুক্তির আনন্দ—দূর···দূর···বহুদূর তারা চললো···কত নতুন অজানা দেবলোক···

ক্রমে আর একটা নতুন লোকের ওরা সমীপবর্তী হতে লাগলো···দূর থেকে তার সৌন্দর্যে যতীনের সমস্ত জৈবিক চেতনা অবশ হয়ে এল—বিলুপ্তপ্রায় চেতনার মধ্যে দিয়ে তার মনে হোল বহু কদম্বদ্রুম যেন কোথায় মুকুলিত, লতানিকর বিকশিত, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গিরিগ্রামে বহু বিহগকণ্ঠের কাকলী, প্রেম স্নেহ···সুগভীর স্নেহের নিঃস্বার্থ আত্মবলি···আরও কত কি··· কত কি সে সবের স্পষ্ট ধারণা ওর নেই···ওর চেতনা রইল না···পুষ্প বিব্রত হয়ে পড়লো— যতীন অতি উচ্চ স্তরে যে সচেতন থাকবে না, পুষ্পের এ ভয় হয়েছিল, তবুও তার আশা ছিল চেষ্টা করলে নিয়ে যাওয়া কি এতই অসম্ভব···একবার সে দেখবে।

না, যতীন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে। যতীনের দেহটাকে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ওর মন থাকবে নিদ্রিত। কিছুই দেখবে না, জানবে না, শুনবে না। নিয়ে গিয়ে লাভ কি?

পুষ্প ডাকতে লাগলো—ও যতুদা···চেয়ে থাকো, কোথায় যাচ্চ ভেবে দেখো···আমি পুষ্প, ও যতুদা···চোখ চাও···

নিকটেই একটা বেগুনি রঙের শৈলশৃঙ্গ···বন্য লতাপাতার আড়ালে একটা শিলাখণ্ডে যতীনকে সে শোওয়ালে। সংজ্ঞা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েচে ···নিকটের ঝরণা থেকে জল এনে ওর মুখে দিয়ে পুষ্প আঁচল দিয়ে ওকে বাতাস করতে লাগলো। পরে নিজের দেহের চৌম্বক শক্তি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ওর দেহে সঞ্চালিত করতে লাগলো।

এমন সময়ে পুষ্পের দৃষ্টি হঠাৎ আকৃষ্ট হলো ওই উচ্চ শিখরটার প্রান্তদেশে। সেখানে পরম সুন্দর এক তরুণ দেবতা বহুদূরে মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন আনমনে। কোনো দিকে তাঁর খেয়াল নেই, কি যেন ভাবচেন। তাঁর অঙ্গের নীলাভ জ্যোতি দেখে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে পুষ্প বুঝলে এ অতি উচ্চ শ্রেণীর আত্মা, দেবতা-গোত্রে চলে গিয়েচেন— মানুষের কোনো পর্যায়ে ইনি এখন আর পড়েন না।

পুষ্প জানতো এ জগতে যে যত পবিত্র, উচ্চ, সে দেখতে তত রূপবান, তত তরুণ। তারুণ্য এখানে নির্ভর করে না জন্মের তারিখের দূরত্ব বা নিকটত্বের ওপরে। এখানে দেহের নবীনতা ও সৌন্দর্য একমাত্র নির্ভর করে আধ্যাত্মিক প্রগতির ওপরে। এঁর রূপ ও নবীনতা পৃথিবীর হিসেবে ষোলো-সতর বছরের অতি রূপবান কিশোর বালকের মত—অত্যন্ত উচ্চ স্তরের দেবতা ভিন্ন এ রকম হয় না।

দেবতার ধ্যানভঙ্গ করতে পুষ্পের সাহস হোল না। সে এত উঁচু আত্মা কখনও দেখেনি। কি করবে ভাবচে, এমন সময় দেবতার অন্যমনস্ক চক্ষু অল্পক্ষণের জন্যে ওদের দিকে পড়লো।

পরক্ষণেই তিনি অতীব জ্যোতিষ্মান দুটি চোখ দিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখলেন। একটু বিস্ময়ের সুরে বল্লেন, কে তোমরা ?

পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—সবই তো বুঝচেন, দেব।

এইবার যেন দেবতার অন্যমনস্ক একাগ্রতা কিছু ভগ্ন হোল—বর্তমান সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। বল্লেন—কি বলো তো ? আমার যোগ নেই এ স্তরের সঙ্গে। বুঝতে পারবো না।

পুষ্প নিজেদের পরিচয় দিয়ে তার গন্তব্যস্থানের কথা ও যতীনের অবস্থা সব বললে।

আত্মা বল্লেন—ওকে যেখানে এনে ফেলেচ, এখানেও তো ওর চৈতন্য হবে না—ওর পক্ষে এও তো অতি উচ্চ স্থান ; নিচে নামিয়ে নিয়ে যাও ওকে।

পুষ্প বল্লে—আপনি কে বলুন দেবতা, আমার কত শুভদিন আজ, আপনাকে দেখলাম। এতকাল তো আছি এ জগতে, আপনার মত আত্মা কখনও দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। আপনি কে দেব ?

আত্মা অতি মধুর প্রসন্ন হাসি হেসে বল্লেন—তুমি অত জানতে চাও কেন ? তুমি ভারতবর্ষের কন্যা, ভক্তি তোমার জন্মগত। বিশ্বাস কর, এই মাত্র। তুমিও খুব উচ্চ স্তরের আত্মা, নইলে আমায় দেখতে পেতে না। তোমার সঙ্গীকে যদি আমি জাগিয়েও দিই, ও আমায় দেখতে পাবে না। যাও ওকে নামিয়ে নিয়ে যাও।

তবু পুষ্প সাহসে নির্ভর করে বল্লে—আপনি কে দেব ?…পাহাড়ের চূড়োতে বসে ছিলেন কেন ? এ স্তর তো আপনার নয়।

কথাটা শেষ করেই পুষ্প বুঝলে আত্মা তখনই বড় হয়, যখন প্রেমে সে বড় হয়। সামান্য পৃথিবীর মেয়ের এই প্রগল্ভ কথায় আত্মা চটে তো গেলেনই না, কৌতুকমিশ্রিত গভীর স্নেহে তাঁর সুশ্রী বিশাল জ্যোতির্ময় চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে এল। বল্লেন—দেখবে কি দেখছিলাম ? এসো এখানে। তোমায় দেখাবো, তুমি তার উপযুক্ত হয়েচো।

পুষ্প আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেল। আত্মা শৈলশৃঙ্গের প্রান্তসীমার দিকে দাঁড় করিয়ে হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করে বল্লেন—দেখচ ?

পুষ্পের সারাদেহ শিউরে উঠলো। সামনে এ এক অন্য পৃথিবী, বিশাল জলাভূমিতে বড় বড় অতিকায় জীবজন্তু কর্দমে ওলট-পালট খাচ্ছে—গাছপালার একটিও পরিচিত নয়। বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গরম জলীয় বাষ্প—সূর্যের তেজ অতিশয় প্রখর…তারপর ছবির পর ছবি…কত দেশ, কত যুদ্ধ, কত সৈন্যদল…কত প্রাচীন দেশের বেশভূষা পরা লোকজন…প্রশস্ত রাজপথ, প্রাচীন দিনের শহর…পচা ডোবা খানা শহরের রাজপথের পাশেই…ঘোর মহামারীতে দলে দলে লোক মরচে, কী বীভৎস দৃশ্য !

আত্মা বল্লেন—বহু দূর অতীতে ফিরে চাইছিলাম। কত কল্প আগেকার আমারই বহু পূর্ব জন্মে। কত লোককে হারিয়েচি, কত মধুর হৃদয়—আর কখনো খুঁজে পাইনি। বিশ্বের দূর প্রান্তের মোহনায় বসে তাদের কথা মনে পড়ছিল। যা দেখলে, সব আমার জীবনের বিভিন্ন অঙ্কের রঙ্গভূমি। লক্ষ্মী মেয়েটি, এখন তোমার সঙ্গী ছেলেটিকে নিয়ে নেমে যাও।

পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে বিনীতভাবে বল্লে—আপনার দেখা আবার কবে পাবো ?

—যখন স্মরণ করবে। একমনে স্মরণ করলেই আসবো—কিন্তু যখন তখন আমায় কষ্ট দিও না। আমার নানা কাজ, কোথায় কখন থাকি। কল্প-পর্বতে সঙ্গীত যেদিন বাজবে, চুম্বকের ঢেউ কম থাকবে, সেদিন আমায় ডেকো।

কল্প-পর্বতের সঙ্গীত কি, পুষ্প তা জানতো। চতুর্থ স্তরে একটি সুনির্জন পাহাড়ে বহু শতাব্দী ধরে এক নির্দিষ্ট সময়ে আপনা-আপনি অতি মধুর অপার্থিব সঙ্গীতধ্বনি ওঠে। কত কাল পূর্বে জনৈক পবিত্র আত্মা ঐ স্থানটিতে বসে নূতন সুর সৃষ্টি করতেন—কোনো বড় সুরশিল্পী হবেন। ওপরের স্বর্গে উঠে গিয়েচেন বহুকাল, কেউ তাঁকে এখন আর দেখে না—কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ে এখনও তাঁর সৃষ্ট সুরপুঞ্জে স্বর্গমণ্ডলের অজ্ঞাত কোণটি ছেয়ে যায়।

দেবতা বিদায় নিলেন—বহুদূরব্যাপী নভোমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো তাঁর দেহ-জ্যোতিতে। তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও যেন খানিকক্ষণ আকাশটা আলো হয়ে রইল।

পুষ্প অবাক্ হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। এত বড় দেবতা এতদিন এখানে থেকেও কখনো সে দেখে নি।

৭

যতীনের চেতনা ফিরে এল বাড়ীতে ফিরবার পথেই।

পুষ্পকে বল্লে—এ কোথায় যাচ্চি আমরা, এখনও পৌঁছুই নি ?

পুষ্প বল্লে—না, চলো বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে এখন তোমার যাওয়া চলবে না। তুমি পথে এমন হয়ে পড়লে! চতুর্থ স্তর পার হতে না হতেই তোমার সংজ্ঞা চলে গেল। পঞ্চম স্তরে নিয়ে যাই কি করে ? উঃ, একটা অদ্ভুত জিনিস তুমি দেখলে না!

তারপর পুষ্প সবিস্তারে উন্নত আত্মাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে। বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে ছিল তুমি দেখতে পাও, কিন্তু বুঝলুম তিনি এখন তোমায় দেখা দিতে ইচ্ছুক নন। তুমি দেখতে পাবেও না।

যতীনের মনে পড়লো তার মায়ের সঙ্গে যেদিন কথা বলছিল আকাশের দূর প্রান্তে অমনি একটা অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতির্রেখা দেখা গিয়েছিল, পুষ্প যেমন বর্ণনা করলে তেমনি। পুষ্পকে সে কথা বল্লে। পুষ্পকে বল্লে—আমি জানি, ও আলো সব সময়ই উচ্চ আত্মাদের, যাঁদের আমরা দেবতা বলি, তাঁদের গতিবিধির পথে দেখা যায়। উল্কার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁদের পথ, যখন তাঁরা যান। অত শুদ্ধ আত্মা কিন্তু আমাদের স্তরে কমই আসেন, খুব কমই দেখা যায়।

—দেখ পুষ্প, আমি তোমার এখানে এসে ভাবতুম কত উঁচু স্তরেই এসেচি! আজ আমার সে অহঙ্কার ভেঙে গেল। অত সব উঁচু স্তর আছে, তা কি জানতাম!

পুষ্প হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বল্লে—এ কথা তো কখনো শুনিনি! তুমি ভাবতে আমাদের এই বুঝি বৈকুণ্ঠধাম ? তবে তুমি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে, তোমার দোষ কি, যারা

এখানে অনেকদিন আছে তারাও জানে না। আমি শুনেছিলাম এক শুদ্ধ আত্মার কাছে, যাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন সপ্তম স্তর পর্যন্ত আছে, যেখানে পৃথিবীর মানুষ যেতে পারে। তার ওপরেও অসংখ্য স্তর আছে, তবে সে সব অঞ্চলের খবর তিনিও জানেন না। সে সব পৃথিবীর মানুষের জন্য নয়।

—আর আমি চতুর্থ স্তর ছাড়িয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম!

—তা যদি না হোত, আমি বৌদিকে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতাম।

যতীন আগ্রহের সঙ্গে কিন্তু কিছু অবিশ্বাসের সুরে বল্লে, আশাকে? কি করে?

—সে ঘুমিয়ে পড়লে তার সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহ থেকে বার করে। এ রকম করা যায়, আমি করতেও জানি। কিন্তু বৌদিদির কোন জ্ঞান থাকবে না, যখন তাঁকে এখানে আনা হবে। তোমার মত অচৈতন্য হয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্তর পার না হতেই। এই এ জগতের নিয়ম। যে স্তরের যে উপযুক্ত নয়, সে স্তরে পৌঁছুলে তার চেতনা লোপ পায়। কার সঙ্গে কথা কইবে যতুদা?

—কোনো উপায় নেই পুষ্প? আমরা পৃথিবীতে গিয়ে দেখা দিতে পারি নে?

—প্রথমত, তা পারা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর যদিও বা পারা যায়, তাতেও কোনো ফল হবে না। বৌদিদি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, মানুষ মরে কোথায় যায়, তাদের কি অবস্থা হয়, এসব সম্বন্ধে কিছু জানে না। মন কুসংস্কারে পূর্ণ। তোমায় দেখে সে এমনি ভয় পাবে যে তোমার যে জন্যে যাওয়া বা দেখা দেওয়া, তা হবে না।

যতীন কিছুতেই ছাড়ে না। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে পুষ্প অবশেষে ওকে আশার কাছে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে রাজী হোল। যতীন বল্লে, আজই চলো।

পুষ্প ঘাড় নেড়ে বল্লে—এখন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে। ওর আলোর ঢেউ আমাদের দেহ ধারণ করে দেখা দেওয়ার পক্ষে বড় বাধা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে অনেক সহজ হবে। ক'টা দিন সবুর করো না!

তারপর একদিন ওরা কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে দুজনে পৃথিবীতে নেমে গেল। যতীন নতুন পৃথিবী থেকে গিয়েচে, সে স্পষ্টই সব দেখতে লাগলো, কিন্তু পুষ্প অনেক দিন উচ্চস্তরে কাটানোর ফলে ওর সব ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট কুয়াসার মত ঠেকচে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তার কষ্ট হতে লাগলো।

ওরা বেশি রাত্রে আসে নি, কারণ আশা তখন ঘুমিয়ে পড়বে, ওদের দেখবে কি করে?

পুষ্প বল্লে—খুব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো। খুব জোর করে ভাবো যে আমি আশাকে দেখা দেবো, দেবো, দেবো। তুমি বেশিদিন পৃথিবী ছেড়ে যাওনি, তোমার দেহ স্থূলচোখে দেখা যাবে তা হোলে।

পৃথিবীর হিসেবে দুঘণ্টা প্রাণপণে চেষ্টা করেও যতীন নিজের দেহ কিছুতেই আশার চোখে দৃশ্যমান করতে পারলে না। আশা রান্নাঘরে যাচ্ছে আসচে, ছেলেদের খাইয়ে আঁচিয়ে দিলে, ঘরে গিয়ে বাবার জন্যে পান সাজলে, দোতলার ঘরে একা গিয়ে ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এল। যতীন সব সময় ওর পাশে পাশে সামনে, রোয়াকে, ঘরে, দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে

দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুতেই কিছু করতে পারলে না। কতবার ডাকলে—আশা, ও আশা, এই যে আমি, ও আশা—আশা? আমি এসেচি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আশা ওকে টেরও পেলে না। এমন কি মনেও কিছু অনুভব করলে না। পুষ্প বল্লে, আচ্ছা, এখন থাক। ওর মন এখন চঞ্চল অবস্থায় রয়েচে। যখন বিছানায় এসে শোবে, প্রথম তন্দ্রা আসবে, তখন মন হবে শান্ত, স্থির, একাগ্র। সেই সময়ে সামনে দাঁড়িও।

যতীন বল্লে—উঁহু, সে হবে না! ওর হ্যারিকেন লণ্ঠন ঘরে সারারাত জ্বালিয়ে ঘুমুনো অভ্যেস। সে আলোতে তো কোনো কাজই হবে না!

—আচ্ছা সে হবে এখন। তুমি সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমি চেষ্টা করবো এখন।

ততক্ষণ যতীন পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর বাইরে গেল। এই তার শ্বশুরবাড়ীর দেশ। প্রথমে সে যখন এখানে আসে তখন ওই মজুমদারের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে আরও পাড়ার পাঁচজন নতুন জামাইয়ের সঙ্গে পাশা খেলে তাস খেলে কত দুপুর সন্ধ্যা কাটিয়েছে। ওই সেই যদু ভড়ের পুকুর, যেখানে মস্ত বড় রুইমাছ ধরেছিল ছিপে, সেই প্রথম ও সেই শেষ। ওঃ, মাছটা ঘাটের ঐ পৈঠাটার ওপর পড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল জলে, ওরই বড় শালা, আশার ভাই ছেনি জাল দিয়ে মাছটা ধরে ফেলে। সে সব এক দিন গিয়েচে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠলো—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

ওরা দুজনেই ফিরে চাইলে। যদু ভড়ের ছেলে শ্রীশ ভড় গাড়ু হাতে পুকুরের ঘাটে নামতে গিয়ে হাঁ করে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে—হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে।

পুষ্প বল্লে—তুমি পৃথিবীর ভাবনা খুব একমনে ভাবছিলে, তোমায় দেখতে পেয়েচে। পরক্ষণেই দেখা গেল শ্রীশ গাড়ু ঘাটে রেখে ওর দিকে এগিয়ে আসচে, সে যে পুষ্পকে দেখতে পাচ্চে না—সেটা বেশ বোঝাই গেল। তার বিস্মিত দৃষ্টি শুধু যতীনের দিকে নিবদ্ধ। পরক্ষণেই কিন্তু সে থমকে দাঁড়িয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। যতীন তো অবাক্! ভয়ে চীৎকার করে কেন? সে বাঘ না ভালুক?

শ্রীশ ভড়ের গলার আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণ তাদের বাড়ীর মধ্যে থেকে, পাশের নিমাই ভড়ের বাড়ী থেকে, ওর জ্যাঠামশাই নন্দ ভড়ের বাড়ী থেকে অনেক লোক ছেলেবুড়ো বেরিয়ে এল। সকলের সমবেত ভয় প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—উঃ কি কাণ্ড! এমন তো কখনো দেখিনি!

সবাই বল্লে—কি, কি, কি দেখলি রে?

—ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল সাদামত দিব্যি একজন মানুষ। যেমন ডেকেচি, অমনি মিলিয়ে গেল। বাপ্...না রে বাপু, স্পষ্ট নিজের চোখে দেখলাম, তোমরা বলচো চোখের ভুল! আমি কি গাঁজা খাই যে চোখের ভুল?

সবাই গোলমাল করতে লাগলো, দু-একজন সাহসী লোক এগিয়ে দেখতে এল লেবুগাছের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা, যতীনের আশেপাশে যাতায়াত করচে অথচ সে আর পুষ্প সেইখানেই দাঁড়িয়ে।

যতীন কৌতুকের হাসি হেসে বল্লে—লোকগুলো কানা নাকি? খুঁজচে যাকে, সে তো এখানেই দাঁড়িয়ে।

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—যাক্, ভালই হয়েচে তোমায় চিনতে পারে নি। চিনতে পারলে বলতো, মুখুয্যেদের বাড়ীর জামাই ভূত হয়ে লোকের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৌদিদি শুনলে কষ্ট পেতো। লোকে বলতো গতি হয় নি। কেমন, শখ মিটলো তো? নিরীহ লোককে আর ভয় দেখিয়ে দরকার কি, চলো পালাই।

৮

বুড়োশিবতলার ঘাটে অশ্বত্থতলায়, যতীন অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল।

পুষ্প মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আজও বেরিয়েচে। তার নানা কাজ, কোথায় কখন ঘোরে। পুষ্পকে যতীন খানিকটা বোঝে, খানিকটা বোঝে না। পুষ্পের ভালবাসায় সেবাযত্নে তার বহুদিনের বুভুক্ষু প্রাণ তৃপ্ত হয়েচে বটে কিন্তু সঙ্গিনী হিসাবে যতীনের মনে হয় পুষ্প অনেক অনেক উঁচু। সে পুষ্পকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এমন কি কিছু কিছু ভয়ও করে। তার সঙ্গে কিন্তু মন খুলে কথা বলা যায় না, বলতে চাইলেও মুখে অনেকটা আটকে যায়। এমন সুখ, শান্তি, আনন্দের মধ্যেও যতীন নিজেকে খানিকটা একা মনে না করে পারে না।

আশা, আজ যদি আশা···

এই সব সুন্দর দিনে, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে আশার কথাই মনে হয়। আরও মনে হয় সে বড় হতভাগিনী, তার এত ভালবাসা আশা বোঝেনি; আশা যদি বুঝতো, তার মূল্য দিত, হতভাগিনী নিজেই কত তৃপ্তি পেতো।

তার ইচ্ছা হয় যখন তখন আশার কাছে যায়। কিন্তু পুষ্প তাকে যেতে দেয় না। এর কারণ যতীন জানতো না। আশার জীবনের অনেক ব্যাপার পুষ্প যা জানে যতীন তা জানে না। পাছে সে সব দেখলে যতীনের মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে যায়, সেজন্যে পুষ্প প্রাণপণে সে সব জিনিস ওর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। যার কোনো প্রতিকার করবার ক্ষমতা নেই, তা ওকে জানতে দিয়ে কোনো লাভ নেই।

যতীন জানতো আশা খেয়ালের বশে অভিমান করে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেছিল এবং অভিমানের দরুনই তার সঙ্গে দেখা করে নি। তার নিষ্ঠুরতা, সেও অভিমানপ্রসূত। আশার চরিত্রের আসল দিক পুষ্প কত কৌশলে ঢেকে রেখেচে যতীনের কাছে তা একমাত্র জানতেন যতীনের মা। পাছে ওর চোখেও সে সব ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে নিজে সঙ্গে না নিয়ে যতীনকে একা আশার কাছে যেতে দিত না। যতীনের একা যাবার প্রবল ইচ্ছা সত্বেও একা পৃথিবীতে যেতে সে তেমন সাহস পায় না—একদিন যাবার চেষ্টা করে খানিকটা গিয়েছিলও, হঠাৎ মধ্যপথে কে যেন ওকে চৌকো কাঠের বাক্সের আকারের ঘর তৈরী করে তার মধ্যে বন্দী করবার চেষ্টা করতে লাগলো। ও এগিয়ে যায়, একটা ঘর ফুঁড়ে বার হয়, আবার

সামনে ঐ রকম কিউব দিয়ে সাজানো ঘর আর একটি তৈরী হয়—সেটা অতি কষ্টে পার হয়, তো আর একটা। দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত স্থূল অথচ অত্যন্ত নমনীয় বস্তুপুঞ্জের ওপর ওর নিজের চিন্তাশক্তি কায ক'রে আপনা-আপনিই এই রকম কিউব সাজানো দেওয়াসের বেড়াজাল সৃষ্টি হচ্ছিল—চিন্তার সংযম বা পবিত্রতা অভ্যাস না করলে এই সব নিম্নস্তরে যে ও রকম হয় তা যতীনের জানা ছিল না—যতীন যত ভয় পায়, ততই তার মনের বল কমে যায়—ততই সে নিজের সৃষ্টি কিউবরাশির মধ্যে নিজেই বন্দী হয়। জনৈক উচ্চস্তরের পথিক-আত্মা তাকে সে বিপদ থেকে সেদিন উদ্ধার করেন। সেই থেকে একা পৃথিবীতে আসতে ওর ভরসা হয় না।

আজও বসে ভাবতে ভাবতে আশার জন্যে সহানুভূতি ও দুঃখে ওর মন পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু কি করবার আছে তার, অশরীরী অবস্থায় আশার কোনো উপায়ই সে করতে পারে না—অন্তত করবার উপায় তার জানা নেই।

হঠাৎ তার প্রবল আগ্রহ হোল আর একবার সে আশার কাছে যাবার চেষ্টা করবে। এলোমেলো চিন্তা মন থেকে সে দূর করবে—ভেবে ভেবে চণ্ডীর একটা শ্লোক তার মনে পড়লো…

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

এই শ্লোকটা একমনে আবৃত্তি করতে করতে সে ইচ্ছা করলে যে পৃথিবীতে যাবে—আশাদের বাড়ীতে—আশার কাছে! পরক্ষণেই সে অনুভব করলে সে মহাশূন্যে মহাবেগে কোথায় নীত হচ্ছে, গতির বেগে তার শরীরে শিহরণ এনে দিলে, মন মাঝে মাঝে অন্যদিকে যায়, আবার ফিরিয়ে এনে জোর করে চণ্ডীর শ্লোকের প্রতি নিবদ্ধ করে।

এই তো তার শ্বশুরবাড়ীর পুকুর। ঐ তো সামনেই বাড়ী। বড় মজার ব্যাপার। এটা এখনও যতীন বুঝতে পারে না, কি করে সে চিন্তা করা মাত্রেই ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে গেল। এরোপ্লেন যারা চালায়, তাদের তো দিক্ ভুল হয়, কত বিপাকে বেঘোরে কষ্ট পায়—কিন্তু কি নিয়ম আছে এ জগতে যে, জনৈক অজ্ঞ আত্মা শুধু মাত্র চিন্তা দ্বারা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছয়।

রাত্রি…আশা দোতলার ঘরে ঘুমুচ্ছে, ও গিয়ে তার শিয়রে বসলো। খানিকটা পরে দেখলে আশার দেহের মধ্যে দিয়ে ঠিক আশার মত আর একটি মূর্তি বার হচ্ছে। যতীন শুনেছিল গভীর নিদ্রার সময় মানুষের সূক্ষ্মদেহ তার স্থূলদেহ থেকে সাময়িক ভাবে বার হয়ে ভুবর্লোকে বিচরণ করে। কিন্তু আশার এই সূক্ষ্মদেহ দেখে যতীন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে গেল। কি জ্যোতি-হীন, শ্রীহীন, অপ্রীতিকর মেটে সিঁদুরের মত লাল রঙের দেহটা! চোখ অর্ধনিমীলিত, ভাবলেশহীন, বুদ্ধিলেশহীন…একটু পরে সে দেহের চক্ষুদুটির দৃষ্টি যতীনের দিকে স্থাপিত হোল—কিন্তু সে দৃষ্টিতে এমন কোনো লক্ষণ নেই, যাতে যতীন বুঝতে পারে যে আশা ওকে চিনেচে বা ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও সচেতন হয়েচে। যেন মুমূর্ষু লোকের চোখের চাউনি—যা কিছু বোঝে কিছু বোঝে না, চেয়ে থাকে অথচ দেখে না। যতীন ভুবর্লোকের অল্পদিন-সঞ্জাত সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলে, আশার সূক্ষ্মদেহ অত্যন্ত অপরিণত এবং আদৌ উচ্চতর স্তরের উপযুক্ত নয়। সে জিজ্ঞেস করলে—আশা, কেমন আছ? আমায় চিনতে পারো?

আশার চোখে-মুখে এতটুকু চৈতন্য জাগলো না, সে যেন ঘুমুচ্চে। যতীন চতুর্থ স্তরে যেমন অবস্থায় পড়েছিল, আশার ভুবর্লোকে অতি নিম্নস্তরেই সেই অবস্থা ; এখন ও যদি পৃথিবীর স্থূল দেহটা হারায়, এ লোকে এসে মহাকষ্ট পাবে, কারণ যে দেহটা নিয়ে এ লোকের সঙ্গে কারবার সে দেহটাই ওর তৈরী হয় নি। সদ্যপ্রসূত অন্ধ বিড়াল ইঁদুর ধরবে কেমন করে ?

অর্থাৎ আশা অতি নিম্নশ্রেণীর আত্মা। যতীন আরও কয়েকবার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশাকে সচেতন করবার বৃথা চেষ্টা করে ব্যথিত মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে।

সেদিনই বুড়োশিবতলার ঘাটে গঙ্গার ধারে এক ব্যাপার ঘটলো।

৯

পুষ্প ও যতীন দুজনে নিজেদের বাড়ীর সামনে বাগানে বসে গল্প করচে। যতীন পুষ্পকে পৃথিবীতে যাওয়ার কথা কিছুই বলে নি। তবুও পুষ্প সব ব্যাপার জানে। পাছে মনে কষ্ট পায় এই জন্যে যতীনকে সে বলে নি যে সে জানে। হঠাৎ আকাশের এক কোণে নীল উজ্জ্বল আলো দেখা গেল—গঙ্গার এপার ওপার, ওদের বাড়ী, ঘর, বাগান, বুড়োশিবতলার ঘাট, এমন কি ওপারের শ্যামাসুন্দরীর ঘাট পর্যন্ত সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পুষ্প শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—ছাখো, ছাখো, কোনো দেবতা যাচ্চেন—চেয়ে ছাখো—

পরক্ষণেই যতীনের মনে হোল একটা বিরাট প্রজ্বলন্ত উল্কা তাদের বাড়ীর অদূরে উন্মুক্ত বনজ লিলির ঝোপের ধারে এত প্রখর আলো বিকাশ ক'রে এসে পড়লো যে, দুজনেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল তাব্রতায়।

ওরা আশ্চর্য হয়ে ছুটে গিয়ে দেখলে যে এক মহাজ্যোতির্ময়দেহধারী পুরুষ ঝোপের ধারে বসে পড়েচেন। অমন মহিমময় শ্রী যে পৃথিবীর মানুষের হয় না—তা দুবার দেখে বুঝতে হয় না।

দুজনেই বিস্ময়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দূরে থেকে চেয়ে দেখচে, এমন সময় দেবতার নিকট থেকে পুষ্পের নিকট পর্যন্ত একটা ম্যাজেণ্টা রঙের আলোয় চওড়া শিখা সাপের মত কুটিল বক্র আকৃতি ধরে একবার খেলে গেল। একটা বড় দশ ব্যাটারির টর্চের আলো কে যেন একবার টিপে তখনি বন্ধ করলে।

পুষ্প বুঝলে এটা কি। অতি উচ্চশ্রেণীর দেবতাদের বিদ্যুতের ভাষা!

পঞ্চম স্তরের সেই আত্মার কাছে পুষ্প একথা শুনেছিল।

তিনি বলেছিলেন, ঊর্ধ্বতন লোকে—নবম বা দশম স্তরের ওপরেও যে সব উচ্চ স্তর, সেখানে দেববিবর্তনের জীবেরা বাস করেন। মানুষের সর্বপ্রকার ধারণার অতীত তাঁদের ক্রিয়াকলাপ—তাঁদের সে বিরাট জীবনের সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকই বা কি, সাধারণ প্রেতলোকের আত্মারাই বা কি, কোনো খবর জানে না। মুখের ভাষায় তাঁরা কথা বলেন না—তাঁদের প্রকাশের ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আগুনের বা বিদ্যুতের ভাষায় চলে তাঁদের কথাবার্তা।

পুষ্প হাতজোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। পুনরায় মহাব্যস্ত ও ক্ষিপ্র আর একটা তীব্র

বিদ্যুৎ-শিখা ওকে এসে স্পর্শ করতেই ওর মনের মধ্যের চিন্তায় এই প্রশ্ন জাগলো—আমি কোথায়···?

দেবতাকে দেখা যায় না। তাঁর স্থানে শুধু একটা আলোর মণ্ডলী পরিদৃশ্যমান। পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

আবার বিদ্যুতের শিখা। পুষ্পের মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো—পৃথিবী কি?

পুষ্প বল্লে—পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

পুষ্পের এ কথাগুলো কি ভাবে দেবতা বুঝলেন, পুষ্প জানে না। বোধ হয় এ উত্তরগুলো চিন্তারূপে দেবতার নিজের মনে জাগছিল। পৃথিবীর ভাষায় অনুবাদ করলে দুজনের কথাবার্তা খানিকটা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়ায়। পুনরায় প্রশ্ন হোল—

—বিশ্বের কোন্ অংশে?

পুষ্প বিপদে পড়ে একমনে সেদিনকার সেই দেবতাকে স্মরণ করলে। এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার সাধ্যের অতীত।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! সেদিনকার সেই শৈলশিখরারূঢ় দেবতা তখনই তার সম্মুখে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেব, আমি সামান্যা মানবী। উনি যে প্রশ্ন করছেন, আমি তার কি উত্তর দেবো? আমায় বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তারপর সে দ্বিতীয় দেবতাটির পানে কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তিনি সেদিন বলেছিলেন বটে 'স্মরণ করলেই আমি আসবো', পুষ্প একথা বিশ্বাস করেনি। সে মহা অপরাধী দেবতার কাছে—ছি ছি, কি অবিশ্বাসী তার আত্মা!

কিন্তু এ চিন্তা চাপা পড়ে গেল আর এক আশ্চর্য ব্যাপারে। দুই দেবতার মধ্যে যেন তীব্র বিদ্যুৎশিখার ক্ষিপ্র আদানপ্রদান চলচে—পৃথিবীর কোনো ঘটনার উপমাদ্বারাই তার স্বরূপ বোঝানো যাবে না। দুখানা বড় যুদ্ধজাহাজ যেন পরস্পর পরস্পরের ওপর তীব্র অক্সি-হাইড্রোজেন আলোর সার্চলাইট্ বিক্ষেপ করচে! দুই বিরাট দেবতার কথাবার্তা চলছিল। পরে এই কথাবার্তা পৃথিবীর ভাষায় অনুবাদ করে পুষ্পের দেবতা-বন্ধু তাকে যা বলেছিলেন, তা এইরূপ—

পুষ্পের দেবতাবন্ধু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি কে দেব?

আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমি কোথায় আগে বলুন।

—পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

—পৃথিবী কি?

—একটা ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্য নামে একটা নক্ষত্রের চারিধারে ঘোরে।

—বিশ্বের কোন্ অংশে?

—এ প্রশ্নের কি জবাব দেবো? ছায়াপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ যে নক্ষত্রজগৎ তারই এক অংশে। আপনি কোন্ অংশের অধিবাসী?

এর উত্তরে আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমার কথা শুনে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি বহু, বহু দূরের অন্য এক নক্ষত্রজগতের অধিবাসী। আমি বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভ্রমণে এবং নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছিলাম। আমার চৈতন্য যতদিন হয়েচে আমার মনে এক অদম্য পিপাসা ছিল বিশ্বের প্রত্যন্ততম সীমা আবিষ্কার করবো। কি কি নতুন দেশ এতে আছে দেখবো। এতকাল ধরে বেগমান বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুততর গতিতে শুধু শূন্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্চি। সম্প্রতি নক্ষত্রের, গ্রহের, নানা জগতের ও বিভিন্ন লোকের গোলকধাঁধার অরণ্যে দিশাহারা হয়ে এখানে শক্তিহীন, অবসন্ন ও বিমূঢ় অবস্থায় এসে পড়েচি। নক্ষত্র ও বস্তুজগৎ এখানে এত বেশী কেন? এ দুটি প্রাণী কোথাকার লোক?

—এই দুই জীব পৃথিবীর তৃতীয় স্তরের অধিবাসী। পুরুষটি সম্প্রতি বস্তু-স্তর থেকে আত্মিক স্তরে এসেচে। ওরা নিতান্ত নিরীহ, অজ্ঞ। মেয়েটি কিছু উন্নত—তাও জ্ঞানে নয়, প্রেমে।

যতীন এতক্ষণ শ্রদ্ধায় ভয়ে ও গভীর বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এই কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও বুঝছিল না—তার মনে অত উচ্চ দেবাত্মাদের চিন্তা প্রতিফলিত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পুষ্প ওর দিকে চেয়ে কথা বলতে সে বুঝলে যে তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হচ্চে। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে চুপ করে রইল। এত বড় জ্যোতির্ময় আত্মা সে আর কখনো দেখেনি। দেবতা বল্লেন—উঃ, কোথায় এসে পড়েচি। বিশ্বের কোন্ অংশে যে আছি তা কিছুই বুঝতে পারচি নে। তুমি কোন্ একটা গ্রহের নাম করলে? যে নক্ষত্রটার চারিধারে ঘোরে সেটা আমি নতুন দেখলাম। নক্ষত্রটা খুব বড় নক্ষত্রের দলে পড়ে না। এবং ওর আলোও পরিবর্তনশীল, আমি বার কয়েক ওর আলো-কে বাড়তে-কমতে দেখেচি। ওর নাম কি বল্লে—সূর্য!

পুষ্প তার নিজের চিন্তার কিছু অংশ এবার যতীনের মনে চালনা করলে। সে বেচারা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝচে না কোন্ ভীষণ মহাপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্প পোড়ারমুখী কথা বলচে। জানুক ও বুঝুক কিছু।

পুষ্পের মনের মধ্যে দিয়ে ওদের কথাবার্তা যতীন বুঝতে পারলে এবং বুঝে অবাক হয়ে গেল। পুষ্প ভাবছিল—এ আবার কত উচ্চস্তরের, কি ধরনের লোক রে বাবা, যে সূর্যের নামটাই শোনে নি কখনো, পৃথিবী তো দূরের কথা।

কথাটা মনে হয়ে তার বড় হাসি পেল। ছিঃ—হাসি সামলে নিয়ে সে বল্লে—আপনার কথা শুনতে বড় আগ্রহ হচ্চে। আপনি আমাদের বাড়ীতে বসে একটু বিশ্রাম করুন। আর দয়া করে বলবেন কি, কি দেখলেন এতকাল ধরে?

আগন্তুক ওদের বাড়ীর বাইরে পাথরের বেঞ্চিতে এসে বসলেন।

যতীন সম্ভ্রমে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে হঠাৎ বিনীতভাবে বলে বসলো, একটু চা খাবেন কি সার?

পুষ্প মুখে আঁচল চাপা দিয়ে অতিকষ্টে হাসি দমন করে বল্লে—কি যে তুমি করো যতুদা! পৃথিবীর অভ্যেস্ তোমার এখনও গেল না। চা খাবে কে? আর 'স্যর' বলচো কাকে?

যতীন অপ্রতিভ হয়ে অধিকতর বিনীত ভাব ধারণ করলে।

এই দুই নবদৃষ্ট আত্মার কাণ্ড দেখে আগন্তুক দেবতার মন কৌতুকে ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কোথাকার জীব এরা, অথচ ছাখো কি সুন্দর হাসে! মহামহেশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি শুধু বিরাটতার দিক থেকেই নয়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যেও এর কি রহস্যময় মূর্তি। এরা কেন হাসচে, কি নিয়ে কথা বলচে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। আর একটা কথাও তিনি বোঝেন নি, তাই এখন পুষ্পকে প্রশ্ন করলেন—গ্রহের জড়লোক আর আত্মিকলোক কি বলচো, বুঝতে পারলাম না তো? কি সেটা?

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি, তখন আমাদের দেহ অন্য পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়। সে দেহ স্থূল, সেখানকার সব জিনিসই সেই ধরণের স্থূল পদার্থে গড়া। তারপর একটা সময় আসে, যখন সেই স্থূল দেহটা নষ্ট হয়ে যায়—তখন আমরা এই আত্মিক লোকে আসি। কেন, প্রভু, আপনি কি এ জানেন না?

দেবতা বল্লেন—শুনেচি বটে এমন হয় কোনো কোনো গ্রহের জীবের ক্ষেত্রে, আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমায় সেখানে একবার নিয়ে যাবে—তোমাদের এই পৃথিবী গ্রহের জড়লোকে?

—কিন্তু সেখানে আপনি যেতে পারবেন দেব অত স্থূল রাজ্যে?

দেবতা হেসে বল্লেন—আমি পথিক। কত বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে দিয়ে চলা অভ্যেস্ করতে হয়েচে আমাকে, তবে বিশ্বভ্রমণ করা সম্ভব হয়েচে। নইলে তোমাদের এই যে যাকে বলচো আত্মিকলোক, এখানেই কি আমি আসতে পারতাম? জড়বস্তুর নিবিড় প্রকাশ আত্মার ক্ষেত্রে আমি দেখেচি অন্য অনেক গ্রহে। চল, যাই।

একটু পরে ওরা তিনজনে পৃথিবীর দিকে চললো। পৃথিবীর নিকটে এসে দেবতা বল্লেন—উঃ, মেঘের মত কি সব বিশ্রী চিন্তার ধোঁয়া চারদিকে! তোমরা দেখতে পাচ্চ না?

যতীন তো কিছুই দেখতে পায় না—পুষ্প জানে, পৃথিবীর মানুষের পাপের ও দুঃখের নানা-রকম চিন্তার মেঘ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে জমা হয়ে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যাতায়াতের সময় তাকে কষ্ট দিয়েচে। তবুও সে পৃথিবীরই জীব, তার ততটা কষ্ট হয় না, যতটা ইনি পাবেন।

যেখানে ওরা গিয়ে নামলো সেটা ভারতবর্ষের বিহার অঞ্চলের একটা ছোট গ্রাম। মহিষদল মাঠে চরাচ্চে রাখালরা। তিনজন মেয়েমানুষ একটা ভুট্টাক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করচে পৃথিবীতে ভাদ্রমাস। শরতের বেশ পরিষ্কার নীল আকাশ, বন্যার জল এসে নেমে গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে গৃহস্থবাড়ীর উঠানে পচা কাদা। একটা বাড়ীতে মকাই-এর মরাই-এর মধ্যে জল ঢুকে মকাই-এর দানা পচিয়ে ফেলেচে বলে বাড়ীর মেয়েরা মকাইগুলো নামিয়ে ঝাড়চে।

দেবতা বল্লেন—কি আশ্চর্য। এদের গতি এতটুকু জায়গায় সীমাবদ্ধ! এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না?

কাটিহার থেকে মুঙ্গেরগামী একখানা ট্রেন এসে পড়লো। দেবতা বিস্ময়ের সুরে বল্লেন—ও ব্যাপারটা কি?

—মানুষে ওই গাড়ীটা তৈরী করেচে। ওকে বলে রেলগাড়ী। খুব জোরে মানুষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়, প্রভু।

দেবতা কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—ওই কি দ্রুত যাওয়ার নমুনা? নমুনা দেখে তো খুব আশা হয় না এদের দ্রুতগামিতার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্বন্ধে। ওর নাম কি জোরে যাওয়া?

এক জায়গায় দুটি ছোট ছেলেমেয়ে ভুট্টাক্ষেত থেকে ভুট্টা চুরি করে খেতে গিয়ে ক্ষেত্রস্বামীর হাতে পড়ে খুব মার খাচ্চে দেখে দেবতা বল্লেন—আহা, কচি ছেলেমেয়ে দুটিকে অমন করে মারচে কেন? পরে তিনি ক্ষেত্রস্বামীর মনে সদয় চিন্তা বিক্ষেপ করতে চেষ্টা করলেন। স্থূল দেহের স্থূল মনে প্রথমেই কোনো কার্যকরী হোল না—কিন্তু অসাধারণ শক্তিশালী দেবতার মনের জোরে তাকে সৎ চিন্তার প্রেরণা স্পর্শ করলে। সে ছেলেমেয়ে দুটিকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে—আচ্ছা, যা নিয়েচিস্ যা, তা এবারকার মত নিয়ে যা—আর কখনো আসিসনে।

দেবতা বল্লেন—আহা, এদের তো বড় কষ্ট! কি অদ্ভুত এই সৃষ্টি! যত দেখচি ততই এর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্চি। আমার কি ইচ্ছে হচ্চে জানো—এদের মধ্যে মানুষ হয়ে থাকি। এদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করি।

পুষ্প বল্লে—দেব, নিকটের এই পাহাড়ের চূড়াটাতে বসে আপনার ভ্রমণের গল্প একটু করবেন দয়া করে? শুনবার বড় ইচ্ছে হচ্চে।

ভাদ্র মাসের গঙ্গা কূলে কূলে ভরা। বিকেল হয়েচে। পশ্চিম দিগন্তে জামালপুরের পাহাড়ের পিছনে রঙীন্ মেঘস্তূপের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাচ্চে।

পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট জঙ্গল। একটা ফাঁকা জায়গায় বন্য হরীতকী গাছের তলায় ওরা বসলো। নীচে গঙ্গার ধারে একটা পাট-বোঝাই ভড়ের মাঝিমাল্লারা রান্নাবান্নার উদ্যোগ করছিল। যতীন ভাবছিল—এই তো বৃহত্তর জীবন, মৃত্যুর পরে যা সে লাভ করেচে। কোথায় বাংলাদেশের এক ছোট্ট গ্রামে সে ছিল বন্দী, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল তার জীবন—পৃথিবীর অতীত কত লোকে কত স্তরে এমনি কত নিস্তব্ধ শরৎ দুপুরে, অপরাহ্ণে, কত বসন্তদিনের আসন্ন বেলায়, কত জ্যোৎস্নারাত্রিতে তার ইচ্ছামত অভিযান ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে জমা রয়েছে! এমন সব সুখের দিনে শুধু মনে হয় সেই হতভাগী—

দেবতা তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতে লাগলেন।

সে ভারি চমৎকার কথা। তাঁর সব কথা পুষ্প বা যতীন বুঝতে পারছিল না। তবুও তারা মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর উৎসাহদীপ্ত মুখের ভঙ্গীতে, কথার সুরে। কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি বেরিয়েচেন বিশ্বভ্রমণে। কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রজগৎ, কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ মানস-গতিতে ভ্রমন করেচেন। আলো বা বিদ্যুতের যেখানে পৌছুতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে—সে

সব সুন্দর নক্ষত্রমণ্ডলী পার হয়েও লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অঞ্চলে চলে গিয়েচেন। তখনও দেখেন বহু দূরে আর এক অজানা বিশ্বের সীমা মহাশূন্যের প্রান্তে আবছায়া দেখা যায়। আবার সে বিশ্বেও পৌঁছেচেন, আবার অগণিত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিকারাজির মধ্যে দিয়ে দেবতার অমিত গতিতে বহু শত বৎসর ধরে ছুটে গিয়ে যেমন তার সীমা ছাড়িয়েচেন, আবার দূরে দেখতে পেয়েচেন আর এক রহস্যময় অজ্ঞাত বিশ্বের ক্ষীণ সীমান্তবর্তী ক্ষীণালোক তারকামণ্ডলী। কত প্রজ্বলন্ত নক্ষত্র, কত স্বয়ম্প্রভ বাষ্পমণ্ডলী লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত হয়ে রয়েচে শূন্যের দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে···অবশেষে এই বর্তমান বিশ্বটায় পৌঁছে গ্রহনক্ষত্রের গোলকধাঁধার মধ্যে কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন।···

পুষ্প বল্লে—আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?

দেবতা বল্লে—তা অসম্ভব। এই গ্রহের বিভিন্ন আত্মিক স্তর ছেড়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। এর আকর্ষণে টেনে রাখবে। সে দেহ তোমাদের তৈরী হয় নি। তবে আর কিছুকাল অপেক্ষা কর। কাছাকাছি বহু অদ্ভুত জগৎ আছে, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাবো; আমায় স্মরণ ক'রো না—তাতে আমি আসবো না। যখন তোমরা তার উপযুক্ত হয়েচ বুঝবো—আমি নিজেই আসবো। এখন আমি যাই। আর একটা বিষয়ে সাবধান থেকো, তোমরা দেখতে পাচ্চ না, আমি পাচ্চি, তোমাদের এই গ্রহটার চারিদিক ঘিরে একটা বিরাট শক্তিশালী চৌম্বক ঢেউ বইচে, সেটা সব সময় তোমাদের ঐ পৃথিবীর দিকে টানচে। এই ঢেউ-এ পড়লে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ঐ পৃথিবীর জড়লোকে তোমাদের ফেলে পুনরায় জড়দেহ ধারণ করাতে বাধ্য করবে। এটাকে পুনর্জন্মের ঢেউ বলা যেতে পারে। খুব সাবধান। বিশ্বের সীমা আবিষ্কার করবার যার আগ্রহ, সে যেন ক্ষুদ্র গ্রহের স্থূলস্তরে আবার স্থূল জড়দেহ ধারণ না করে।

পুষ্প ও যতীন দুজনে প্রণাম করলে। পুষ্প বল্লে—আবার যেন আপনার দেখা পাই, দেব।

পর মুহূর্তে দেবতা অন্তর্হিত হলেন।

পুষ্প বল্লে—দেখলে তো? শুনলে? ওই সেই চুম্বকের ঢেউ। আমাকে এক দেবতা বলেছিলেন অনেক দিন আগে। তোমাকে একবার পঞ্চম স্তরে নিয়ে যেতে যেতে বিপদে পড়েছিলুম, তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে—মনে আছে? সেইবার তাঁর সঙ্গে দেখা।

১০

একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে থাকার সময় যতীন দেখে অবাক হয়ে গেল যে দিব্যি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। একেবারে পৃথিবীর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। তার শুভ্র আলোর ঢেউ পড়লো গঙ্গাবক্ষে, পড়লো গিয়ে ওপারের শ্যামাসুন্দরী মন্দিরের সর্বাঙ্গে, তীরের প্রাচীন বটের মাথায় ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

যতীন ভাবলে—এ আবার কি? জ্যোৎস্না তো কখনো এখানে দেখিনি! এখানে রাত্রিই বা কি, দিনই বা কি!

এমন সময়ে পুষ্প হাসতে হাসতে পাশে বসে বল্লে—কেমন জ্যোৎস্না হয়েচে দেখ; মনে পড়ে তুমি আর আমি কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটে এমনি জ্যোৎস্নারাতে কত বসে ইলিশমাছ ধরা দেখতাম ?

—কিন্তু জ্যোৎস্না উঠলো কোথা থেকে ? চাঁদ এল কি করে ?

—তৈরী করলুম জ্যোৎস্নাটা। ভাবলুম তোমার সঙ্গে একদিন জ্যোৎস্নারাত্রে ঘাটে বসা যাক। কেমন, বেশ হয় নি ?

—আচ্ছা পুষ্প, যে কোনো ঋতু, যে কোনো সময়কে তৈরী করতে পারো ? এ তো অদ্ভুত !

—সময় এখানে মনের দ্বারা সৃষ্টি করা যায়, যেমন অন্য সব জিনিস করা যায়। সে তো তুমি চোখের ওপর দুবেলা দেখচো। আচ্ছা যতুদা, সাগঞ্জ-কেওটার কথা মনে পড়ে ?

—খুব পড়ে পুষ্প। সেই একবার আমি গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, মনে আছে ? তোর কি কান্না ! সত্যি আমি এক একবার ভাবি জীবনে কি পুণ্য না জানি করেছিলুম যে তোর মত মেয়ের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমার এখনও মনে হয় এ সব স্বপ্নই বা !

পুষ্প লজ্জিত সুরে বল্লে—আহা !

পুষ্প বুঝতে পারে যে, যতীন আশার কথা ভাবচে, ঘাটে এসে বসেই তার কথা ওর মনে হয়েছে। যত উচ্চ স্তরের আত্মাই হোক, পুষ্প মেয়েমানুষ, তার মনটা হু হু করে ওঠে। যতুদাকে সে আবাল্য ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কিন্তু যতুদা তার চেয়ে যে আশাবৌদিকে বেশী ভালবাসে, একথা সে জেনেও মনে স্থান দেয় না বেশীক্ষণ। উপায় কি ? এই তার অদৃষ্টলিপি, নইলে সে ছেলেবেলায় পৃথিবী ছেড়ে, যতুদাকে ছেড়ে আসবে কেন ? যতীনের গত তেরো বছরের জীবনে পুষ্প ছিল না, ছিল আশা—এ অবস্থায় আশার সঙ্গেই যতীনের মনের যোগ অনেক গাঢ়বদ্ধ। কারো কোনো দোষ নেই। .

পুষ্পের মনে দুঃখের ছায়া এসে পড়তেই বাইরের জ্যোৎস্না ক্রমশ ম্লান হয়ে এল। মন প্রফুল্ল না থাকলে মানসিক সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হবেই।

হঠাৎ পুষ্প যতীনের দিকে চেয়ে বলে—একটা কথা ভুলে গিয়েছিলুম যতুদা। আজ কল্প-পর্বতের গান বাজবার দিন। চল তোমাকে শুনিয়ে আনি। সে এক অদ্ভুত জিনিস।

ওদের স্বর্গ থেকে বেরিয়ে ওরা শূন্য বেয়ে চললো। বহুদূরে একটা সবুজ নক্ষত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে পুষ্প বল্লে—ওইখানে আমাদের যেতে হবে। ওই দিকে একদৃষ্টে চোখ রেখে ভাবো যে আমরা ওখানে যাবো।

নক্ষত্রটা যেন ক্রমে বড় হচ্চে, যতীনের মনে হোল সে সবেগে ওর দিকে নীত হচ্চে। কি অদ্ভুত এ যাত্রা। যতীন অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গ্রহ ডুবে ডুবে ঘুরচে।

পুষ্প বল্লে – এই হচ্চে শুক্রগ্রহ—সন্ধ্যাবেলা সেটাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়।

আকাশের রং এখানে নীল নয়, অনেকটা ধূসরমিশ্রিত বেগুনী। শূন্যপথে অনেক আত্মা তাদের মতই যাওয়া আসা করচে, তবে তাদের মধ্যে কেউই উচ্চশ্রেণীর নয়, ওদের রং দেখে

শ্রেণী ঠিক করতে শিখে গিয়েচে যতীন। এ সব আত্মার রং খানিকটা খানিকটা মেটে সিঁদুরের মত লাল। খুব সাধারণ শ্রেণীর আত্মা। তবে নিম্ন শ্রেণীর আত্মা এখানে আসে না। তাদের দ্বিতীয় স্তরের নিম্ন পর্যায় ছাড়িয়ে ওঠবার সাধ্যই নেই।

হঠাৎ যতীন বল্লে—সে পাহাড় তো চতুর্থ স্তরে, সেখানে পৌঁছে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বো না পুষ্প ?

পুষ্প হেসে বল্লে—তাহলে তোমায় কি আনতুম যতুদা ? সেবার তুমি সেখানে অজ্ঞান হয়েছিলে, সেটা চতুর্থ স্তরের ঊর্ধ্বলোক। চতুর্থ স্তরে ঠিকই ছিলে। চতুর্থ স্তরে সেই নীল হ্রদ দেখেছিলে, যেখানে দেবদেবীরা স্নান করছিলেন।

যতীন বল্লে—কই, কোথায় দেবদেবীরা স্নান করছিলেন আমি তো দেখিনি ? তখন থেকেই আমার জ্ঞান চলে যাচ্ছিল তাহলে।

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই যতীন দেখলে তারা একটা অত্যন্ত সুন্দর দেশে এসে পৌঁছেচে।

দেশটার চারিদিকেই চক্রবাল রেখার কূলে কূলে নীল পাহাড়। গাছপালা সেখানে আদৌ তৃতীয় স্তরের মত নয়—কোনোটার রং নীল, কোনোটার বেগুনী, কোনোটার সোনালী ; ফুলফল যেন রঙীন আলো দিয়ে গড়া। পাহাড়ের মাথায় মাথায় যেন জ্বলন্ত রঙীন্ আলোর মেলা। পুষ্প একটা গাছের ফুল তুলে ওকে দেখালে, তুলবা মাত্র বোঁটায় আর একটা ফুল কোথা থেকে এসে শূন্যস্থান পূর্ণ করলে। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, প্রান্তরের ও শৈলসানুর সব ফুল মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হচ্চে, যেন চারিদিকে রাশি রাশি লক্ষ লক্ষ নানা বিচিত্র বর্ণের জোনাকি নিবচে জ্বলচে। পাখীগুলো যখন আকাশে উড়চে, তাদের ডানায় যেন সাতরঙা রামধনুর খেলা। এদেশে বাতাসে একটু অদ্ভুত শান্তি ও আনন্দের বার্তা—একটা বিচিত্র জীবন-উল্লাসের ইঙ্গিত।

যতীন একটা জিনিস লক্ষ্য করলে, এখানকার দৃশ্য যে রকম, পৃথিবীতে এ দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। এর কোনো জিনিস পৃথিবীতে নেই।

পুষ্পকে সে কথাটা বল্লে।

—পৃথিবীর সঙ্গে খুবই কমই মিল এ দেশের, না পুষ্প ?

পুষ্প বল্লে—যতুদা, এর একটা সহজ কারণ আছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের আত্মারা পৃথিবী থেকে সদ্য এসেচে। পৃথিবীর স্মৃতি তখনও তাদের কাছে ম্লান হয়নি। যখন তারা মানসলোক সৃষ্টি করে, পৃথিবীর সেই স্মৃতি তাদের অনেকখানিই সাহায্য করে। কাজেই তাদের তৈরী স্বর্গ হয় পৃথিবীরই অবিকল নকল। কিন্তু এই সব স্তরের আত্মিকদের মনে পৃথিবীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেচে—অনেকের নেই বল্লেই হয়। কাজেই তারা যখন গড়ে—নিজেদের কল্পলোক নিজেদের কল্পনা থেকে গড়ে। তাই সব হয় নতুন, সবই হয় আত্মগুহী। এ সবই যা দেখচো এ স্তরের অধিবাসীদের সৃষ্টি—ওই পাহাড়পর্বত, গাছপালা, ফুল, পাখী, সাধারণ দৃশ্য—সব।

—কিন্তু তোমার মানুষজন কই ? একজনেরও তো সাক্ষাৎ নেই।

—তাঁরা ইচ্ছে না করলে এ স্তরের আত্মাকে তুমি সহজে দেখতে পাবে না যতুদা। কল্পপর্বতের কাছে যাকে আমরা চুম্বকশক্তির ঢেউ বলি—তা অত্যন্ত প্রবল। সেখানে গেলে তোমার দেহ শক্তিমান হবে, তখন খুব উচ্চ স্তরের আত্মাকেও অল্পক্ষণের জন্যে—মানে মাত্র যতক্ষণ সেই পর্বতের কাছে থাকবে ততক্ষণের জন্যে—দেখতে পাবে।

অল্প পরেই একটা অনুচ্চ পর্বত সামনে দেখা গেল, তার ওপরটা অনেকখানি সমতল। সেই সমতল জমিটুকুর ওপর যে দৃশ্য চোখে পড়ল যতীনের, তাতে সে বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সেখানে বহু দেবদেবী একত্র হয়েচেন। তাঁদের অঙ্গের জ্যোতি ও রূপে সমস্ত ভূমিশ্রী আলোকিত হয়ে উঠেচে, সমগ্র বায়ুমণ্ডল (যদি এখানে বায়ুমণ্ডল বলে কোনো কিছু থাকে) তাঁদের দেহনিঃসৃত উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তির স্পন্দনে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের নির্ঝর হয়ে উঠেচে যেন, দেহগন্ধের সুরভিতে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত।

যতীন এ পর্যন্ত এত উচ্চ জীবের একত্র সমাবেশ কখনো দেখেনি। সে চুপি চুপি বল্লে—এ যে ওঁদের দস্তুরমত ভিড় লেগে গিয়েচে দেখচি, পুষ্প! উঃ—

সবাই যেন কিসের অপেক্ষা করচে। সকলের চোখ বাঁ দিকের একটা খুব উঁচু পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ। যতীন বল্লে—ও পুষ্প, এ যেন ফোর্টের র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে এসেচে সব—আহা, টিকিট কিনতে পায়নি বেচারীরা!

পুষ্প তিরস্কারের সুরে বল্লে—নাঃ, তুমি জ্বালালে যতুদা—চুপ করে থাকো না কেন ছাই।

যতীন কি বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল।

বাঁ ধারের সেই পাহাড়ের চুড়া থেকে এক অপূর্ব মধুর, শব্দের ঢেউ উত্থিত হোল। দেবদেবীরা সকলে অবনত মস্তকে শুনতে লাগলেন। কেউ কেউ পাহাড়ের ঢালুর বর্ণান স্বয়ম্প্রভ তৃণদলে শুয়ে পড়লেন অলসভাবে। কেউ বসে দুহাতে মুখ ঢাকলেন। বেশীর ভাগই কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন।

সে মধুর শব্দ কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসঙ্গীতের মত শব্দটা। কিন্তু পরিচিত কোনো যন্ত্রে বাদিত সঙ্গীত নয়। অত্যন্ত রহস্যময় তার উৎপত্তিস্থল। যেন গঙ্গার ধারা,—কোন্ উচ্চ পর্বতের তুষারপ্রবাহে তার জন্ম, কেউ খবর রাখে না। যতীনের সর্বাঙ্গ বার বার শিউরে উঠতে লাগলো।

শুনতে শুনতে যতীনের মনে হোল সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়—সে উচ্চ অমৃতের অধিকারী দেবতা হয়ে গিয়েচে, সে মুক্ত, সে বিরাট—তার আত্মা সারা বিশ্বকে ব্যেপে সচেতন হতে চায়, তার বিরাট হৃদয়ে সকল পাপী তাপী, মূর্খ ও নিন্দুকের স্থান আছে, পতিতের উদ্ধার করতে যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মেচে, তাদের দুঃখে যুগে যুগে করেচে মৃত্যুবরণ। বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পার্শ্বচর সে—সে নৃত্যশীল গ্রহনক্ষত্রের বিচিত্র নৃত্যচ্ছন্দে লীলাময়, পবিত্র, প্রেমিক, মুক্ত দেবতা। এ কি আনন্দ! এ কি শিল্পমাধুর্য! এ কি অভিনব অনস্বভূতপূর্ব অমরতা!

কোনো দিকে কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই···সবাই বসে পড়েচে···নিস্তব্ধ চারিদিক···মধুর

অশরীরী রহস্যময় মোহিনী সঙ্গীতলহরী কখনও উচ্চে, কখনও মৃদুস্বরে একটানা বয়ে চলেচে··· বিরাম নেই···বিরতি নেই, পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই তার বর্ণনা নেই ··কতক্ষণ সময় কেটে গেল তার লেখাজোখা নেই—অনন্তকাল ধরে অমন সঙ্গীতপ্রবাহিণী গোমুখী-নির্গত ভাগীরথী-ধারার মত বয়ে চলেচে···চলেচে। যতীনের মনের কোন্ গুপ্ত কক্ষের গভীর অনুভূতির দ্বার খুলে গেল। সে দেখতে পেলে তার পৃথিবীতে যাপিত আরও অনেক পূর্ব জীবন···এই অনন্ত জীবনপ্রবাহে সে যুগযুগান্তর ধরে ভাবের ও প্রেমের স্রোতে বয়ে আসচে···আশা কি এক জন্মের আশা, না পুষ্প এক জন্মের পুষ্প ? কত যুগ ধরে ওরা যে ওর নিত্যসঙ্গিনী, ওর জীবনে ছন্দে গাঁথা ওদের জীবন—কতবার কত বিরহ-মিলন হাসি-অশ্রুর মধ্যে দিয়ে ওদের সঙ্গে কতবার দেখাশোনা, কতবার আবার ছাড়াছাড়ি—কত বিস্মৃত মরুদ্বীপে, কত শ্যামল পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে, কত ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরের কুটীরে, কত পাহাড়ের নীচেকার আদিম কালের গুহায়···কত রাজার রাজপ্রাসাদে···কত দশার্ণ গ্রামে ব্যাধরূপে, কত শারদ্বীপে ক্রৌঞ্চমিথুন রূপে, কত কুরুক্ষেত্রে বেদগায়ক ব্রাহ্মণরূপে···

যতীন দেখলে পুষ্প কাঁদচে···ও নীরবে পুষ্পের হাতে হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে সস্নেহে নিয়ে এল···

তারপর কখন সে অপূর্ব সঙ্গীত থেমে গিয়েচে, বিচিত্ররূপী জ্যোতির্ময় জীবেরা মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচেন···কখন জ্যোৎস্নার আলোতে সারা দেশ ভরে গিয়েচে যতীনের খেয়াল নেই···জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না··বহু পূর্ণিমার সম্মিলিত জ্যোৎস্নালোক চারিদিকে···

যতীন বল্লে—পুষ্প, চল ওঠো।

১১

ওরা কিছু দূরে মাত্র এসেচে· এক জায়গায় দেখলে মাটির বুকে যেন চাঁদ খসে পড়েচে।

দুজনে কাছে গিয়ে দেখলে, পরমরূপসী এক দেবী ঘাসের ওপর বসে হাপুস নয়নে কাঁদচেন। ওরা অবাক হয়ে গেল। এত উচ্চস্তরের দেবীর দুঃখ কিসের ?

যতীন জিজ্ঞেস্ করলে—মা, আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি ?

দেবী ওদের দিকে চাইলেন। যতীনের মনে হোল দেবী কি সাধে হয় ? এত রূপ এত জ্যোতি এত মহিমা—অথচ কি মমতা, করুণা, দীনতায় ভরা দৃষ্টি !

বল্লেন—পারবে ?

দুজনেই বলে উঠলো—হুকুম করুন, আপনার আশীর্বাদে পারবো।

দেবী বল্লেন—কল্পপর্বত থেকে ফিরচো ? তোমরা কোথায় থাকো ?

- আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা এর নীচের স্বর্গে থাকি, তৃতীয় স্তরে।

—কি মধুর সঙ্গীত ! শুনলে ?

যতীন বল্লে—শুনলাম, মা ! আমি বেশীদিন পৃথিবী ছেড়ে আসিনি। এই ব্যাপারটা কি

আমায় একটু বলবেন দয়া করে ?

দেবী বল্লেন—বলবো এর পরে। এখন বলি শোনো। আমি থাকি অন্য নক্ষত্রলোকে। পৃথিবীর এক জায়গায় মানুষের ভয়ানক কষ্ট। আমি সে দেশে জন্মেছিলুম হাজার হাজার বছর আগে। তাদের দুঃখে, আর আজ কল্পপর্বতের সঙ্গীত শুনে, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েচে। চলো যাই পৃথিবীতে, দেখি কি করা যায়—কিন্তু মুশকিল হয়েচে এই যে আমি এতকাল আগে পৃথিবী থেকে চলে এসেচি, জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক এতকাল হারিয়েচি যে সরাসরি ভাবে কোনো কাজই সে জগতে করতে পারি নে। মধ্যবর্তী স্তরের আত্মার সাহায্য ভিন্ন আমি পৃথিবীতে গিয়ে কি করবো ? তোমরা যদি যাও—

ওরা বলে উঠলো, নিশ্চয়ই যাবো মা !

দেবী বল্লেন—একটু অপেক্ষা কর। আমার এক সঙ্গী আছেন—তিনি আমার লোকেই থাকেন, উচ্চ স্তরের জীব, পৃথিবীতে গিয়ে শুধু আঁকুপাঁকু করেন, কিছু করতে পারেন না কাজে। পৃথিবীর জড়স্তরে আমরা সংস্পর্শ স্থাপন করতে পারি নে। তিনি প্রাচীন যুগের একজন বড় কবি ছিলেন। তাঁকে নিয়ে যাই চলো। এসো আমার সঙ্গে।

আবার নীল শূন্যে যাত্রা।…বহু দূরে একটা ক্ষীণ নক্ষত্র জ্বলছিল। দেবী সেই নক্ষত্র লক্ষ্য করে চললেন। পরক্ষণেই কি সুন্দর উপবন। এক শুভ্র নদী বয়ে যাচ্চে উপবনের মধ্য দিয়ে - লতাপাতা কিন্তু পৃথিবীর মত শ্যামল—পৃথিবীরই যেন এক শান্ত প্রাচীনকালীন তপোবন। মৃগকুল নির্ভয়ে খেলা করে বেড়াচ্চে, লতায় লতায় বিচিত্র বন্য পুষ্প প্রস্ফুটিত। এক সৌম্যমূর্তি জ্যোতির্ময় আত্মা লতাবিতানে বসে কি যেন লিখচেন। দেবী ওদের নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড় করালেন। মুখ তুলে চাইতেই যতীন ও পুষ্প এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে।

দেবী বল্লেন—কল্পপর্বতের পথে এদের সঙ্গে দেখা। পৃথিবীতে নিয়ে যাবো তাই সঙ্গে করে আনলাম।

যতীন ও পুষ্পের দিকে চেয়ে দেবী বল্লেন—রামায়ণ-রচয়িতা কবি বাল্মীকি তোমাদের সামনে।

ওরা দুজনেই চমকে উঠলো। মহাকবি বাল্মীকি !

দেবতা স্মিতহাস্যে ওদের বসতে বল্লেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—এই আমার আশ্রম। ওই পাশেই তমসা নদী। ওই আমার গৃহ। পৃথিবীতে যা আমার প্রিয় ছিল এখানে তাই সৃষ্টি করেচি, ওই আমার স্বর্গ। আর তোমাদের সামনে ইনি আমার মানস-দুহিতা—সীতা, যিনি তোমাদের সঙ্গে করে এনেচেন।

পুষ্প, যতীন বিস্মিত, স্তব্ধ। ভারতবর্ষের ছেলেমেয়ে তারা। সীতার নামে ওদের সর্ব শরীরে বিদ্যুতের ঢেউ বয়ে গেল। কত যুগ ধরে ভারতের আকাশ বাতাস যে পুণ্য নামে মুখরিত, সেখানকার বনের পাখীও যে নামে গান গায়, সেই ভগবতী দেবী জানকী তাদের সম্মুখে ! এ কি

স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম ?

বাল্মীকি বল্লেন—তোমরা বিস্মিত হয়েচ। বোধ হয় এ লোকে বেশী দিন আসনি। সীতাকে আমি সৃষ্টি করেচি। যা ছিলেন পৃথিবীতে আমার কল্পনার মধ্যে—এ লোকে তা মূর্তিমতী হয়েচেন।

যতীন বল্লে—বুঝতে পারলাম না, দেব।

—এ লোকে চিন্তার দ্বারা জীবের সৃষ্টি করা যায়। শুধু যে বাড়ীঘর করা যায় তাই নয়, স্থানের ও সময়েরও সৃষ্টি করা যায়।···আমার আশ্রমের সময় কি দেখচো ?

—আজ্ঞে সন্ধ্যা গোধূলি।

—আমার সময় সন্ধ্যা গোধূলি। আমি ভালবাসি গোধূলি। আমার কল্পনা এই সময় জাগ্রত হয়। তাই আমার আশ্রমে সব সময় গোধূলি।

—আচ্ছা দেব, শ্রীরামচন্দ্র তবে কোথায় ?

—সীতাকে যত আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম, রামচন্দ্রকে তত সহানুভূতি নিয়ে গড়িনি। তাই আমার স্বর্গে আমার প্রিয়তম সৃষ্টি সীতাই আছেন, রামচন্দ্র নেই। লক্ষ্মণ নেই, ভরত নেই,—কেউ নেই।

—তবে কি, দেব, সীতা বা রামচন্দ্র সত্যি সত্যি কেউ ছিলেন না ?

—হয়তো ছিলেন। আমি তাঁদের জানি না। আমার কাব্যের রাম, আমার কাব্যের সীতা—আমারই সৃষ্ট জীব। ও প্রায়ই আমার এখানে আসে। নানা কাজে সারা জগৎ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আমায় ভোলে না।

করুণা দেবী বল্লেন—বাবা, ওসব এখন রাখো। পৃথিবীতে যাবে ?

বাল্মীকি বল্লেন—তুই তো জানিস, পৃথিবীতে গিয়ে আমি কিছু করতে পারি নে। বহুকাল আগে ভবভূতিকে প্রভাবান্বিত করে একখানা কাব্য লিখিয়েছিলাম—চমৎকার কাব্য হয়েছিল। আর বাংলাদেশের মধুসূদনকে দিয়ে আর একখানা কাব্য লেখাতে গিয়েছিলুম—কিন্তু বেশী প্রভাবান্বিত করতে পারি নি—গিয়ে দেখি কয়েকটি ভিন্নদেশীয় কবি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। তাঁদের প্রভাবই তার ওপর বেশী কাজের হোল। আমি গিয়ে ফিরে এলাম। তুই একাই যা মা—এদের নিয়ে যা—এই ছেলেমেয়ে দুটিকে। এরা নতুন পৃথিবী থেকে এসেচে—এদের দিয়ে কাজ ভাল হবে।

পুষ্প বল্লে—চলুন দয়া করে, যেখানে আমাদের নিয়ে যান যাবো।

ওরা কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীতে এসে পৌছলো। পৃথিবীতে তখন সকাল দশটা, কিন্তু দেশটা খুব শীতের দেশ। রৌদ্রের মুখ দেখা যায় না। কুয়াসায় চারিদিক ঘেরা। প্রথমে একটা গ্রামে ওরা গিয়ে পৌছলো—সেখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েচে। প্রত্যেক বাড়ীতে অনাহারে-জীর্ণ বাপ মা ছেলে মেয়ে—পথের ধারে অনাহারে মৃত মানুষের দেহ। পাশাপাশি অধিকাংশ গ্রামেরই সেই অবস্থা। নিকটবর্তী একটা গ্রামে মোটরভ্যান এসেচে মৃতদেহ কুড়িয়ে ফেলবার জন্যে।

পুলিশের লোক জেলের কয়েদীদের দিয়ে মৃতদেহ বহন করাচ্চে। তারা রাস্তার ধার থেকে ঘরের মধ্যে থেকে মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে মোটরভ্যান বোঝাই করচে। গাড়ীটা ময়লা ফেলা গাড়ীর মত বোঝাই হয়ে গিয়েচে মৃতদেহের স্তূপে। তার মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু সকলের মৃতদেহই আছে। পচা মড়ার গন্ধে চারিদিক নিশ্চয়ই পূর্ণ, কারণ যে সব জেলকয়েদী মুর্দাফরাসের কাজ করচে, তাদের নাকে মুখে কাপড় বাঁধা। বীভৎস দৃশ্য।

রোগজীর্ণ ও অনাহারশীর্ণ লোক দলে দলে শহরের দিকে চলেচে—সকলের ভাগ্যে শহরে পৌছনো ঘটবে না, পথেই অর্ধেক লোক মরবে। তারপর আছে পুলিশের মোটরভ্যান ও জেলকয়েদী মুর্দাফরাসের দল। যারা শহরে পৌছুচ্চে, তারা অনেকে সেখানে দুর্বল শরীরে দুরন্ত শীতের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পেভমেণ্টের ওপর ল্যাম্প-পোস্টের তলায় মরে পড়ে থাকবে। বেচারারা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় আশ্রয় নিচ্চে ওপরের আলোটা থেকে এতটুকু উত্তাপ পাবার মিথ্যা আশায়। তারপর তাদেরও জন্যে রয়েচে পুলিশের মোটরভ্যান ও সেই জেলকয়েদী শ্মশানবন্ধুর দল।

পথের ধারে বসে এক জায়গায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট আট বছর বয়সের বড় ভাই পাঁচ বছর বয়েসের শীর্ণকায় কঙ্কালসার ছোটভাইকে একটা ভাঙা তোবড়ানো, রাস্তার ধারে কুড়োনো টিনের মধ্যে করে মুসুরির ডালসিদ্ধ মুখে তুলে খাওয়াচ্চে। এই সব অসহায় ছেলেমেয়ের কষ্ট সকলের চেয়ে বেশী—দেবীর চোখে জল এল এদের কষ্টে। অধিকাংশ ছেলেমেয়ের বাপ-মা তাদের শহরে ছেড়ে দিয়ে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গিয়েচে—এই আশায় যে, শহরে থাকলে তবু তাদের পাঁচজনে দয়া করবে, একেবারে না খেয়ে মরবে না, কোনো কোনো ছেলেমেয়ের বাপ-মা অনাহারে ও রোগের কষ্টে পথের ধারেই ইহলীলা সংবরণ করে লাসবোঝাই মোটরভ্যানে নিরুদ্দেশযাত্রা করেচে—

আরও কয়েকটি আত্মা এদের মধ্যে কাজ করচে দেখা গেল।

দেবীকে দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এলেন। এঁর দেহ অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, সুনীল জ্যোতি-মণ্ডিত—দেখেই বোঝা যায় খুব উচ্চ শ্রেণীর আত্মা।

এঁদের কাজ দেখে মনে হোল দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যাতে আত্মিকলোকে এসে দিশাহারা হয়ে কষ্ট না পায়—সেই দেখতেই এঁরা সমবেত হয়েচেন।

দেবী সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলেন। মেয়েটি বল্লে—আমার এই দেশ। বহু দিন আগে ভল্গা নদীর ধারে একটি গ্রামে এক কৃষকপরিবারে আমি জন্ম নিয়েছিলাম—জার আইভ্যানের রাজত্বকালে। রাশিয়ার কৃষকেরা চিরদিনই দুঃখী—সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের আমলে এদের ক্ষেত্রের ফসলের ভাগ দিতে হয় কারখানার শ্রমিকদের ও শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক শ্রেণীর জন্যে। এদের জন্যে যা থাকে, তাতে এদের কুলোয় না। তাই এই ঘোর দুর্ভিক্ষ। এদের ছেড়ে আমি যেতে পারিনে—তাই এদের সঙ্গে সঙ্গে থাকি। আর একজন লোকের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই আসুন।

একজন অতি সুন্দর সুশ্রী যুবক কিছু দূরে একদল দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক-বালিকার মধ্যে

দাঁড়িয়ে কি করছিলেন।

মেয়েটি বল্লেন—ইনি ডাক্তার আমেগ্তো। রাশিয়ার কৃষকদের জন্যে ইনি সারা জীবন খেটেচেন পৃথিবীতে থাকতে। গবর্ণমেন্টের কুদৃষ্টিতে পড়ে লণ্ডনে পালিয়ে গিয়েছিলেন মহাযুদ্ধের পূর্বে। সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের সময়েও ফিরে এসে অনেক দুর্দশা ভোগ করেচেন। স্ট্যালিনের সুনজরে বড় একটা ছিলেন না। এঁর জীবনের একমাত্র কাম্য হচ্চে গরীব ও দুঃখী লোকের দুঃখ দূর করা। সোভিয়েট গবর্ণমেন্টের অনেক জিনিস ইনি সুদৃষ্টিতে দেখতেন না, তারাও এঁকে সুনজরে দেখতো না। আজ মাত্র পাঁচ বছর হোল আত্মিক লোকে এসেচেন; তাও সেই গরীবদেরই কাজে প্রাণ দিয়ে। আমাশা রোগে আক্রান্ত পল্লীতে ডাক্তারি করতে গিয়ে নিজে সংক্রামক আমাশা রোগেই প্রাণ হারান। এত বড় নিঃস্বার্থ দয়ালু আত্মা এ যুগে খুব কমই জন্মেচে। মরণের পরে এ লোকে এসেও সেই রাশিয়ার গরীব লোকদের নিয়েই থাকেন। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে রোগ-শোক সেখানেই ছুটে আসচেন। চতুর্থ স্তরের আত্মা, কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান না কোথাও।

ডাক্তার আমেগ্তো এদের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। বল্লেন—আপনারা ভারতবর্ষের লোক ছিলেন না? দেখলেই বোঝা যায়। এরা ভগবানকে খেদিয়ে দিচ্চে দেশ থেকে, যেন ইটপাথরের তৈরী গির্জা ভাঙলেই ভগবানকে তাড়ানো যায়! রাশিয়াতে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় মুক্তাত্মা যদি দয়া করে আসেন, তবে কিছু কাজ করা যায়।

মেয়েটি বল্লেন সে দু-একজনের কাজ নয়, ডাক্তার। অনেক আত্মার সমবেত চেষ্টার ফলে যদি চিন্তার চৌম্বক ঢেউ এর সৃষ্টি করা যায়—খুব শক্তিশালী ঢেউ, তবে হয়তো কিছু হতে পারে। তোমার আমার দ্বারা তা হবে না।

ডাক্তার আমেগ্তো বল্লেন—আর একটা ব্যাপার। পৃথিবীতে এসে এখন দেখচি আমরা বড় অসহায় হয়ে পড়ি। দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের আত্মার সাহায্য না নিয়ে কিছু করতে পারিনে। জনকতক দ্বিতীয় স্তরের লোক আমরা যোগাড় করে এনেচি কিন্তু ওরা মন দিয়ে কাজ করছে না।

পুষ্প বল্লে—আমাদের দুজনকে নিন্ দয়া করে আপনার দলে। আমাদের দিয়ে যা সাহায্য হয় পাবেন। একটা কথা, আমাদের ভারতবর্ষেও দুর্ভিক্ষে আর বন্যায় বড় কষ্ট পায় লোকে। সেখানকার জন্যেও আপনারা সাহায্য করবেন—তারা বড় দুঃখী।

ডাঃ আমেগ্তো বল্লেন—সে আপনি ভাববেন না। যেখানেই লোকে দুঃখ পাচ্চে, সেখানেই আমরা থাকবো। দেশ, জাতি, ধর্মের গণ্ডি নেই আমাদের কাছে। সারা পৃথিবী আমাদের দেশ। তবে কি জানেন, এই রাশিয়া আমাদের জন্মভূমি। এখানকার লোকের দুঃখ আমাদের প্রাণকে বড় স্পর্শ করে। ভারতবর্ষেও যখন যেতে বলবেন, তখনই আমরা যাবো। আমাদের দলে অনেক লোক আছেন—সবাইকে নিয়ে যাবো।

যতীন বল্লে—আরও উচ্চস্তরের কোনো লোক আসেন না কেন? পঞ্চম বা ষষ্ঠ কি তারও ওপরের স্তরের কাউকে তো দেখতে পাইনে।

ডাঃ আমেণ্ডো বল্লেন—তাঁরা কাজ করেন আমাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরা এলেও আপনি তাঁদের চোখে দেখতে পাবেন না। পৃথিবীতে এলে তাঁরা আমাদের চেয়েও অসহায় হয়ে পড়েন। পৃথিবীর স্থূললোকের স্থূল মনের ওপর তাঁদের প্রভাব আদৌ কাযকর হয় না। তাঁরা উৎসাহ ও প্রেরণা দেন আমাদের—আমরা কাজ করি।

মেয়েটি বল্লেন—এর মধ্যে আরও কথা আছে। বড় বড় দুর্ভিক্ষ, মড়ক, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি যাতে দেশকে দেশ বা জাতিকে জাতি কষ্ট পায়—এ সবের মূলে অতি উচ্চ দেবতা—যারা গ্রহদেব প্ল্যানেটরি স্পিরিট—তাঁদের হাত রয়েচে। তাঁদের উদ্দেশ্য বা কর্মপ্রণালী আমরা বুঝিনে। কিন্তু ঐ সব উচ্চস্তরের বড় বড় লোকে তা বুঝতে পারেন। এর হয়তো কোথাও বড় একটা উদ্দেশ্য রয়েচে। আমাদের দৃষ্টি তত দূর পৌঁছোয় না—তাঁরা সেটা দেখতে পান, কাজেই গ্রহদেবদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যান না। আপনি কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকুন, ঘোরাফেরা করুন, অনেক কিছু দেখতে বা জানতে পারবেন। এ লোকের কাণ্ডকারখানা এত বিরাট ও জটিল যে নতুন পৃথিবী থেকে এসে মানুষে হতভম্ব হয়ে পড়ে—কিছুই ধারণা করতে পারে না।

যতীন বল্লে—কিন্তু জানবার আগ্রহ আমার অত্যন্ত বেশী, দেবী। আমি জানতে চাই কি করে এই বিরাট আত্মিকমণ্ডলী কাজকর্ম চালাচ্চেন—এঁরা কি করেন, এঁদেরই বা কে চালাচ্চে, গ্রহদেব যাঁদের বলচেন, তাঁরাই বা কে, কোথায় থাকেন, কত উচ্চস্তরের আত্মা তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না কেন,—কোথা থেকে তাঁরা এলেন—এ সব না জানলে আমার মনে শান্তি নেই।

মেয়েটি বল্লেন—জানবার ইচ্ছে থাকলেই ক্রমে ক্রমে সব জানতে পারবেন। এই আগ্রহই আসল। বেশীর ভাগ মানুষ পৃথিবী থেকে এখানে এসে কিছুই জানে না, বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। জানবেন, জ্ঞান ভিন্ন উন্নতি নেই। এ লোকে আরও শক্ত নিয়ম। সেবা বলুন, ধর্ম বলুন, প্রেম বলুন—ততদিন উর্দ্ধলোকে আপনার ঠাঁই হবে না, যতদিন জ্ঞানের আলো আপনার মনের অন্ধতা দূর না করচে।

ডাক্তার আমেণ্ডো বল্লেন পৃথিবীতে কি জানেন, নানা মুনির নানা মতে সেখানে সত্যের সমাধিলাভ ঘটেচে। এখনও পৃথিবীর মন আপনার যায় নি। এ জীবনের বিরাট প্রসারতা এখনও আপনি দেখতে পান নি। আপনি অজর, অমর, আপনার জীবন শাশ্বত অফুরন্ত। আপনার জন্মগত অধিকার এই জীবনের অমৃতপানে। আপনি তৃতীয় স্তরের মানুষ, আপনি কি ছোট? আপনিও মুক্তাত্মা, আপনার সঙ্গে এই মহীয়সী মহিলা তো সাক্ষাৎ দেবী। এই সব পৃথিবীর হতভাগাদের ভরসার স্থল আপনারা। এরা যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, সে প্রার্থনা যাঁর কাছে পৌঁছোয়, তিনি আপনাদের মত পবিত্র মুক্তাত্মাদের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এদের সাহায্য করেন। তিনি শক্তি বিকীর্ণ করচেন, আপনারা যন্ত্ররূপে সেই শক্তিকে ধরচেন, ধরে কাজে লাগাচ্চেন। বেতারের ঢেউএর আপনারা রিসিভার। যন্ত্র যত উঁচুদরের, যত নিঁখুৎ—তাঁর বাণীর প্রকাশ সেখানে তত সুস্পষ্ট, সুন্দর।

যতীন অদ্ভুত প্রেরণা পেলে, ডাক্তার আমেণ্ডোর মত এত বড় আত্মার প্রশংসাতে। কিছু

লজ্জিতও হোল। এতখানি প্রশংসার উপযুক্ত সে নয় তা সে জানে। তবে হবার চেষ্টা আজ থেকে তাকে করতেই হবে।

কিছু পরে পুষ্প ও যতীনের পায়ের তলায় বিশাল ভল্‌গা একটা সরু রৌপ্যসূত্রের মত হয়ে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিনের মত ওরা বিদায় নিলে।

পুষ্পদের বুড়োশিবতলার বাড়ীতে আজকাল দেবী প্রায়ই আসেন। এঁকে আমরা করুণাদেবী বলে পরিচয় দেবো। করুণাদেবী অতি উচ্চস্তরের নীলজ্যোতিবিশিষ্ট আত্মা—কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি তিনি থাকতে ভালবাসেন, কারণ পৃথিবীর আর্ত জীবকুল ছেড়ে ঊর্ধ্বে স্বর্গে গিয়ে তিনি শান্তি পান না। এঁর চরিত্রের মাধুর্যে ও সুন্দর ব্যবহারের কথা শুনে পুষ্প ও যতীন এঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

যখনই তিনি আসতেন, একরাশ ফুল ও ফল নিয়ে আসতেন ওপরের স্বর্গ থেকে। সে ফুল যেন স্পন্দনশীল আলোর তৈরী—খাওয়া যায়, খুব সুস্বাদু এবং ভারি চমৎকার ভুরভুরে সুগন্ধ তার। সে ফল খেলে মনে শক্তি ও পবিত্রতা আসে, এই তার গুণ। কিন্তু এই নিম্নতর তৃতীয় স্বর্গে সে ফল বেশী সময় থাকতো না—কিছুক্ষণ পরেই ঠিক কর্পূরের দলার মত উবে যেত। দেবী বলতেন, ওপরকার জগতের এই সব ফল পৃথিবীর ন্যায় স্থূল দেহের পুষ্টির জন্যে জন্মায় না, মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টির খোরাক যোগানোই এদের কাজ।

সেদিন তখন ওদের বাড়ীতে সকালবেলা করে রেখেছে পুষ্প। ঠিক যেন পৃথিবীর সকাল, লতাপাতায় শিশির, পাখী ডাকচে ও গঙ্গার ওপারে সূর্য উদয় হচ্চে, পুষ্প সবে গঙ্গাস্নান করে শিবমন্দিরে পূজো করতে যাচ্চে, এমন সময় করুণাদেবী এলেন। পুষ্পকে বল্লেন—বেশ সকালটি করে রেখেচ তো! পূজো সেরে নাও, চল তুমি আর যতীন আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে!

যতীন ঘরের মধ্যে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

দেবীকে বসবার আসন দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। করুণাদেবী বল্লেন—তুমি পুজো কর না?

—ওতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় পৃথিবীতে দেবতা ও ভগবান সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে, এখানে এসে তার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সে ভাবের দেবতা কই এখানে? সে ভাবের ভগবানই বা কোথায়? পুষ্প মেয়েমানুষ, ওর মনে ভক্তি ও পূজার্চনার প্রবৃত্তি কোনো প্রশ্ন ওঠায় না। বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে সে পূজার ফুল তার মন-গড়া ইষ্টদেবের পায়ে দেয়। আমি তা পারি না। আমার মনে হয়—

করুণাদেবী বল্লেন—তোমার এ কথার মধ্যে ভুল রয়েচে, যতীন। তুমি ভেবো না ভগবান সম্বন্ধে তুমি কোনো ধারণা কখনো করে উঠতে পারবে। তুমি কোথায়, আর সেই বিরাট বস্তু, যাঁকে পৃথিবীতে বলে ভগবান, তিনিই বা কোথায়? অতএব ভক্তি ও অর্চনা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে হোলে তোমায় মনের মত ভগবান তোমাকে গড়ে নিতে হবে। তোমার সেই মন-গড়া দেবতার মধ্যে দিয়েই অর্ঘ্য পৌঁছোবে সেই বিশ্বদেবের পায়ে। তুমি তৃতীয়-স্বর্গবাসী জীব, এর বেশী কি করতে পারো?

যতীন ছাড়তো না তর্ক করতো, এমন সময়ে পুজো শেষ করে পুষ্প ফিরে এল। দেবী ওদের দুজনকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন।

যে জায়গাটিতে তাঁরা এলেন, সেখানটা একটা নির্জন স্থান। ছোট্ট একটা নদী, তার ধারে অনেকদূরব্যাপী ঘন জঙ্গল।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ দেশ?

দেবী বল্লেন—বাংলাদেশ, চিনতে পারচ না কেন? মধুমতী নদী, এইখানে ছিল বড় গঞ্জ নকীবপুর, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে। ধ্বংস হয়ে জঙ্গল হয়ে রয়েচে। বাংলাদেশ ছাড়া তোমাদের আনতাম না—কারণ যে কাজ করতে হবে তাতে বাঙলা ভাষা বলা দরকার হবে। চল দেখাচ্চি।

নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় ছোট একখানা খড়ের বাড়ী। কিন্তু বাড়ীখানা দেখেই যতীন অবাক্ হয়ে গেল। ঘরখানা পৃথিবীর বস্তু দিয়ে তৈরী নয়। আত্মিকলোকের চিন্তাশক্তিতে সৃষ্ট আত্মিকলোকের সূক্ষ্ম পদার্থে তৈরী ঘর। পৃথিবীতে এমন ঘর কি করে এল, যতীন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্চে—এমন সময় একটি বৃদ্ধ এক বোঝা কঞ্চি বয়ে নিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

যতীন আরও অবাক্ হয়ে গেল।

বৃদ্ধটি পার্থিব স্থূল দেহধারী মানুষ নয়—খুব নিম্নস্তরের আত্মা—পৃথিবীতে যাকে বলে প্রেত! তার হাতের কঞ্চির বোঝাও সত্যিকার কঞ্চির বোঝা নয়, সেটা চিন্তাশক্তিতে গড়া, আত্মিকলোকের বস্তু দিয়ে তৈরী।

বৃদ্ধের ভাব দেখে মনে হোল সে তাদের কাউকে দেখতে পায়নি।

যতীন বিস্মিতভাবে বল্লে—ব্যাপার কি? এ তো মানুষ নয়। এখানে এ ভাবে কি করচে?

করুণাদেবী বল্লেন—সেই কথা বলবো বলেই তোমাদের আজ এনেচি। বড় করুণ ইতিহাস লোকটির। ওর নাম দীনু পাড়ুই। স্ত্রীকে সন্দেহ হয় বলে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়—দেশ থেকে পালিয়ে পুলিশের ভয়ে নাম ভাঁড়িয়ে নকীবপুরের এই জঙ্গলে অনেক দিন ঘর বেঁধে ছিল। আট দশ বছর পরে ওর নিমোনিয়া হয়, তাতেই মারা পড়ে। মৃত্যুর পরে হয়ে গিয়েচে আজ ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছরেও ও বুঝতে পারেনি যে ও মরে গিয়েচে। ভাবে, ওর কি অসুখ করেচে, তাই ওকে কেউ দেখতে পায় না। জঙ্গলের মধ্যে খুব কমই লোক আসে, কাজেই জীবন্ত মানুষের সঙ্গে ওর পার্থক্য কি, বুঝবার সুযোগ ঘটেনি। নিজেও পুলিশের ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। অথচ এত স্থূল ধরনের মন, এত নিম্নস্তরের আত্মা যে, আমি কতবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি। আমাকে ও দেখতেও পায় না। ওর নিজের লোক যারা মারা গিয়েচে, কখনো কেউ আসে না। তাই তোমাদের এনেচি আজ।

যতীন বল্লে—আশ্চর্য!

দেবী বল্লেন—মরে গিয়ে বুঝতে না পারা আত্মিক লোকের এক রকম রোগ। পুরোনো হয়ে গেলে এ রোগ সারানো বড় কঠিন, কারণ মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ কখনো না জানার দরুন এই

সব অজ্ঞ নিম্ন আত্মারা বেঁচে থাকার সঙ্গে মৃত্যুর পরের অবস্থার সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু আদৌ বুঝতে পারে না। এমন কি, বুঝিয়ে না দিলে ষাট, সত্তর, একশো, দুশো বছর এ রকম কাটিয়ে দেয়, এমন ব্যাপারও বিচিত্র নয়।

যতীন এমন ব্যাপার কখনো শোনেনি। সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগ্য, বন্ধুহীন, স্বজনহীন, অসহায় বৃদ্ধের ওপর তার সহানুভূতি হোল। করুণাদেবী সত্যই করুণাময়ী বটে, পৃথিবীর এই সব হতভাগ্যদের খুঁজে খুঁজে বার করে তাদের সাহায্য করা তাঁর কাজ, তিনি যদি দেবী না হবেন, তবে কে হবে?

যতীন বল্লে—আচ্ছা এই খড়ের ঘরটা—

এবার উত্তর দিলে পুষ্প। বল্লে—বুঝলে না? ওর আসল পৃথিবীর ঘরখানা কোন্ কালে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েচে। কিন্তু সেই ঘরখানার ছবি ওর মনে তো আছে—ওর চিন্তা সেই ছবির সাহায্যে ঘরটা গড়েচে—যেমন আমার তৈরী গঙ্গা আর কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। এ লোকে তো ও তৈরী করা কঠিন নয়। অনেক সময় আপনা-আপনি হয়।

দেবী বল্লেন—পুষ্পকে আর আমাকে ও তো দেখতে পাবেই না। যতীন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও তো ওর সামনে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে ঘন অন্ধকারে ঝোপেঝাড়ে জোনাকি পোকা জ্বলে উঠলো। যতীন গিয়ে বুড়োর সামনে দাঁড়ালো, কিন্তু ফল হলো উল্টো। বৃদ্ধ ওকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলো এবং ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। দেবী বল্লেন, ও তোমাকে দেখতে পেয়েচে, কিন্তু ভাবচে তুমি ভূত।

পুষ্প ভাবলে, কি মজার কাণ্ড ছাখো! ভূত হয়ে ভূতের ভয় করচে!

দেবী বল্লেন—ওর সঙ্গে কথা বলো—

যতীন বল্লে—ভয় কি বুড়োকর্তা! ভয় পাচ্চ কেন?

বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপচে আর রাম রাম বলচে। যতীনের হাসি পেল কিন্তু দেবী সামনে রয়েচেন বলে সে অতি কষ্টে চেপে গেল।

যতীন আবার বল্লে—বুড়োকর্তা, ভয় কিসের, তুমি এখানে একলা আছ কেন? এবার বোধ হয় বৃদ্ধের কিছু সাহস হোল। সে বল্লে—আজ্ঞে কর্তা, আপনি কে?

—আমার এখানেই বাড়ী। কাছেই থাকি। তুমি কতদিন এখানে আছ? একলা থাকো কেন? তোমার কেউ নেই?

বৃদ্ধ এইবার একটু ভিজল। বল্লে—বাবু, আপনি পুলিশের লোক নয়? আমায় ধরিয়ে দেবেন না?

যতীন বল্লে—না, কেন ধরিয়ে দেবো? কি করেছ তুমি? তা ছাড়া তোমার যা অবস্থা তাতে পুলিশে তোমাকে এখন আর কিছু করতে পারবে না।

বৃদ্ধ উৎকণ্ঠিত স্বরে বল্লে—কি হয়েছে বলুন তো বাবু আমার? আপনি কি ডাক্তার? সত্যি বাবু, আমিও বুঝতে পারিনে যে আমার এ কি হোল। একবার অনেককাল আগে আমার

শক্ত অসুখ হয়—তারপর অসুখ সেরে গেল, কিন্তু সেই থেকে আমার কি হয়েচে আমার কথা কেউ শুনতে পায় না, লোককে ডেকে দেখেচি আমার ডাক না শুনে তারা চলে যায়। মামুদপুরের হাটে যাই, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমার শরীরে যেন খিদে তেষ্টা চলে গিয়েচে। আগে ভাত খেতাম, এখন খিদে হয় না বলে বহুকাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শরীরটা কেমন হাল্‌কা মনে হয়, যেন তুলোর মত হাল্‌কা—মনে হয় যেন আকাশে উড়ে যাবো। তেষ্টা নেই শরীরে। আর একটা জিনিস বাবু, কোনো কিছুতে হাত দিলে আগের মত আর আঁকড়ে ধরতে পারিনে। হাত গলিয়ে চলে যায়। এ কি রকম রোগ বাবুমশাই? পুলিশের ভয়ে কোথাও যেতে পারি নে, নইলে নলদীর সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়ে একবার ডাক্তার-বাবুকে দেখাবো ভেবেছিলাম।

যতীন বল্লে—বল্‌ছি সব কথা। কিন্তু পুলিশের ভয় কর কেন? কি করেছিলে?

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বল্লে—কেন বাবু?

—বল না। আমি কাউকে বলবো না। আমার অবস্থা বুঝতে পারচ না? আমিও তোমার দলের একজন। আমিও মানুষজনের সঙ্গে মিশতে পারিনে।

কথাটার মধ্যে দুরকম অর্থ ছিল। বৃদ্ধ সোজাটাই বুঝলে। বুঝে বল্লে—আপনার নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে নাকি বাবু? কি করেছিলেন আপনি?

—আমি আমার স্ত্রীকে খেতে দিতাম না। বাপের বাড়ী ফেলে রেখেছিলাম। তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হোত প্রায়ই। তারপর একদিন—

বৃদ্ধ বল্লে—বাবু মশাই, আপনি পুলিশের লোক। আমি বুঝতে পেরেচি। আপনি সব জানেন দেখচি। তা ধরুন আমায়, যে আমার রোগ হয়েচে, বোধ হয় বেশীদিন বাঁচবো না। এ রকম জ্যান্ত মরা হয়ে থাকার চেয়ে ফাঁসি যাই যাবো। এতদিনে আমার ভুল বুঝতে পেরেচি বাবু মশাই। আমার বৌ-এর কোনো দোষ ছিল না, সতীলক্ষ্মী ছিল সে। আমার মনে মিথ্যে ধুক্‌বুক ছিল, কালাগয়লার ছোট ভাইটার সঙ্গে বড় হাসিঠাট্টা করতো। বারণও করে দেলাম অনেকবার, তাও শুনতো না। তাই একদিন রাগের মাথায়—কিন্তু দোহাই দারোগাবাবু, খুন করবো বলে মারিনি। মাঠ থেকে সবে এসে পা দিইচি বাড়াতে, দেখি কালীগয়লার ভাই ছিচরণ খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্চে; চাষার রাগ—বল্লাম—ও কেন বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল? বউ উত্তর দেবার আগেই রাগের মাথায় তার মাথায় এক ঘা—

বৃদ্ধ হঠাৎ কেঁদে ফেললে। বল্লে—তারপর আমি সব বুঝতে পেরেছিলাম দারোগাবাবু। ছিচরণকে বউ ভাই-এর মত দেখতো। ছিচরণ হাসির গল্প বলতে পারতো, বউ তাই শুনতে ভালবাসতো। বৌ-এর কোনো দোষ ছিল না। সেই পাপের ফলে আজ আমার এই ভয়ানক রোগ জন্মেচে শরীরে। আজ আমার জীবনের মায়া নেই, সর্বদা বউডার কথা ভাবি আজকাল। অনেক দিন থেকেই ভাবি। একা একা এই জঙ্গলে এই রোগ নিয়ে আর কাটাতে পারিনে, দারোগাবাবু। জেলে গেলে তবুও পাঁচটা মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাঁচবো।

দেবা বল্লেন—ওকে জিজ্ঞেস কর, ও কি বৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়?

যতীন বৃদ্ধকে কথাটা জিজ্ঞেস্ করতেই সে অবাক্ হয়ে ওর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বল্লে—তবে কি বাবু বৌ হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল ?

যতীন বল্লে—তা নয়, তুমিও আর বেঁচে নেই। তুমিও মরে গিয়েচ, তোমার বৌও মরে গিয়েচে। আমিও মরে গিয়েচি। সবাই আমরা পরলোকে আছি এখন। তোমাকে উদ্ধার করতে আর দু'জন দেবী এখানে এসেচেন, তুমি তাদের দেখতে পাচ্ছ না। এখানেই তাঁরা আছেন। তোমার এ অবস্থা দেখে তাঁদের দয়া হয়েছে। এবার তোমার ভাবনা নেই, তোমার স্ত্রীর সঙ্গেও আমরা দেখা করিয়ে দেব।

বৃদ্ধ কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করলে না। সে সন্দিগ্ধ স্বরে বল্লে তবে আমার এই রোগটা হোল কেন ? এটা সারাবার একটা ব্যবস্থা করে দিন দয়া করে। বৌ-এর সঙ্গে দেখা করে কি হবে বাবু? হাসপাতাল থেকে সে যদি সেরে থাকে, তবে তো ভালই। তার ভাইএর বাড়ী আছে বুঝি ? তা থাক্, দেখা করে আর কি হবে বাবুমশাই, এ রোগ নিয়ে আর কারু সঙ্গে দেখা করতে চাইনে বাবু।

যতীন ওর কাছে পরলোক ও মৃত্যুর প্রকৃতি বর্ণনা করলে খানিকক্ষণ। করুণাদেবী বল্লেন—ওসব বলো না যতীন ওর কাছে। ওতে কোনো উপকার হবে না। ও কি বুঝবে ওসব কথা ? দেখচো না কত নিম্ন স্তরের আত্মা ? বুদ্ধি বলে জিনিস নেই ওর মধ্যে। ওকে বোঝাতে হোলে অন্যপথে যেতে হবে। ওর স্ত্রীকে আনতে হবে খুঁজেপেতে কোনরকমে, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ওর তো দেখচি ভালবাসার কোনো বন্ধন নেই স্ত্রীর সঙ্গে। এ অবস্থায় দুজনের যোগস্থাপন করানোই কঠিন কাজ। এ লোকে যার সঙ্গে যার ভালবাসা বা স্নেহ নেই, তার সঙ্গে তার কোনো যোগই যে সম্ভব নয়।

আরও কয়েকবার যাতায়াত ও অনবরত চেষ্টা করলে ওরা। বৃদ্ধ কিছু বোঝেই না। তাকে তার অবস্থা বোঝানো সাংঘাতিক কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না যে সে মরে গিয়েছে। কারো ওপর তার টান নেই—না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে, না অন্য কারো ওপর।

করুণাদেবী বল্লেন—শুধু বুদ্ধিহীন বলে নয়, এমন একটি অদ্ভুতধরনের হৃদয়হীন প্রেমহীন আত্মা আমি খুব কমই দেখেচি। মনে প্রেম ভালবাসা স্নেহ এসব যদি থাকতো তা হলেও ওর উদ্ধার এত কঠিন হোত না। কি যে করি এখন!

কিন্তু কি অপূর্ব নিঃস্বার্থ দরদ করুণাদেবীর। পতিত হতভাগ্যদের ওপর কি তাঁর মায়ের মত গভীর সহানুভূতি! কত কষ্ট করে তিনি নিম্নস্তরের বহু জায়গা খুঁজেপেতে একদিন এক স্ত্রীলোককে এনে হাজির করলেন ওর সামনে। যতীন আর পুষ্প সব সময়েই ওঁকে সাহায্য করতো, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। কারণ অত নিম্নস্তরে দেবী সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য · পুষ্পও তাই—যতীনের বিনা সাহায্যে কোনো কাজই সেখানে হবার উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকটিরও তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, মনে প্রেম-ভালবাসাও তথৈবচ। ধূসরমিশ্রিত লাল রঙের দেহধারী আত্মা। তবে সে সক্রিয় ধরনের বা অনিষ্টকারী চরিত্রের মেয়ে নয়—মোটামুটি ভালমানুষ এবং ওর

স্বামীর মতই প্রেম ভালবাসার ধার ধারে না।

খুব এমন কিছু উঁচুদরের আত্মা না হোলেও বৃদ্ধের অপেক্ষা কিছু উঁচু। কিন্তু হঠাৎ খুন হয়ে মৃত হওয়ার ফলে অনেকদিন পর্যন্ত তার এ লোকে ভাল জ্ঞান হয় নি। সম্প্রতি কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেচে।

যতীন বৃদ্ধকে বল্লে —চিনতে পারো? এগিয়ে এসে দ্যাখো তো—

বৃদ্ধ চমকে উঠলো, বল্লে —বড় বৌ যে!

ওর স্ত্রী হেসে বল্লে—হাঁ, মুগুরের বাড়ি মাথায় দিয়ে ভেবেছিলি হাত থেকে বুঝি এড়ালি। তা আর হোল কৈ?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বল্লে—বড় বৌ, তুই তাহলে বেঁচে আছিস?

বড় বৌ বল্লে—তুইও যা আমিও তাই। দুজনেই মরে ভূত হয়ে গেয়েছি। আজ এঁরা সব এসেচেন তাই এঁদের দয়ায় উদ্ধার হয়ে গেল। নে এঁদের পায়ে গড় কর্ পায়ে।

পুলিশের দারোগাবাবুকে?

—যমের অরুচি —পুলিশের দারোগা আবার কে এর মধ্যে? মরচেন কেবল পুলিশ পুলিশ করে, অত যদি পুলিশের ভয় তবে রাগের সময় কাণ্ডজ্ঞান ছিল না কেন রে মুখপোড়া? এঁকে প্রণাম কর্, আর দুজন আছেন, তাঁদের দেখবার ভাগ্যি তোর এখনও হয়নি, এই পিটুলি গাছের তলায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর্। চল্ আমার সঙ্গে, তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্চি—এখন কিছু বুঝবিনে।

বৃদ্ধ যতীনের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। স্ত্রীর কথায় পিটুলি গাছের তলায় মাথা নীচু করে অদৃশ্য পুষ্প ও দেবার উদ্দেশে প্রণাম করলে। স্ত্রীলোকটিও সকলকে প্রণাম করলে—তারপর বৃদ্ধকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল।

ফেরবার পথে করুণাদেবী বল্লেন—যারা কিছুই বোঝে না, তাদের দিয়ে না হয় নিজের উপকার না হয় পরের উপকার। দেখলে তো চোখের সামনে? যারা এই বিরাট বিশ্বরহস্যের কিছুই বোঝে না, তারা নিজেদের মহান্ অদৃষ্টলিপি, আত্মার বিরাট ভবিষ্যৎ কি বুঝবে? এসব লোকের এখনও কতবার পৃথিবীতে জন্মাতে হবে, তবে এরা উচ্চস্তরের উপযুক্ত হবে। এদের নিয়ে ভাবনায় পড়তে হয় এমন।

যতীন মনে মনে ভাবলে—পতিতের ওপর এমন দয়া না থাকলে সাধে কি আর দেবী হওয়া যায়!

পৃথিবী থেকে ফেরবার পথে এক জায়গায় শূন্যপথে ক্ষুদ্র একটি জগৎ মহাশূন্য-সমুদ্রের মধ্যে নির্জন দ্বীপের মত দেখা যাচ্চে। তার কিছু ওপর দিয়ে যাবার সময় একটি দৃশ্য দেখে যতীন আর পুষ্প দুজনেই থেমে গেল! ঐ জগতে এসে পর্যন্ত ওরা অনেক উন্নত স্তরের জ্যোতির্ময়ী মহিমময়ী রূপসী দেবীদের দেখেচে, যেমন একজন করুণাদেবী তাদের সঙ্গেই রয়েচেন। কিন্তু এই নির্জন ক্ষুদ্র জগৎটির একস্থানে প্রান্তরের মধ্যে শিলাখণ্ডের ওপর যে নারীকে ওরা বসে থাকতে দেখলে, তার শ্রী ও মহিমার কোনো তুলনা দেওয়া চলে না। কি তেজ, কি দীপ্তি, কি প্রজ্বলন্ত

রূপ—অথচ মুখে কেমন একটা দুঃখ ও বিষাদের ছায়া—তাতে মুখশ্রী আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। স্বচ্ছ নীল আভা তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বার হয়ে শিলাখণ্ডটাকে পর্যন্ত যেন দামী পান্নায় পরিণত করেচে।

করুণাদেবীও সেদিকে চেয়ে চমকে থেমে গেলেন। বল্লেন—ওঁকে চেন না? বহু সৌভাগ্যে দেখা পেলে। বহু উচ্চস্তরের দেবী, চল, দেখা করিয়ে দিই। তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে উনি বিশেষ খুশি হবেন এই জন্যে যে, উনি প্রেমের দেবী। ওঁর কাজ পৃথিবীতে শুধু চলে না, বহু গ্রহে উপগ্রহে, স্থূল ও আত্মিক জগতে, বিশ্বের বহু দূর দূর নক্ষত্রের মধ্যে যেখানেই জীব বাস করে—সেই সব স্থানেই দুটি প্রেমিক আত্মার মিলন সংঘটন করিয়ে বেড়ান। উনি একা নন, ওঁর দলবল খুব বড়। অনেক সঙ্গিনী আছে ওঁর। উনি অসীমশক্তিময়ী দেবী, আলাপ হোলে হঠাৎ কিছু বুঝতে পারবে না। অত বড় প্রাণ, অত উদার প্রেম-ভালবাসা ভরা আত্মা তোমরা কখনো দেখনি। খুব সৌভাগ্য তোমাদের যে চোখে ওঁকে দেখতে পেয়েচ আজ, এর একমাত্র কারণ আজ তোমরা পৃথিবীতে ওই আত্মাটির উদ্ধারের সাহায্য করেচ, সেই পুণ্যে এই মহাদেবীকে চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলে। নইলে সাধ্য কি তোমাদের ওঁকে দেখতে পাও? এসো আমার সঙ্গে, আলাপ করিয়ে দিই।

ওরা এসে সেই দেবীর সামনে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে—করুণাদেবী বল্লেন—এরা পৃথিবীর লোক, মেয়েটি একে ভালবাসতো বড়। বাল্যপ্রেম। মেয়েটি আগে মারা যায়, তারপর এ লোকে সে বহুদিন প্রতীক্ষায় ছিল। সম্প্রতি মিলন হয়েচে।

প্রণয়দেবী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—আমি জানি, সখী। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন। আমি ওদের ওপরে দৃষ্টি রাখিনি ভেবেচ? এই একটি সত্যিকার প্রেমের উদাহরণ। যেখানেই সত্যিকার জিনিস, সেখানেই আমি আছি। চেষ্টা করি তাদের মিলিয়ে দিতে, কিন্তু সব সময় পারিনে। আরও ওপরে রয়েচেন কর্মের দেবতারা—লিপিকদের দল। তাঁদের প্যাঁচ ছাড়ানো কত কঠিন তোমার তো জানতে বাকী নেই! এদের পূর্বজন্মের কর্ম ছিল ভাল, তাও এই ছেলেটির গোলমাল রয়েছে এখনও, পরে দেখতে পাবে। তা এনে ভালই করেচ। আমার মণ্ডলীতে এরা আসুক, কারণ এরা আমারই দলের উপযুক্ত লোক।

পুষ্প ও যতীন উল্লসিত হয়ে উঠল।

প্রেমের ব্যাপারে কি সাহায্য তাদের দিয়ে হবে তারা জানে না, কিন্তু একথা তাদের প্রাণের কথা যে তারা নিজেদের জীবন ধন্য মনে করবে যদি পৃথিবীর একটি ব্যর্থ প্রণয়ীর জীবনেও তারা সার্থকতার আলো জ্বালাতে পারে। এই তাদের অন্তরের কথা। যারা যে দলের, এতদিন পরে যতীন ও পুষ্প যেন সগোত্র আত্মার আত্মীয়মণ্ডলীকে আবিষ্কার করলে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে ভাবছিল, বিশ্বের কি অদ্ভুত কার্যপ্রণালী! অদৃশ্য জগতের কি বিরাট সংঘরাজি, কি বিরাট কর্মপ্রবাহ। পুষ্প ভাবছিল—কিন্তু করুণাদেবীকে ছেড়ে ওরা কি করে যাবে? তাঁকে যে ওরা বড় ভালবাসে—কিন্তু তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া হবে যে!...করুণাদেবী

যেন ওর মনের কথা বুঝেই বল্লেন—তোমাদের প্রকৃত স্থানএঁর মণ্ডলীতে। আমার দেখা সর্বদাই পাবে, যখন চাইবে তখনই দেখা দেবো, সেজন্য ভেবো না। তোমরা যাও এঁর সঙ্গে।

প্রণয়দেবী বল্লেন—উনি আর আমি পৃথক্ নই। উনি যেখানে, সেখানে আমি আছি; আমি যেখানে, সেখানে উনিও থাকেন। প্রেম আর করুণা পরস্পর ফুল আর সুতোর মত এক-সঙ্গে আছে। সুতোকে ফেলে মালা গাঁথা যায় না, ফুলকে বাদ দিয়ে সুতো নিয়ে মালা হয় না।

—কেন, বিনি সুতোয় মালা হয় না সখী?

—বড় সন্তর্পণে গলায় দিতে হয়। বড় ঠুন্‌কো হয়। বড় অল্পে মরে বাঁচে। করুণা প্রেমকে সাহায্য না করলে,প্রেম হয় ঠুন্‌কো। এদিকে প্রেম পেছনে না থাকলে করুণা রক্তাল্পতা রোগে মারা পড়ে। ছলনা কেন করচো সখী, তুমি নাকি এ জান না!

আবার নীল শূন্যপথে, আবার বাধাহীন তড়িৎ-অভিযান! যতীন ও পুষ্প বুড়োশিবতলার ঘাটে পৌঁছে গেল।

১২

যদিও তৃতীয় স্বর্গে দিন নেই রাত নেই, সময় অবিভাজ্য ও মাত্রাস্পর্শহীন তবুও যতীনের সুবিধার জন্যে পুষ্প বুড়োশিবতলার, ঘাটে পৃথিবীর মতই দিনরাত্রি সৃষ্টি করতো। ঘুমের আবশ্যক না থাকলেও নিজের সৃষ্ট রাতে ঘুমোতো।

দিন কয়েক পরে।

পুষ্প ঘুম ভেঙে উঠেচে। ওর শয়নকক্ষের বাইরের প্রকাণ্ড মুচুকুন্দ চাঁপার গাছটাতে পাখীরা কিচ্ কিচ্ করচে। ও দেখলে জানালা দিয়ে নতুন-ওঠা প্রভাত-সূর্যের আলোর রং কেমন অদ্ভুত ধরনের সবুজ ও গোলাপী। আরও বিস্মিত হোল দেখে যে সেই রঙীন আলোর মৃদু জ্যোতিটা বাষ্পাকারে তার খাটটা ঘিরে রয়েচে যেন। যতীন বুঝতে পারতো না ব্যাপারটা। পুষ্প বুঝলে ওপরের স্বর্গ থেকে কোনো উচ্চতর আত্মা তাকে স্মরণ করেচেন।

যতীনকে কথাটা বলতেই সে বল্লে—চল আমিও যাই।

পুষ্প দুঃখিত সুরে বল্লে—পারবে না যতুদা, নইলে তোমায় ফেলে যেতে কি আমার সাধ? আমার মনে হচ্চে ইনি সেদিনকার সেই দেবী, করুণাদেবী যাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তা যদি হয়, সে স্বর্গে যাওয়া তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তুমি থাকো, আমি যাই, কাজ শেষ হলেই চলে আসবো।

গোলাপী আলোর সরল জ্যোতিরেখা অনুসরণ করে সে মহাশূন্যপথে উঠলো। পুষ্প চতুর্থ স্তরের আত্মা, তার শক্তির গতিবেগ যতীনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু যতীন সঙ্গে থাকলে পুষ্প নিজেকে সংযত করে চলে ওর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে। নইলে লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের নিমিষে অতিক্রম করবার শক্তি ধরে সে।

পুষ্প যে স্বর্গে পৌঁছুল, পৃথিবীর ভাষায় তার হয়তো বাইরের রূপের অনেকখানিই বর্ণনা

করা যায়, কেবল করা যায় না তার অন্তঃপ্রবিষ্ট সুগভীর শান্তি ও বহুগুণে বর্ধিত সুখদুঃখের অনুভূতির স্পন্দমান তীব্রতার। সে কি ভয়ানক জীবনছন্দ! সেখানকার মাটিতে পা দিলেই মনের সুখ, দুঃখ, শোক, স্নেহ, প্রেম কল্পনা সব শতগুণ বেড়ে যায়। অনুভূতির তীব্রতা যারা সহ্য না করতে পারে, তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তেই। বলহীন মন স্বর্গলাভ করতে পারে না।

পুষ্প শক্তিময়ী, পুষ্প চতুর্থ স্তরের উচ্চ থাকের আত্মা—তাকেও রীতিমত চেষ্টা করতে হোল প্রাণপণে, সংজ্ঞা বজায় রাখবার জন্যে।

চারিপাশের অদৃশ্য ইথারের তরঙ্গ যেন তার দেহের কোন্ অজানা ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে তাকে সক্রিয় করে তুলেচে। সে অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের কাজ যে অনুভূতিরাজিকে মনের মুকুরে প্রতিভাত করা—পৃথিবীতে, এমন কি নিম্নতর স্বর্গগুলিতেও, সে সব অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে না।

অথচ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তারা থাকতে পারে এবং আছেও, কেবল আস্বাদ করবার ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে আছে। উচ্চ জগতের তীব্রতর স্পন্দন-তরঙ্গ তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে—কিন্তু যেমন গঙ্গা যখন মর্তে অবতরণ করেন, তখন কেউ তার তাল সামলাতে পারেনি, ঐরাবত পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল—উচ্চ স্বর্গের দেবতা মহাদেব নেমে এসে জটাজাল বিস্তার করে না দাঁড়ালে কারো মাথা ছিল না সে বেগবতী স্রোতোধারার মুখে দাঁড়ায়—ঐ সব অনুভূতির বেগ তেমনি সহ্য করতে পারে একমাত্র উচ্চস্তরের দেবতারাই। চারিদিকে ফুল ফুটে আছে, সে সব ফুলের রঙও না কত রকম, কিন্তু আলোর মত কি একটা অজানা পদার্থে সে সব গাছ, সে সব ফুল তৈরী—একটা ছিঁড়ে নিলে তার জায়গায় তখনি আর একটা ঐরকম ফুল গজাবে। বড় বড় জলাশয় আছে, তার নীলাভ নিস্তরঙ্গ বক্ষের উপর দিয়ে লোকেরা হেঁটে যাতায়াত করচে, যেমন মাটির ওপর দিয়ে পৃথিবীর লোক যায়। অথচ সেখানে নৌকাও আছে যাদের ইচ্ছে, নৌকা করেও বেড়াতে পারে।

এক জায়গায় স্ফটিক প্রস্তরের মত স্বচ্ছ কোনো পদার্থে তৈরী একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে ঐ রঙীন জ্যোতিরেখা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গিয়েচে। পুষ্প সেখানে ঢুকে দেখলে প্রণয়দেবী একটা বড় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখচেন।

পুষ্প ঘরে ঢুকতেই ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমায় ডেকেচি বড় বিপদে পড়ে। আমায় একটু সাহায্য করো।

পুষ্প বল্লে—বলুন কি করতে হবে!

দেবী বল্লেন—বোসো। পৃথিবীতে গিয়ে কাজ করতে পারি, এমন লোকই চাইছিলাম। তুমি ভিন্ন আর কারো কথা মনে উঠলো না। যতীন কোথায়, তাকে আনলে না কেন?

পুষ্প সলজ্জস্বরে বল্লে—যতুদা এখানে আসতে পারবে না। আসতে চেয়েছিল, আমি আনিনি।

দেবী প্রসন্ন সহাস্য মুখে বল্লেন—আচ্ছা, এবার থেকে আমি তাকে নিয়ে আসবো।

—আপনি পারেন, আমার শক্তি কতটুকু, আমার কাজ নয়। একবার পঞ্চম স্বর্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলুম, চতুর্থস্তরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আর আমি চেষ্টা করিনি।

পুষ্প একটা জিনিস লক্ষ্য করলে।

প্রথমদিন সে প্রণয়দেবীকে যে মূর্তিতে দেখেছিল এ ঠিক সে মূর্তি নয়। প্রণয়দেবীকে আরও তরুণী দেখাচ্ছে, মুখশ্রী আরও সুন্দর। শরীর স্বচ্ছ, সুন্দর, নীলাভ শুভ্র।

দেবী বল্লেন—কি ভাবচ?

—আপনি জানেন কি ভাবচি।

—আমার চেহারা এখন যে রকম দেখচো, তখন অন্যরকম দেখেছিলে—তাই তো?

পুষ্প কথাটা জানতো। সে শুনেছিল বহু উচ্চ স্বর্গে অধিবাসীদের কোনো নির্দিষ্ট রূপ নেই। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা একটা ডিম্বাকৃতি সোনালী আলোর মত। যখন কারো সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয় না বা মূর্তি গ্রহণ করবার বিশেষ কোনো আবশ্যক থাকে না—তখন তাঁরা শুধু একটা চৈতন্য-বিন্দুতে পর্যাবসিত হয়ে এই ডিম্বাকৃতি আলোর মূর্তিতে অবস্থান করেন। কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হোলে তাঁরা যে কোন মূর্তি ইচ্ছামত ধারণ করতে পারেন—অতি সুন্দর তরুণের রূপ বা মহিমময় গম্ভীর বয়স্ক লোকের রূপ বা পৃথিবী-প্রচলিত নানা শাস্ত্র ও ধর্ম-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত দেব, দেবী, দেবদূত প্রভৃতির রূপ—যাতে মানুষেরা স্বজাতীয় ও ও স্বদেশীয় ট্র্যাডিশন অনুযায়ী মূর্তিতে তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে, প্রাণে বল ও উৎসাহ পেতে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবুও ভাল করে দেবীর মুখে শোনবার জন্যে তার কৌতূহল হোল। প্রণয়দেবী বল্লেন—দেখ, পৃথিবীতেও এই একই ব্যাপার হয়। আত্মার অবস্থার সঙ্গে বাইরের আকৃতি বদলায়। সাধুর একরকম চেহারা, নিম্নস্তরের লোকের আর একরকম। কিন্তু পৃথিবীর স্থূল পদার্থের ওপর আত্মার প্রভাব তত কার্যকর হয় না। এখানে তা নয়। এমন কি এবেলা ওবেলা রূপের পরিবর্তন হয় এখানে। খুব প্রেম বা সহানুভূতির সময় এখানে মুখশ্রী দেখতে দেখতে অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে, ঠিক পৃথিবীর খুব ভাবপ্রবণ, কল্পনাময়ী, অপরূপ রূপসী কিশোরীর মত। আবার অন্য অবস্থায় অন্য রূপ ফুটে ওঠে মুখে। ইচ্ছামত যেমন পৃথিবীতে পোশাক বদলায়, এখানে তেমনি মূর্তি বদলানো যায়—

পুষ্প সকৌতুকে ভাবলে—অর্থাৎ কিনা আটপৌরে গেরস্থালি মূর্তি, পোশাকী মূর্তি, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করার মূর্তি, প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের মূর্তি, ভক্তের কাছে পুজো নেওয়ার মূর্তি—এরা আছে বেশ মজায়!

প্রণয়দেবী পৃথিবীর এই প্রগল্ভা বালিকার চিন্তা বুঝতে পেরে স্নেহের হাসি হাসলেন। বল্লেন—আমি পৃথিবীতে এখন যেতে পারচি নে। তুমি যাও, যতীনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এখানে সরে এসো, যে ব্যাপারের জন্যে পাঠাচ্ছি এখানে এসে দেখ দাঁড়িয়ে।

ওদিকের যে প্রকাণ্ড বড় ফরাসী বে-উইণ্ডোর মত জানালার ধারে তিনি পুষ্প আসবার আগে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলেন, পুষ্প গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো।

দাঁড়াবামাত্র তার দৃষ্টিশক্তি যেন সহস্রগুণে বেড়ে গেল। লক্ষ কোটি যোজন দূরবর্তী এক অতি ক্ষুদ্র গ্রহ—পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র গ্রাম ওর নয়নপথে পতিত হোল। দেখেই বুঝলে, বাংলা দেশ। সন্ধ্যা নেমে আসচে।

নারিকেল সুপারি গাছে ঘেরা ছোট্ট একটা একতলা কোঠাবাড়ী। বাড়ীতে বিবাহ হচ্চে। উঠোনে ক্ষুদ্র শামিয়ানা টাঙানো, বাইরের বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো, বরযাত্রীরা এখনও আসে নি, কন্যাপক্ষ ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করচে। সকলের একটা ব্যস্ততা ও উৎসাহের ভাব। কিন্তু সরুপাড় ধুতি পরনে একটি সতেরো আঠারো বছরের কিশোরী নিরানন্দ মুখে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছে। যেন আজকের উৎসবের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই—মাঝে মাঝে চোখের উদ্‌গত অশ্রু আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে ভয়ে ভয়ে চকিত-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইচে, কেউ দেখতে না পায়।

দেবী বল্লেন—ওই যে মেয়েটা দেখচো, ওর নাম সুধা, বিয়ে ওর ছোট বোনের। ওই মেয়েটার দুঃখে আমি এত কষ্ট পাচ্চি যে স্বর্গে থাকা আমার দায় হয়ে উঠেচে। ও অত্যন্ত প্রেমিকা মেয়ে—অত অল্প বয়সে অত ভাবপ্রবণ প্রেম-পাগলিনী মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। ও আজ বছর-দুই বিধবা হয়েচে—তেরো বছরে বিবাহ হয়েছিল। স্বামী বেঁচে ছিল বছর-দুই। এই দু-বছরে স্বামীকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। রোজ রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। আজ ওর ছোট বোনের বিয়ে। ওর কেবলই মনে হচ্চে ওর বিয়ের দিনটির কথা। আজ সারাদিন লুকিয়ে কাঁদচে পাছে মা বাবা মনে কষ্ট পায়। আমার আর সহ্য হয় না ওর দুঃখ—কি যে করি! তার চেয়েও করুণ ব্যাপার হচ্চে এই যে, মেয়েটিকে আমি তিনজন্ম ধরে লক্ষ্য করচি, তিন জন্মই ওর এই অবস্থা, বিয়ের অল্পদিন পরেই বিধবা হচ্চে। অথচ কি ভালবাসার পিপাসা ওর! কি প্রেমপ্রবণ হৃদয়!···আর দেখচো তো, গরীব ঘরের মেয়ে!

পুষ্পের হৃদয় গলে গেল অভাগী বালিকার জীবনের ইতিহাস শুনে। চোখে জল এল। সে বল্লে—কিন্তু আপনার তো অসীম শক্তি, আপনি তো ইচ্ছে করলেই ওর উপায় হয়।

দেবী বিষণ্ণ মুখে বল্লেন—তা হয় না, পুষ্প। কেন হয় না, চল তোমায় দেখাবো। তুমি আগে যাও—আমি কিছু পরেই যাবো। যতীনকে নিয়ে তুমি চলে যাও।

লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের পলকে অতিক্রম করে পুষ্প এল ওদের বুড়োশিবতলার বাড়ীতে। যতীনকে সঙ্গে নিয়ে তারপর সে চলে এল সুধাদের বাড়ী। সুধাদের বাড়ী তখন বর এসেচে। মেয়েরা হুলু দিয়ে শাঁক বাজিয়ে বরকে এগিয়ে নিয়ে এল। সুধার সেখানে যাবার উপায় নেই। বাড়ীর বিধবা মেয়ে, মাঙ্গলিক কোনো অনুষ্ঠানে আজ তার সামনে থাকবার জো নেই। তবুও সে কৌতূহলদৃষ্টিতে ঘরের জানালার গরাদে ধরে উঠোনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে বর দেখচে। কৌতূহল অল্পদিনের জন্য তার শোককে জয় করেচে।

পুষ্প এসে সুধার পাশে দাঁড়ালো। সুধা যে আত্মা হিসেবে উচ্চশ্রেণীর তা তখনি বুঝলে পুষ্প, কারণ পুষ্পের প্রভাব সে তখনি নিজের মনের মধ্যে অনুভব করলে। তার ভারী মনটা তখনি হালকা হয়ে গেল। জীবনে সব যেন শেষ হয়ে যায় নি, আরও অনেক কিছু আছে,

জীবনের তো সবে শুরু, বহুদূরের পথে কোথায় কোন্ বাঁকে নক্ষত্রের মত সারারাত জেগে আছে বনফুলের দল, চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্নাময় হয়ে আছে সে জায়গা—আবার আশা ফুটে ওঠে মনে—অতীত বাসররাত্রির স্মৃতির আনন্দের মত পবিত্র অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে।

যতীন দেখলে একটি আত্মা অনেকক্ষণ থেকে বিবাহসভার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করচে। যতীনকে দেখে সে কাছে এল। বল্লে—আপনি কে? আপনি এখানে কেন?

যতীন বল্লে—আপনি কে?

—আমি এই বিধবা মেয়েটির স্বামী।

—ওকে একটু সান্ত্বনা দিন আজ।

—আমি চেষ্টা করচি কিন্তু পারচি নে। আপনাকে দেখে বুঝেচি আপনি উচ্চ স্বর্গের মানুষ, আপনি যা পারবেন, তা আমি পারবো না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম আপনি এখানে কেন।

—এই মেয়েটির দুঃখে একটি দেবীর মন গলে গিয়েছে। তিনি পাঠিয়েচেন এখানে আমাদের।

—কই, আর কেউ তো নেই এখানে? আপনি তো একা—

যতীন পুষ্পের পাশেই ছিল, সুধার স্বামী খুব উঁচুদরের আত্মা নয়, ওরা দেখেই বুঝেছিল, সে দেখতে পেলে না পুষ্পকে।

যতীন বল্লে কথাটা। সুধার স্বামী বিনীতভাবে তাকে এবং উদ্দেশে পুষ্পকে প্রণাম করলে। বল্লে—আমি বড় কষ্ট পাচ্চি ওর জন্যে। কিন্তু কিছু করবার নেই, ও যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি—কিন্তু আমার চেয়ে ওর অবস্থা উন্নত, আমার ক্ষমতা নেই কিছু করবার—

যতীন বল্লে—উচ্চস্বর্গের একজন দেবী আপনার স্ত্রীর ওপর কৃপাদৃষ্টি রেখেচেন—তিনি আমাদের এখানে পাঠিয়েচেন। তিনি নিজে এখুনি আসবেন—

পুষ্প বল্লে—তিনি এসেচেন, এই তো এলেন—

সুধার স্বামী পুষ্পের কথা শুনতে পেলে না, যতীন প্রণয়দেবীকে দেখতে পেলে না। কিন্তু প্রণয়দেবীর শান্ত কোমল প্রভাব সে মনের মধ্যে অনুভব করতে পারলে। প্রণয়দেবী নিজে সব সময় সুধার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, বল্লেন—এদের ফেলে আমার কোথাও থেকে সুখ নেই। এবারও এদের ওই রকম ভুগতে হবে, সুধার স্বামী তত উচ্চ অবস্থার নয়—তা ছাড়া কেন এরা এ রকম ভুগচে তা আমি ঠিক জানি না। জগতে এইসব ঘটে যে অদৃশ্য বিরাট শক্তির নির্দেশ অনুসারে, সে শক্তি বড় রহস্যময়। তার কর্মপ্রণালী বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না, জানি-ও না।

পুষ্প বল্লে—তিনিই তো ভগবান?

প্রণয়দেবী চমকে উঠে বল্লেন—ও নাম কানে গেলে মন অন্যরকম হয়ে যায়। যখন তখন ও নাম নিও না। ভগবান যে কি, তা আমরা জানিনি এখনও। যে শক্তির কথা বলচি,

হয়তো তাকেই তোমরা ওই নামে ডাকো।

সুধার বোনের বিয়ে হয়ে গেল, বরকনে বাসরঘরে চলে গিয়েচে এই মাত্র। গরীবের ঘরের বিয়ে, তবুও উঠানে ছোট্ট শামিয়ানা টাঙানো হয়েচে প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চেয়ে এনে, আধমণটাক ময়দার লুচি ভাজা হয়েচে বরযাত্রী ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর জন্যে, তারা খেতেও বসেচে। গ্রামের বৌ-ঝিদের দল সেজেগুজে বাসরঘরে ঢুকে বরের চারিপাশে ভিড় জমিয়ে তুলচে। প্রণয়দেবী ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইলেন, যেন মনে মনে সকলকে আশীর্বাদ করলেন। আজকার দিন এবং সময় তাঁর চরণপাতের শুভ সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেল।

কিন্তু যতীন বিষণ্ণ মনে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল—আজকার বিবাহ-উৎসবের দৃশ্যে তার মনে হচ্ছিল, আশার সঙ্গে এমনি এক উৎসবের মধ্যে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আজ কোথায় সে আর কোথায় আশা! সুধার মত আজ সে বিধবা, জীবনের সব সাধ তারও আজ ফুরিয়ে গিয়েচে পরের সংসারে পরের হাততোলা খেয়ে—

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—যতীন-দা!

এই সময় প্রণয়দেবী বল্লেন—সুধা রান্নাঘরের কোণে বসে কাঁদচে, একটু ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও পুষ্প।

পুষ্প এসে দেখলে সুধার স্বামীও সেখানে উপস্থিত। তারও চোখে জল। মরণের যবনিকার আড়ালে প্রেমের এই লীলা পুষ্পকে মুগ্ধ করলে। প্রেম মরণজয়ী, এই সত্যটা এই দৃশ্যে যেন পুষ্পের মনে ভাল করে অঙ্কিত হয়ে গেল।

একটু পরে প্রণয়দেবী নিজে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। সুধার মাথায় তাঁর হাত রেখে বল্লেন—কোনো দুঃখ কোরো না। আমি মিলন করিয়ে দেবো। তোর মত মেয়ে লক্ষ লক্ষ রয়েচে আমার পৃথিবীতে—তাদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে পারি নে।

পুষ্প বল্লে—আপনার মত দেবী ইচ্ছে করলে সুধার কোনো উপকার হয় না?

—আমি সেবা করতে পারি, বিশ্বের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবার আমি কে? আমার মত হাজার হাজার আছেন দেবদেবী। তা ছাড়া পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে আমার কারবার। অগণ্য জীবলোক রয়েচে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—তাদের জন্যে অন্য সব দেবদেবী আছেন।

—তাঁদের আপনি জানেন?

—জানি তাঁরা আছেন—পরিচয় সকলের সঙ্গে নেই। আমাদের শক্তি মানুষের চেয়ে হয়তো বেশী, তবুও সীমাবদ্ধ। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সেদিন যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটে একা বসে অন্যমনস্কভাবে আশালতার কথা ভাবলে অনেকক্ষণ। পুষ্প ওকে সব কথা বলেচে, প্রণয়দেবীর মুখে যা কিছু শুনেছিল। তিনিই যখন অদৃষ্টকে উল্টে দিতে পারেন না, সে তো অতি তুচ্ছ ওঁর কাছে—কি করতে পারে সে? আশাকে তার নিজের ভাগ্যের পথে চলতে হবে।

পশ্চিমাকাশে অস্তসূর্যের রাঙা আভা। গঙ্গার বুকে পাল তুলে ছোট বড় নৌকার দল চলেচে। দু-একটা মাছরাঙা পাখী ছোঁ মেরে মাছ ধরচে ডাঙা থেকে অনতিদূরে। নৈহাটির গঙ্গা, কেওটা-সাগঞ্জের গঙ্গা।

কতক্ষণ সে এরকম বসে ছিল জানে না, হঠাৎ সে চমকে উঠে দেখলে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে। যতীন শশব্যস্তে উঠে তাঁকে প্রণাম করলে।

আগন্তুক বল্লেন—বেশ করে রেখেচ হে তুমি! পৃথিবী থেকে অল্পদিন এসেচ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তাই দেখচি। হুগলী জেলায় বাড়ী ছিল? তাই গঙ্গার ধার-টার ঠিক এই রকম করেচ। এ সব মায়া। জগৎ বা বিশ্বটাও তেমনি মায়া—সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছাড়া সব মায়া। কোনো কিছুর মধ্যে বাস্তবতা নেই।

যতীন মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগলো। এ ধরণের একটা মতের কথা সে শুনেছিল, একবার একটা বইএও পড়েছিল যেন। মনে এনে বল্লে—অদ্বৈতমত বলচেন?

মহাপুরুষ যেন একটু বিস্ময়ের ভাবে বল্লেন—অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে তুমি জানো? তবে বই পড়লে কি হয়? প্রত্যক্ষ অনুভূতি চাই। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি চাই। তুমি মরে এখানে এসেচ, কিন্তু জ্ঞান জন্মায়নি ভেতরে। এখানে হুগলী জেলার গঙ্গার ঘাট তৈরী করে রেখেচ। এমনি করেচে অনেকেই এখানে। সব মায়া। আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে গিয়ে—অদ্যবাব্দশতান্তেবা—আজই হোক, দুশো বছর কি হাজার বছর পরেই হোক। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি ভিন্ন মুক্তি নেই।

যতীন ভয়ে ভয়ে বল্লে—আজ্ঞে, মুক্তি মানে কি?

—ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ। যোগসাধনা ভিন্ন তা সম্ভব নয়। উপনিষদে দুটি পাখীর রূপক বর্ণনা আছে। একটি গাছের দুটি ডালে ওপরে নীচে দুটি পাখী বসে রয়েচে। নীচের পাখীটা মিষ্ট ফল খাচ্চে, কটু ফল খাচ্চে, ওপরের পাখী নির্বিকার অবস্থায় বসে আছে, সুখ-দুঃখে উদাসীন, নিজ মহিমায় মগ্ন। একটি পরমাত্মা, অপর পাখীটি ইন্দ্রিয়সুখমগ্ন জীবাত্মা। নীচের পাখীটি যখন ওপরে উঠে ওপরের পাখীটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে—তখনই তার মুক্তি।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি—

যতীন এমন কথা কখনো শোনেনি। বিস্ময়মুগ্ধের মত চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। সে ভেবেছিল মরণের পর যখন বেঁচে আছে, তখন তার আর ভাবনা কি? কিন্তু এখন ওর মনে হোল কোথায় যেন কি গলদ রয়ে গিয়েচে। সে বিনীতভাবে বল্লে—আজ্ঞে তবে আমাদের উপায়? আমাদের কে যোগ-শিক্ষা দেবে, কি হবে—শুনেচি সে বড় খটমট ব্যাপার—ওসব কি আমাদের জন্যে?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—খুব সোজা নয়, শক্তও নয়। আমি পৃথিবীতে তোমারই মত মানুষ ছিলাম। যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগ হোল, সংসার মিথ্যা মনে হোল। তবুও পাঁচ বছর সংসারেই

হয়ে গেলাম। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম। সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলাম। আসামের এক জঙ্গলে পনের বছর যোগ অভ্যাস করবার পর একদিন গুরুর কৃপায় নির্বিকল্প সমাধি হোল।

যতীন রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্লে—তারপর?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—তারপর? তারপর আর কিছুই না। মুখে সে অবস্থার কথা বলা যায় কি? সে তুমি কি বুঝবে? এখনও তুমি ছেলেমানুষ মাত্র। বড় উচ্চ অবস্থার কথা সে সব। তুমি আর নির্গুণ ব্রহ্ম এক। মায়া তোমার স্বরূপ আবরণ করে বসেচে। তুমি কেন, পৃথিবীর সব কিছু। ছোট কেউ নও। তোমরা সবাই অজর অমর, শাশ্বত আত্মা—তুমিই এ জগতের কর্তা, এ জগৎকে সৃষ্টি করেচ—তবে ছোট হয়ে আছ কেন? এই লোকে এসেচ—এও উপাধির লোক। এর আরও ওপরে উচ্চতর লোক আছে—মহা জ্যোতির্ময় লোক, দেব-দেবীরা সেখানে বাস করেন। তোমার মত লোক তার ধারণা করতে পারবে না। জগৎকে সৃষ্টি ও লয় করতে তাঁরা সমর্থ। কিন্তু সেও অনিত্য। সেও উপাধি ও স্বগুণস্তরের জগৎ। তারও ওপরে নিরুপাধি নির্গুণ ব্রহ্ম বিরাজ করেন। সেখানে পৌঁছুনো মানুষের আগ্রহ থাকলেই হয়। আসলে তোমার সঙ্গে তার অভিন্নতা কোথায়? এ জগতে দুঃখ নেই, পাপ নেই, শোক নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই সে তো দেখেই নিলে, ক্ষুদ্রত্ব নেই, এসব কিছু নেই—আছে শুধু আনন্দ, অমরত্ব, বিরাটত্ব। আর তুমিই তার অধিকারী। অতএব ওঠো, জাগো—তৎ ত্বমসি—তুমিই সেই।

সন্ন্যাসীর সর্বদেহ দিয়ে একপ্রকার নীল বিদ্যুতের মত জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্চে—তাঁর দিকে চাওয়া যায় না। যতীন তাঁর পদস্পর্শ করবার জন্যে মাথা নীচু করতেই তিনি বল্লেন—উঁহু—ছোট ভেবে আমার পা ছুঁয়ে তোমার কি হবে? ছোট তুমি নও। তুমিই দেব, তুমিই দেবী, তুমিই সগুণ ঈশ্বর—তুমিই জগৎকারণ নিরুপাধি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—একই আছে, আর কিছু নেই জগতে—একম্ এব, অদ্বিতীয়—পৃথিবী বা পরলোক সব দুদিনের খেলা, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু—বার বার আসা-যাওয়া—সব অনিত্য—জেগে ওঠো—ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো।

সন্ন্যাসী এত জোরে জোরে কথাগুলো বল্লেন—যতীনের মনে হোল তার সমস্ত শরীরে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল—সন্ন্যাসীর দেহ থেকেই যেন সে বিদ্যুৎতরঙ্গ ছুটে এল তার দেহে। সে চোখের সামনে কতকগুলো গোল গোল জড়ানো জড়ানো গোলকধাঁধা খেলার মত কি দেখলে—তারপর আর তার জ্ঞান রইল না। যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে সে যেন কোথায় চলেচে।

নীল আকাশ, সোম-সূর্য-তারকাচিহ্নিত—তার আশেপাশে ঊর্ধ্বে, নামোতে। বহু দূরে নীল সমুদ্রে ডুবে একটা কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা পাক খাচ্চে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নক্ষত্র, সূর্য,—কুয়াসার ঢেউ-এর মত উল্কাপিণ্ডদল বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের বহির্দেশে ভ্রাম্যমাণ—লক্ষ লক্ষ জীব-জগৎ, কোটি কোটি জীবজগৎ, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি আত্মিক লোক—কত লীলা, কত খেলা, কত সুখদুঃখের অনন্ত প্রবাহ—অনন্ত জীবজগৎ……

এ সবও ছাড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় রাজ্যের প্রান্তে গিয়ে একটি অপূর্ব শান্তির অনুভূতি সে অনুভব করলে···সুগভীর আনন্দ ও শান্তি, আর যেন মনে কোনো আশা নেই, কোনো তৃষ্ণা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, পাপের ভয় নেই, পুণ্যের স্পৃহা নেই, স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই, পুষ্পের প্রতি প্রেম নেই, আশালতার প্রতি অনুকম্পা নেই—মনই নেই—যেন শুধু আছে 'আমি আছি' এই অনুভূতি, আর আছে তার সঙ্গে মিশে এক অতি উচ্চস্তরের আনন্দ, শান্তি মহা উচ্চ জ্ঞান ও স্বয়ম্ভু স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের গভীর অনির্বচনীয় আনন্দ।

যতীনের মনে হোল সেই সন্ন্যাসী যেন কোথায় তার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন···কখনও তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ দেখা যায়, কখনও যায় না।

তারপর সেই জ্যোতির্ময় দেশের অপূর্ব শান্তি ও আনন্দময় আবেষ্টনীর মধ্যে সে প্রবেশ করলে···সঙ্গে সঙ্গে সেই সুগভীর পুলকে তার মন আবার ভরে উঠলো—উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেহধারী দেবদেবীরা সে রাজ্যের মণ্ডলে বিচরণ করচেন, তাঁরা যে আসনপীঠে ঠাকুর সেজে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন তা নয়, তাঁরা যেন সে জগতের সাধারণ অধিবাসী, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই কেউ আকাশপথে বায়ুভরে চলেচেন, সমতল ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল পৃথিবীর মানুষের মত নন তাঁরা—উর্ধ্বে, নিম্নে—সবদিকে সমান গতি তাঁদের···দু'একজনকে কাছে থেকে দেখবারও অবসর সে পেলে···পৃথিবীর মানুষের মত দেহ বটে, কিন্তু যেন বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, দেবীদের মুখের সৌন্দর্য অতুলনীয়, তাদের পৃথিবীর বাড়ীতে ছেলেবেলায় একটি প্রাচীন পটুয়ার আঁকা রাজরাজেশ্বরী মূর্তি ছিল দেওয়ালে টাঙানো, তার বৃদ্ধা ঠাকুরমা রোজ স্নান সেরে সেই পটের পুজো করতেন, খানিকক্ষণের জন্যে যেন পটের মুখ হাসতো—এতদিনের মধ্যে জীবনে সে সেই পটে আঁকা রাজরাজেশ্বরীর মুখশ্রীর মত সুন্দর ও কমনীয় মুখশ্রী আর দেখেনি···এখানে সে দু-একটি দেবীর মুখ যা দেখবার সুযোগ পেলে, পটের সে ছবির মুখের চেয়ে অনেক, অনেকগুণে সুশ্রী, আরও মহিমময়ী, বঙ্ক চাহনির মধ্যে ত্রিভুবন-বিজয়ী শক্তি··· অথচ মুখে অনন্ত করুণার বাণীমূর্তি ·

কোথায় যেন রাশি রাশি বনপুষ্প ফুটেচে, নির্বাত ব্যোম তাদের সম্মিলিত সুবাসে ভরপুর···

এসবও ছাড়িয়ে চললো সে···মহাবিদ্যুতের মত তার গতি, কোথাও অনন্ত ব্যোমে, মহাশূন্যের সুদূরতম প্রান্তে, অনন্তের জ্যোতি-বাতায়ন যেখানে চারিদিকে উন্মুক্ত···দেবদেবীর বাসস্থান এ সব মহাদেশও যেন আপেক্ষিক চৈতন্যের রাজ্য; বাসনার রাজ্য···এদেরও দূর, বহুদূর পারে, সব আকাশ ও সময়ের পারে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেখানে এক হয়ে মিলিয়ে গিয়েচে—সোম সূর্য নেই, তারকা নেই, অন্ধকার নেই, আলোও নেই—সেই এক বহুদূর দেশে সে গিয়ে পৌঁছেচে···এদেশ আকারধারী জীব বা দেবযানীর রাজ্য নয়, সর্ববিধ আকার এখানে জ্যোতিতে লোপ পেয়েচে, অথচ এ জ্যোতিও দৃশ্যমান আলোকের জ্যোতি নয়, আগুন নয়, বিদ্যুৎ নয়—কি তা সে জানে না···তার সর্বদিকে, তাকে চারিধার থেকে ঘিরে এই জ্যোতি···আর কি একটা বিচিত্র, অনির্বচনীয় অনুভূতি···ওর মন লোপ পেয়েচে অনেকক্ষণ, চৈতন্যও যেন লোপ পেতে বসেচে···অথচ যতীনের মনে হোল এই তার আপন স্থান, এতদিনে আপন স্থানে সে ফিরে

এসেচে···এই তার বহুপরিচিত স্বদেশ— যুগ-যুগান্ত, কত মহাযুগ ধরে সে এখানে আবার ফেরবার অপেক্ষায় ছিল। মহাব্যোমে আর কেউ নেই, আশালতা না, পুষ্প না, তার যতীনও না, সন্ন্যাসী না, তাদের এ লোকে বাঁধা কত সাধের ঘর বা বুড়োশিবতলার ঘাট না, দেব না, দেবী না পরলোক না, এমন কি ঈশ্বরও না···

মহাব্যোমের মহাশূন্যে অনাদি, অনন্ত, স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, নিবিকার, নিবিকল্প সে শুধু আছে— পাপহীন, পুণ্যহীন, মঙ্গলহীন, অমঙ্গলহীন, সুখহীন, দুঃখহীন সর্বপ্রকার উপাধিহীন···

সে-ই আছে মাত্র একা।

নিঃসঙ্গ মহাব্যোমে আর কোথাও কিছু নেই, কেউ নেই!

সে-ই সব।

এমন কি, এ মহাব্যোমও তার সৃষ্টি··সৃষ্টি নয়--সে নিজেই।

যতীন আর কিছু জানে না।

যখন ওর চৈতন্য হোল তখন সে দেখলে সেই মহাসন্ন্যাসী পাশেই বুড়োশিবতলার ঘাটের রাণাতে বসে আছেন--সে তাঁর এপাশে বসে। যেন সে ঘুম ভেঙে উঠেচে এইমাত্র।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন---কি হোল? দেখলে?

যতীন মূঢ় ও অভিভূতের মত তার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কি দেখলাম বলুন দিকি?

—আমি চললাম। যা দেখলে, দেখলে। মুখে কি বোঝাবো? মন নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয় মাত্র, ওর চেয়ে বড় অনুভূতির দরজা যেদিন খুলবে, সেদিন আমায় বোঝাতে হবে না, নিজেই বুঝবে। তোমার সে অবস্থার এখনও বহু বিলম্ব। দু-চার জন্মে হবে না। অনেকবার এখনও পৃথিবীতে যাতায়াত করতে হবে।

তিনি যাবার উদ্যোগ করচেন দেখে যতীন ব্যাকুলভাবে বল্লে—প্রভু, যাবেন না, যাবেন না। পুষ্প বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন দয়া করে?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—সময় হোলে দুজনেই দেখা পাবে আবার। তবে স্ত্রীলোকের পথ ভক্তির, জ্ঞানের নয়। আমি তোমাদের দুজনকেই জানি, গত তিন জন্ম তোমরা আমার দেখা পেয়েচ, তোমাদের ভালবাসি। কিন্তু তাতে কি হবে? সময় হয়নি। চক্রপথে ঘুরতে হবে অনেকদিন। আমি আছি তোমাদের পেছনে। নতুবা আমার দেখা পেতে না।

সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হোলেন।

একটু পরে পুষ্প এল। বল্লে—কি করছিলে ?

যতীন তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—পুষ্প, তুমি মায়া ? মিথ্যে ?

—সে কি যতীন-দা ? ব্যাপার কি ?

—এ সব ভেল্কি ? তুমি ভুল বুঝিয়েচ পরলোক-টরলোক। আমরা মরে ভূত হয়ে আছি। চক্রপথে এখনো আমাদের অনেক ঘুরতে হবে।

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বল্লে—এ তত্ত্ব তুমি জানলে কোথায় ? নতুন কথা তোমার মুখে !

—হাসি নয়। আমার মনে শান্তি নেই। এক মহাপুরুষ এসে অদ্ভুত দর্শন করিয়ে গেলেন আমার গা ছুঁয়ে। এখন বুঝেচি সব মিথ্যে।

—কিছুই বোঝোনি। বুঝতে অনেক দেরি ! ভগবানের দয়া যেদিন হবে সেদিন বুঝবে। এ আমি অনেকদিন জানি। কিন্তু তাতে কি ? এতেই আনন্দ। যুগে যুগে আসবো যাবো, এর শোক-দুঃখেও আনন্দ খুঁজে নেবো। লালাসঙ্গী হয়ে থাকবো তাঁর। তিনিই খেলা করচেন, খেলুড়ে না পেলে খেলা করবেন কাকে নিয়ে ? সবাই ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকলে সব শূন্য, নিরাকার। তুমি নেই, আমি নেই, জগৎ নেই—ইহলোক নেই, পরলোক নেই। সত্যি কথা। কিছুই নেই—আবার সবই আছে। খেলা করো না দুদিন, যতদিন তিনি খেলাবেন।

—তারপর ?

—তারপর সকলের যা গতি, তোমারও তাই। তাঁতে ভক্তি রাখো, সব হবে। তুমি তো তুমি, আমি তো আমি—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অতি উচ্চ স্তরের আত্মা, যাঁরা দেব-দেবী হয়ে গেছেন—তাঁরাও তাই।···সব অনিত্য।

—তুমি এসব কি করে জানলে ?

—করুণাদেবী সেদিন বলেচেন। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না। ও শেষ অবস্থার কথা। যখন সে অবস্থা আসবে, তখন আর বসে ভাবতে হবে না। তিনিই পথ দেখিয়ে দেবেন। এখন চলো, আশাবৌদির বড় বিপদ, কিছু করতে পারি কিনা দেখা যাক্—

যতীন ব্যস্ত হয়ে বল্লে—কি-কি-কি বিপদ ? আশার ? কি হয়েচে ?

পুষ্প কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়লো যেন। বল্লে—ঐ ! এত বাসনা এত মায়া যার মধ্যে এখনও, তিনি জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে ভগবানে মিশে যেতে চান ! সন্ন্যাসি ভেল্কি দেখালে কি হবে, ও অবস্থা তোমার-আমার জন্যে নয়। পৃথিবী ছেড়ে এসে এখনও তার বাঁধন কাটাতে পারেন না, উনি বড় বড় বুলি ঝাড়েন !

—সন্ন্যাসী তাই বলছিলেন, সময় হয় নি।

—সময় শুধু হয়নি যে তা নয়—হোতে ঢের দেরি। ও নিয়ে মাথা ঘামাবে না বলে দিচ্চি।

তাঁর লীলাসঙ্গী হয়ে থাকো, মনে মনে সর্বদা তাঁকে ভক্তি করে ডাকো। তিনিই আলো আসবার কর্তা। করুণাদেবী কি কম উঁচু স্তরের জীব? কিন্তু উনি বলেন, আমি মনে-প্রাণে মেয়েমানুষ—সুখদুঃখ স্নেহভালবাসা নিয়ে থাকতে ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে চাই নে, লীলাসহচরী হয়ে থাকি তাঁর সৃষ্টিতে। তাকে ভালবাসি মনেপ্রাণে, তাঁর জীবদের সেবা করি যুগে যুগে। এই আমার তপস্যা। মুক্তি চাইনে।

—সত্যি, এমন না হলে আর দেবী! দেবী কি—সাক্ষাৎ মা! জগতের করুণাময়ী মা। আমাকে একবার দেখা দিতে বোলো, পায়ের ধুলো নেবো—না ভুল হোলো, ধুলো আর এখানে কোথায়? তা ছাড়া ওঁদের পায়ে কি ধুলো লাগে। এত উচ্চ জ্ঞান তাঁর এ আমি জানতাম না।

—আচ্ছা আর অত বিচার করতে হবে না তোমায়। আমি বলবো তোমায় দেখা দিতে। ওঁরাই তো দেবী। পৃথিবীতে ওঁদেরই তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পূজো করা হয়। ওঁরাই দুর্গা, ওঁরাই কালী, ওঁরাই সরস্বতী। নামে কি আসে যায়? অন্য দেশে হয়তো অন্য নামে পূজো করে।

—এখন কিছু কিছু বুঝচি। আগে এ সব কথাই শুনিনি কখনো পুষ্প—সত্যি বলচি।

—সময় না হোলে শুনতেও পায় না কেউ। অবধূত তোমায় কি দেখালেন বলো না?

যতীন বর্ণনা করলে। বর্ণনা করবার সময় তার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সেই অপূর্ব অনুভূতি ও পুলকের স্মৃতি এখনও ওর মনে খুব জাগ্রত—তাই বর্ণনা করতে গিয়ে এখনও তার কিছুটা যেন আবার সজাগ হয়ে উঠলো মনে।

আবার সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ, যেখানে সংকল্পও নেই, বিকল্পও নেই, মনের পারের সেই অনির্দেশ্য রাজ্য, ক্ষণকালের জন্যও যার মধ্যে প্রবেশের অধিকার সে পেয়েছিল মহাপুরুষ অবধূতের কৃপায়—সে জগতের বর্ণনা মুখে সে কি ক'রে দেবে? কথা তার জড়িয়ে যেতে লাগলো, ঘন ঘন রোমাঞ্চ হতে লাগলো সে অবস্থার স্মরণে। পুষ্প সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

পরে হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লে—তাঁর চরণে প্রণাম করো যতীন-দা। বড় ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েচ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সমান ওঁরা। কি পুণ্য না জানি ছিল তোমার।

দুজনে পৃথিবীতে নেমে এসেচে।

সন্ধ্যার কিছু পরে। যতীন কবি নয়, কিন্তু পৃথিবীর এ সন্ধ্যা, কি যে ভাল লাগলো ওর। পৃথিবীতে বৈশাখ মাসের প্রথম, আম্রনিকুঞ্জের নিভৃত অন্তরালে কোকিলের ডাক, সন্ধ্যা হওয়ায় প্রস্ফুটিত বিল্বপুষ্পের ঘন সুবাস, একটি জামগাছে কচি সবুজ থোলো থোলো জাম ধরেচে, রাঘবপুরের হাট সেরে হাটুরে গোরুর গাড়ীর সারি চুয়াডাঙার কাঁচা সড়ক ধরে চলচে আম-কাঁঠাল বাগানের তলায় তলায়, মাঠে মাঠে আউশ ধানের ক্ষেতে সবুজ ধানের জাওলা।

আশাদের পুকুরের ধারের তেঁতুল গাছের তলায় ওরা বসলো। যতীনের মনে হোল, কি সুন্দর পৃথিবীর বসন্ত! সেই বহুপরিচিত প্রিয় পৃথিবী, কত দুঃখ-সুখ, আশা-আনন্দের স্মৃতিতে ভরা। সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে ভাল আছে কি মন্দ আছে জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে এলেই মন সরে না এখান থেকে যেতে। এই বৈশাখে কচি আমের ঝোল, বেলের পানা, ঐ

অদূরবর্তী চূর্ণী নদীতে এই গরমের দিনে অবগাহন স্নান, হাট থেকে পাকা তরমুজ কিনে আনা …নাঃ, পৃথিবীই ভালো। কোথায় এ সব সুখ? মাটির পথে চলার ছোটখাটো কত আনন্দ, কত স্মৃতি…হাসি অশ্রু…

পুষ্প হঠাৎ বল্লে—কি ভাবচো যতীন-দা? ব্রহ্মজ্ঞান পেতে গিয়েছিলে না?

—না পুষ্প, বড় ভাল লাগচে। অনেকদিন পরে এসে—

—পৃথিবীর বাতাসে বাসনা কামনা ভাসচে, এজন্য বড় বড় আত্মারা পৃথিবীতে আসতে চান না। ছেলেবেলায় যাত্রা হয়েছিল একটা গান শুনেছিলে নৈহাটিতে? 'এ বাঁধন বিধির সৃজন, মানব কি তায় খুলতে পারে'—পৃথিবীতে ফিরে এসে বেশীক্ষণ এই জন্যে থাকতে নেই। ঐ ছোটখাটো সুখদুঃখের সোনার শেকলে বাঁধা পড়তে সাধ যায়। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'—তুমি তো তুমি!

—যা বলেচ পুষ্প, তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো—

—সত্যি যতীন-দা। আমার কি হয় না? এখনই হচ্চে। বড় বড় আত্মা পর্যন্ত অনেক সময় পৃথিবীতে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে পুনর্জন্ম গ্রহণের কামনা করেন। নিম্নস্তরের দুর্বল আত্মার তো কথাই নেই। খুঁৎ খুঁৎ করে পৃথিবীর কাছাকাছি ঘোরে। নয়তো ফট্ করে আবার জন্ম নিয়ে বসে। তাদের ঘন ঘন পৃথিবীতে আসা বারণ!

যতীন হেসে বল্লে—যেমন আমি—

—তুমি কেন, অনেক মহারথীর এই দশা হয়। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে মানুষ এগিয়ে চলবে কবে? ভগবানের তা ইচ্ছে নয়। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকলে চলবে না। পথ অফুরন্ত, পথের পাশে ফুলের সুগন্ধে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়তে ভালো লাগে বটে কিন্তু তা আমাদের গতি আটকে দেবে। অভীঃ, ভয় নেই—এগিয়ে চলো, অভীঃ—

—ওঃ, তুমি এত কথা জানলে কবে পুষ্প?

—করুণাদেবীর সঙ্গে কি এমনি এমনি বেড়াই। তা ছাড়া আমি তোমার কত আগে এখানে এসেচি জানো তো? দয়া করে ওঁরা আমায় শিখিয়েচেন। ভগবানের মহাশক্তিই এগিয়ে নিয়ে চলেচে সবাইকে—

হঠাৎ পুষ্প পুকুরপাড়ের ওদিকে চেয়ে বল্লে—ঐ ভাখো যতীন-দা—

যতীন চেয়ে দেখলে পুকুরপাড়ের আমবাগানের তলায় চুপি চুপি চোরের মত একটি লোক এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই ওদের বাড়ীর খিড়কিদোর খুলে আশা বের হয়ে এল এবং গাছতলায় লোকটির সঙ্গে যোগ দিলে। যতীন সর্বশরীরে কেমন একটা জ্বালা অনুভব করলে। সংস্কারের প্রভাব, জ্বালা তো দেহের নয়, আসলে মনের।

সে আপন মনে বলে উঠলো—যদু মুখুয্যের ছেলে নেত্যনারান—

পুষ্প বল্লে—চেন ওকে?

—কেন চিনবো না? শ্বশুরবাড়ীর এ পাড়াতেই ওদের বাড়ী, ও কলকাতায় কি চাকরি

করতো জানি, বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল তাও জানি। আশা বলতো প্রায়ই, আমাদের গাঁয়ের নেত্যদা এবার বি-এ পাশ দেবে। উঃ, আশা যে এতদূর নেমে যাবে—! এখনও আমি দুবছর মরিনি—এর মধ্যেই—পাপীয়সী!

—যাত্রাদলের ভীমের মত কথা শুরু করে দিলে যে যতীনদা! আশা-বৌদির বয়সের কথা ভেবো। জড়দেহ থাকলেই তার কামনা বাসনা আছে। বড় বড় হাতী তলিয়ে যাচ্চে তো মূর্খ আশা-বৌদি।

যতীন বিরক্ত হয়ে বল্লে—লেকচার রাখো। এই দেখাতে নিয়ে এলে! উঃ, ইচ্ছে হচ্চে ছোকরার ঘাড়টা মট্‌কাই—পারি কই? হাত পা যে হাওয়া।

—অত অধৈর্য হয়ো না। খুন করবার প্রবৃত্তি জাগলো কেন? একটা কিছু করতে হবে। সে কিন্তু ওভাবে নয়। একটা ছোকরাকে মারলে আরও অনেক ছোকরা জুটবে। মন নীচু দিকে নামলে জলের মত গড়িয়েই চলে। আশা-বৌদির অদৃষ্ট ভাল না। এখনও অনেক দুঃখ, অনেক অপমান আছে ওর ভাগ্যে, তুমি আমি কি করবো? কর্মফল ওর। বেচারী! এখন ওরা যা করচে, তাতে বাধা দিতে তুমি আমি কেউ নই! মানুষ স্বাধীন, সে পুতুলখেলার পুতুল নয়। বাসনানদী পাপের পথেও বয়, পুণ্যের পথেও বয়। চলো, এক কাজ করি।

যতীন কিন্তু এগিয়ে গেল পুকুরের ওপাড়ের দিকে। আশার পরনে সরু কালোপাড় ধুতি, হাতে ক'গাছা সোনার চুড়ি, যতীন চিনতে পারলে তাদের গ্রামের মহেন্দ্র সেকরার দোকান থেকে বিয়ের পরের বছর গড়া। আশা বসে পড়েচে গাছের গুঁড়ির আড়ালে, নেত্যনারান কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

আশা বলচে—বাড়ী করে দিলে গাঁয়ের লোক যদি কিছু বলে?

নেত্য হাত নেড়ে বল্লে—থোড়াই কেয়ার। এ শর্মা আর কাউকে ভয় করে না। তুমি ঠিক থাকলেই হোল। তুমি বলবে, বাপের বাড়ার সংসার আর দুদিন পরে ভাইয়েদের সংসার হবে। আমার শ্বশুরবাড়ার টাকায় আমি বাড়া করচি। মিটে গেল, কার কি বলবার আছে?

—ও জমিটা তা হোলে কিনতে হবে তো?

—সে লেখাপড়া আমি করে দেবো। বেশ হবে, ইটের দেওয়াল আর খড়ের চালা করে দিই। তুমি ওখানে চলে যাও। পাড়ার বাইরে ঘর হবে, একটু বেশী রাত করে চলে যাবো, শেষ রাতে উঠে চলে আসবো। এমন বনে-জঙ্গলে ভয়ে ভয়ে আর দেখা করতে হবে না। সারারাত্রি মজা করো, কি বলো?

—তুমি যা বোঝো। আমার কিন্তু হাতে মাত্র পঞ্চাশটি জমানো টাকা আছে, আর কিছু নেই বলে দিচ্চি—দু'এক কুঁচো গহনা-ভাঙা সোনা হয়তো আছে। বাড়ী করবার খরচ কিন্তু তোমায় দিতে হবে।

নেত্য হাসিমুখে বল্লে—দেখি মুখখানা? ও মুখ দেখে বাড়া তো বাড়া, পয়সা থাকলে মটোর গাড়ী কিনে দিতে পারতাম। কিন্তু বলে দিচ্চি, ও শম্ভু চক্কত্তিটার সঙ্গে আর কথা বলতেও পাবে না কোনো দিন।

আশা হেসে বল্লে –আহা! শম্ভুদা'র ওপর তোমার অত হিংসে কেন? আমি কবে কি করচি তার সঙ্গে? সে আসে যায়, পাশের বাড়ীর ছেলে তাড়িয়ে তো দিতে পারিনে?

— আচ্ছা, ভালো কথা। নিজের বাড়ী হোলে সে তো আর পাশের বাড়ীর ছেলে থাকবে না, তখন নতুন বাড়ীতে না ঢোকে যেন।

আশা একটু ভেবে বল্লে—হ্যাগো, এতে গাঁয়ে কোনো কথা উঠবে না তো? আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি বলো। তুমি রাগ কোরো না—আমার ভয় করে।

—কোনো ভয় নেই। নেত্য মুখুয্যে যে কাজে হাত দেবে, তাতে কিছু গোলমাল হবে না। কিছু ভেবো না।

কথা শেষ করে নেত্য আশার পাশে বসে পড়ে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে –আমায় ভালোবাসো আশা?

আশা এদিক ওদিক চেয়ে মৃদুস্বরে বল্লে—নিশ্চয়ই।

—সত্যি বলচো?

— কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

—তোমাদের যে মতিস্থির নেই কিনা, তাই বলচি। কাল সাগ্রাহপুর শম্ভু চক্কত্তির সঙ্গে গল্প করেচ।

—আহা! মা সেখানে সব সময়ে বসে। শম্ভুদা একটা কবিতার বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

—কি কবিতা?

—তা জানি নে। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভাবো কেন? আমার একটা উপায় যেখানে হয়, সেখানেই আমি থাকবো। মা বুড়ো হয়েচেন, আমার নিজের হাতে সম্বল নেই। ভাইবৌরা এসে যদি জ্বালা দেয়, কুকথা শোনায়, সে সংসারে থাকা আমার পোষাবে না। যদি অদৃষ্ট মন্দ না হবে, তবে এত শীগ্‌গির কপাল পুড়বে কেন আমার?

আশা মুখ নাচু করে আঁচলে চোখের জল মুছলে। যতীনের মন করুণা ও সহানুভূতিতে ভরে উঠলো ওর ওপরে· তাহলে জীবনের এসব সঙ্কটময় মুহূর্তেও আশা তার কথা মনে করে! এখনও তাকে সে ভোলেনি! পুষ্প ওর পাশে এসে মৃদুস্বরে বল্লে—চলে এসো যতীনদা, এখানে থেকে কিছু করতে পারবে না।

গভীর রাত্রি।

আশা তাদের বাড়ীর ছোট্ট ঘরে ময়লা বালিশ মাথায় দিয়ে মেজেতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। গরমের দরুন শিয়রের জানালাটা খোলা। পুকুরপাড়ের অভিসার থেকে ফিরে সে দুটি মুড়ি খেয়ে শয্যা আশ্রয় করেচে। গরীবের ঘরের বিধবা, রাত্রে লুচি পরোটা জোটে না।

যতীন বল্লে—আহা, কি খেলে দেখলে তো পুষ্প? পেট পুরে খেতেও পায় না।

—তা তো হোল, কিন্তু এখনও ঘুমোয়নি ভালো। গরমে ঘুমুতে পারচে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখন সামনে যেও না। এই রকম আধ-তন্দ্রা অবস্থায় তোমাকে ও

দেখতে পেতে পারে। তোমার দেহও এখনও তেমন সূক্ষ্ম হয়নি। তাতে ফল হবে উল্টো! ও আঁক-পাঁক করে উঠবে ভূত দেখচে বলে, সেবারে সেই জানো তো?

যতীন বাইরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালো। যতীনের বৃদ্ধা শাশুড়ী পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। যতীনের মনে পড়লো, আশার সঙ্গে প্রথম বিয়ের পরে এই ঘরে তাদের বাসর হয়। তারপরে জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ীতে এসে সে এই ঘরে নববিবাহিতা বধূর সঙ্গে রাত্রিযাপন করেচে। কোথায় গেল সে সব দিন! তার ইচ্ছে নেই অন্য কোথাও যাবার। আশা বিপন্না, সে এখানে আশার কাছেই থাকবে। স্বর্গ-টর্গ তার জন্যে নয়। ঐ সেই কুলুঙ্গি, আশার জন্যে এক শিশি গন্ধতেল কিনে এনেছিল একবার, ঐ কুলুঙ্গিটাতে থাকত, দুজনে মাখতো। তার মাথায় জোর করে বেশি তেল ঢেলে দিয়ে আশা নিজের হাতে মাখিয়ে দিত। কাড়াকাড়ি করে মাখতো দুজনে।

সেই আশা কেন এমন হয়ে গেল?

পুষ্প এসে বল্লে—এসো যতীন-দা। আশাবৌদি ঘুমিয়ে পড়েচে।

আশা খানিকক্ষণ আগে ঘুমিয়েচে। ময়লা বালিশটা মাথায় দিয়ে ছেঁড়া মাদুরে শরীর এলিয়ে দিয়েচে। যতীনের মন করুণায় ভরে উঠলো। মেয়ে-মানুষ অসহায়, ওদের কি দোষ। সংসারে বহুলোক ওৎ পেতে আছে ওদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্যে। একটু আশ্রয়ের আশায় ওরা না বুঝে না ভেবে দেখে সে পথে ছোটে। যতীন কাছে গিয়ে ডাকলে —আশা?

পুষ্প বল্লে—দাঁড়াও, শুধু ডাকলে হবে না, লেক্‌চারের কাজ নয়। ওর মনে তোমাদের কোনো একটা সুখের রাত্রির ছবি আঁকো। যেমন ধরো তোমাদের ফুলশয্যার রাত্রি, তোমাদের গাঁয়ের ভিটেতে।

—সে কি করে করব?

—সেদিনের কথা একমনে চিন্তা করো—

একটু পরে আশার সূক্ষ্ম শরীর ওর দেহ থেকে বের হয়ে মূঢ়, অভিভূতের মত চারিদিকে চাইলে। কিন্তু পুষ্প দেখেই বুঝলে সে দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতের ঊর্ধ্বের অতি নিম্নস্তরেও নিজের চৈতন্য পূর্ণ প্রকাশ করতে অসমর্থ।

পুষ্প বল্লে—ওকে ছবি দেখাও যতীনদা—

—ছবি দেখবে কে? ওর তো এ লোকে জ্ঞান নেই দেখচি—

—ছবি দেখাও, তা হোলে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে—

—ফুলশয্যার রাত্তিরের?

—বা যে কোনো একটা সুখের দিনের। পারবে তো? আমার দ্বারা তো হবে না। তোমার নিজের ছবি তোমাকে দেখাতে হবে।

যতীন একমনে ভেবে সত্যিই একটা ছবি তৈরি করতে সমর্থ হোল। এ স্তরে চিন্তার শক্তি ক্ষণস্থায়ী আকার নির্মাণ করতে সমর্থ—একটা পুরোনো কোঠার ঘর আশাকে এবং ওদের

সকলকেই যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে। কাঁঠাল-কাঠের পুরোনো তক্তপোশে লেপ তোশক পাতা বিছানা যতীনের পৈতৃক, জানালার বাইরে মনসাতলার আমগাছটা, ঘরে জল-চৌকির ওপর ঝকঝকে পুরোনো পেতল কাঁসা, যতীনের মায়ের হাতে মাজা। যতীনের শোবার সেই ঘরটি এমন বাস্তব হয়ে উঠলো যে আশার ঘরবাড়ী মিলিয়ে গেল। যতীনও যেন অবাক হয়ে গেল তার চিন্তাশক্তির কার্য দেখে। আশা তার শ্বশুরবাড়ীর ঘরটাতে শুয়ে আছে —প্রায় নিখুঁত শ্বশুরবাড়ীর ঘর, দেওয়ালে টাঙানো কাঠের আর্শিটা পর্যন্ত। আশার সূক্ষ্ম দেহ তখনও অর্ধ-সচেতন। যতীন স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যেন ঘুম ভেঙে উঠে চারিদিকে চাইলে এবং কি দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। যতীন আবার ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যতীনের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখল, যেন কিছু বুঝতে পারলে না।

—আশা, ভাল আছ ?

পুষ্প বল্লে—অমন ধরনের কথা বোলো না। ছবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুরোনো দিনের মত কথা বলো।

যতীন বল্লে—আশা, কাল সকালে উঠে কাপাসডাঙায় যাবো কাজে। ভোরে একটু চা করে দিতে পারবে ?

আশা উত্তর দিলে—খুব ভোরে যাবে ? কত ভোরে ?

—সাতটার মধ্যে।

আশার চোখের মূঢ় দৃষ্টি তখনও কাটেনি। সে বল্লে—আমি কোথায় ?

যতীন বল্লে—কেন, তোমার শ্বশুরবাড়ীতে—চিনতে পারচো না ? কি হয়েচে তোমার ? চা দেবে করে ?

—হ্যাঁ।

—খাবার দেবে না ?

—কি খাবে ? চিঁড়ে দিয়ে ঘোল দিয়ে খেও এখন।

একদিন আশা সত্যিই এই কথা বলেছিল। যতীনের চোখে জল এল আবেগে। সে আবার তার পুরোনো পৈতৃক বাড়ীর বিস্মৃত দিনে ফিরে গিয়েচে নববিবাহিতা আশার পাশে। যতীনে অনুভূতির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে তার তৈরি ছবি আরও স্পষ্ট নিখুঁত হয়ে উঠলো। আশা এবার আরও সজাগ হয়ে উঠে চারিদিকে চাইলে, কিন্তু তার বিস্ময়ের দৃষ্টি এখনও কাটেনি।

যতীন বল্লে—তাহলে তাই। আমায় তুমি ভালবাসো আশা ?

কথা বলেই নেত্য চক্কত্তির মত সে আশার হাতখানা নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে রাখলে। তারপর পেছনে চেয়ে দেখলে পুষ্প সেখানে নেই। মেয়েমানুষ, যত উচ্চস্তরের হোক না কেন, প্রেমাস্পদ অন্যকে ভালবাসচে, এতে মন স্থির রাখতে পারে না।

আশা বল্লে—হ্যাগা, তুমি কখন এলে ?

—কোথা থেকে আসবো ?

—যেন তুমি অনেকদিন বাড়ী ছিলে না !

—নিশ্চয়ই ছিলাম। কোথায় আমি যাবো ? খেপলে নাকি আশা ?

আশা প্রবোধপ্রাপ্ত ছোট মেয়ের সুরে বল্লে—যাওনি তাহলে ?

—না আশা— কোথায় যাবো ?

—আমার জন্যে একজোড়া শাড়ী এনে দিও কাল। আটপৌরে শাড়ী নেই।

—ক' হাত ?

—এগারো হাত দিও, দশহাতে ঘোমটা দিতে পারিনে মার সামনে, লজ্জা করে।

—বেশ।

তারপর আশা ভেবে ভেবে বল্লে—আচ্ছা, আমার কি একটা হয়েছিল বলো তো, কিছুতেই যেন মনে নিয়ে আসতে পারচি নে।

—কি আবার হবে, কিছুই না।

—ও! তবে বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলাম। না ?

—তাই হবে। লক্ষ্মীটি, ও সব ভাবতে নেই। তুমি আমায় ভালবাসো ?

আশা সলজ্জ সুরে বল্লে—হু'-উ—

যতীন ভাবলে, কোন্ জগৎ সত্য ? এই ছবিতে গড়া স্বপ্নের জগৎ, না বাস্তব জগৎ ? না কি সবই স্বপ্ন ? সেদিন সেই অবধূত যা বলে গিয়েছিল। জগৎটাই জাগ্রত স্বপ্ন ছাড়া আর কি ? কোথাকার আশা, কি সে দেখচে, কে তাকে কি ভাবাচ্চে। অথচ আশা ভাবচে এই বুঝি সত্য। ভগবান কি জীবকে ছবি দেখাচ্চেন না তাঁর সৃষ্ট জগতের মধ্যে দিয়ে, যেমন সে এখন দেখাচ্চে আশাকে ?

সে সস্নেহ সুরে বল্লে—তা হলে তুমি ঘুমিয়ে পড় আশা, রাত হয়েচে—

—আজ বড্ড গরম, না ? ঘুম হচ্চে না। একটা মশারি এনে দিও— বড্ড মশা—

—তা হবে। সকালে সকালে উঠে চা করে দিও তাহলে ?

—আচ্ছা।

পুষ্প বাইরে থেকে বল্লে—চলো, যতীনদা। একদিনে ওর বেশি আর কিছু তুমি করতে পার না।

ওরা চলে যাওয়ার একটু পরে আশার ঘুমও ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে চারিদিকে দেখলে। এ কোথায় সে আছে ? এমন স্পষ্ট স্বপ্ন সে আর কখনো দেখেনি। কতদিন পরে সে তার স্বামীকে এত স্পষ্ট ভাবে দেখেচে, এইমাত্র যেন তিনি পাশে বসে ছিলেন। কতক্ষণ স্বপ্নের কথা সে ভাবলে। সব কথা তার মনে নেই, এইটুকু মনে আছে, তিনি যেন বলচেন—একটু চা করে দিতে পারো ? চা খাবো—

সেই পুরোনো হাসি, পুরোনো আমলের স্নেহদৃষ্টি স্বামার চোখে। আশা উদ্‌ভ্রান্তের মত জানালার বাইরে চেয়ে রইল। কোথায় আজ সেই স্বামী, কোথায় তার সেই শ্বশুরবাড়ী ! নিজের প্রতি করুণায় তার মন ভরে গেল, চোখে জল এল।

সেদিন পুষ্প বল্লে—যতীনদা, মন খারাপ করে বসে আছ নাকি? চলো করুণাদেবীর কাছে যাবে।

—আমি সেখানে যেতে পারবো না। অত উঁচুতে উঠলে আমার চৈতন্য থাকে না জানো—সব সময় তাঁকে দেখতেও পাইনে। কি করবো বলো। তা ছাড়া আমার অন্য অনেক রকম ভাবনা—

—ভাবনা তো জানি। ও ভেবে কোনো লাভ আছে? যার যেমন অদৃষ্টে আছে, তেমনি হবে। চেষ্টা তো করলে অনেক। ওর কর্মফল ওকে ওই পথে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি আমি কি করবো বলো।

আরও কয়েক মাস কেটে গিয়েচে। আশালতার মনের অবস্থা দিনকয়েকের জন্য একটু ভাল হয়েছিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনো ফল তাতে হয়নি। নেত্য তাকে গ্রামের প্রান্তে আলাদা বাড়ী করেও দেয়নি। ভুলিয়ে তার কতকগুলো সোনার গহনা হাত করে সেই টাকায় ওকে কলকাতায় এনে রেখেচে। যতীন রোজ সেখানে যায় রাত্রে, একটা লম্বা ব্যারাকমত পুরনো বাড়ীর একটা ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে আশা বসে রাঁধে, এখানে সে পাশের ভাড়াটেদের সামনে সামাজিকতা বজায় রাখার জন্যে বিধবার বেশ ঘুচিয়ে নেতার স্ত্রী সেজেচে, হাতে চুড়ি পরে, কপালে সিঁদুর দেয়। প্রথমে যেদিন নেতাই তার কাছে এ প্রস্তাব করে যতীন সেখানে উপস্থিত ছিল।

নেত্য বল্লে—রাস্তা থেকেই তোমাকে এটি করতে হবে আশা। যেখানে যাবে, সেখানে আশ-পাশের ঘরে অনেক ফ্যামিলি বাস করে। তাদের সামনে কি বলে দাঁড়াবে, কি পরিচয় দেবে? বাড়ীওয়ালাই বা জায়গা দেবে কেন?

আশা বল্লে—সে আমি পারবো না। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হয়ে আবার পেড়ে কাপড় পরবো, সিঁদুর পরবো,—এ হবে না আমায় দিয়ে নেতাদা—

নেত্য শ্লেষের সুরে বল্লে—নাও নাও আর ন্যাকামি করতে হবে না। ব্রাহ্মণের বিধবার তো সব রাখলে, এখন যার সঙ্গে বেরিয়ে এলে তার কথামত চলো।

আশা বিস্ময়ের সুরে বল্লে—বেরিয়ে এলাম!

—আহা-হা নেকু! বেরিয়ে আসার কি হাতীঘোড়া আছে নাকি? আবার তুমি ঘরে ফিরে যাও তো মানিক! এতক্ষণ গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েচে ছাখো গে যাও—

—বা-রে, তুমি বল্লে আমাকে কলকাতায় আলাদা বাসা করে দেবে। আমি আমার গহনা বিক্রি করে চালাবো—তারপর মাকে সেখানে নিয়ে এসে রাখা হবে। বলো নি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এখনও তো তাই বলচি, বলচি নে? আমার হাত ধরে যে-মাত্তর বাড়ীর বাইরে পা দিয়েচ, সেই মাত্তরেই তুমি বেরিয়ে এসেচ। ওকেই বলে বেরিয়ে আসা। এখন

আর ফেরবার পথ নেই—যা বলি সেই রকমই করো। তোমার ভালোর জন্যেই তো বলচি। দেখো কত সুবিধে হবে, কলকাতায় বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। আখেরে ভালো হয় কিনা দেখে নিও।

যতীন সেদিন ফিরে এসে পুষ্পকে সব বলেছিল। পুষ্প বলে—আশাদি বড় নির্বোধ, নেত্য লোকটা ওকে ভুলিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটাচ্চে। কিন্তু কিছু করবার নেই।

—কেন পুষ্প? এক অবলা মেয়েকে সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাতে পারো না তোমরা?

—কই পারি। যে যার কর্মফলের পথে চলে, কে কাকে সামলায়?

এরপর প্রায় তিন মাস কেটেচে। আশা ও নেত্য বাসাবাড়ীতে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে বসে স্বামী-স্ত্রীর মত সংসার করচে। নেত্য বাজার করে নিয়ে আসে, আশার সামনে বসে গল্প করে, দুবার সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েচে, একবার পাশের ঘরের ভাড়াটেদের সঙ্গে আশা কালীঘাটেও ঘুরে এসেচে।

পুষ্প কত চেষ্টা করেচে যতীনকে ওখান থেকে আনবার। কিন্তু যতীন শোনে না, পুষ্পকে লুকিয়ে সে আজকাল প্রায়ই আশার বাসায় যায়। একদিন রাত্রে একটা স্বপ্নও দেখিয়েছিল, কিন্তু পুষ্পের সাহায্য না পাওয়ায় সে স্বপ্ন হয় বড় অস্পষ্ট, তাতে ঘুম ভেঙে উঠে আশা সারা সকালটা মন ভার করে থেকে নেত্যর কাছে বকুনি খায়।

পুষ্প বল্লে—চলো আজ করুণাদেবীর কাছে গিয়ে বলি—

—এইখানেই তাঁকে আনো। আমি কোথাও যাবো না।

—পৃথিবীর মধ্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এই রকম?

—কি করি বলো। আমরা তো খুব উঁচুদরের মানুষ নই তোমাদের মত, এই আমাদের পরিণাম। কর্মফল!

যতীনের ঠেস দেওয়া কথায় পুষ্প মনে আঘাত পেলেও মুখে কিছু বল্লে না। সে বেশ বুঝেছে যতীনদাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত না করলে ওর উন্নতি হবে না। যতদিন আশা বাঁচবে, তার পেছনে অস্থানে কুস্থানে ও ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—তাতে কোনো পক্ষেরই কোনো সুবিধে হবে না।

ইতিমধ্যে একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল আশাদের বাসায়। আশার গ্রামের শম্ভু চক্কত্তি বলে সেই ছেলেটি অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আশার সন্ধান পেয়ে সেখানে এল। আশা তখন রান্না করচে। শম্ভুকে ঢুকতে দেখে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। শম্ভু এসে বল্লে—কি আশাদি, চিনতে পারো?

আশা শুকনো মুখে ভয়ের সুরে বল্লে—এসো বোসো শম্ভুদা—কি করে চিনলে ঠিকানা?

—নেত্য স্কাউণ্ড্রেলটা কোথায়? আমি একবার তাকে দেখে নিতাম। তারপর, কি মনে করে এখানে এসে আছ?

—কারু দোষ নেই শম্ভুদা, আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেচি।

—গাঁয়ে কি রকম হৈ-চৈ পড়ে গিয়েচে তুমি জানো না। কেন তুমি এরকম ক'রে এলে? কতদূর খারাপ করেচ তা তুমি বুঝেচ?

—গাঁয়ে থেকেই বা কি করতাম শম্ভুদা। এ বেশ আছি। আমাদের মত মানুষের আবার গাঁ আর অগাঁ কি? কি ছিল জীবনে? মা মরলে কোথায় দাঁড়াতাম? এখানে খারাপ নেই কিছু। ফিরে যখন যেতে পারবো না, তখন সেকথা ভেবে আর কি হবে!

—আমি তোকে বোনের মত ভালবাসি আশা, চল্ তোকে এখান থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেবো।

আশা কি একটা জবাব দিতে যাচ্চে এমন সময়ে নেত্য এসে হাজির। শম্ভুকে ওখানে দেখে সে খুব চটে গেল মনে মনে, তখন কিছু বল্লে না, কিন্তু তারপর আশাকে যথেষ্ট তিরস্কার ও অপমান করলে। তার ধারণা আশাই শম্ভুকে লুকিয়ে খবর দিয়ে এনেছিল।

যতীন সব দেখলে দাঁড়িয়ে। আজকাল সে সন্দেহ করে এই নেত্যর জন্যেই আশা শ্বশুরবাড়ী যেতে চাইত না। পুষ্প সব জানে কিন্তু তাকে কখনো কিছু বলেনি। তবুও রাগ হয় না আশার ওপর—গভীর একটা অনুকম্পা, সে দ্বিতীয় স্তরের প্রেত যদি হোত, তবে নেত্যকে একদিন এমন বিভীষিকা দেখাতো যে মরে কাঠ হয়ে যেতো নেত্য, কেমন নেত্য সে দেখে নিত!

করুণাদেবীর কাছে এইজন্যেই সে গেল পুষ্পকে নিয়ে। একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মত স্থান অসীম ব্যোমসমুদ্রে, চারিদিকে উপবন, কুসুমিত বন্যলতা, কিছুদূরে একটা ঝর্ণা পড়চে পাহাড়ের মাথা থেকে। বনানীর বন্য সৌন্দর্য ও উপবনের শোভা এক হয়ে মিলেচে। একটা প্রাচীন বৃক্ষতলে ঝরা পাতার রাশির ওপর দেবী এলিয়ে শুয়ে পড়েচেন। কেউ কোথাও নেই, শূন্য দ্বীপ, শূন্য ব্যোমতল। দেবীর অপরূপ রূপে সেই প্রাচীন বনস্থলী উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। যতীন ভাবলে, এই তো স্বর্গ। এত সৌন্দর্য দিয়ে গড়া যে ছবি তা স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীতে এমন বনবনানীর সমাবেশ কই, যদি বা থাকে এমন রূপসী মেয়ে কই, তাও যদি থাকে, এত নির্জনতা কই—যদি বা থাকে, এ তিনের অদ্ভুত সমাবেশ কোথায়? দেবীর মাথায় কি এই তৈরি হয়েচে? হয়তো তাই। এতটুকু একটা গ্রহ বা উপগ্রহ, শুধু বনবনানীতে ঘেরা, সেখানে আবার অন্য কেউ নেই উনি ছাড়া, আবার দিব্যি পাখীর ডাকও আছে! করুণাদেবীর মুখশ্রী কি সুন্দর! আর কি সহানুভূতি ও করুণায় ঈষৎ বিষাদমাখা। মাতৃমূর্তির এমন অপূর্ব মহিমময় জীবন্ত আলেখ্য তার সামনে থাকতেও যদি সে ঈশ্বরের দয়ায় কি দেবদেবীতে বিশ্বাস না করে, তবে সে নিতান্ত নির্বোধ। শুধু পুষ্পের জন্যই সে এখানে আসতে পারচে বা দেবীকে পাচ্চে—নইলে ওঁর দর্শন পাওয়া তার পক্ষে কি সহজ হোত?

যতীনের বক্তব্য পুষ্পই বল্লে—আশাবৌদি কলকাতার বাসাবাড়ীতে কাল রাত্রে মার পর্যন্ত খেয়েচে—সারারাত কেঁদেচে, যতীনের মনে বড় কষ্ট। এই আকর্ষণ তাকে সর্বদা পৃথিবীতে টানচে, এখন কি করা যায়?

করুণাদেবী সব শুনে বল্লেন—এতে কিছু করবার নেই। কষ্ট যতদিন ঠেকে না শিখবে, তার জ্ঞান হবে না।

যতীন ভাবলে—এ কি কথা হোল! এত বড় দেবীর মুখে এ কি সাধারণ পৃথিবীর মানুষের মত কথাবার্তা! এ কথা তো পৃথিবীতে যে কোন জমিদারগিন্নী কি দারোগা ইন্‌স্‌পেক্টরের বৌ

শুনেই বলতো।

সে বল্লে—আপনি মন করলে কি ওকে দয়া করতে পারেন না?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—আমি খেটেই মরি, ভেবেই মরি। দয়া কি করতে পারি সে-ভাবে বাছা? এদের যেদিন ভালো হবে, সেদিন আমারও ছুটি। এ সব অতি নিম্নদরের আত্মা, কেউ ওদের ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্চে না, নিজের কর্মফলে কষ্ট পাচ্ছে। ভগবান প্রত্যেক লোককে বড় দেখতে চান, সৎ, সুন্দর, নির্মল দেখতে চান, উচ্চ প্রকৃতি জাগলো কিনা দেখতে চান—যেমন ধরো সেবা, স্বার্থত্যাগ, দয়া, ভক্তি, ভালবাসা। এ যাদের মধ্যে নেই বা জাগেনি, তাদের সেগুলো জাগিয়ে দেবার কৌশল তাঁর জানা আছে। কষ্ট দিয়ে, শোকের বোঝা রোগের বোঝা দিয়ে যে করেই হোক ও-লোকে কি এ-লোকে তার চোখ ফোটানোর চেষ্টা হয়ই, তাও যাদের না হয়, অন্য গ্রহে তাদের জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যে গ্রহ পৃথিবীর চেয়েও ধীর গতিতে চলে। সেখানে লোকে আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে সব জিনিস শেখে। জড়বুদ্ধি জীবেরা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে না—সেটা তাদের উপযুক্ত পাঠশালা। এ-লোকেও নরকের মত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আছে, অতি নিম্নস্তরের পাপী জীবেরা সেখানে ঠেকে শিখে মানুষ হচ্চে। এ একটা মস্ত বড় বিদ্যালয়। দেখতে চাও? একবার নিয়ে যাবো—

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আশা বৌদির কি হবে বলুন—

—আমি দেখি একটু ভেবে, দাঁড়াও।

পরে তিনি চোখ বুজে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। চোখ চেয়ে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—এখনও তিন জন্ম। ওর হৃদয়ে প্রেম নেই। সব স্বার্থ। যে কোনো লোককে ভালবাসলেও তো বুঝতাম। এখন যার সঙ্গে আছে, তাকেও তেমন ভালবাসে না। সাংসারিক স্বার্থ। বুড়ো মার সেবা না করে তাকে ছেড়ে এসেচে। যতীনের মনে ভালবাসা আছে, তাই সেখানে যায়। কিন্তু ওর স্ত্রীর কোনো উপকার আপাতত কিছু হবে না।

যতীন বল্লে—ওর জন্যে মন বড় খারাপ, ওর কষ্ট দেখে—

—তুমি যাকে ভাবচো কষ্ট বা পাপ, ও তাকে ভাবচে সুখ, সাংসারিক সুবিধা। ও যেদিন পাপ ভেবে ত্যাগ করবে, সেদিনই না ওর উন্নতি। তোমার ভাবনায় কি হবে?

—আমি কি ওর কোনো উপকার করতে পারিনে? আপনি যদি দয়া করে ওকে পাপী ভেবে ওকে সাহায্য করেন—

—পাপ বলে যে না বুঝেচে, অনুতাপ যার না হয়েচে, পাপকেই যে আনন্দের পথ বলে ভাবচে, যার মনে ত্যাগ নেই, কর্তব্যবুদ্ধি নেই, কোনো উঁচু ভাব নেই—আনবার চেষ্টাও নেই—তাকে শুধু দয়া করলেই ভালো করা যাবে না। ওর ভার আছে যাঁদের হাতে তাঁরা অসীম জ্ঞানের প্রভাবে জানেন, এই সব নিম্নশ্রেণীর মনকে কি ভাবে সংশোধন করতে হয়। সেই পথ দিয়ে ওরা উঠবে। কোনো আত্মার প্রভাব ওর মনে রেখাপাত করবে না।

পুষ্প বল্লে—যদি আমরা রোজ ওর মনে ভাল ভাব দেবার চেষ্টা করি?

—ঊষর মরুভূমিতে বীজ বুনলে কি হয়? যে চায়, সে পায়। যে কেঁদে বলে, ভগবান আমায় ক্ষমা করো, আমায় পথ দেখিয়ে দাও, সে পাপপুণ্য বুঝেচে। তখন তাকে আমরা সাহায্য করতে ছুটে যাই। যে যা চায়, সে তা পায়। যে জ্ঞান চায় তাকে জ্ঞানের পথ দেওয়া হয়। যে ভগবানের প্রতি ভক্তি চায়, তাকে সাধুজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, মনে ভক্তির সঞ্চার করে দেওয়া হয়।

—যে বলে আমি ভগবানকে দেখবো?

—ভগবান তাঁকে দেখা দেন।

যতীন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—তিনি দেখা দেন?

—অবিশ্বাস করবার কি আছে বলো। সে যে-ভাবে চায় সেই রূপ ধরে তাকে দেখা দেন। ভগবানের বিরাট রূপের ধারণা কে করতে পারে। ইষ্ট মূর্তিতে দেখতে চায়, যার যা ইষ্ট, যে রূপ যে ভালবাসে, তাকে তিনি সেইরূপেই দেখা দেন। তিনি করুণার সাগর, কত বড় করুণা তাঁর—তা তুমি জানো না, বুঝতেও পারবে না। ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য হয়ে ক্ষুদ্র সম্বন্ধ পাতিয়ে মা, ভাই, বোন, সন্তান, বন্ধু সেজে দেখা দেন।

—আমার প্রতি একটা আদেশ করুন দেবী, আপনার কাছে এসেচি অনেক আশা নিয়ে, শুধু হাতে ফিরে যাবো?

—আমি যা করতে পারি, এখন তা করবো না। সময় বুঝলে পৃথিবীর যে কোনো ভ্রান্ত ছেলেমেয়ের সাহায্যে আমিই সকলের আগে ছুটে যাবো, বাছা। আশালতার কথা আমার মনে রইল। কিন্তু এখনও অনেক বাকি, অনেক দেরি, যতদূর বুঝচি। তুমি পৃথিবীতে বেশি যাতায়াত কোরো না। পৃথিবীতে গেলে এমন সব বাসনা কামনা জাগবে যা তোমাকে কষ্ট দেবে শুধু—কারণ পৃথিবীর মানুষের মত দেহ না থাকলে সে সব বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। তখন হয়তো তোমার ইচ্ছে হবে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিই। প্রবল ইচ্ছাই তোমাকে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করাবে। অথচ এখন পুনর্জন্ম নিয়ে কি করবে? গত জন্মে যা করে এসেচ তাই আবার করবে। সেই একই খেলা আবার খেলবে। তাতে তোমার উন্নতি হবে না। অথচ যার জন্যে করতে যাচ্চ, তারও কিছু করতে পারবে না। কারণ ও সব ভালমন্দ করবার কর্তা তুমি নও। যে যার পথে চলেচে, তোমার পথ তোমার, তার পথ তার। পর্বতকে টলাতে পারবে না, বিশ্বজগতের নিয়ম বড় কড়া, একচুল এদিক-ওদিক করবার শক্তি নেই কারো।

—আপনারও না?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—তুমি এখনও ছেলেমানুষ। আমি তো আমি, পৃথিবীর গ্রহদেব স্বয়ং পারেন না। তিনি তো অসাধারণ শক্তিধর দেবতা, ভগবানের ঐশ্বর্য রয়েচে তাঁর মধ্যে। তবে আমরা যেখানে যাই, সময় হয়েচে বুঝে যাই। যেখানে সাহায্য করলে সত্যকার উপকার হবে আত্মার, এ আমি মনে মনে বুঝতে পারি। সে ক্ষমতা আছে আমাদের। সেখানেই যাই শুধু। ঐ যে বল্লাম, পাপ বুঝে যে সে পথ থেকে ফিরতে চায়, ভগবানকে মনেপ্রাণে ডাকে,

বলে, আমি ভুল বুঝেচি, আমায় ক্ষমা করো, দয়া করে পথ দেখিয়ে দাও—ভগবান সেখানে আগে ছুটে যান—তাঁর কতবড় করুণা, কত প্রেম জীবের প্রতি—তা ক'জন মানুষে বোঝে? সবাই পৃথিবীতে টাকা নিয়ে যশ নিয়ে মান নিয়ে উন্মত্ত—

যতীন ও পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে চলে আসতে উদ্যত হোলে তিনি ওদের দিকে চেয়ে প্রসন্ন সুন্দর হেসে বালিকার মত ছেলেমানুষী স্বরে বল্লেন—আমার এ জায়গাটা তোমাদের কেমন লাগে?

দুইজনেই বল্লে, ভারি চমৎকার স্থান, এমন তারা কখনো দেখেনি।

দেবী বালিকার মত খুশি হোলেন ওদের কথা শুনে। বল্লেন—মাঝে মাঝে এখানটাতে বিশ্রাম করি। তোমরা মাঝে মাঝে এসো। একাই থাকি।

যতীন বিনীত স্বরে বল্লে—গ্রহদেব বৈশ্রবণকে দেখাবেন একবার?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—তোমার দেখ্‌চি বড্ড বড় সাধ।

যতীন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফেরবার পথে সে পুষ্পকে বল্লে—এমন না হোলে দেবী! কি সরলতা! জায়গাটা সম্বন্ধে আমাদের সার্টিফিকেট পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন!

উচ্চ স্বর্গে আজ পুষ্পকে নিয়ে গেলেন প্রেমের দেবী। বহু বিচিত্র বর্ণের মেঘের মধ্যে দিয়ে সে অপূর্ব যাত্রা। অন্তরের জ্যোতি-বাতায়ন খুলে গিয়েচে যেন, সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েচে সে আলো।

দেবী বল্লেন—সারা পৃথিবীতে প্রেমের জন্য এত দুঃখও পাচ্চে মানুষে! ইচ্ছে হয় সব মিলিয়ে দিই।

—দেন না কেন দেবি?

—দিই তো। কাজই ওই। আমার যা ক্ষমতা তা করি। তবে আমাদের ক্ষমতারও সীমা আছে—দেখচো তো সুধার কিছুই করতে পারচি নি। সুধার মত লক্ষ লক্ষ নরনারী পৃথিবীতে—তবে আমরা আঁকুপাঁকু করি নে তোমাদের মত। সময় অনন্ত, সুযোগ অনন্ত—তোমরা ভাবো অমুক দিন মরে যাবো, কবে আর কাজ করবো? আমরা জগৎকে দেখি অন্য চোখে—

পুষ্প হেসে বল্লে—মরেচি তো অনেকদিন, তবে আর কেন এ অনুযোগ দেবি?

প্রণয়দেবী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেন—আহা! আজ একাদশী। সুধা শুয়ে আছে ঘরে দোর দিয়ে—দেখো এখানে এসে।

একটা আলোকের পথ যেন তৈরী হয়ে গিয়েচে এই অসীম ব্যোমের বুক চিরে। পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভাঙা কোঠার ভাঙা ঘরকে তার নোনাধরা চুন-বালি-খসা দেওয়ালের ব্যবধান ঘুচিয়ে যুক্ত করচে অনন্ত তারালোক-খচিত মহাকাশের সঙ্গে, দেবযানের পথে।

পুষ্পের সারাদেহ আনন্দে ও সত্যের অনুভূতিতে শিউরে উঠলো—যেখানে প্রেম, যেখানে সত্য, যেখানে গভীর রসানুভূতি বা দুঃখবোধ, সেখানে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের যোগ ক্ষণে ক্ষণে

নিবিড় হয়ে ওঠে—অথচ সে অদৃশ্য যোগের বার্তা পৃথিবীর মানুষে জানেও না, বিশ্বাসও করে না।

কোকিল ডাকে বৈশাখের অপরাহ্ণে, ছায়াভরা মাঠে, নদীতীরে। সে সুরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বনঝোপ যুক্ত হয় সুরলোকের আনন্দবীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে। কে জানে সে কথা।

—আর একটি দেখবে? এদিকে চেয়ে দেখ—

পুষ্প কিন্তু সে দেশ চিনতে পারলে না। খুব ফর্সা মেয়েটি, বয়স নিতান্ত কম নয়—দেখেই বোধ হয় আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থার মেয়ে। একটা পুরোনো সোফায় বসে বসে কি পরিষ্কার করচে। জিনিসটা পুষ্প কখনো দেখেনি, বুঝতে পারলে না।

দেবী বল্লেন—ওর স্বামী ছিল শিকারী, কার্পেথিয়ান পর্বতে শিকার করতে গিয়ে বুনো শূওরের হাতে মারা পড়ে। সে আজ সতেরো-আঠারো বছরের কথা—স্বামীর তামাক খাবার নলটা যত্ন করে রোজ পরিষ্কার করে, ফুল দিয়ে সাজায়। সুন্দরী ছিল, বিধবা বিবাহ করবার জন্যে কত লোক ঝুঁকেছিল—কারো দিকে ফিরেও চায় নি। দুঃখ কষ্ট কত পেয়ে আসচে, খেতে পায় না—তবুও স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান।

পুষ্প কি ভেবে বল্লে—বিবাহিত স্বামী যদি না হয়, তবে কি আপনাদের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে না?

প্রণয়দেবী হেসে বল্লেন—পুষ্প!

পুষ্প সলজ্জ ভাবে চোখ নিচু করলে।

—আমাদের অবিশ্বাস ক'রো না, ছিঃ—আমি তোমাকে কতদিন থেকে দেখছি জানো, যতদিন তুমি পৃথিবী থেকে প্রথম এখানে এলে। যতীনের সঙ্গে আমিই তোমাকে মিলিয়ে দিয়েচি—নইলে তুমি ওর দেখা পেতে না। প্রেমের আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবী ছেড়ে এসে সকলের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

—এমন হয়?

—কেন হবে না? সেই তো বেশি হয়। একটি মেয়েকে জানি, সে পৃথিবী থেকে এসেচে আজ তিনশো বছর। তার স্বামী এসেচে তার আসবার পঁচিশ বছর পরেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি আজও—এই তিনশো বছর। কারণ প্রেম নেই। প্রেম না থাকলে আমরা মিলিয়ে দিই না। তাতে পরস্পরের আত্মার ক্ষতি বই লাভ হবে না কিছু।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—উঃ! তিনশো বছর স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয় নি?

দেবী বল্লেন—মানে, আর হবেও না। তারা কেউ নয় পরস্পরের। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সত্যিকার প্রেম দুটি আত্মাকে পরস্পর সংযুক্ত করে। যে-প্রেম যত কামনা-বাসনাশূন্য সে প্রেম তত উঁচু। এই ধরনের প্রেমের জন্যই আমাদের কত খাটুনি।

পুষ্প ফিরে এসে দেখলে যতীন নেই, আবার পৃথিবীতে চলে গিয়েচে আশার কাছে। পুষ্পের মনে কেমন একটা ব্যথা জাগলো—এত করেও যতীনদা আপনার হোল না! পরক্ষণেই

সে নিজের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিলে। পৃথিবীর সম্পর্কে আশা বৌদিদির অধিকার তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ন্যায্য। ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

যতীন কলকাতার সেই ছোট্ট বাসাবাড়ীতে আবার এসে দাঁড়িয়েচে। নেত্য বাসাতে উপস্থিত আছে বটে কিন্তু ঘুমুচ্চে। আশা বসে বসে পরদিন রান্নার জন্যে মোচা কুটচে। যতীনের মনে হোল এমনি একদিন সে কুড়ুলে বিনোদপুরের বাড়ীর রোয়াকে বসে আশাকে মোচা কুটতে দেখেছিল, যতীনের মা তখন বেঁচে, পাশেই তিনিও ছিলেন বসে সেদিন। যতীন কোথা থেকে এসে হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিল। পল্লীসংসারের সেই শান্ত পরিচিত পরিবেশ! এখনও তাই, সেই ছবিটিই অবিকল, কিন্তু কি অবস্থায়! কোথায় মা, কোথায় কুড়ুলে বিনোদপুরের সেই যত্নে পাতানো সংসার—কোথায় সে।

কোথায় যেন কি অবাস্তবতা লুকিয়ে ছিল আপাতপ্রতীয়মান বাস্তবতার পেছনে। আসল রূপটি চিনতে দেয়নি সংসারের। ছেলেবেলায় শোনা যাত্রার পালার সেই গান মনে পড়লো—

কেবা কার পর, কে কার আপন,
কালশয্যা 'পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে,
দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

সব মিথ্যে। সেই সন্ন্যাসীর দেখানো নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মনে পড়লো। কেউ কারো নয়। সব স্বপ্ন, সব মায়া, সব অনিত্য।

পুষ্প এসে পাশে দাঁড়াতেই যতীনের চমক ভাঙলো। এ তো এসেচে, একে কিন্তু মিথ্যা বলে মনে হয় না তো? 'নৈহাটির ঘাটে, বসে পৈঠার পাটে'—সেই পুষ্প কি অখণ্ডসত্যরূপে বিরাজ করচে চিরদিন এই খণ্ডিতসত্য খণ্ডিতসত্তা জীবনের আপাতপ্রতীয়মান স্থায়িত্বের মধ্যে?

আশা মোচা কুটে উঠে নেত্যকে ডাকতে লাগলো—ওগো, ওঠো—ভাত বাড়ি?

নেত্য জড়িতস্বরে কি বল্লে, তারপর চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসলো বিছানায়। বল্লে—কি? বাবাঃ, এতক্ষণ বসে বসে মোচা কুটলে? রাত কত?

—তা কি করে জানবো?

—দেখে এসো চৌধুরী মশায়ের ঘরে।

—হ্যাঁ, এখন বুড়ো খেটেখুটে এসে শুয়েচে, আমি গিয়ে ওঠাই—

—শম্ভু চক্কত্তি আজ এসেছিল?

—আমি জানিনে অতশত খোঁজ। এখন উঠে দয়া করে খেয়ে আমার হাত অবসর করে দাও—

এ কথার উত্তরে নেত্য আবার সটান্ বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে চোখ বুজলে।

পুষ্প বল্লে—যতীনদা, তুমি চলে এসো, এখানে থেকো না।

—পুষ্প, তুমি চলে যাও, আমি আর একটু থাকি।

যতীনের মুখের ও চোখের ভাব যেন কেমন। ও মোহগ্রস্ত হয়ে উঠেচে পৃথিবীর স্থূল

আবহাওয়ায়। এ সব জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ওর পক্ষে ভালো না। চুম্বকের মত আকর্ষণ করে পৃথিবীর যত বাসনা কামনা আত্মিক লোকের জীবকে। টেনে এনে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে —ওপরে উঠতে দেয় না। অবিশ্যি যে বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়েচে, সে কামচর, স্বাধীন, মুক্ত। শত পৃথিবী তাকে বাঁধতে পারে না। কিন্তু যতীনের মত আত্মার পক্ষে এমন ঘন ঘন যাতায়াত বড় বিপজ্জনক।

পুষ্প কিছু বলবার আগেই যতীন আবার বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে, করুণাদেবীকে আর একবার আশার বিষয় বলি। তোমার কি মত?

—যতীনদা, তাতে ফল হবে না। আশা বৌদির কর্ম ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ কিছু করতে পারবে না। নইলে চেষ্টা তুমি আমি কম করি নি। ওর মন ওকে টানচে নিচের দিকে—অধঃপতনের পথে। বাধা দেবার সাধ্য কার! এক যদি ভগবান সাহায্য করেন, কৃপা করেন—

কথাটা যতীনের মনঃপূত হোল না। সে বল্লে—ভগবান সাহায্য করলে এই অবস্থায় এসে ও দাঁড়ায় আজ? তিনি চোখ বুজে আছেন।

পুষ্প বল্লে—ভুলে যাচ্চ যতীনদা, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে অকপটে সৎ হবার চেষ্টা করচে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। যেচে তিনি সাহায্য করতে গেলে তাতে কোনো ফল হবে না বলেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য আসে না।

—কেন?

—যে ভগবানকে চেনে না, তাঁকে স্বীকার করে না, তার হোল আচ্ছাদিত চেতন। তার চেয়ে যে ভালো, তাকে বলে সঙ্কুচিত চেতন। এই দুই ধরনের লোককে ভগবৎকথা শোনালে উল্টো উৎপত্তি হয়। আশা বৌদির আচ্ছাদিত চেতন। আলো জ্বাললে কি হবে? ঢাকনির মধ্যে আলো সেঁধোবে না। এদের ওপরে মুকুলিত চেতন, তাদের মনে ভগবানের জ্ঞান জাগতে শুরু করেচে। তারও ওপরে বিকচিত চেতন, সবার ওপরে পূর্ণ বিকচিত চেতন—যেমন বড় বড় ভক্ত কি সাধকেরা। কত নিচে পড়ে আছে আশা বৌদি আর নেত্যর দল ভাবো।

যতীন কৌতুকের সুরে বল্লে—ও বাবা, তোমার পেটে এত! নবদ্বীপের ভট্‌চায্যিদের মত শাস্তর কথা শুরু করলে যে। তোমার কী চেতন পুষ্প, বিকচিত না পূর্ণ বিকচিত? আর আমিও বোধহয় আচ্ছাদিত চেতন—না, কি বলো?

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—আলবৎ। নইলে তুমি কি ভাবো তুমি খুব উন্নতি করেচ?

—না, তাই জেনে নিচ্চি তোমার কাছে।

—জেনে নিতে হবে কেন, নিজে বুঝতে পারচো না, না? কখনো ভগবানকে ডেকেচ? তাঁর দিকে মন দিয়েচ জীবনে? তাঁকে বোঝবার চেষ্টা তো দূরের কথা। আমার কথা বাদ দাও যতীনদা, আমি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, কিন্তু বড় বড় বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী লোকের মধ্যেও অনেকে মুকুলিত চেতনও নয়। পূর্ণ বিকচিত তো ছেড়ে দাও, বিকচিত চেতনই বা ক'জন? পৃথিবীতে বা এই লোকে কোথাও জিনিসটা পথেঘাটে মেলে না। তবে নেই তা নয়, আছে।

—একজন তেমন লোকের কাছে একদিন নিয়ে যাবে ?

—আমার কি সাধ্যি যতীনদা ? তাঁদের দেখা পাওয়া কঠিন, ধরা দিতে চান না সহজে। আচ্ছা একজন মানুষকে আমি জানি—যাবে সেখানে ? চলো, একটুখানি দেখিয়ে দিই, সেখানে গিয়ে দেখে চলে আসবে, কোনো কথাবার্তা বোলো না। আশা বৌদিকে ছেড়ে একটু চলো দিকি। পৃথিবীর এ সব আবহাওয়া তোমার পক্ষে যে কত খারাপ তা তুমি বুঝতে পারবে না।

যতীন হেসে বল্লে—কেন, ম্যালেরিয়া ধরবে ?

—আত্মারও ম্যালেরিয়া আছে। দেহ থেকে মুক্ত হয়েচ বলে গুমর কোরো না। এমন ম্যালেরিয়া ধরে যাবে মনের আত্মার যে কেঁদে কূল পাবে না যতীনদা। তখন ডাক্তার দেখাতে হোলে এই ছাই-কেলতে-ভাঙা-কুলো পুষ্প হতভাগীকেই দরকার হবে।

পৃথিবী দেখতে দেখতে নিচে মিলিয়ে গিয়েচে ততক্ষণ। সাদা সাদা মেঘ, অনন্ত আকাশ। সূর্যের আলোর রং আরও সাদা। মানুষের স্থূল চোখ হোলে ধাঁধিয়ে যেতো। যতীন ভাবলে, এই তো রাত দেখে এলাম কলকাতা সহরে, এখানে চোখ-ধাঁধানো সূর্যের আলো ! জগতে সব ভেল্‌কিবাজি, অথচ পৃথিবীতে বসে কিছু বোঝবার জো নেই।

ভুবর্লোকের বিশাল আলোর সরণী দিক থেকে দিগন্তরে প্রসারিত তাদের সামনে। বহু লোক যাতায়াত করচে, কেউ ধূসর বর্ণের, কেউ লাল মেটে সিঁদুরের রং, কচিৎ কেউ নীল রঙের। পুষ্পকে যতীন বল্লে—দ্যাখো বেশির ভাগ আত্মাই কিন্তু ছাই রঙের আর লাল রঙের। নীলবর্ণের আত্মা পথে ঘাটে কত কম।

পুষ্প হেসে বল্লে—তুমিও ওদের দলে। ভেবো না তুমি নীলবর্ণের দেহধারী আত্মা। অনেক উঁচু জীব তারা। পথে-ঘাটে তাঁদের কি ভাবে দেখবে ? ও যা দেখচো, ওরাও তেমন উঁচু স্তরের নয়। পঞ্চম স্বর্গের লোকের দেহ উজ্জ্বল নীল, দামী নীল রঙের হীরের মত। সে বড় একটা দেখতে পাবে না।

—তারও ওপরে ?

—উজ্জ্বল সাদা। ষষ্ঠ সপ্তম স্বর্গের আত্মারা দেবদেবী, তাঁদের দিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

—তোমার মত ?

হঠাৎ যতীন লক্ষ্য করলে সে এমন এক স্থানে এসে পড়েচে যেখানকার বায়ুমণ্ডলে একটি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও পবিত্রতা আত্মার চিরযৌবন নির্দেশ করচে যেন। কিসের সুগন্ধ সর্বত্র, সেই গন্ধে ভরা বনপথের আবছায়া অন্ধকারে শত শত চিরযৌবনা অভিসারিকা যেন চলেচে তাদের পরমপ্রিয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষায়, কত যুগের কত রাজ্য-সাম্রাজ্যের অতীত কাহিনীর দুঃখবেদনা যেন এর পরিবেশকে কোমল করুণ করে রেখেচে—মুখে ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু যতীন যেন হঠাৎ বুঝলে মনে সে অনন্তকালের শাশ্বত অধিবাসী, চিরযৌবন, অমর আত্মা—অনাদ্যন্ত বিশ্বের লীলাসহচর, সে ছোট নয়, পাপী নয়, পরমুখাপেক্ষী নয়—ভগবানের চিহ্নিত

শিশু, অন্ধ হতভাগ্য আত্মাকে টেনে তোলবার জন্যে তার জন্মমৃত্যুর আবর্ত-পথে সুখ-দুঃখময় পরিভ্রমণ।

অদূরে একটি সাদা পাথরের মন্দির, মন্দিরের চুড়োটা তার গম্বুজের তুলনায় একটু যেন বেশি লম্বা বলে মনে হোল যতীনের। কিন্তু আশ্চর্য রকমের দুগ্ধ-ধবল কী পাথরের তৈরী, না মার্বেল, না এলাবেস্টাস, যেন স্বয়ংপ্রভ পালিশ করা স্ফটিক প্রস্তরে ওর বিমান ও জঙ্ঘা গাঁথা।

পুষ্প বল্লে—খুব বড় একজন ভক্ত সাধকের আশ্রমে তোমায় এনেচি।

মন্দিরের চারিপাশে খুব বড় বাগান। প্রায় সবই ফুলের গাছ, কিন্তু অত সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল এ পর্যন্ত যতীনের চোখে পড়ে নি। খুব বড় উদ্যানশিল্পীর রচনার পরিচয় সেখানকার প্রতিটি ফুলগাছের সারিতে, লতাবিতানের সমাবেশে। যতীন ভাবলে—এ স্তরেও বাগান থাকে? এসব করে কে? কে গাছ পোঁতে না জানি! পৃথিবীর মত কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে হয় নাকি?

পুষ্প একটি নিভৃত লতাবিতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল যতীনকে সঙ্গে করে।

ভেতর থেকে কে বল্লে—এসো মা, তোমার অপেক্ষা করচি—

পুষ্প ও যতীন দুজনে লতাকুঞ্জের মধ্যে ঢুকে দেখলে একজন জ্যোতির্ময়দেহ সুশ্রী বৃদ্ধ পাথরের বেদীতে বসে। দুজনে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

ভুর ভুর করচে চন্দন ও ফুলের সুবাস লতাবিতানে, অথচ শৌখিন বিলাসলালসার কথা মনে হয় না সে সুগন্ধে, মনে জাগে অতীতকালের ভক্তদের প্রেমোচ্ছল অনুভূতি, মনে জাগে ভগবানের নৈকট্য, শান্ত পবিত্রতার আনন্দময় মর্মকেন্দ্র। দিগন্তে বিলীন প্রেমভক্তির মধুর বেণুরব কান পেতে শোনো এখানে বসে বসে, শুনে নবজন্ম লাভ করো।

বৃদ্ধ বল্লেন—আগে গোপাল দর্শন করে এসো—

মন্দিরের কাছে গিয়ে ওরা দেখলে নীল রঙের পাথরের অতি সুশ্রী একটি গোপালমূর্তি, যেন হাসচে—এত জীবন্ত। নানা রঙের ফুল দিয়ে বিগ্রহের পাদপীঠ সাজানো, গলায় বনফুলের মালা। পুষ্প করজোড়ে কতক্ষণ ভাবে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—যতীন ভক্ত-টক্ত নয়, সে একটু অধীর ভাবেই পুষ্পের ভাব ভাঙবার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

যতীন অবশেষে পুষ্পকে বল্লে—ইনি কে?

—ইনি কে আমি জানিনে। সেকালের একজন বড় বৈষ্ণব আচার্য—পৃথিবীতে নাকি এখনও এঁর আবির্ভাবের তিরোভাবের উৎসব হয়। বহুদিন পৃথিবী ছেড়ে এসেচেন।

বৈষ্ণব সাধু জিজ্ঞেস করলেন—বিগ্রহ দর্শন করলে?

যতীন বল্লে—দেখেচি, অতি চমৎকার। প্রভু, আপনি কতদিন পৃথিবী থেকে এসেচেন?

—অনেককাল। এখানে ওসব হিসেব রাখবার মন হয় নি, কি হবেই বা পৃথিবীর হিসেব রেখে?

যতীনের মনে অনেক সংশয় উঁকি মারছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে—প্রভু, এখানেও বিগ্রহ?

—কেন বল তো? কি আপত্তি তোমার?

—এ তো স্বর্গ। ভগবানের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে। কাঠ পাথরের মূর্তি পৃথিবীতে দরকার হতে পারে, এখানে কেন?

বৈষ্ণব ভক্তটি হেসে বল্লেন—ভগবানের সাক্ষাৎ তুমি যেভাবে বলচো ওভাবে পাওয়া যায় কিনা জানিনে। আমি পৃথিবীতে এই বিগ্রহের পূজারী ছিলাম, বড় ভালবাসি ওঁকে, ছেড়ে থাকতে পারিনে—তাই এখানে এসে এই মন্দির স্থাপন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেচি, ওঁরই সেবা-আরাধনায় দিন কাটে বড় আনন্দে। মন্দির আর বাগান সবই মানসী কল্পনায় সৃষ্টি করেচি, এ স্বর্গে তা করা যায় তা নিশ্চয়ই জানো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা এর নিচের স্বর্গেও দেখেচি।

—আমার দেবতা শুধু পাথরের নয়, জীবন্তও বটে। কিন্তু তোমাকে তো দেখাতে পারবো না। আমার মা দেখতে পারেন। দেখেচেনও একবার।

পুষ্প আবদারের সুরে বল্লে—আপনি দয়া করলে ইনিও দেখতে পাবেন, বাবা।

সাধু হেসে বল্লেন—ইনি দেখতে পারেন না। ইনি ভাবেন, ভগবানকে নিয়ে আমি এভাবে পুতুলখেলা করচি। বালগোপাল বড় লাজুক, এঁর সামনে বার হবেন না। যে তাঁকে মন অর্পণ করে ভাল না বেসেচে, বিশ্বাস না করেচে—তিনি যেচে অপমান কুড়ুতে যাবেন সেখানে? ভগবান যখন ইষ্টদেবের বেশে লীলা করেন কৃষ্ণ সেজে, কালী সেজে,—তখন তিনি মানুষের বা দেবদেবীদের মনোভাব—যেমন রাগ, লজ্জা, মান, অভিমান, এমন কি ভয় পর্যন্ত পান! এই তো লীলা—এরই নাম লীলা। বিরাট ঐশী শক্তি যা বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণ করচে, তাকে কে ভালবাসতে পারে আপনার ভেবে? শত শত নক্ষত্র, শত শত সূর্য যার ইঙ্গিতে লয় হয়, যে পলকে সৃষ্টি, পলকে স্থিতি, পলকে প্রলয় করতে পারে—তাকে কে ভক্তি করতে পারে, যদি তিনি—

মন্দির থেকে চঞ্চল, মধুর, সজীব কণ্ঠে কে বলে উঠলো—ওখানে বসে বক্‌বক্ না করে এখানে এসে আমায় একবার জল খাইয়ে যাও না বাপু? তেষ্টায় মলুম—

সাধু চমকে উঠলেন, পুষ্প ও যতীন চমকে উঠলো।

পুষ্প হেসে বল্লে—যান, যান, জল খাইয়ে আসুন—

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—কে ছেলেটি?

সাধু যতীনের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—বুঝতে পারলে না? ঐ তো বালগোপাল। তোমার খুব ভাগ্য তোমাকে গলার স্বর শুনিয়ে দিলেন। আমার পুষ্প মায়ের ভাগ্য। যাই আমি—

সাধুর মুখে স্নেহ বাৎসল্যের রেখা ফুটে উঠলো, তৃষ্ণার্ত সন্তানকে পানীয় জল দেবার ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি মন্দিরের দিকে অদৃশ্য হোলেন।

যতীন ভাবলে, এও পুতুলখেলা, নয় আবার!

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলে। সাধু অন্তর্যামী, সবার মনের কথা বুঝতে পারেন,

অন্তত তার তো মনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে বার করেচেন। এখানে কিছু ভাবা হবে না।

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—মনে পড়েচে, ইনি বৈষ্ণব আচার্য রঘুনাথ দাস।

বেলা পড়ে যেন অপরাহ্ণ হয়ে এসেচে। অপূর্ব পুষ্প-সুবাসে আশ্রম আমোদিত। বৈষ্ণব সাধু বল্লেন—বিকেল বড় ভাল লাগে, তাই সৃষ্টি করি। নইলে এখানে আর সকাল বিকেল কি? সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, অন্ধকারও নেই। হ্যাঁ, কি সংশয় তোমার, যতীন? এখনও যায়নি, অন্ধকার বড় একগুঁয়ে। তাড়ানো যায় না।

—প্রভু কি করি বলুন। আপনি বৈষ্ণব আচার্য, কতদিনের লোক আপনি?

—মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সপ্তগ্রামের নাম শুনেছিলে? সেই সপ্তগ্রামে বাড়ী ছিল আমার।

—আপনি এখানে কেন? আর সব কোথায় আপনার দলের? সাড়ে তিনশো বছর ধরে এ পুতুলখেলা নিয়ে—

—তোমার মন এখনও কাঁচা। আমি তোমাকে তো বলেচি, মুক্তি চাইনি। সপ্তগ্রামে হরিদাস শিক্ষা দিয়েছিল ভক্ত চায় ভগবানের প্রতি ভক্তি তাঁর প্রতি যেন মন থাকে। আমাদের তাতেই আনন্দ। তাঁর ভজন আরাধনা নিয়েই আছি। খুব সুখে আছি। মহাপ্রভু ভগবানে মিলিয়ে গিয়েচেন, তিনি নারায়ণের অংশ, মাঝে মাঝে আমাদের আহ্বানে প্রকট হন, এই আশ্রমে আসেন। তাঁর পৃথিবী থেকে এখানে আসার দিনে আশ্রমে উৎসব হয়, সে উপলক্ষে বড় বড় বৈষ্ণব আচার্য এমন কি জীবগোস্বামী মীরাবাঈ পর্যন্ত আসেন। ওঁরা আরও উচ্চ লোকে আছেন। অনেকে জীবকে শিক্ষা দিতে দু-একবার ইতিমধ্যে পৃথিবীতে নেমেছিলেনও।

—আর একটা কথা আপনাকে—

—বুঝেছি। তুমি যা জিজ্ঞেস্ করবে তার মুখে উত্তর চাও, না সে জগৎ দেখতে চাও? অর্থাৎ তুমি জানতে চাইচ, পৃথিবী ছাড়া অন্য জীবলোক আছে কি না।—কেমন তো? বহু বহু আছে। বিশ্বের অধিদেবতার ভাণ্ডার অনন্ত। কোনো কোনো জগৎ পৃথিবী থেকেও তরুণ, সজীব। সেখানে সব মানুষ অত্যন্ত বেশি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে মরে যায়। আবার বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জগৎ আছে—সেখানে মানুষ পৃথিবীর চেয়ে অনেক দীর্ঘজীবী, ধীরেসুস্থে জীবনের কাজ করে। পৃথিবীর হিসেবে যার বয়স পঁচিশ বছর, সেও বালক। ষাট বছর যার বয়স, সে নব্যযুবক। যাদের উন্নতি হতে দেরি হবে জানা যাচ্চে পৃথিবীতে, এমন সব আত্মাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না, দিলে সে পূর্ব জন্মের জীবনেরই পুনরাবৃত্তি করবে মাত্র। সুতরাং তাদের এই সব ধীর সানন্দ প্রৌঢ় পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অনেকদিন সময় পায় বলে শেখবার ও শোধরাবার অবকাশ ও সুযোগ পায়। বিশ্বের দেবতার এমন আইন, সকলকেই অনন্ত মঙ্গলের পথে যেতে হবে—যে সহজে না যাবে, তাকে দুঃখ দিয়ে পীড়ন করে চোখ ফোটাবেনই। সেসব পৃথিবীতেও জীবশিক্ষার জন্যে উচ্চস্তরের আত্মারা নেমে যান দেহ গ্রহণ করে। পৃথিবী থেকেও বেশি কষ্ট পেতে হয় তাঁদের সে সবখানে। কিন্তু

ভগবানের কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন, দুদিনের দেহ, দুদিনের কষ্ট, দুদিনের অপমান। শাশ্বত-আত্মায় কোনো বিকার স্পর্শ করে না, তার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই।

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল মহাপুরুষের কথা, এর মধ্যে অবিশ্বাস এনে লাভ নেই। আজ তার অত্যন্ত সুদিন, এমন একজন লোকের দর্শনলাভ করেচে সে।

বৈষ্ণব সাধু আবৃত্তি করচেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।

যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে যা কিছু বলেচি, সব তাঁর কৃপা। শ্রীধর স্বামীর ঐ শ্লোক তো শুনলে? তিনিই, মূক যে, তাকে করেন বাচাল। গোপালের এমনি কৃপা, এমনি শক্তি। তাঁর বিশ্ব, তিনি যা কিছু করতে পারেন।

যতীন বল্লে—এ ভাবে কত কাল থাকবেন আর?

—অনন্ত কাল থাকতে পারি, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়।

হঠাৎ তিনি উৎকর্ণ হয়ে বল্লেন—বৃন্দাবনে গোবিন্দ বিগ্রহের আরতি হচ্চে, চলো দেখে আসি—

পুষ্প খুশি হয়ে বল্লে—আমাদের নিয়ে যাবেন! আপনার বড় কৃপা—

বৈষ্ণব সাধুর জ্যোতির্ময় ঈষৎ নীলাভ দেহ ব্যোমপথে ওদের আগে আগে উড়ে চলেচে, ওরা তাঁর পেছন পেছন চলেচে। নভোচারী দু-একটি আরও অন্য আত্মাকে ওরা পরে দেখতে পেলে। যতীন কখনো বৃন্দাবন দেখেনি, তাই বৈষ্ণব সাধু ওকে চার-পাঁচটি বড় বড় গাছের ক্ষুদ্র বাগান দেখিয়ে বল্লেন—ওই দেখ চীরঘাট, ওখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্নান করে উঠে গোপালের দেখা পেয়েছিলেন। বড় পুণ্যস্থান, প্রণাম করো।

তার পরেই একটা বড় মন্দিরের গর্ভগৃহে সেকালের ঝুলোনো প্রদীপের আলোয় একটি সুন্দর বিগ্রহের সামনে ওরা গিয়ে দাঁড়ালে। অনেক লোক আরতি দর্শন করচে। একটা আশ্চর্য দৃশ্য যতীন এখানে প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ-মর্তের অপূর্ব সম্বন্ধ দেখে অবাক হয়ে গেল। দেহধারী দর্শকদের মধ্যে বহু অশরীরী দর্শক এসে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের আরতি দর্শন করচেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি আত্মার দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ দেখে যতীন বুঝলে ওঁরা উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত সাধক।

যতীনের সঙ্গী বৈষ্ণব সাধু একজনকে দেখিয়ে বল্লেন—কবি ক্ষেমদাস। উনি বৃন্দাবনের বড় ভক্ত, এর মন্দির, এর কুঞ্জবন ছেড়ে থাকতে পারেন না।

যতীন বল্লে—একটা কথা শুনেছিলাম, আত্মিক লোক থেকে বার বার এলে না কি আত্মার অনিষ্ট হয়?

সাধু বল্লেন—এসো, কবিকে প্রশ্নটা করি।

সাধু ও ক্ষেমদাস পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সাধুর প্রশ্ন শুনে কবি ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—শ্রীরূপগোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণিতে গোপীদের বিরহের দশদশার বর্ণনা আছে—চিন্তা, উদ্বেগ, প্রলাপ, এমন কি মৃত্যুদশা, উন্মাদ রোগ পর্যন্ত। আমার এমন এক সময় ছিল

বৃন্দাবনের যমুনাতট না দেখলে প্রায় তেমনি অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটতো। বৃন্দাবনের মত স্থানে এলে অনিষ্ট হয় না, কৃষ্ণে আসক্তি তো আত্মার ইষ্টই করে, ঊর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়।

বৈষ্ণব সাধু বল্লেন—কৃষ্ণে আসক্তি কৃষ্ণপদে মতি এনে দেয়। হরিদাস স্বামী কি বলেছিলেন সপ্তগ্রামে মনে নেই?

ক্ষেমদাস বল্লেন—শুনেচি বটে। তবে মনে রাখবেন, আমি কবি ছিলাম, ভক্ত ছিলাম না আপনাদের মত। আপনারা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ, অপেনাদের মত ভাগ্য আমি করি নি। আমার কৃষ্ণ বিশ্বের বনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ান, বালকস্বভাব—উদাস; কেউ যদি ডাকে তার কাছে যান, না ডাকলে আপন মনেই একা একা থাকেন। অনাদিকাল থেকে এমনি। তাঁকে যদি ভালবেসে কেউ ডাকে, তবে তিনি সঙ্গী পেয়ে খুশি হন—তিনি করুণস্বভাব, ভালবাসার বশ।

পুষ্প বল্লে—কেন একা থাকেন? রাধা কোথায়?

—ও সব কল্পনা। এই সব ভক্তপ্রভুরা বানিয়েছেন। কে রাধা? যে নারী ভালবাসে তাঁকে, সে-ই রাধা। সে-ই তাঁর নিত্যলীলার সহচরী। মীরাবাঈ যেমন।

—মীরাবাঈ আছেন?

—আছেন। তাঁরা নিত্যলীলার সহচরী ভগবানের—যাবেন কোথায়? বহু পুণ্যে তাঁদের দর্শন মেলে। বহু ঊর্ধ্বলোকে ওঁদের অবস্থিতি। আবার বিশ্ব ব্যেপে ওঁদের অবস্থান, তাও বলতে পারো। পৃথিবীর ব্যক্তিত্ব তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েচে বহুকাল, ও তো স্থূল দেহ ধরে লীলা করবার জন্যে যাওয়া। ওটা কিছু নয়। পৃথিবীর সেই মীরাবাঈকে কোথাও পাবে না। আছেন খাঁটি তিনি—অর্থাৎ যে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা মীরাবাঈ সেজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দুদিনের জন্যে, তিনি আছেন।

যতীন বলে উঠলো—তাই আপনার মত একজন কবি বলেচেন—**All the world's a atage, and the men and women merely players**—অর্থাৎ—

ক্ষেমদাস মৃদু হেসে বল্লেন—বুঝেচি। গভীর সত্যবাণী। নানাদিক থেকে সত্য—নানাভাবে।

যতীন একটু বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আপনি কি ইংরিজি জানেন?

—ভাষার সাহায্যে বুঝিনি, তোমার মনের চিন্তা থেকে ও উক্তির অর্থ বুঝেচি। ওঁর সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। পঞ্চম স্তরে কবি-সম্মেলন হয়, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় কবি আসেন—

যতীন ব্যাকুল আগ্রহের সুরে বল্লে, আপনি কালিদাসকে দেখেছেন? ভবভূতি?

—সে সৌভাগ্য আমার হয়েচে। পৃথিবীর সে কালিদাস নয়—যে নিত্য মুক্ত কবিআত্মা কালিদাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই আত্মার সঙ্গে আমার পরিচয়। একবার নয়, অনেকবার নানা দেশে নানা প্রাকৃত দেহ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি অপ্রাকৃত দেহধারী চিদানন্দময় আত্মা; আজ নাম কালিদাস, কাল নাম চণ্ডীদাস, পরে ক্ষেমদাস—তাতে কি?

—কবি-সম্মেলন হয় কোন্ সময় ?

ক্ষেমদাস জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বুঝি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে ? তোমার কথাতে মনে হচ্ছে। এখানে সময়ের কি মাপ ? কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ—অনন্তকাল বায়ুর মত শন্ শন্ বইচে। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরূপগোস্বামী বলেচেন তাই—অনর্পিতচরীং চিরাৎ—রূপগোস্বামীও কবি, তিনিও আসেন। আর তুমি জানো না, যাঁর সঙ্গে এসেচ এই আচার্য রঘুনাথ দাসও কবি ? এঁর রচিত চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ কি পড়ে থাকবে ? পড়েচ বলে মনে হচ্চে না। শোনো তবে—

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথাৎ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধতি দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।

কেমন ছন্দ ? কেমন লাগচে ওঁর শ্লোক ?

যতীন বিষণ্ণমুখে বল্লে—আজ্ঞে বেশ!

বৃন্দাবনের গোবিন্দ-মন্দিরের আরতি বহুক্ষণ থেমে গিয়েচে। পাশের রাজপথ দিয়ে দু'এক-খানা গাড়ী যাতায়াত করচে, মন্দিরের বড় বড় দরজায় আলো জ্বলচে, কোথা থেকে উগ্র বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে, মন্দিরের সামনে একটা হিন্দুস্থানী টাঙ্গাওয়ালা যাত্রীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কি বকাবকি করচে। যতীন ভাবলে, স্বর্গ-মর্তের কি অদ্ভুত সম্বন্ধ! অথচ বেঁচে থাকতে পৃথিবীর লোকে কেউ এ রহস্য জানে না। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, এত বড় জীবনের খবর যদি কেউ রাখতো, প্রেম-ভক্তির এ সম্পর্ক যদি রাখতে জানতে ভগবানের সঙ্গে—তবে কি তুচ্ছ বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত থাকে? এইমাত্র যে লোকটা সামনের রাস্তা দিয়ে মোটর চড়ে গেল ও হয়তো একজন মাড়োয়ারী মহাজন, সারাজীবন ব্যাঙ্কে টাকা মজুত করে এসেচে—জীবনের অন্য কোনো অর্থ ওর জানা নেই, কেবল তেজীমন্দী, লাভ-লোকসান এই বুঝেচে। জয়পুর শহরে হয়তো ওর সাততলা অট্টালিকা। কিন্তু হয়তো ছেলেগুলো অবাধ্য, বেশ্যাসক্ত, স্ত্রী কুচরিত্রা। মনে সুখ নেই—অথচ ও কি জানে, এই পাশেই মদনমোহনের মন্দিরে এই গভীর রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কবি সাধুরা আজ সমবেত হয়েচেন, সেখানে পুষ্পের মত নারীর স্নেহ, কত শতাব্দীর পার থেকে ভেসে আসা অমর মহাপুরুষদের বাণী, বকুলপুষ্পের সুবাস, ভগবানে অর্পিত মধুর প্রেমভক্তির পরিবেশ—এইখানেই স্বর্গ-মর্ত্যের বিশাল ব্যবধান রচনা করেচে। হায় অন্ধ পৃথিবীর মানুষ!

১৫

পৃথিবীর হিসেবে দীর্ঘ দু বছর কেটে গেল।

সেদিন পুষ্প ও যতীন বসে কথা বলচে বুড়োশিবতলার ঘাটে, এমন সময় পুষ্প হঠাৎ চীৎকার করে বল্লে—এই! থামো—থামো—খবরদার—

পরক্ষণেই সে ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন মুখে বহুদূর আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লে—যতীনদা, যতীনদা—

যতীন বিস্মিত হয়ে বল্লে—কি হোল? পুষ্প বল্লে—কিছু না। যতীন নাছোড়বান্দা, সে বার বার বলতে লাগলে—কি হোল বল না পুষ্প? বলবে না?

অবশেষে পুষ্প বল্লে—আশা-বৌদিকে খুন করতে যাচ্চে তার সেই উপপতি নেত্য—

—সে কি!

—ঐ যে, দেখতে পাচ্চ না?

যতীন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে—চলো চলো ছুটে যাই, সামলাই গিয়ে—আমি তো কোনো দিকে কিছু দেখচি নে—ওঠো।

বিস্মিত যতীন পুষ্পের দিকে চেয়ে দেখলে যে তার যাবার কোন ব্যস্ততা নেই। সে চুপ করে বসেই রইল, কিছুক্ষণ পরে পুষ্পের বিশাল আয়ত চোখ দুটি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

যতীন বল্লে—কি হয়েচে, চলো চলো—

—গিয়ে কি হবে। এ যাত্রা রক্ষা হোল গিয়ে—

—বেঁচে গিয়েচে?

—আপাতত বটে। আহা, কি দুঃখ আশা-বৌদির!

—আমি সেখানে যাবো পুষ্প। চলো দেখা যাক—

—না।

—তোমার ওই সব কথা আমার ভাল লাগে না পুষ্প, সত্যি বলচি। আমি আলবৎ যাবো সেখানে। আমার মন কেমন হচ্চে বল তো?

—সেজন্যেই তোমার আরও যাওয়া উচিত নয়। দেখে কষ্ট পাবে খুব।

—চলো পুষ্প, তোমার পায়ে পড়ি, আচ্ছা তুমি বোঝো সব, অথচ মাঝে মাঝে—

অগত্যা পুষ্প ওকে নিয়ে কলকাতায় আশার বাসায় এসে উপস্থিত হোল। তখন যতীন বুঝতে পারলে কেন পুষ্প এখানে তাকে আসতে চায় নি। নেত্য আজকাল মদ খায়, মাতাল অবস্থায় এসে দিন-দুপুরে সে আশাকে এমন মার দিয়েচে যে, সে ঘরের মেঝেতে পড়ে ভয়ার্ত চোখে দুর্দান্ত মাতালটার দিকে চেয়ে আছে। দরজার চৌকাঠের এপারে একখানা নেপালী কুকরি পড়ে, সম্ভবত নেত্যর হাত থেকে ঠিকরে পড়ে থাকবে। ওদের দোরের বাইরে আশ-পাশের ঘরের ভাড়াটেরা জড়ো হয়ে উঁকি মেরে মজা দেখচে। নেত্য মত্ত অবস্থায় টলচে ও হাত নেড়ে নেড়ে জোর গলায় আস্ফালন করচে—ওকে আমি আজ খুন করে ফেলবো—আচ্ছা পাল মশায়, আপনি বিচার করুন, ওকে কে খেতে দিচ্চে, পরতে দিচ্চে? ও দেশে না খেয়ে মরছিল কিনা ওকে জিজ্ঞেস করুন না? আমি মশাই হক্ কথা হক্ কাজ বড় ভালবাসি। আমি আনলাম ওকে এখানে, খাওয়াই পরাই, অথচ সেই শত্তু ব্যাটা এসে তলায় তলায় ফুর্তি মারে। কত দিন পই পই করে বারণ করিচি—করি নি? তেমন পুরুষ বাপে নেত্যনারাণের জন্ম দেয় নি—আজ তোকে খুন করে ফাঁসি যাবো, সেও থোড়াই কেয়ার করে এই শর্মা। এত বড় তোর বদমাইসি! কম করেচি আমি তোর জন্যে? তোর নিজের বিয়ে করা ভাতার কোনো দিন তোকে খেতে দেয়নি, আর আমি কিনা···দিয়েচে কোনো দিন সেই যতীন?

এই সময় আশা আধ-বসা অবস্থায় উঠে ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে—খবরদার! তিনি স্বগ্গে গিয়েচেন, তাঁর নামে কিছু বোলো না—

নেত্য বিদ্রূপের সুরে বল্লে—ওরে আমার স্বামী-সোহাগী সতী রে! মারো মুখে ঝাঁটা, বলতে লজ্জাও করে না? আমি বলচি, না তুই বলতিস্ সেই যত্‌নেটা বেঁচে থাকতে? আবার স্বামী-সোহাগ দেখাতে এসেচেন, মরণ নেই? ভারি স্বামী ছিল মুরোদের, সব জানি, বিয়ে করে একখানা কাপড় কিনে দেবার, এক মুঠো অন্ন দেবার ক্ষমতা হয় নি—

আশা আবার উঠে বল্লে—আবার ওই কথা! তিনি মরে স্বগ্গে গিয়েচেন, তাঁর নামে কেন বলবে তুমি?

নেত্য হঠাৎ তেড়ে এসে আশার কাঁধে এক লাথি মেরে বল্লে—স্বামীর সোহাগ উথলে উঠলো বদমায়েশ মাগীর, যে বেরিয়ে এসেচে তার মুখে আবার—গলায় দড়ি দিগে যা—

আশার চেহারা আগের চেয়ে খুব খারাপ হয়ে গিয়েচে, গায়ের রঙেরও আগের মত জলুস নেই, লাথি খেয়ে সে কিন্তু এবার ঠেলে উঠলো। বল্লে—তাই দেবো, গলায় দড়ি দিয়ে তোমায় পুলিশের হাতে যদি তুলে না দিই—

—চুপ—পুলিশ তোর বাবা হয়!

—আবার মুখে ওই সব কথা?

এইবার একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—এসব আপনাদের কি কাণ্ড? আপনারা না ভদ্দর লোক? আশপাশের বাড়ীতে গেরস্তর ঝি-বউ সব রয়েচে, এখানে মদ খেয়ে চেঁচামেচি চলবে না। হ্যাংগামা করতে হয়, ন্যাকরা করতে হয়, সরকারী রাস্তা পড়ে রয়েচে। আমার বাড়ী ওসব করলে পুলিশে খবর দিতে হবে—

পালমশায় এবার বোধ হয় সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন—আমিও তাই বল্লু। বলি এখানে ওসব কোরোনি—তা মাতালের সামনে এগোতে কি সাহস হয়!

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি আশাকে ধরে ঘরের বাইরে আনতে আনতে বল্লে—মাতালের সামনে তক্কো কত্তে আছে, ছিঃ মা—দেখচো না ওর এখন কি ঘটে জ্ঞান আছে? এসো আমার ঘরে—

আশা চলে যায় দেখে নেত্য জড়িত কণ্ঠে বাজখাঁই আওয়াজে বল্লে—এই, কোথাও যাবিনি বলে দিচ্চি—হাড় ভাঙবো মেরে—খবরদার! এই! আমি এখন চা আর ডিমভাজা খাবো—করে না দিয়ে যদি নড়বি—নিয়ে যেও না মাসী—

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি যেতে যেতেই বল্লে—আচ্ছা, চা করে ডিম ভেজে আমার ঘর থেকে পাঠিয়ে দিচ্চি বাবা—আপনি একটু শান্ত হয়ে শুয়ে থাকুন—

পালমশায় উপস্থিত লোকজনদের দিকে চেয়ে বল্লে—চলো সব, চলো, কি দেখতে এসেচো সব? জুটো হাত পা বেরিয়েচে কারো, না ঠাকুর উঠেচে? বল্লু তখন ওখানে যেওনি, যে যার ঘরে যা খুশি করুক না, তোমার কি? আসুক দিকি আমার নিজের ঘরে। দেখি কত বড় কে বাপের ব্যাটা!

শেষের কথা ক'টি পৌরুষগর্বে উচ্চারণ করবার সময় তিনি নেত্যনারায়ণদের ঘর থেকে বেশ একটু দূরে বারান্দার প্রায় ওপাশে চলে গিয়েচেন যদিও, তবুও চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে দেখে নিলেন, দুর্দান্ত মাতালটা তাঁর কথা শুনলো কিনা।

যতীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—এতদূর নেমেচে ওর অবস্থা! এ আমি ভাবিনি—

পুষ্প বল্লে—ভাবা উচিত ছিল, এ সব জিনিসের এই কিন্তু পরিণাম—এখান থেকে চলো যাই—

যতীন চুপ করে বসে ছিল, আশার দুর্দশা তার মনে গভীর রেখাপাত করেচে। সে দুঃখিত ভাবে বল্লে—তুমি কেবলই এসে চলে যেতে চাও, কিন্তু আমি কোথায় গিয়ে শান্তি পাবো পুষ্প? আমার কর্তব্য পালন করিনি বলেই আজ ওর এই দুর্দশা। আমি যদি স্বামীর কর্তব্য পালন করতাম, যদি আশার জন্যে তেমন টাকাকড়ি রেখে যেতে পারতাম, তাহোলে—

—তোমার ভুল এখনো গেল না।

—কেন, ঠিক কথা বলচি কি না? ভুলটা কোথায়?

পুষ্প মৃদু হেসে ওর পাশে এসে বল্লে—তোমাকে এত ভাল ভাল জায়গায় নিয়ে গেলাম, তোমার বুদ্ধিটা যেমন স্থূল তেমনই রইল—

—কেন?

—আশা বৌদি নিজের কর্ম-ফলে এখনও অনেকদিন এই রকম ভুগবে। তুমি ওর কর্মের বন্ধন কাটাতে পারো সাধ্যি কি? টাকা রেখে যেতে, টাকা সুদ্ধ চলে যেতো। বড়লোকের ছেলেদের তো অনেক টাকা দিয়ে বাপ-মা মরে যায়—তারা উচ্ছন্ন যায় কেন?

—আমি এখানে থাকবো পুষ্প। ওকে ফেলে যেতে পারবো না এ ভাবে—

—তুমি কেন, দরকার হোলে আমিও থাকবো। এখানে থাকতে আমার রীতিমত কষ্ট হয় —তবুও আমি তোমার জন্যে, যদি আশা বৌদির এতটুকুও উপকার করতে পারতাম তবে এখানে থাকতে কিছু আপত্তি করতাম না। কিন্তু তুমি এখনও অনেক জিনিস বোঝো নি। এসব নিষ্ফল চেষ্টা। করুণাদেবীর মুখে শুনেচি করুণার পাত্র মেলানো বড় দুর্ঘট। নয়তো করুণাদেবীর মত শক্তিশালিনী দেবী আশা বৌদিকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারেন না? এক্ষুনি পারেন—কিন্তু তাঁরা জানেন, তা হয় না। জীব নিজের চেষ্টায় উন্নতি করবে, বাঁশ দিয়ে ঠেলে উঁচু করে দিলে জীব উন্নতি করে না! নয়তো ভগবান এক পলকে সব পাপী উদ্ধার করতে পারতেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে কাজ করতে হয়। সে তুমি আমি বুঝিনে, কিন্তু করুণাদেবী, প্রেমদেবীর মত দেবদেবীরা অনেকখানি বোঝেন—তাই তাঁরা অপাত্রে—

—আমি না বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি ঠিক বোঝো। তোমার দেখবার ক্ষমতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও তোমার সঙ্গে এখানে ওখানে গিয়ে আমার অনেক উন্নতি হয়েচে আগেকার চেয়ে—এখন বুঝিয়ে বল্লে বুঝি। তোমার সেই সন্ন্যাসীর মতে এখন বোধ হয় আমার মুকুলিত চেতন—নয়তো বুঝিয়ে বল্লেও বুঝতাম না, মনে সংশয় জাগতো, অবিশ্বাস জন্মাতো, তা হোলে সে সব তত্ত্ব আমার কোনো কাজে লাগতো না।

এই সময় নেত্যনারাণ ডাকতে লাগলো চেঁচিয়ে—ও আশা, শোনো এদিকে—এই আশা- -

প্রৌঢ়া বাড়ীওয়ালী বারান্দায় বার হয়ে বল্লে—একটু চা খাচ্চে, আপনাকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি তৈরী হোলে। আশা এখন যেতে পারবে না।

নেত্য গরম মেজাজে ধল্লে- কেন যেতে পারবে না—শুনতে পাই কি? ও আমার মেয়েমানুষ, আমি যখন ডাকবো, আলবৎ আসবে—ওর বাবা আসবে—

এই কথাটা যতীনের বুকে যেন গরম শূলের মত বিঁধলো। আশা তার স্ত্রী, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যার সঙ্গে সে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েচে—সেই আশা অপরের 'মেয়েমানুষ'? নেত্যর হুকুমে তাকে চলতে হবে? যতীনের মাথা যেন ঘুরে উঠলো। এক মুহূর্তে সমস্ত দুনিয়া বিস্বাদ, মিথ্যে, জোলো হয়ে দাঁড়ালো—মস্ত একটা ফাঁকি, মস্ত একটা ধাপ্পাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েচে সে। পুষ্প-টুষ্প, সন্নিসি-টন্নিসি সব এই মস্ত জুয়োচুরির অন্তর্গত ব্যাপার। নইলে অগ্নিসাক্ষী করে, হোম করে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যাকে সে সহধর্মিণী করেছিল—

কিংবা এই হয়তো নরক!

সে হয়তো নরক ভোগ করচে—স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করেনি, জোর করে তাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে এনে কাছে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করে নি, ক্লীবের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিল, সেও তমোগুণ। তার জন্যেই এই দারুণ নরক তাকে স্বচক্ষে দেখতে হচ্চে, কে যেন টেনে নিয়ে আসচে এখানে, এই শোচনীয় দৃশ্য দেখতে কে যেন তাকে বাধ্য করচে, নিয়তির মত নিষ্ঠুর সে আকর্ষণ, রেহাই দেবে না তাকে।

পুষ্প বল্লে—চলো যতীনদা, আর এখানে থেকে কষ্ট পেয়ো না—

যতীন দুঃখমিশ্রিত হতাশার সুরে বল্লে - তুমি অতি করুণাময়ী। তুমি জানো যে এ আমার কর্মফলের ভোগ, এ নরক। তুমি দয়া করে তাই কেবল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইচ, আমি সব বুঝতে পেরেচি এবার। কিন্তু পুষ্প দয়াময়ী, আমার সাধ্যি কি, আমি যাই? চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আশার ভাগ্য ও আমার কর্মফল পরস্পরকে তেমনি টানচে। টেনে আনচে কোথায় তোমাদের সেই তৃতীয় স্তর থেকে—আমায় সে টানে আসতেই হবে এবং আমি কোথাও যেতেও পারবো না।

পুষ্প দৃঢ়স্বরে বল্লে—তুমি দুর্বল হয়ে হাল ছেড়ে বসে থেকো না, সেও কি পুরুষের কাজ, বীরের কাজ? তা ছাড়া তোমাকে এই বন্ধন থেকে বাঁচাবো আমি। নইলে তুমি বুঝতে পারচো না কি বিপদ তোমার সামনে—

কিন্তু যতীন কিছুতেই না যেতে চাইতে পুষ্প কিছুক্ষণের জন্যে পৃথিবীতে থেকে চলে গেল, বল্লে—পৃথিবীর ভোরের দিকে সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু রাত দুটোর পর নেত্য মদ্যপানের অবসাদে ঘুমিয়ে পড়াতে যতীন ভাবলে এবার সে স্বস্থানে ফিরতে পারে। আশা বাড়ীওয়ালীর ঘরেই ঘুমুচ্চে, সুতরাং এখন আর কোনো ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। যেন ভয় বা উদ্বেগ থাকলেই সে ভয়ানক কিছু সাহায্য করতে পারতো।

পৃথিবী ছেড়ে বাইরের আকাশের তলায় এসে সে দেখলে শূন্যপথের সাধারণ চলাচলের মার্গ-গুলি একেবারে জনশূন্য। কেউ কোথাও নেই। যতীন একটু বিস্মিত হয়ে গেল। পৃথিবীর লোক না দেখতে পাক, কিন্তু অসীম ব্যোমের নানা স্থান দিয়ে বিশেষত ভূপৃষ্ঠ থেকে একশো দেড়শো গজের ওপর থেকেই মেঘপদবীর সমান্তরালে বা তদূর্ধ্বে বহু পথ সীমা-সংখ্যাহীন অনন্তের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেচে। এই সব পথ কোনো বাঁধাধরা সুরকি সিমেন্টের তৈরী রাস্তা নয়—আত্মিক জীব, দেব দেবী, উচ্চ জীবগণের গমনাগমন দ্বারা সুনির্দিষ্ট একটা অদৃশ্য জ্যোতিরেখা মাত্র।

সাধারণত বিশ্বের এই রাজমার্গগুলিতে আত্মিক পুরুষেরা সর্বদা যাতায়াত করেন, কিন্তু আজ সেখানে একেবারে কেউ নেই—আরও ওপরে এসে যে স্থান ধূসরবর্ণ আত্মাদিগের অধিষ্ঠানভূমি, সেও জনহীন।

যতীন বুঝতে পারলে না, এরকম ব্যাপারের কারণ কি। আজ এত বছর সে এসেচে আত্মিকলোকের তৃতীয় স্তরে—কিন্তু এমন অবস্থা সে দেখেনি কখনো। তার মনে যেন কেমন ভয়ের সঞ্চার হোল। অথচ কিসের ভয় সে নিজেই জানে না। যে একবার মরেচে, সে আর মরবে না, তবে ভয়টা কিসের?

হঠাৎ যতীন দেখলে একটি লোক যেন আতঙ্কে চারিদিকে চাইতে চাইতে ঝড়ের বেগে উড়ে দ্বিতীয় স্তরের আত্মিক লোক থেকে আরো উর্ধ্বলোকের দিকে পালাচ্চে। পৃথিবী হোলে বলা চলতো লোকটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্চে। ব্যাপার কি? এর নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে।

যতীন তাকে কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার পূর্বেই লোকটা অন্তর্হিত হোল—মনে হোল পলায়মান ব্যক্তি যেন হাতের ইঙ্গিতে তাকে কি বল্লে—কি বিষয়ে সাবধান করতে গেল।

লোকটি অদৃশ্য হবার কিছু পরেই যতীনের মনে হোল কী এক ভীষণ টানে তাকে নীচের দিকে যেন টেনে নিয়ে যাচ্চে। অতি ভীষণ সে টানের বেগ, তিমির-প্রসারক যেন কোন্ বিশাল চৌম্বক শক্তি জগৎব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার জাল বিস্তার করেচে—যতীনের সামনে, পাশে, দূরে, চারিদিকে ঝড়ের মত কোথা থেকে সেই ভীষণ শক্তির লীলা এক মুহূর্তে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। যতীন যেন ভীম আবর্তে তলাতল পাতালের অভিমুখে কোথায় চলেচে…তার জ্ঞান লোপ পেয়ে আসচে…কেবল এইটুকু সে লক্ষ্য করলে, শুধু সে নয়, ঝড়ের মুখে তার মত বহু জীবাত্মা কুটোর মত কোথায় চলেচে বিষম ঘূর্ণিপাকের টানে।…তারপর একটা আর্ত চীৎকার স্বর, এক কি বহু সম্মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ, যতীন ঠিক বুঝতে পারচে না, তার সংজ্ঞা নেই, অতিপ্রাকৃত কী এক বিষম শক্তির অমোঘ আকর্ষণ তাকে খেলার পুতুলে পরিণত করেচে…

ভয়ানক অন্ধকার তার চারিদিকে, এই কি তলাতল পাতাল? পৃথিবী কোথায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র সূর্য কোথায়, পুষ্প কোথায়? করুণাদেবী কোথায়, হতভাগিনী আশা কোথায়—সব লুপ্ত, একেবারে! কোন্ রসাতলে সে চলেচে দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণে।

অনেকক্ষণ···অনেক যুগ যেন কেটে গিয়েছে···জ্ঞান নেই যতীনের। অন্ধকার ছাড়া আর কোনদিকে কিছু নেই। বহুদিন সে কী এক গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে ছিল। সব অন্ধকার···বিস্মৃতি ··

পুষ্পের ডাকে তার চৈতন্য হোল। পুষ্প তাকে ডাকচে, ও যতীনদা, যতীনদা, বেরিয়ে এসো।

পুষ্প ও আর একজন তাকে প্রাণপণে ডাক দিচে, যেন কতদূর থেকে...

যতীন বলে উঠলো—অ্যাঁ!—

—শীগগির চলে এসো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ—পুষ্প, পুষ্প ডাকচে!

যতীনের জ্ঞান একটু একটু ফিরে এসেচে—এ কোন্ স্থান!

কে যেন ওর হাত ধরলে এসে। পুষ্পের কণ্ঠস্বর ওর কানে গেল আবার। পুষ্প যেন কাকে বলচে—এবার যতীনদা বেঁচে গেল। তবে এখনও ঠিক জ্ঞান হয়নি—.

আবার আত্মিকলোকের নির্মল বায়ুস্তরে ওর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সহজ ও আনন্দময় হয়ে আসচে। যতীন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলে, সামনে পুষ্প ও পুষ্পের মা। সে বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে বল্লে—কি হয়েছিল বল তো? এ কি কাণ্ড! এমন তো কখনো—

তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখে আরও অবাক হয়ে গেল। সে পৃথিবীর এক গরীব গৃহস্থের পুরোনো কোঠাঘরের মধ্যে। পৃথিবীতে রাত্রিকাল, সম্ভবত গভীর রাত্রি। বর্ষাকাল। বাইরে ঘোর অন্ধকার, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়চে বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে। ঘরের এক কোণে কিছু পেতল কাঁসার বাসন একটা জলচৌকির ওপরে, একটা পুরোনো তক্তপোশ, দুতিনটি বস্তা—একটার ওপর আর একটা সাজানো—সম্ভবত ধান। ঘরের মেঝের একপাশে একটা জলের বালতি, ওদের ঠিক সামনে মেঝের ওপর মলিন কাঁথা পাতা একটা বিছানার একপাশে ছোট ছোট বালিশ পাতা—আর একটা ছোট্ট বিছানা, কিন্তু সে ছোট বিছানাটা খালি। আর বিছানার সামনে মেঝের ওপরেই মলিন শাড়ী পরনে একটি মেয়ে বসে অঝোরে কাঁদচে, মেয়েটির কোলে একটি মৃত শিশু, সম্ভবত ছ'সাত মাসের। ঘরের দরজার কাছে একটা পুরোনো হ্যারিকেন লণ্ঠনে বোধ হয় লাল তেল জ্বলছে, কারণ আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি হয়ে লণ্ঠনের কাঁচের একটা দিক কালো করে ফেলেচে। ঘরের মধ্যে আরও দু'তিনটি মেয়ে ও পুরুষমানুষ সবাই ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে ঘিরে নিঃশব্দে বসে।

মেয়েটি কাঁদচে আর বিলাপ করচে—ও আমার ধনমণি, ও আমার সোনা, হাসো, দেয়ালা করো, আমার মানিক, চোখ চাও—আমার কোল খালি করে পালিও না আমার সোনা—কোথায় যাবা আমায় ফেলে?

যতীন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পুষ্পের ও পুষ্পের মার দিকে চেয়ে বল্লে—এ সব কি ব্যাপার! এরা কারা? আমি কোথায়?

মেয়েটি একমনে বিলাপ করেই চলেচে কোলের মৃত শিশুর দিকে চোখ রেখে।

—কাল থেকে তুমি একবারও মাইএ মুখ গুঁজাওনি যে বাবা আমার! মাই খাবা? মায়ের মাইএ মুখ দেবা না, ও মানিক আমার? আর মুখ দেবা না? চোখ চাও দিনি—

মেয়েটির আকুল ক্রন্দনে যতীনের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরণের চঞ্চলতা দেখা দিল, পরের কান্না শুনে এমন কখনো তার হয়নি—সম্পূর্ণ অননুভূত কোন্ অনুভূতিতে ওর চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প বল্লে—চলে এস যতীনদা, চলো সব বল্‌চি। তুমি পুনর্জন্মের টানে পড়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলে আজ ছ'সাত মাস। ওই তোমার মা। আজ আবার দেহ থেকে মুক্তি পেলে। ওই মৃত শিশুই তুমি—কি বিপদেই ফেলেছিলে আমাদের।

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—পুনর্জন্মের টান! সে কি! আমি এই বাড়ীতে—

—এই ঘরেই জন্মেছিলে। এরা ব্রাহ্মণ, গ্রামের নাম কোলা-বলরামপুর, জেলা যশোর। ভগবানের কাছে বহু ডাক ডেকে আর করুণাদেবীর দয়ায় আজ উদ্ধার পেলে—নতুবা দেহ ধরে এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে এখন বহুকাল কাটাতে হোত—পুনর্জন্মের ঠ্যালা বুঝতে পারতে। বার বার পৃথিবীতে যাওয়া-আসার কুফল এখন বুঝতে পারচো তো? কতবার না বারণ করেছি?

যতীনের মন তখন কিন্তু পুষ্পের ওসব আধ্যাত্মিক তিরস্কারের দিকে ছিল না। তার সামনে বসে এই তার পৃথিবীর মা, গরীব ঘরের মা, তারই বিয়োগব্যথায় আকুলা, অশ্রুমুখী। গত ছ'মাসের শৈশবস্মৃতি কোনো দাগই কাটেনি তার শিশু-মস্তিষ্কে। কিন্তু কত বিনিদ্র রজনী যাপনের মৌন ইতিহাস ওই দরিদ্রা জননীর তরুণ মুখে! তারই মা, তারই নবজন্মের দুঃখিনী জননী, যাঁর বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে ছ'মাস পূর্বে এই দরিদ্র গৃহে কত আশা আনন্দের ঢেউ তুলে একদিন সে পুনরায় ধরণীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কি অদ্ভুত মোহ, কি আশ্চর্য মায়ার বাঁধন, মনে হচ্চে, স্বর্গ চাইনে, করুণাদেবীকে চাইনে, পুষ্পকে চাইনে, আশাকে চাইনে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-টুন্নতি চাইনে—এই পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীর এই মায়ের কোলে সুখদুঃখে সে আবার মানুষ হয়! এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিধারা, এই বর্ষার রাত্রিটি, এই গরীব মায়ের তারই জন্যে এ আকুল বুকফাটা বিলাপ—এ সব জীবনস্বপ্নের কোন্ গভীর রহস্যময় অঙ্ক অভিনয়ের দৃশ্যপট? ভগবান হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্বপ্ন।

ওর মনে পড়ল যাত্রায় শোনা গানের দুটো লাইন—

এ নাটকের এ অঙ্কে পেয়েছি স্থান তোর অঙ্কে,
হয়তো যাবো পর অঙ্কে পর অঙ্কে পুত্র সেজে।

ওদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া বল্লে—আর কেঁদো না বৌ, যা হবার হয়ে গেল, এখন উঠে বুক বাঁধো—মনে করো ও তোমার ছেলে নয়—ভারত করতে যদি ও আসতো তা হোলে কোলজোড়া হয়ে থাকতো, তা ভারত করতে তো আসে নি—কেঁদো না—

একজন আধবুড়ো গোছের লোক বল্লে - বিষ্টি মাথায় এখন আর কোথায় যাবো—সকালের আর বেশি দেরি নেই, সাধন আর হরিচরণকে নিয়ে আমি যাবো এখন—

প্রৌঢ়া বল্লে—বিষ্টিরও বাপু কামাই নেই—সেই যে আরম্ভ করেচে বিকেলবেলা, আর

সারারাত -

কথা বলতে বলতে কাক কোকিল ডেকে রাত ফর্সা হয়ে গেল। পুষ্পের বার বার আহ্বানেও যতীন সেখান থেকে নড়তে পারলে না। পুত্রহারা জননীর আকুল কান্না ও আছাড়ি-বিছাড়ির মধ্যে সেই আধ-বুড়ো লোকটি আর দুজন ছোকরা মৃত শিশুদেহ নিয়ে বৃষ্টিধারা মাথায় বাঁশবনের পথে চললো। যতীন, পুষ্প ও পুষ্পের মা গেল ওদের সঙ্গে। বাড়ী থেকে দু রশি আন্দাজ দূরে ছোট্ট একটা নদী, কচুরিপানার দামে আধ-বোজা; ওরা শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহটা নদীর ধারে পুঁতে ফেললে। তখনও ভাল করে দিনের আলো ফোটেনি, বৃষ্টিধারায় চারিধার ঝাপসা। পথে-ঘাটে লোকজন নেই কোথাও—বর্ষাকালের ধারামুখর প্রভাতকাল।

১৬

পুষ্প যতীনকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর বৃষ্টিধারা-মুখর ঝাপসা আকাশে উর্ধ্বে এক সু-উচ্চ পর্বত-চূড়ায় এসে বসলো। পুষ্পের মা বল্লে, আমি যাই মা পুষ্প, বসো তোমরা।

নিম্নে পৃথিবীর চারিদিকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ খেলচে, দিক্‌-চক্রবালে সুনীল আকাশে সূর্যোদয় হচ্চে, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ রাঙা। ওরা যেন পার্থিব বাসনা কামনার বহু উর্ধ্বের কোনো নির্মল দেবলোক থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। বাংলা দেশের উত্তরে এ বোধ হয় হিমালয় পর্বতের চূড়া। দূরে নিকটে তুষাররাশি সূর্যালোকে ঝক্‌মক্ করচে। যতীনের মনে হচ্ছিল এই সবই মায়া, ভেল্‌কিবাজি, ভগবানের ভেল্‌কিবাজি। মৃত্যুর অসত্যতা সে ভাল ভাবে বুঝেচে। মৃত্যু বল্লে তাহোলে কোনো জিনিস নেই; এই তো সে যশোর জেলায়ই কোলা-বলরামপুর গ্রামে মরে গেল শেষ রাত্রে, অথচ এখানে সে পর্বতশিখরে বাহাল-তবিয়তে সমাসীন। মরণ নেই, বিচ্ছেদ নেই, দুঃখ নেই, আমরা অমর—জীবনমরণের সঙ্গে, সুখদুঃখের সঙ্গে—সনাতন, নিত্য, অনশ্বর আমাদের এ ক্ষণিক লীলাখেলা।...

পুষ্প যতীনের মনের ভাব বুঝতে পারলে। হাজার হোক, যতীনদা পুরুষমানুষ, ইউনি-ভার্সিটির ছাত্র ছিল, জিনিসগুলো চট্ করে ধরতে পারে। পেটে একেবারে বিদ্যে না থাকলে অন্ধকার ঘোচে? সে গম্ভীর মুখে বল্লে, এবার বেঁচে গেলে বটে, কিন্তু বার বার আশা বৌদির কাছে যাতায়াতের ফলে তোমার এই বিপদ। অনেকবার তোমায় সাবধান করেছিলাম, শোনো নি। পুনর্জন্মের আবর্ত মাঝে মাঝে আত্মিক স্তরে ঝড়ের মত এসে পৌছয়, কোথা থেকে আসে তা জানিনে, ক'টা ব্যাপারই বা বুঝি জগতের! সেই সময় যে'কেউ সামনে পড়ে, তাকে নিয়ে এসে পৃথিবীতে ফেলে ঘুরিয়ে। ও থেকে রেহাই নেই। তাই এসে জন্মেছিলে পৃথিবীতে—

—আমার মনে আছে সে ভীষণ টানের কথা—জ্ঞান ছিল না আমার।

—তোমার উচিত হয় নি আশাদের বাসায় অতক্ষণ থাকা। ও একটা ঝড়ের মত, ভূমি-কম্পের মত বিপর্যয়; তবে তৃতীয় স্তরের নীচের অঞ্চলেই ও আবর্তের সৃষ্টি, চতুর্থ স্তরের

আত্মারা তত বিপদগ্রস্ত হন না ওতে-- যদিও পালিয়ে যান সকলেই ; ও একটা অন্ধশক্তি—ওকে বিশ্বাস নেই। কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে পুনর্জন্ম ঘটাবে পৃথিবীতে। অনেকেই পৃথিবীতে জন্ম নিতে চায় না, সকলেই ওটাকে ভয় করে।

—তুমি আমাকে কোনোদিন এই ব্যাপারটার কথা বলো নি তো ?

—ভূমিকম্পের কথা পৃথিবীতে সবাইকে সবাই বলে বেড়ায় ? হয়তো জীবনেই ঘটলো না, নয় তো এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল—এও তেমনি। পৃথিবীর বাসনা কামনা আসক্তি যখন মনের মধ্যে বেশি হয় বা যখন তৃতীয় স্তরের নীচেকার আত্মিক লোকে থাকে—তখনই ওই আবর্ত বড় বিপজ্জনক। সেইজন্যেই তোমায় বার বার বারণ করতাম। একা আর তোমাকে বেরুতে দেবো না—

—তুমি জানতে পারলে কখন ?

—তখুনি। আমি তখন জপে বসেচি—

লজ্জায় পুষ্প নিজেকে হঠাৎ সামলে নিলে, সে জপ-ধ্যান করে লুকিয়ে, যতীনদার সামনে সে মস্ত বড় কোনো যোগিনী সাজতে চায় না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারপর ?

—তারপর তখুনি বুঝলুম, তুমি মাতৃগর্ভে ঢুকে গিয়েচ। সঙ্গে সঙ্গে তোমার তো সব বিস্মৃতি এসে গেল, আমি মরি ছুটোছুটি করে। ছুটি করুণাদেবীর কাছে, আমার গুরুদেবের কাছে ছুটি। করুণাদেবী বল্লেন, মার মনে দুঃখ দিয়ে তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না—

যতীন হেসে বল্লে পৃথিবীতে মরে গেলুম, আর তোমাদের এখানকার ভাষায় বেঁচে গেলুম, এ বেশ মজার কথা বলচো কিন্তু পুষ্প। আরও দুবার এর আগে এমনি বলেচ 'বেঁচে গেলে যতীনদা'—আরে, মরেই তো গিয়েচি আজ সকালে পৃথিবীতে ?

পুষ্প হেসে বল্লে—তারপর শোনো। করুণাদেবী মাকে কাঁদাতে পারবেন না—গুরুদেব বল্লেন—তোমাকে মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন থাকতে হবে—তারপর ভূমিষ্ঠ হতে হবে, তবে তিনি চেষ্টা করবেন—

—কি চেষ্টা করবেন—শিশুহত্যার ?

—তোমার অজ্ঞান অন্ধকার কাটেনি দেখচি এখনও—

—না, আমার মনে খট্‌কা লেগেচে। পুষ্প, আমায়—তোমাদের ভাষায়—'বাঁচিয়ে' খুব ভাল করেচ, কিন্তু ওই মেয়েটির কান্না—আমার মায়ের ওই কান্না—

যতীনের চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প হেসে বল্লে—চলো, গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই। এতদিন তোমায় বলিনি তাঁর কথা—তোমার মন আজ ভাল না, চলো আমার সঙ্গে—

—সে কতদূর ?

—পঞ্চম স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে—তোমাকে আবরণ দিয়ে শক্তি দিয়ে নিয়ে যাবো, নইলে তোমার জ্ঞান থাকবে না অত ওপরে। কিছু দেখতেই পাবে না—

যতীন খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বল্লে—বোসো পুষ্প, দেখে আসি মা কি করচেন—

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—কে মা? কিসের মা? বৈষ্ণবী মায়ায় ভুলো না। অনন্ত পথে কত মা, কত বাবা, কত ছেলে, কত স্ত্রী। প্রত্যেকেই অ-বিনাশী আত্মা, প্রত্যেকেই লীলা করচে। চলো—

—না পুষ্প, আমার সত্যিই এখনো তোমার মত জ্ঞান জন্মায় নি মনে। এখনো মায়া-দয়া মন থেকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারিনি। তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তোমরা থাকো—আমি ওর মধ্যে নেই, সত্যি বলচি। আমাকে যেতেই হবে মাকে দেখতে। আজ সকালে মার সেই বুকফাটা কান্না আমারই জন্যে, সে আমি ছেলে হয়ে কি করে ভুলি?

পুষ্প মৃদু হেসে একটু ধীরভাবে বল্লে—উঃ, কি বাঁধন, তাই দেখচি! মায়ার শক্তি আছে বটে! এড়ানো বল্লেই কি এড়ানো যায়? মানুষকে নিয়ে পৃথিবীর লীলা তা হোলে হয় কি করে!

পরে সে হঠাৎ সুস্বরে গেয়ে উঠলো দুটো মাত্র কলি—

'এ বাঁধন বিধির সৃজন, মানব কি তায় খুলতে পারে?
কারাগার ভাঙতে কি পারো, ও যে মায়ার পাঁচিল আছে ঘিরে!'

যতীন ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—থাক্, থাক্, ব্রহ্মবিদ্যে এখন তুলে রেখে দাও, ওসব সইবে না ধাতে।

পুষ্প হেসে বল্লে—কেমন গলা, যতীনদা?

—চমৎকার!

—তা এখন মার কাছে না গিয়ে এর পরে যেও।

—আমি একবার দেখে আসি, বোসো—

আবার সেই কোলা-বলরামপুর গ্রাম। বেলা দুপুর। বৃষ্টি থেমেচে, কিন্তু আকাশ মেঘ-মেদুর। সজল বর্ষার বাতাস বইচে, সারারাত্রি বর্ষণের ফলে পথে-ঘাটে জল দাঁড়িয়েচে। বৃষ্টি-সিক্ত লতাঝোপের পত্রপুঞ্জ থেকে টুপটাপ বৃষ্টির জল ঝরে পড়চে এখনও।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মেয়েটি খেতে বসেচে। কলাইয়ের দাল, মোচা চেঁচকি আর কাঁচকলা ভাজা। সকালবেলার সেই প্রৌঢ়াও পাশে বসে খাচ্চে। সে খেতে খেতে বল্লে—একটু ডাল দেবো বৌ?

—না, আমি আর কিছু খাবো না মাসী। যা খেয়েচি সকালবেলা, পেট ভরে গিয়েচে—

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই বৌ, আবার কোলজোড়া ছেলে পাবে, হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক্।

মেয়েটি ভাত খাওয়া ছেড়ে হাত তুলে বল্লে—কি মুখ চোখের ছিরি, মাসী—ও যে বাঁচবে না সে আমি জানি—আমার কপালে কি অমন ছেলে বাঁচে। সেবার কিসে কামড়ালো রাত্তিরে, ছেলে ককিয়ে কেঁদে উঠলো, আমি তাড়াতাড়ি টেমি জ্বেলে দেখি ছেলের কাঁথার তলায়

এতবড় কাঁকড়া বিছে! সেই রাত্তিরে কাঁটানটের শেকড় বেটে, জলপড়া এনে নাপিতবাড়ী থেকে দিই। আহা, আশ্বিন মাসে একবার এমন কাশি হোল যে বাছা দম আটকে বুঝি যায়—কি যে বল্লে শিবু ডাক্তার, হুপিং কাশি না কি—যে ক'দিন ছিল, কষ্টই পেয়ে গিয়েচে বাছা আমার!

প্রৌঢ়া বল্লে—কেঁদো না বৌ, ছিঃ—ভাতের থালা সামনে কাঁদতে নেই দুপুর বেলা। অলক্ষণ।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—আর আমার লক্ষণ অলক্ষণ সব হয়ে গিয়েচে মাসী—এখন তোমরা বলো আমিও তার সঙ্গে চলে গিয়ে হাড় জুড়ুই। আমি কি করে খোকার মুখ না দেখে থাকবো, ও মাসী!

মেয়েটি এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো ডাল ভাত মাথা হাত তুলে হাঁটুর ওপর রেখে।

—ছিঃ বৌ, ওকি! খাও, খাও, আরে অমন করে না। তুমি তো অবুঝ নও, আবার হবে, এই-স্ত্রী মানুষ, ভাবনা কি? কোল জুড়ে আবার পাবে—

যতীনকে নিয়ে টেনে বার করাই কঠিন সেখান থেকে। পুষ্প অনেক কষ্টে তাকে কোলা-বলরামপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল বুড়োশিবতলায়।

বল্লে—খুব মন কেমন করচে মার জন্যে?

—সত্যিই, এত কষ্ট দিয়ে এসে অপরের মনে, আমার কোনো সুখ হবে না এ স্বর্গে। এ যেন পানসে হয়ে গিয়েচে। জগতে যখন এত কষ্ট—তখন আমি সুখে থেকে কি করবো পুষ্প। পৃথিবীই আমার ভাল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানে জমি চাষ করি, স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াই, মাকে খাওয়াই। দেখলে না মায়ের খাওয়া গেল? আমি সেই মায়াবাদী সন্নিসিকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করি, সবাই যদি সমাধি লাভ করে ব্রহ্মে লয় পাবে, তবে জগৎসংসার চলবে কাদের নিয়ে? সব নিয়েই তো সংসার। চাষা যদি লাঙল না চষবে, তাঁতি কাপড় না বুনবে, মজুর যদি তোমার আমার হয়ে না খাটবে—তবে একদিন সংসার চলে কেমন চলুক তো? তুমি তো বলচো সব মিথ্যে, সব ভুল—

—এ কথার উত্তর আমি তোমায় এখুনি দিতে পারি, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না আমার মুখ থেকে শুনলে। তাই এর জবাব দিলাম না।

—জবাবে দরকারও নেই। তুমি কেন আমাকে নিয়ে এলে পৃথিবী থেকে?

—কেন নিয়ে এলুম! শুনবে তবে? আমি আনিনি। তোমার অদৃষ্ট তোমাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়েছিল, অদৃষ্টই আবার এনেচে। পৃথিবীতে পুনর্জন্মের সময় তোমার আসেনি—দৈবদুর্বিপাকে পুনর্জন্মের টানে জন্মাতে বাধ্য হয়েছিলে। ও একটা দুর্ঘটনা—যেমন ভূমিকম্প। ও থেকে তোমার কর্মফল তোমাকে মুক্ত করে আনতো—এনেওচে। আমি কে? আমি সাহায্য করেচি মাত্র। পুনর্জন্মের জন্যে অত ভেবো না—ও যখন হবে, তখন কেউ রুখতে পারবে না।

—আমার ভাল লাগে না…পৃথিবীতে এত কষ্ট! এখানে নির্ঝরঘাটে কোন্ প্রাণে…ওদিকে

আশা, এদিকে আমার মা—

—পৃথিবীর মানুষ তুমি এখন আর নও এই কথাটা ভুলে যাচ্চ। পৃথিবীর মানুষ যখন ছিলে, তখন যে কথা বলচো তা বল্লে মানাতো। বিধাতার নিয়মই এই, পৃথিবীর জীবন থেকে এখানে আসতে হয়। সকলের জন্যে কষ্ট করবো বল্লেই তোমার শুনচে কে? নিয়মের অধীনে তোমাকে চলতে হবে। ভগবান তোমার আমার চেয়ে ভাল বোঝেন। তাঁর আইন মেনে নিতেই হবে। কেন এরকম হোল, এর জবাব তিনিই দিতে পারেন। আমার সেই গুরুদেবের কাছে যাবে? তিনি তোমায় বোঝাতে পারবেন।

—না, আমার গুরু-টুরুতে দরকার নেই পুষ্প, তুমি ক্ষ্যামা দাও—ঢের হয়েচে। আমার বড় ইচ্ছে সেই মায়াবাদী সমাধিবাজ সন্নিসিটার সঙ্গে—

মহাপুরুষদের সম্পর্কে তোমার মুখের ভাষাগুলো একটু ভদ্র করো যতীনদা—

এমন সময়ে বুড়োশিবতলার ঘাটে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো।

হঠাৎ দুজনেই আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলো, পশ্চিম দিকের আকাশ যেন প্রজ্বলন্ত উল্কার মত কোন্ আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেচে বহুদূর পর্যন্ত। আরও একটু পরে ওরা দেখতে পেলে, বহুদিন আগেকার দেখা সেই পথিক দেবতা শূন্যপথে চলেচেন। মনে হোল যেন তিনি ওদের দিকেই আসচেন, সেই রকম একটা নীল আলো ওদের সাগর-কেওটার ঘাট অবধি এসে পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর পথ গেল বদলে। তিনি আরও দূরের কোন্ গ্রহলোকের দিকে যাত্রা করলেন। যতীন প্রথমটা চিনতে পারেনি। বল্লে—উনি কে পুষ্প?

—চিনতে পারলে না যতীনদা? উনি সেই পথিক দেবতা, এককল্প পূর্ব থেকে যাত্রা করেচেন এই বিশ্বের শেষ দেখবেন বলে কিন্তু এখনও এর একাংশও দেখে উঠতে পারেননি—কত নীহারিকা, কত নক্ষত্রলোক, কত গ্রহলোক তিনি ঘুরেচেন, এমন কত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী—তবু এর কোনো হদিস তিনি পাননি। মনে নেই, সেই এখানে ক্লান্ত হয়ে এসে পড়েছিলেন? পৃথিবী শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটা আবার কোন্ গ্রহ! সূর্য কোনটা চিনতে পারেননি।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েচে।

পুষ্প একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরে বল্লে, তাই তো বলচি যতীনদা, এই সামান্য সৌরজগতের এই ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবীর মায়া তুমি কাটাতে পারচো না, অথচ দেখ তুমি যে লোকে এসেচো সেখানে একটু সাধনা করলেই তুমি অমনি কত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ, তার কোটি কোটি গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে পাবে! কত দেখবার আছে, কত জানবার আছে যতীনদা, সে সব তোমার দেখতে জানতে ইচ্ছে করে না?

যতীন তখনই কোন জবাব দিতে পারলে না, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর সহসা উত্তেজিত সুরে বল্লে—আমি সব দেখব, বুঝবো পুষ্প। আমার চোখ উনি অনেকখানি যেন খুলে দিয়ে গেলেন। চলো করুণাদেবীর কাছে—

—এখুনি?

—এতটুকু দেরি নয়।

আবার সেই উচ্চ আত্মিকলোকের বায়ুস্তর, চক্ষের নিমেষে পুষ্পের সাহায্যে যতীন শত শত যোজন, যোজনের পর যোজন পার হয়ে চললো। করুণাদেবীর আশ্রম সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে ওরা পৌঁছে দেখলে কেউ কোথাও নেই। সেই কুসুমিত উপবন, সেই প্রাচীন বৃক্ষতল যেখানে রাজ-রাজেশ্বরীর মত রূপসী দেবী সেদিন এলিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, আজ সে স্থান জনশূন্য।

যতীন হতাশার সুরে বল্লে—তাই তো! এ যে দেখচি—

—জগৎ-সংসারের কাজে সর্বদা ঘুরচেন, কি জানি কোথায় গিয়েচেন –

—কিন্তু কি সুন্দর দেশ এটা! আমার ইচ্ছে করে এখানেই থাকি। বুড়োশিবতলার ঘাট এমন করে নেওয়া যায় না?

—অনেক বেশি শক্তি দরকার এমন দেশ গড়তে, আমার তা নেই যতীনদা। এদেশ শুধু বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে সুন্দর হয় নি, মনের ওপর এর প্রভাব বুঝতে পারচো নিশ্চয়ই। আমরা যেন অনেক উঁচু জীব হয়ে গিয়েচি, শ্রান্তি নেই; ক্লান্তি নেই, দেহমন কত উঁচু ধরনের হয়ে গিয়েচে।•

এমন সময় একটি বিস্ময়কর আবির্ভাবের মত করুণাদেবী হঠাৎ যেন জ্যোতিঃপদ্মের মত ফুটে উঠলেন সেই বনস্থলীর প্রান্তে। স্নেহ ও প্রসন্নতা দেবীর বিশাল চক্ষু দুটির ঘননীল তারকায়। হেসে বল্লেন—আমি তোমাদের দেখে এক জায়গা থেকে ফিরে এলাম —

পুষ্প লজ্জিত ও অপ্রতিভের সুরে বল্লে—আপনার কাজে বাধা দিলাম দেবী?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—না। আমিও ইচ্ছে করেছিলাম তোমরা আজ এখানে আসবে —বসো, এসো এই গাছের তলায়।

যতীন ও পুষ্প গাছের তলায় ওঁর পাশে বসে পথিক দেবতার অদ্ভুত আবির্ভাবের ব্যাপার বল্লে। করুণাদেবী সব শুনে বল্লেন—ভগবানে বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কোনো নাস্তিক দেবতা, তবে মহাশক্তিধর বটে। আমার জানা নেই।

যতীন বল্লে—এত যিনি দেখে বেড়াচ্চেন তিনি নাস্তিক?

—ওঁরা অন্য বিবর্তনের প্রাণী।

—পৃথিবীর নয়?

—না, অন্য কল্পের। সে শুনবে এখন। চলো, যেখানকার কাজ ফেলে এখানে এসেচি, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাই।

দুজনেই চোখ বোজে। যতীনের জ্ঞান যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো সে উচ্চস্তরে গিয়েও কিছু দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না। এক মুহূর্তে ওরা অনুভব করলে খুব অদ্ভুত এক জায়গায় এসেচে। ওরা এক নিমেষে যেন বিরাট আত্মা হয়ে গিয়েচে, বাধা-বন্ধনহীন সর্বসংস্কারমুক্ত দেবাত্মা। দেশ ও কাল উপন্যাসের কাহিনী যেন,—এই ছিল কোথায়, এই এল কোথায়। দেশ অতিক্রম করতে হোল না, কালের ব্যবধান অনুভূত হোল কই?

সেও এক বিচিত্র দেশ। বাতাসে যেন নব প্রস্ফুটিতা মৃণালিনীর সুগন্ধ। এক বিশাল সুনীল সমুদ্রের ঢেউ তটশিলায় এসে আছড়ে পড়চে; সমুদ্রের মাঝে মাঝে ম্যাজেণ্টা রঙের,

ধূসর কৃষ্ণ রঙের ছোট-বড় পাহাড় ইতস্তত ছড়িয়ে। সমুদ্রের তীরে একটি অরণ্যবৃক্ষের তলে এক রূপবান জ্যোতির্ময় তরুণ দেবতা বসে একমনে চিন্তা করচেন।

যতীন এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি, এমন অপূর্ব রূপবান মহাজ্যোতিষ্মান দেবমূর্তি। সে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

পুষ্প তাঁকে দেখে কিন্তু অবাক হয়ে গেল অন্য কারণে। এঁকে সে অনেক বছর আগে দেখেছিল, যেদিন সে যতীনকে পঞ্চম স্তরে নিয়ে যেতে যেতে তার সংজ্ঞাহীন দেহ দ্বারা বিপদ-গ্রস্ত হয়েছিল। সেই তরুণ দেবতা, যিনি সেদিন শৈলশিখরে বসেছিলেন।

দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে বল্লেন—এরা কে?

পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি আমাকে দেখেচেন এর আগে—সেই একদিন—

করুণাদেবী বল্লেন—এদের কথা তোমাকে বলেছিলাম। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন, তোমার পৃথিবীরই নাম বাপু—

দেবতা প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—ও, বুঝেচি।

পরে যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—কিন্তু এঁকে নিয়ে এসে ভাল করলে না। এর এখনো অনেক দেরি। পার্থিব তৃষ্ণা এর এখনও যায় নি। এত উঁচু স্বর্গে একে আনলে এর ফল হবে এই, আগামী জন্মে এর স্মৃতি ওকে কষ্ট দেবে—কোন কিছুতেই মন বসাতে পারবে না। তুমি তো জানো, তৃতীয় স্তরের কোনো লোককে এখানে আনা সেই ব্যক্তির পক্ষেই ক্ষতিকর।

করুণাদেবী ঝগড়া করার সুরে বল্লেন—বেশ করেচি, যাও। তুমি ওর সব স্মৃতি মুছে দিও, নয়তো আমি দেবো। দেখাতে নিয়ে আসিনি শুধু, ওর অনেক প্রশ্ন আছে, জানতে ইচ্ছে হয়েচে।

যতীন ভাবছিল তার কি মহাপুণ্য ছিল, আজই এমন দুটি জ্যোতির্ময় দেবতার দর্শনলাভের সৌভাগ্য তার ঘটলো! কি অদ্ভুত রূপ!

সে বিনীত সুরে বল্লে—যদি দেখার সৌভাগ্যই ঘটলো, তবে দেবতা, আমায় এমন করে দিন, যাতে এখানে বার বার আসতে পারি বা আপনার দেখা পেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।

তরুণ দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—ওই দেখলে তো কি বলচে? এদের অজ্ঞানতা ঘুচতে অনেক বিলম্ব।

পুষ্প হাত জোড় করে বল্লে—আপনি ওঁকে দয়া করে ক্ষমা করুন। উনি নতুন এ স্তরে এসেচেন, এখানকার কিছুই জানেন না।

যতীন অপ্রতিভ না হয়ে বল্লে—আপনি দয়া করলেই সব হবে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের ওদিকে একজন কে এসেছিলেন, তাঁর কথা যা শুনলাম তাতে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েচি। আমার সব জানবার ইচ্ছে হয়েচে, তিনি কত গ্রহনক্ষত্র বেড়িয়ে এসেচেন—আমায় এর আগে বলেছিলেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন—

দেবতা বল্লেন—কে?

করুণাদেবী বল্লেন—পথিক কেউ হবে। দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানোই তাঁর কাজ বলে মনে হোল। নাস্তিক দেবতা।

তরুণ দেবতা একটুখানি চুপ করে থেকে বল্লেন—নাস্তিক কি? মনে হয় না। ওদের উপাসনাই ওই। বিশ্বে-ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক আবিষ্কারক আছে, এদের শক্তি যথেষ্ট, তেজ অসীম। তাদের মধ্যে কেউ হবে। আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে চলো, আর একটা জায়গা দেখিয়ে আনি—

যতীন বল্লে—দেবতা, আপনার কথা আমি ওই মেয়েটির মুখে আগে শুনেচি। তবে আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

—না, কি করে দেখবে। পুষ্প আর তুমি এক স্তরের লোক নও—

পুষ্প বল্লে—উনি এক বিপদে পড়েছিলেন—চুম্বকের ঢেউএ পড়ে পৃথিবীতে গিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন—সবে এসেচেন সেখান থেকে।

দেবতা ধীরভাবে বল্লেন—তা সম্পূর্ণ সম্ভব। খুব সাবধানে চলাফেরা কোরো। ওই যে পথিক দেবতার কথা বলছিলে, ওঁরা এ কল্পের জীব নন। পূর্ব কল্পে ওঁদের দেবত্বপ্রাপ্তি হয়েচে—মুক্ত আত্মা হয়ে বহু উর্দ্ধে উঠে বহু তেজ সঞ্চয় করেচেন, কিন্তু ওঁরাও পুনর্জন্মের আকর্ষণকে ভয় করে চলেন। তবে এই লোকটির এখনও অনেক জন্ম বাকি—একে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে অনেকবার।

যতীন বার বার ওই এক কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে বিরক্তি না চাপতে পেরে বলে উঠলো—দেব, তার জন্যে আমি দুঃখিত নই। পৃথিবীতে জন্ম নিলে কষ্টটা কি?

—আমি জানি। যে জানে সে ও বিশ্বের সব কিছু এবং বিশ্বদেব একবস্তু এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—তার পক্ষে পৃথিবী যা স্বর্গ সমান হয়ে গিয়েচে। যে জানে পৃথিবীর সব কিছুই তিনি, তার কাছে পৃথিবী ও স্বর্গ একই সুরে বাঁধা মোহন সঙ্গীতে। তোমাদের জ্ঞানী লোকেরা তাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণকে বংশীধারী কল্পনা করেচেন। কিন্তু এ চোখে পৃথিবীর সবাই দেখে কি? সাধারণ মানুষ কর্ম অনুসারে প্রথম তিন স্তরে গতাগতি করে, মরে ভূর্লোক থেকে ভুবর্লোকে আসে, সেখান থেকে উন্নতি করে স্বর্গলোকে আসে—আবার সেখান থেকে জন্মায় পৃথিবীতে, আবার মরে, আবার জন্মায়, আবার মরে। এ'কে বলে মানব-আবর্ত। চাকার মত ঘুরচে এই আবর্ত—চলো, একটা ব্যাপার তোমায় দেখাই, পৃথিবীতেই চলো, সেখানে তোমরা সহজ ও স্বচ্ছন্দ অবস্থায় থাকবে? চলো তোমাদের দেশেই নিয়ে যাই—

মহাশূন্যের পথহীন পথে করুণাদেবী ওদের নিয়ে আগে আগে চল্লেন। দূরে একটা কি বিশাল গ্রহ নিরন্ধ্র অন্ধকার সমুদ্রে পাক খেয়ে ঘুরচে। হু-হু করে নেমে এল—একটু পরে পৃথিবীর এক তুষারাবৃত পর্বতশিখর ডিঙিয়ে ওরা এক নদীর ওপরকার শূন্যে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দেবতা পিছনে পিছনেই আসছিলেন। বল্লেন—এটা চিনতে পারচো কী নদী?

যতীন বল্লে—না দেব, ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে—কিছু দেখতে পাচ্চিনে—এখন বোধ হয় রাতদুপুর।

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—এত বড় নদী বাংলাদেশে ক'টা আছে। আন্দাজ করে বলো।

—আজ্ঞে, হয় গঙ্গা, নয় পদ্মা।

—ওই রকমই, এটা গঙ্গা।

দেবতা হেসে বল্লেন—তুমিও ঠিক ভাল বলতে পারলে না, গঙ্গা তো বটে। মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা—

যতীন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আপনি বাংলাদেশের খবর সব জানেন দেখচি।

করুণাদেবী মৃদু সস্নেহ হাস্যে ওকে নেপথ্যে বল্লেন—ও রকম বোলো না। উনি কে তা তোমরা জানো না। পরে বলবো।

একটা ছোট্ট খাল। একটা আমবাগান। মুর্শিদাবাদ জেলা, সুতরাং বনবাগান বেশি নেই, মস্ত বড় মাঠ একদিকে, একদিকে ছোট্ট একটি গ্রাম। যতীন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই গ্রামের ঘরের আনাচে-কানাচে অনেকগুলি নিম্নস্তরের ধূসর ও মেটে সিঁদুরের রঙের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্চে—কেউ এ-বাড়ী, কেউ ও-বাড়ী। তারা যদি মানুষ হোত তবে আনাচে-কানাচে এদের এমনতর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হোত এরা নিশ্চয়ই চোর বা ডাকাত।

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—তাই তো, এরা কি করচে এখানে?

পুষ্প হাসিমুখে বল্লে—আমি বুঝতে পেরেচি অনেকটা, যদি তাই হয়, যা ভেবেচি—

যতীন বল্লে—কি পুষ্প?

তরুণ দেবতা বল্লেন—পুষ্প বুঝেচে। ওরা পৃথিবীতে জন্ম নেবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। প্রতি রাত্রেই এমনি লোকের বাড়ীর আশে-পাশে ঘোরে। কিন্তু ভিড় বেশি—সবাই সুবিধে পায় না। তৃষ্ণাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করায়। ভুবর্লোকে ওদের ভাল লাগচে না, সেখানে পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনার পরিতৃপ্ত হয় না—সুতরাং ওরা চাইচে আবার দেহ ধরতে। কিন্তু তার প্রার্থী অনেক। ওদেরই মত। সুতরাং জন্ম নিতে চাইলেও জন্ম নেওয়া হয় না। উচ্চতর আত্মারা বংশ দেখে, পিতামাতা দেখে জন্ম নেওয়ার সময়ে। এদের সে সব নেই, যে কোন বংশ, জাত, কুল হোলেই হোল। দেহ ধারণ নিয়ে কথা।

যতীন বল্লে—দেব, এরা কতদিন ধরে এমন ঘোরে?

—পৃথিবীর হিসেবে কেউ কেউ দশ বছর পর্যন্ত ঘোরে। এই এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা—এই অবস্থাকে প্রেতত্ব বলো তোমরা। কারো স্বাধীন কাজে আমরা কোনো বাধা দিই না—জীব যখন নিজের ভ্রম বুঝবে তখন সে নিবৃত্ত হবে। যতদিন তৃষ্ণা, ততদিন তাকে বাধা দিয়ে ফল হবে না। সে ভুবর্লোকে ঘোর অসুখী অবস্থায় থাকবে—তার চেয়ে যাও বাপু, পৃথিবীতেই গিয়ে সুখী হও। চলো, এখানে কষ্ট হচ্চে—আর নয়—

ওরা যেখানে এসে বসলো, সেটা একটা পর্বতশিখর, বড় চমৎকার পাইন এবং দেওদার গাছের নির্জন অরণ্যানী। গাছের ডালে ডালে অগণিত পরগাছায় রং-বেরঙের ফুল। পায়ের নীচে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে আছে, গভীর রাত্রি। আকাশের মাঝখানে চওড়া জলজলে

ছায়াপথ, অসংখ্য ঝক্‌ঝকে তারকারাজি। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের সঙ্কেত।

তরুণ দেবতা বল্লেন—এই হোল হিমালয়। বাংলাদেশের ওপরেই—ওই ছাখো দূরে একটা নদী নেমেচে পাহাড় থেকে—

যতীন বল্লে—তা হলে বোধ হয় তিস্তা—

—তুমি দেখলে তো মানুষের অবস্থা ?

—আশ্চর্য লাগলো, এমন হয় তা জানতাম না, দেব। আপনি যাকে মানব-আবর্ত বল্লেন, ওর উচ্চতর অবস্থা কি ?

—উচ্চতর সাধনা মানুষকে দেবযান-পথে উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়। স্বঃ, জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক বলেচেন ভারতবর্ষের জ্ঞানী লোকেরা। এত কল্পকাল সেখানে থাকে উচ্চতর জীবাত্মা।

—কল্প কি ?

—প্রত্যেকবার সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। এই কালব্যাপ্তির নাম কল্প। কল্পান্তে উচ্চতর জীবাত্মারও পতন হয়। তবে সত্যলোকেরও দূরপারে ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত যে ব্রহ্মলোক, সেখানে যাঁরা যান ভগবানের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যান। মানব-আবর্তে তাঁরা আর ফিরে আসেন না।

—এরই নাম মুক্তি ?

—একেই ভারতবর্ষের ঋষিরা মুক্তি বলেচেন। চলো তোমাকে একটি ভারতবর্ষের প্রাচীন কবির কাছে নিয়ে যাবো। উপনিষদ বলে দার্শনিক কবিতা ভারতবর্ষের, তিনিও তার একজন রচয়িতা। ভ্রাম্যমান কবি, সব সময় পাহাড়ে সমুদ্রতীরে বনানীর নির্জনতায় কাল কাটান। পৃথিবীর মধ্যে এই হিমালয় এবং আরও অনেক উচ্চতর পর্বতের বনে বৃক্ষলতায় প্রায়ই মাঝে মাঝে রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। আর মিশর দেশের এক উচ্চ আত্মার সঙ্গে পরিচয় করাবো।

—তা হোলে তো, দেব, পৃথিবীর আসক্তি তাঁর এখনও যায় নি ? অর্থাৎ আমি উপনিষদের সেই কবির কথা বলচি—

—তাঁর আসক্তি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান। কোনো পার্থিব তৃষ্ণা নয়। তাই জনলোকের অধিবাসী, নিজের আনন্দের জন্যে নেমে আসেন পৃথিবীতে। তাঁর আগমনে পৃথিবীর অনেক উপকার। বহু লেখক ও কবিকে অদৃশ্যভাবে প্রেরণা দান করেন, সেইজন্যেই তিনি পৃথিবীতে আসতে ভালবাসেন। পৃথিবীর হিসেবে বলতে গেলে বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে এ কাজ তিনি করেচেন—তাঁর কাজই ওই। আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব। আমার নিজের কাজে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন আমায়।

এবার পুষ্প বিনীতভাবে বল্লে—দেব, একদিন আমাদের কুটিরে পদার্পণ করবেন দয়া করে ? আপনার বন্ধু সেই তাঁকেও নিয়ে ? পরে দেবীকে দেখিয়ে বল্লে—ইনিও যাবেন আমায় বলেচেন দয়া করে।

তরুণ দেবতা বল্লেন—যাবো।

পুষ্প তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে বল্লে—আমাদের ওপর আপনার এ করুণার জন্য ধন্যবাদ।

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার সঙ্গে এক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর দেখা হয়েছিল, তিনি তাঁর নিজের শক্তি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে আমায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়েছিলেন, সে এক অপূর্ব অনুভূতি। সে কথা আমি এখনও ভুলিনি—

—তিনি কোনো যোগী সাধক হবেন। ব্রহ্মে লীন হওয়ার আস্বাদ ইচ্ছামত ভোগ করেন—মুক্ত পুরুষ। তাঁরা ইচ্ছামত কায়াব্যূহ রচনা করে যে কোনো দেহে অনুপ্রবেশ করতে পারেন। সমস্ত ঐশ্বর্য ওঁদের সংকল্প মাত্রেই উপস্থিত হয়—

—প্রভু, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে এই ব্যাপারের চর্চা ছিল?

—নিশ্চয়ই। যে কোনো দেশে যে কোনো সৎ, ঈশ্বরে ভক্তিমান লোক মানব-আবর্তকে জয় করতে পারেন। বিশ্বের যিনি কর্তা, তিনি কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতিকে কৃপা করেন না।

—আচ্ছা আমাদের দেশে যাঁরা বলেন, ভগবানের নাম জপ করলে মুক্তি, যেমন ধরুন বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তাঁদের মত কি সত্য?

—ভক্তি দ্বারা তাঁরা ভগবানে আত্মস্থ হয়ে দেবযান প্রাপ্ত হন। জীব মাত্রেই ব্রহ্মের অংশ জানবে। উপাধি ও নামরূপ ত্যাগ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই মুক্তি। বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মত। কিন্তু জ্ঞানী লোক ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করচেন বহু প্রাচীন যুগ থেকে। শুধু এ কল্প নয়, পূর্ব পূর্ব কল্পেও তাই হয়েছিল। পূর্ব পূর্ব কল্পের মুক্ত পুরুষেরা এ কল্পে পৃথিবীতে দেহ ধরে তাঁদের পূর্ব জীবনের সাধনলব্ধ জ্ঞান প্রচার করতে নামেন। তাঁরাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্য, বাল্মীকি, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ইত্যাদি—

এই পর্যন্ত বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। হঠাৎ পূর্বদিগন্তে অরুণ সূর্যোদয় দূরদূরান্তরের তুষারাবৃত শৈলশিখর অনুরঞ্জিত করে অপূর্ব মহিমায় স্বপ্রকাশিত হোল এক মুহূর্তে। পলকে পলকে শিখর থেকে শিখরান্তরে বর্ণসমুদ্রের বিভিন্ন রঙের ঢেউ গেল ছড়িয়ে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে মহিমময় সৌন্দর্যের দিকে।

করুণাদেবী বলে উঠলেন সাগ্রহে—চলো মানস-সরোবরে—চলো, চলো—

তখনি ঠিক পটপরিবর্তনের মত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। এই ছিল অরুণরাগে রঞ্জিত শৈলশিখর ও অরণ্যানী, তখনি যতীন ও পুষ্প বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলে তাদের সামনে কোনো বিশাল জলাশয়ের নীল জলরাশি বিস্তৃত।

অপরকূলে তুষারাবৃত শৈলচূড়া, সবে প্রভাত হয়েচে, কিন্তু সেই তুষারময় মেরুবৎ প্রদেশে কোনো বিহঙ্গকাকলী নেই কোনোদিকে। সমগ্র পার্বত্যহ্রদের গম্ভীর সৌন্দর্য যতীন ও পুষ্পকে মুগ্ধ করলে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওই দূরে রাবণহ্রদ, সামনে এটা মানস-সরোবর।

তরুণদেবতা বল্লেন—সামনের ওই পাহাড়ের চূড়া গুরলা মান্ধাতা আর ওই দূরে কৈলাস—

পুষ্পের মনে পড়ে গেল কৈলাস পর্বতে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করেন—ওঁদের কাউকে দেখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই আছে তার। করুণাদেবীর কাছে সেকথা তুলতেই তিনি তরুণদেবতাকে পুষ্পের বাসনা জানালেন।

তিনি বল্লেন—একজন জীবন্মুক্ত সাধু ওখানে আছেন, আমি দু-একবার তাঁকে সাহায্য করেছিলাম কোনো কাজে। তবে তিনি আমাকে দেখেননি—চলো নিয়ে যাই।

কৈলাসপর্বত ও সম্মুখবর্তী গুরলা মান্ধাতা চূড়ার মধ্যে বরফের বিশাল ক্ষেত্র—যতীন কখনো গ্লেসিয়ার বা তুষারপ্রবাহ দেখেনি, ওর মনে কথাটা উঠলো, যা সামনে দেখচে, সেটাই বোধ হয় গ্লেসিয়ার। তরুণদেবতা ওর মনের ভাব বুঝে বল্লেন—তুমি যা ভাবচো, তা এ নয়। চলো এখান থেকে তোমায় শতপন্থ বরফস্রোত দেখিয়ে আনবো—

ওরা কৈলাসপর্বতে গিয়ে দেখলে কৈলাস একটি সম্পূর্ণ আলাদা পর্বত, তার তুষারমণ্ডিত পিনাকসদৃশ শিখরের নিম্নভাগে অনেকগুলি গুহা সাধু যোগীদের আবাস। একটি গুহায় একজন শীর্ণকায় সাধুকে দেখিয়ে দেবতা বল্লেন—এঁর কথা বলছিলাম। উনি এখন স্থূলদেহের স্থূলচক্ষে আমাদের দেখতে পাবেন না—নির্বিকল্প সমাধিস্থ অবস্থায় ইনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন আমাদেরও অনেক ওপরে চলে যান উনি। তবে স্থূল দেহে ওঁরা সাধারণ মানুষের সমান।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, এঁরা একা আছেন কেন?

—নির্জনতা আত্মার উন্নতির একটি প্রধান উপায়। নিম্নজগতের কোনো প্রভাব এই উত্তুঙ্গ জনহীন পর্বতচূড়ায় এঁদের দেহমন স্পর্শ করে না। নির্জনতায় এঁরা শক্তি অর্জন করেন—ব্রহ্মজ্যোতিঃ এঁদের মনে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে এ অবস্থায়।

—আমি এঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?

—কি করে? তুমি স্থূল দেহ ত্যাগ করেচ, উনি এখন দেহে অবস্থান করচেন। তা সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, ওই যে একজন তিব্বতী লোক মানস-সরোবরের ধারে বেড়াচ্ছিল তখন, ওরা কি অবস্থায় আছে? ওদের মুক্তি বা উন্নতি—

দেবতা হেসে বল্লেন—ওদের থাক্ আলাদা। ওরা নিম্নস্তরের চৈতন্য নিয়ে জন্মেচে—সঙ্কুচিত চেতন। ওরা মরবে, অমনি অল্পদিন পরেই আবার দেহ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবে, কারণ ভুবর্লোকে ওদের চৈতন্য মোটেই থাকে না। যদিও থাকে, খুব কম। দেহ না নিলে উপায় হয় না—সুতরাং দীর্ঘ সময় ধরে ওদের প্রায় স্থূলদেহেই বর্তমান থাকতে হয়—পৃথিবীর কামনা বাসনার উর্ধ্বে ওদের উঠতে অনেক দেরি। সভ্য সমাজেও এমন অনেক আছে—খুনী, দস্যু, অলস, চোর, পরপীড়ক ইত্যাদি।

করুণাদেবী হেসে দেবতার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—এ তুমি খুব ভালই জানো কারণ তোমার হাতের কাজ এটা, কে কতদিন ভুবর্লোকে বাস করবে কি নতুন জন্ম নেবে। উঃ, দু-একটা ব্যাপার এমন নিষ্ঠুর আর করুণ হয়ে ওঠে তখন আমি অনুরোধ করতে বাধ্য হই—

তরুণদেবতা হাসলেন মাত্র—সে হাসির মধ্যে অসীম দয়া, অনন্ত জ্ঞান ও গভীর শক্তির

আভাস।

পুষ্প চুপি চুপি দেবীকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, উনি কে? এই অদ্ভুত দেবতা?

—উনি?

পদ্মে হেসে দেবতার দিকে চেয়ে বল্লেন—এইবার ওদের বলি?

বলেই চুপ করে গেলেন।

পুষ্প বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লে—আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশচেন! এত বড় উনি! অথচ—

দেবতা এবার হেসে এগিয়ে এসে বল্লেন—মানুষ কি কীট? তোমরাও তিনি। তোমাদের ঋষিরাই বলেচেন—কিঞ্চাহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবৎ যাচে, যোঽসৌ আদিত্যমণ্ডলস্থো ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ সোঽহং ভবামি—আমি ভৃত্যভাবে তোমার সাক্ষাৎকার যাচ্ঞা করচিনে—সবিতৃমণ্ডলে যে ওঙ্কারময় পুরুষ, আমিই সেই। তুমি আমি ভিন্ন কোথায়? ছোট ভাবো কেন, তাই তো ছোট হয়ে থাকো। বড় হও, বীর্যবান হও। সচেতন হয়ে যদি তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দাঁড়াও বিদ্রোহের পথে—সেও ভাল। তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে। যে দুর্বল, তার দ্বারা কি কাজ হবে? যে শক্তিমান, অথচ বিদ্রোহী—তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসতে আমরা জানি।

যতীন কৌতূহলের সঙ্গে বল্লে—এই যে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে রক্তারক্তি,…এও কি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী?

—তুমি বুঝতে পারলে না। প্রত্যেক ঘটনা মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যুদ্ধে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ—এর দ্বারা জাতি শক্তিমান হয়। কি হয় যুদ্ধে? মানুষ মারা যায়। মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। এই তো? কিন্তু মৃত্যুর অসত্যতা এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝেছ। আরামের অত্যন্ত সুযোগ মানুষকে অলস, পশুবৎ করে তোলে। আমার পৃথিবী কতকগুলি আরামপ্রিয়, রোমন্থনকারী, নিজের অবস্থায় মহাপরিতুষ্ট গোরুর দলে ভ'রে তুলতে আমি চাইনে। শক্তিমান হয়ে উঠুক সব। কে কা'কে মারচে? সব মিথ্যে। দুদিনের আরাম কিসের? অনন্ত বিশ্ব তোমাদের পায়ের তলায়। সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ, যা যখন ভাববে, মুক্ত পুরুষে তাই তখন পায়। পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনাকে জয় করো—আরামের ইচ্ছা মন থেকে তাড়াও। নয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

করুণাদেবী বল্লেন—এদের বৃহস্পতি গ্রহের দুই উপগ্রহে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও না?

—দেখাবো। সে দুটো ধীরগামী জগৎ, যারা পৃথিবীতে সুবিধেমত উন্নতি করতে পারচে না, আমরা তাদের ওই সব মন্থরগতি জগতে পাঠিয়ে দিই জন্ম নিতে। সেখানে গেলে আশ্চর্য ব্যাপার দেখবে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওদের এখুনি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—

আবার মানস-সরোবর ও হিমালয় ওদের পায়ের তলায় দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। আবার অসীম ব্যোম—অন্ধকারে ডুবে পৃথিবী দিগন্তহীন আকাশে অদৃশ্য হোল। আকাশের অদ্ভুত দৃশ্য, দিনমানে সব দিক নক্ষত্রযুক্ত।

তারপরে নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় প্লাবিত আকাশপথে এক বিশাল মহাগ্রহ ওদের দিকে যেন দ্রুত ছুটে আসচে। করুণাদেবী বল্লেন—বৃহস্পতি!

কিন্তু বৃহস্পতি খুব বড় মশালের আলোর মত ওদের দক্ষিণে দূরে পড়ে রইল। ওরা অন্য একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর খুব নিকটে এসে তার বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়লো।

যতীন বল্লে—কিসে যেন পড়েছিলুম, পৃথিবী ছাড়া সোলার সিস্টেমের অন্য কোনো কিছুতে মানুষ নেই।

গ্রহদেব বল্লেন—সে সব কথা এখন থাক্। এই পৃথিবীটা দেখে নাও আগে—

পৃথিবীর মত অবিকল সে স্থান, খুব বেশি ফুল, ছোট বড় নদী। বসন্তের হাওয়া বইচে, বিহঙ্গের সুস্বর সর্বত্র, নির্মল জলাশয়। গ্রহটির একদিকে রাত্রির অন্ধকার, অন্যদিকে দিবসের আলো। যে অংশে ওরা গেল সেখানে মানুষের কর্মব্যস্ততা নেই, নিশ্চিন্ত মনে সকলে নিজের নিজের বাড়ীতে বসে আছে। গৃহস্থাপত্য অতি সুন্দর, সব রকম শিল্পকলার অদ্ভুত উন্নতি হয়েচে সেখানে, দেখেই মনে হোল, সর্বত্র সঙ্গীত, বাদ্য নৃত্য। অত্যন্ত সুন্দরী মেয়েরা বনে উপবনে ভ্রমণ করে বেড়াচ্চে পরম নিশ্চিন্ত মনে, যেন তাদের হাতে অতি সুদীর্ঘ অবকাশ, যেন সারা দিনমান শুধু কমলের বনে অলস পাদচারণ জীবনের সব মুহূর্তগুলি ভরে দেবে অমৃতে। শান্ত ও অপরূপ সৌন্দর্যের রূপায়তন সে পৃথিবীর সুশ্যামল প্রান্তরে, ফুলফোটা বনে ঝোপে গন্ধে ভরা কুঞ্জতলে। বৃহস্পতির আলো পড়ে যে অংশে রাত্রির অন্ধকার, সে অংশের শোভাও চমৎকার—তবে সমগ্র পৃথিবীটি একটি নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব শান্তির গভীরতায়, ব্যস্ততাহীন জীবনমুহূর্তগুলির পুঞ্জীভূত ভারে যেন ঘুমিয়ে আছে, এলিয়ে আছে, কিসের অলীক স্বপ্নে দিনরাত্রি বিভোর।

করুণাদেবী বল্লেন—এই দেখ যে পৃথিবীর কথা তোমায় বলেছিলাম।

—স্লো—মানে ধীরগামী পৃথিবী?

করুণাদেবী হেসে ফেলতেই যতীন অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—না, ইংরিজিটা আপনি হয় তো জানেন কি না—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ও ভাষা কি আপনারা—মানে ম্লেচ্ছ ভাষা—

গ্রহদেব বল্লেন—তুমি এখনও বুঝলে না। আমাদের কোনো ভাষা নেই, যখন যে পৃথিবীতে, যে মানুষের সঙ্গে কথা কই—তাদের ভাষাই আমাদের ভাষা। পৃথিবীতে প্রচলিত যে কোনো ভাষাই হোক—তা আমাদের আপন। ইটালী দেশের কোনো লোকের সঙ্গে কথা বলবার সময় তাদের ভাষাতেই বলবো—

—আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা তা হোলে কি ভাষায়—কেন, বাংলাতেই তো আপনাদের মধ্যে বলছিলেন?

করুণাদেবী বল্লেন—মুখ দিয়ে কথা বলার দরকার হয় না কোনো স্বর্গেই—চতুর্থ স্তরের ওপরে কোথাও। মনের মধ্যে পরস্পরের কথা ফুটে ওঠে—আরও ওপরে স্বর্গে রঙীন্ আলোর বিদ্যুৎ-শিখার মত আলোর ভাষায় আদানপ্রদানে কথাবার্তা চলে। আমাদের ভাষা তোমাদের মত "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো" তা হয় না। মরমেই আগে পশে—কান শুনতেই পায় না—শোনবার দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হচ্চে বলেই আমরা মুখের

ভাষা ব্যবহার করি।

পুষ্প বল্লে—এই পৃথিবী কিন্তু আমার বেশ লাগচে। একটু বেড়ানো গেলে মন্দ কি?

বৈশ্রবণ বল্লেন—বেশ তো, ভাল করেই দেখতে পারো।

এক হ্রদে কতগুলি সুসজ্জিতা নরনারী নৌকাতে প্রমোদবিহার করছিল। দেবতা সেখানে গিয়ে বল্লেন—ক'বছর এরা এমনিধারা জল-বিহার করচে জানো? তোমাদের পৃথিবীর মাপে তিনটি বছর। তাড়াতাড়ি নেই কিছু এদের।

যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—তিনটি বছর!

—ঐ যে বল্লাম, ধীরেসুস্থে এখানে সব হয়। নৌকাতে জলবিহার চলচে তো চলচেই। ওদের গিয়ে বল যদি, বিস্মিত হবে।

যতীনের মনে পড়ে গেল বাল্যে কলেজের ক্লাসে পড়া টেনিসনের কবিতার সেই মৃণাল-ভোক্তার দেশ বা Land of Lotus-eaters!...সেখানেও সব লোক—

পরে কার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্চে ভেবে সে লজ্জায় চুপ করে গেল।"

দেবতা বল্লেন—চলো আরও দেখবে।

এক পাহাড়ের শ্যাম সানুতে বনপুষ্পবিকশিত নির্জন অঞ্চলে সে দেশের কবিকুলের মজলিস বসেচে। সেখানে সুদীর্ঘসময়-ব্যাপী গোধূলিতে তারা আরামে কাব্য আলোচনা করচে, পরস্পর পরস্পরকে আবৃত্তি করে শোনাচ্চে নৈসর্গিক শোভা, বনপুষ্পের লাবণ্য সম্বন্ধে নানা কবিতা। নারীপ্রেম নিয়ে কত সঙ্গীত রচনা করে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতি সুকুমার মাধুর্যের সঙ্গে ললিত স্বরে গাইচে—যেন জীবন অনন্ত, সময় অনন্ত। সে সঙ্গীতের ঘুমপাড়ানি মাধুর্য সত্যিই চোখে ঘুম নিয়ে আসে, শুনে যতীনের সত্যিই মনে হচ্ছিল দিগন্তের পাণ্ডুর শোভা শৈলসানুতটে যে শান্তি ও শ্রী বিস্তার করচে তাতে সব ভুলিয়ে দেয়, জীবনের যুদ্ধ অবাস্তব কাহিনী—জীবন শুধু এমনি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব গোধূলি দিয়ে ভরা—আর কোথাও ছুটোছুটি করে কি হবে, এখানেই ঘুমিয়ে পড়া যাক্ দিব্যি।

যতীন বল্লে—আমাদের পৃথিবীতেও এরকম নেই কি দেব?

—আছে, সে অন্য রকম। এরা এদেশের বসন্তকাল ব্যেপে এরকম উৎসব চালাচ্চে। এদের বসন্তের স্থায়িত্ব কত জানো? ন'বছর পৃথিবীর হিসেবে।

যতীন হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল দেবতার মুখের দিকে।

করুণাদেবী ওর বিস্ময় দেখে কৌতুক অনুভব করলেন। বল্লেন—নইলে তোমার ভাষায় স্লো ওয়াল্ড হবে কি করে?...

ও আরও অবাক হয়ে বল্লে—বা রে, আপনি যে ইংরিজি—

—সব ভাষাতেই কথা বলতে পারি আমরা, বল্লাম যে। ভাষা কিছুই নয় আমাদের কাছে। তারপর শোনো, এদের বছর কতদিনে জানো? পৃথিবীর ষাট বছরে এদের দেশের এক বছর। ঐ দেখ বৃহস্পতি গ্রহ ঘুরচে কত আস্তে আস্তে। সূর্য থেকে যে গ্রহ যত দূরে, তার আবর্তন তেতজা। আবার এই উপগ্রহের একটা নিজস্ব আবর্তন আছে নিজের কক্ষে—সব মিলিয়ে দীর্ঘ

দিন, দীর্ঘ রাত্রি, দীর্ঘ পথ. দীর্ঘ বছর এখানে। মানুষও ধীর গতিতে চলে, বহু সময় নিয়ে কাজ করে, বহু সময় নিয়ে আমোদ করে, বদলায় অনেক সময় নিয়ে। পৃথিবীর মত তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই।

—এদের আয়ু?

—তিনশো বছর প্রায়, তোমার পৃথিবীর হিসেবে। ধীরগামী আত্মা, পৃথিবীর পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে যারা উন্নতি করতে পারবে না, কিছু বুঝতে পারবে না—এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হয়। এখানে তারা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা আছে।

—কি রকম ব্যবস্থা বড় জানতে ইচ্ছে হচ্চে—

দেবতা হেসে বল্লেন—রুদ্র ব্যবস্থা কিছু নেই. পৃথিবীতে যেমন আছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যাধি, মহামারী, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ। এখানকার মানুষেরা একটু অলস, একটু ধীর-বুদ্ধি—এদের ওপর দয়া করতে হয় অনেকখানি। সবই তাঁর ব্যবস্থা (এখানে গ্রহদেবের মুখশ্রী শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, ভক্তিতে কোমল হয়ে এল), তিনি তাঁর অসীম করুণায় এ ব্যবস্থা করেচেন— আমরা তাঁর নিয়োজিত ভৃত্য মাত্র। এ কি দেখচো। এর চেয়েও ধীরগামী জগৎ আছে, তবে এ সৌরমণ্ডলে নয়। তিনিই এই সব অলস জড়বুদ্ধি জীবের জগতে উচ্চস্তরের দেবদূত পাঠিয়ে দেন, তাঁরা দেহধারণ করে আসেন এদের শিক্ষা দিতে। তাঁরাই এ সকল পৃথিবীর শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর, ব্যাস, দ্বৈপায়ন—সবাইকে তাঁর লীলাসহচর না করে নিলে তাঁর সুখ নেই। তাঁর অপার অনন্ত করুণার কথা তোমরা কি জানো? কেবল দুঃখ হয় মানুষে তাঁকে আগাগোড়া ভুল বুঝছে। কে তাঁকে জানে বা জানবার চেষ্টা করে? মানুষ যদি এক পা এগিয়ে যায়, তিনি তিন পা এগিয়ে আসেন মানুষের দিকে। অথচ সবাই নিজেকে নিয়ে উন্মত্ত, পৃথিবীর সুখ নিয়ে দিশাহারা— তিনি উদাসীন, কেউ তাঁকে চায় না দেখে অপেক্ষা করে করে দোর থেকে চলে যান। কেউ গ্রাহ্যও করে না। জগৎজোড়া বনফুলের মালা তাঁর গলায়—অথচ—

পুষ্পের চোখে জল এসে গেল গ্রহদেবের অপূর্ব কণ্ঠস্বরে। সে হাত জোড় করে বল্লে—প্রভু, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

গ্রহদেব তখনও আত্মস্থ বিভোর অবস্থায় বলেই চলেচেন আগের কথার জের টেনে—

—দেখ, তোমরা পৃথিবীর ছেলেমেয়ে! আমি তোমাদের ভালবাসি, কারণ তোমাদের জন্ম-জন্মান্তর নিজের হাতে গড়ে তুলেচি। তাঁর জ্যোতির্বাতায়ন অসীম শূন্যে খোলা রয়েচে, আশ্চর্যের বিষয় সেদিকে কেউ চায় না। সবাই অন্ধ। নরক থেকে বাঁচাতে চাই, কিন্তু পারিনে। অন্ধের মত ছুটে যায় সেদিকে। ওঁকে দেখ—উনি সত্যলোকেরও ঊর্ধ্বতন স্তরের দেবী কিন্তু নিজের সুখ চান না। পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের দুঃখে প্রাণ কাঁদে বলে কোনো ঊর্ধ্ব লোকেই থাকতে পারেন না। উনি সৌরমণ্ডলের সমস্ত জগতের মা। তোমরা কি আমাদের দেখা পেতে? আমাদের দেখার মত চোখ পেয়েচ শুধু ওঁর কৃপায়। নইলে ওঁর নিজের স্তরে উনি জনঃ, মহঃ, তপঃ লোকের জীবের অদৃশ্য। এখানে কোনো লোকের অধিবাসী তাদের ঊর্ধ্ব লোকের অধিবাসীকে দেখতে পায় না—দেখা সম্ভব নয়। ওই মেয়েটিকে ভালবাসেন বলে আজ

তোমাদের এই সব সৌভাগ্য। উনি আমারও ঊর্ধ্ব লোকের দেবী, দয়া করে আমার—

করুণাদেবী সলজ্জ স্বরে বল্লেন—পুষ্প, শোনো তবে—উনি কে জানো? উনি গ্রহদেব বৈশ্রবণ। তোমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। যুগযুগান্তর থেকে তাঁর নির্দেশমত উনি তোমাদের পৃথিবী পরিচালনা করচেন। পূর্ব কল্পের দেবতা উনি। তার পূর্ব কল্পে উনি দেবযান-পথে জন্মমৃত্যুর আবর্ত অতিক্রম করেন—বহুদূর পথের যাত্রী উনি। ওঁর স্বরূপে ওঁকে সত্যলোকের জীবেরাও দেখতে পায় না—চোখ ঝলসে যায় ওঁর তেজে। দয়া করে তোমাদের দৃষ্টির উপযুক্ত কায়া ধারণ করে দেখা দিলেন তাই দেখতে পাচ্চ।

সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে ক্ষুদ্র পৃথিবীর ছেলে-মেয়ে পুষ্প ও যতীন একেবারে নির্বাক্ হয়ে রইল। পুষ্প কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিল তা ভুলেই গিয়েছিল, এই সময় মনে আসতে সে আবার হাতজোড় করে বল্লে—প্রভু, আমাদের জন্মান্তরে কত সৌভাগ্য ছিল যে আপনাদের সাক্ষাৎ···একটা প্রশ্ন আমার আছে—

বৈশ্রবণ বল্লেন—আমাকে ধন্যবাদ দিও না পুষ্প। কৃতজ্ঞতা জানাও সেই মহামহেশ্বর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিদেবতা যিনি, তাঁকে। আমরা তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশে চলি—তাঁর দাসানুদাস। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইঙ্গিতে চলে—অথচ কে জানে তাঁকে? তোমাদের পৃথিবীর জ্ঞানী লোকেরা জানতেন—তাই বলে গিয়েছেন—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যতাদৃশান্যনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে এই রকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আবরণের সহিত প্রজ্বলন্ত অবস্থায় অবস্থিত। সে সব ব্রহ্মাণ্ড আমিও দেখিনি। তুমি যে পথিকদেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলে, তাঁর মত বিরাট দুর্ধর্ষ আত্মারা তাঁর কৃপায় বহু সৌরমণ্ডল, বহু নীহারিকা, নক্ষত্রজগৎ অতিক্রম করে এই অনন্ত বিশ্বে ঘুরে বেড়াবার অধিকার ও শক্তি পেয়েচেন। বিগত কল্পে আর একজন এমন দেবদূতকে আমি জানতাম—তিনি পৃথিবীর এক আবর্তকাল অর্থাৎ প্রায় বাইশ হাজার বছর ধরে বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে পরিভ্রমণ করেও শুধু আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডটার কূলকিনারা পান নি। তা ছাড়াও তো অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি - কোথায় তার ঠিকানা, কোথায় তার কূলকিনারা, কোথায় তাদের সীমা! এখন ভাবো, এই সমুদয় বিশ্ব যাঁর ইঙ্গিতে চলেচে—পৃথিবীর ছেলেদের খেলবার ক্রীড়নকের মত বন্ বন্ করে ঘুরচে—তাঁকে কে জানতো যদি তিনি নিজের দয়ায় কৃপা করে—

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্ন করতে চাইছিল, এবার তার সুযোগ পেয়ে মরীয়ার স্বরে বল্লে—প্রভু, আমিও ঐ প্রশ্ন করতে চেয়েছিলুম,—আপনি অন্তর্যামী, বুঝতে পেরেই তার উত্তর দিলেন। আমিও জানতে চাইছিলুম ভগবানকে আপনি কি দেখেচেন? দয়া করে আমার এই কৌতূহল—

করুণাদেবী এবার উত্তর দিলেন, কারণ গ্রহদেব তখন আপন ভাবে বিভোর। বিশ্বের ভগবানের কথা মনে ওঠাতে অন্য প্রশ্নের দিকে তাঁর মন ছিল না, যদি মন নামক অতি ক্ষুদ্র মানুষী ইন্দ্রিয় তাঁর মত বিরাট দেবতাতে আরোপ করা চলে। বল্লেন—না পুষ্প, উনি দেখেন নি। আমিও দেখি নি। অথচ তাঁকে অনুভব করেচি। তিনি কোথায় নেই? বিশ্বের প্রতি বাষ্প-

কণায়, জ্যোতিঃকণায়, পৃথিবীসমূহের প্রতি তৃণে প্রতি ধূলিকণায় তিনি। তিনি আছেন তাই আমরা আছি, তোমরা আছ, বিশ্ব আছে। তিনি সকলেরই। তুমি চাও, তোমার—আমি চাই, আমার।

গ্রহদেব বল্লেন—পুষ্প, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে যেও না। পারা যায় না। সে ইন্দ্রিয় তোমাদের নেই—তবে শুধু তাঁকে ভালবাসা দ্বারা মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এমন ভূমি লাভ করা যায় যে-ভূমি থেকে তাঁকে অনুভব করা যায়। নয়তো যার সে ক্ষমতা নেই—সেও যদি আকুল হয়ে ডাকে—তার মন ও বুদ্ধির গম্য হয়ে নিজেকে খুব ছোট করে সে ভক্তকে তিনি দেখা দেন। পৃথিবীতে কত লোক ইষ্টরূপে তাঁকে ভজনা করে। ছোটর কাছে ছোট হয়ে দেখা দেন তিনি—কত কৃপা তাঁর। কিন্তু যে রূপ তাঁর নিজের—সে রূপে তাঁকে কে দেখতে পায়—

—প্রভু, কেউ কি পায় না?

—ব্রহ্মলোকের বহু ঊর্ধ্বে তাঁর নিজের লোক। দেখি নি, তবে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে পারি। সেখানে হাজার হাজার কল্পের পূর্বেকার মুক্ত আত্মারা আছেন—কখনও দেখিনি তাঁদের। তাঁরা মহাশক্তিধর, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁরাই তাঁকে স্বরূপে হয়তো দেখেন। কিন্তু মানুষের রূপে দেখতে চাও, তুমিও পাবে। ভক্তিভরে চাও। অত বড়ও কেউ নেই, আবার অত ছোটও কেউ নেই।

যতীন বল্লে—প্রভু, এই পৃথিবীর মানুষে ভগবানকে জানে?

—সব পৃথিবীর অবস্থাই সমান। সত্য জানতে চায় ক'জন? এখানে তো দেখচো, ইন্দ্রিয়জ সুখ নিয়ে সবাই মত্ত। সেই বিরাট মহাশক্তির ধারণা করা এদের পক্ষে সহজ নয়। অবশ্য এরা পৃথিবীর জীবের চেয়ে অধিকতর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। বহুকাল যুগ-যুগান্ত কেটে যাবে এদের সমস্ত জড়তা, মনের মালিন্য দূর করে সে ধারণা উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু বিশ্বের ভগবানের অসীম ধৈর্য। কাউকে তিনি অবহেলা করেন না। তবে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যারা নিরলস আত্মা, আধ্যাত্মিক জ্যোতি যাদের মধ্যে জ্বলচে স্বয়ম্প্রভ মহিমায়, তারা এক জন্মেই ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে। যেমন বলেছিলেন তোমাদের গ্রহের এক প্রাচীন কবি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আমি অন্ধকারের ওপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জেনেচি—ওগো শোনো সবাই শোনো—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। কত আনন্দ! আনন্দের ভাগ সবাইকে না দিলে যেন চলচে না। কিন্তু ভাবো, ক'জন সেজন্যে ব্যগ্র? আদিত্যবর্ণ পুরুষকে না জানলেও তাদের জন্মের পর জন্ম, যুগের পর যুগ, এমন কি কল্পের পর কল্প পরম আরামে অন্ধের মত কেটে যাচ্চে চির-অন্ধকারে। তার ওপারে কি আছে কে সন্ধান রাখে?

যতীনের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। প্রশ্নটা সে করলে—তাঁদের মত অসীম শক্তিধর দেবতা কৃপা করলে তো একদিনে সে উদ্ধার হয়! সত্যের প্রচার করে দিলেই তো হয়।

দেবতার মুখে অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠলো। বল্লেন—তা কি হয়? যে পৃথিবী যে সত্যের জন্যে প্রস্তুত নয়, যে মানুষকে যে কথা বল্লে সে বুঝবে না—সেখানে সে সত্য প্রচার করা হয়

না—সে মানুষকে সে কথা জোর করে শোনানো হয় না। স্বাতী নক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়লে মুক্তা হয়—কিন্তু ধুলোয় পড়লে ?…ভগবান মহাজ্ঞানী। যা হয় না, তা তিনি করেন না।

পুষ্প বল্লে—তবে মানুষের মুক্তি কেমন করে হবে ?

—মানুষ যখন স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাবে। তাঁর প্রতি উন্মুখ যে মন, সে মনের সকল ভ্রান্তি তিনি ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

—দেব, সহজ কথায় বলুন আমরা কি করবো ? আমাদের কি কর্তব্য ?

—ত্বমেব বিদত্বাতিমৃত্যুমেতি—তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে।

—কি ভাবে প্রভু ? মৃত্যুকে অতিক্রম করা মানে কি ?

—সাধারণ মানুষে মরচে, আবার জন্মাচ্চে, আবার মরচে। একে বলে মানব-আবর্ত। একে জয় করাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা। তাঁকে না জানলে কিছুতেই এ আবর্ত এড়ানো যায় না। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

—পথ বলে দিন দেবতা—আমরা শরণাগত।

গ্রহদেব গম্ভীর মুখে বল্লেন—তাঁকে ডাকো, তাঁর কাছে আলো ভিক্ষা চাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর সর্বদা। পরকে ভালবাসো। যেথানে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ক্ষমা—সেখানে তিনি। তিনিই তাঁকে বুঝবার শক্তি দেবেন। তাঁর জন্যে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান। পরের জন্যে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান।

—এই মানুষের ধর্ম ?

—এর চেয়ে বড় ধর্ম নেই পৃথিবীর মানুষের। যারা নিরলস হয়ে তাঁকে ডাকে, ভালবাসে—পরের সেবা করে, এক অমানব পুরুষ তাদের হাত ধরে দেবযান-পথে জন্মমৃত্যুর দুস্তর অকূল মহাসমুদ্র পার করে নিয়ে যান। ভগবান নিজেই সেই অমানব পুরুষ, অপার করুণায় যিনি নিজেই এগিয়ে এসে হাত ধরেন অসহায়ের, শরণাগতের। পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকালের বাণী এ। কারণ যা সত্য, তা চিরযুগেই সত্য—এই একই বার্তা যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েচে, দূতের পর দূত এসেচে গিয়েচে, 'অন্ধ জাগো !' না—কিবা রাত্রি কিবা দিন ! চোখ আছে, কেউ দেখে না ; কান আছে, কেউ শোনে না !

ওরা সে পৃথিবীর একটি সুরম্য হ্রদ-মত জলাশয়ের ধারে বসেচে। যতীন চেয়ে চেয়ে দেখছিল, ওদের দক্ষিণে পৃথিবীর দেবদারুজাতীয় বৃক্ষের মত এক প্রকার ঘন সবুজ বৃক্ষের সারি, কিন্তু তাতে থাবা-দোপাটির মত রঙীন ফুল এত ফুটেছে যে, বড় বড় শাখাপ্রশাখা নির্মল স্ফটিকের মত জলরাশির কূলে কূলে নুয়ে পড়েচে। বেলা উত্তীর্ণ হয়েচে, নীলকৃষ্ণ দিগন্তরেখার দিকে চেয়ে হঠাৎ সে দেখলে বিশালকায় এক দশমী কি একাদশীর চন্দ্র উদয় হচ্চে। অত বড় চন্দ্র ! আকাশের এক দিক জুড়ে আলোয় আলো করে তুলেচে সারা দিক্‌চক্রবাল।

সে অবাক্ হয়ে বল্লে—ও কি রকম চাঁদের মত ওটা—অত বড়—

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—বৃহস্পতি। ওর জ্যোৎস্না পড়বে এখুনি। পৃথিবীর জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশি জ্যোৎস্না আর অদ্ভুত শোভা। আর একটা ব্যাপার, তোমাদের পৃথিবীর

মত অমাবস্যা এখানে নেই, উপগ্রহের ক্ষুদ্র দেহ অতবড় বৃহস্পতি গ্রহকে ঢাকতে পারে না, সুতরাং সপ্তমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত কলা হয়—কিন্তু দু'বৎসর ধরে শুক্লা রাত্রি চলে।

সে মুগ্ধ হয়ে গেল এই সুদূরতর পৃথিবীর অদ্ভুত জ্যোৎস্নাময় রজনীর শোভায়। হ্রদের ওদিকে জলজ ঘাসের আড়ালে তরুদলের ভ্রষ্ট কুসুমরাশি পদদলিত করে একদল পরমা রূপসী নারী জলে নামলো স্নান করতে। কে জানতো আবার এমন সব স্থান আছে, সেখানেও মানুষ আছে! ভগবানের যে কথা গ্রহদেব কিছু আগে বলছিলেন, তাতে তার মন ভরে আছে। যে আদিত্যবর্ণ পুরুষের মানস থেকে এই সব পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না, পাহাড় পর্বত, বেণু-বীণার ঝঙ্কারের মত সুস্বরা ওই সুন্দরীদের উৎপত্তি, তাঁতেই লয় কল্পান্তে, সৃষ্টি আর প্রলয় যাঁর নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাস—তিনি কোথায়? কে তাঁকে জানে? কি ভাবে তাঁকে জানা যায়? কে দেখিয়ে দেবে তাঁকে?

হঠাৎ চমক ভেঙে সে দেখলে তারা তিনজনে মাত্র আছে। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কখন অন্তর্হিত হয়েছেন। করুণাদেবী বল্লেন—উনি এ সব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

পুষ্প বল্লে—আমাদের বড় সৌভাগ্য যে ওঁর দেখা পেয়েচি—অবিশ্যি আপনার দয়ায়।

ফেরবার পথে আকাশে উঠে পুষ্পকে দেবী দেখালেন, পৃথিবীটার চারিদিকে আকাশে কুয়াশার মত, মেঘের মত পিঙ্গল প্রভায় আবেষ্টিত করে রেখেছে কি সব। বল্লেন—পৃথিবীর তাবৎ অধিবাসীদের বাসনা কামনা মেঘের মত জমা হয়েচে ও বায়ুমণ্ডলে। ওদের কাছে অদৃশ্য, যেমন আমরা ওদের কাছে অদৃশ্য। তোমাদের পৃথিবীতেও আছে এই রকম—এর চেয়েও বেশি। এই সব ঠেলে আমাদের যাতায়াত বড় কষ্টকর—তোমাদের পৃথিবীর শহরগুলোতে তো আরও বেশি। টাকার নেশা, সুরার নেশা, রূপের নেশা—ওর আকাশ ধূসর বাষ্পে ছেয়ে রেখেচে—তাতে বিষ আছে, আমাদের পক্ষে সে ঠেলে যাওয়া কত কষ্ট! কি করি, পৃথিবীর মত স্থূল দেহের আবরণ তৈরি করে যেতে হয়। কিন্তু গেলে কি হবে, আমাদের পর্যন্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে, ভালভাবে কিছু দেখতে পাইনে, নিজের স্বরূপ আবৃত করে গিয়েও কিছু করতে পারিনে। যাও তোমরা তাহলে···

ওদের পায়ের তলায় বুড়োশিবতলার ঘাটে দেখা গেল দিব্যি দুপুরবেলা। দূর পৃথিবীর জ্যোৎস্না ছায়াবাজির মত গিয়েছে মিলিয়ে, তার অপরূপ রূপসী জলকেলিরতা নারীদের নিয়ে।

যতীন বল্লে—নাঃ, এতদিনে বুঝলুম জগৎটা মায়া!

পুষ্প কৌতুকের সুরে বল্লে—অত বড় দীর্ঘনিঃশ্বাসটা ফেল্লে যে? ওটা কি দার্শনিক দীর্ঘশ্বাস, না সেখানকার ওই সুন্দরীদের অদর্শনে—

—যাও, ওসব ভাল লাগচে না। মন বড় চঞ্চল—আমি এখুনি যাবো। আমার মা কাঁদচেন আমার জন্যে।

—কোন্ মা?

—আরে, কোন্ মা আবার? পৃথিবীর এই সেদিনের—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—জগৎটা মায়া বলছিলে না যতীনদা?

যতীন বিরক্তির সুরে বল্লে—সব তাতেই তোমার ঠাট্টা। আমার ব্যথা আমিই জানি।

—বেশ ভালই। যাও, গিয়ে দেখে শুনে এসো, মায়ের বাছা— আহা!

—তুমিও চলো। পথে নানা বিপদ, চুম্বকের ঢেউ—ঢেউ কখন কি রকম হবে, ওসব আমি বুঝতে পারিনে। শেষকালে আবার কোথায় গিয়ে ঠেলে উঠবো জন্ম নিয়ে, বিশ্বাস কিছু নেই। তার চেয়ে চলো সঙ্গে।

কোলা-বলরামপুর গ্রামে ঝাঁ ঝাঁ করচে শরতের দ্বিপ্রহর। নিবিড় বাঁশবনে ঘুঘু ডাকচে উদাস-মধ্যাহ্নবেলায়, বনে বনে তিৎপল্লার হলুদ ফুল ফুটেছে। যতীন অনেকদিন পরে বাংলার শরতের এ সুপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখলে। বাঁশঝাড়ে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁশের চারা ঠেলে উঠেছে, বনশিমতলায় বেগুনী ফুল ফুটে ঝোপের মাথা আলো করচে—বর্ষার শেষে জল সরে যাচ্চে ডোবায়, পুকুরে নদীতে—তীরের টাটকা কাদায় সাদা বক গেঁড়ি গুগ্‌লি খুঁজে বেড়াচ্চে, জলের ধারেই কাশফুলের ঝাড় থেকে হাওয়ায় কাশফুলের সাদা তুলোর মত পাপড়ি উড়চে।

যতীন বল্লে—কি চমৎকার, পুষ্প! বাংলার সব পাড়াগাঁয়েই এমন। মন খারাপ হয়ে গেল। এর সঙ্গে জীবনের কত স্মৃতি জড়ানো! ছেলেবেলায় এম্‌নি শরতে পুজোর ছুটিতে স্কুল-বোর্ডিং থেকে বাড়ী আসতুম···ভাখো ভাখো এই গেরস্তর বাড়ীটিতে কি শিউলি ফুলটা তলায় পড়ে রয়েচে! আহা!

পুষ্প বল্লে—দুপুরের রোদে এখনও শুকোয় নি—ঘন ছায়া কিনা!

যতীন স্বপ্নালস চোখে বল্লে—কতকাল পরে যেন নিজের মাটির ঘরটিতে ফিরে এলুম পুষ্প। এমনি স্নিগ্ধ, এমনি আপন। চলো—

ঘরের মধ্যে বিছানা পাতা—তাতে যতীনের সেই তরুণী মা আধময়লা লেপকাঁথা গায়ে শুয়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগচে। শুধু এখানে নয়, পাশের বাড়ীতেও তাই—জানলার কাছে ছোট তক্তপোশে আর একটি বৌ শুয়ে জ্বরে এপাশ-ওপাশ করচে, তার পাশে দুটি ছোট ছোট ছেলে—জ্বরে ধুঁকচে তারাও। রান্নাঘরে একটি বৃদ্ধা কলাই-এর ডালে সম্বরা দিয়েচেন, তারই সুগন্ধ জ্বরাক্রান্ত বাড়ীর বাতাসে। পাশের বাড়ীর বৌটি চিঁচিঁ করে বলচে—একটু জল দিয়ে যাও পিসিমা।

বৃদ্ধা বলচে—একা মানুষ কতদিকে যাবো, ক'টা হাত পা? কাল গিয়েচে একাদশী, আর এই খাটুনি। একটু সবুর করো। গোরু দুটো সেই কোন্ সকালে বেঁধে দিয়ে এসেচি নদীর ধারের বাচ্‌ড়ায়, একটু জল দেখিয়ে আসবার সময় পাইনি এত বেলা হোল।

যতীন এসে ওর নতুন মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়ালো। একটু আগে ওর মা ওর কথা মনে করে কেঁদেচে জ্বরের ঘোরে। এই তো গত বর্ষায় ও মায়ের কোল ছেড়ে গিয়েচে, সে স্মৃতি ওর মায়ের মনে এখনও অতি স্পষ্ট। চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে বালিশের গায়ে। মাতৃহৃদয়ের নিঃশব্দ ব্যথার অভিব্যক্তি। যতীন বুঝলে, মায়ের এই চোখের জল, বুকের চাপা

কান্নাই তাকে আজ সপ্তস্বর্গের পার থেকে টেনে এনেচে এখানে। মাতৃশক্তির আকর্ষণ অদম্য, কেউ তাকে তুচ্ছ করতে পারে না, হোলই বা মাটির ঘরের দুঃখিনী মা। সব মা-ই তো দুঃখিনী।

পুষ্প বল্লে—যা ভাবচো তা নয় যতীনদা। মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেও না পৃথিবীকে, পৃথিবীর স্নেহ-ভালবাসাকে। তোমার সাধ্যি কি এই মাতৃশক্তিকে অবহেলা কর? নিজের নিজের জায়গায় কারো শক্তি কম নয়।

যতীন কৃত্রিম রাগের সুরে বল্লে—ওঃ, এখন যদি সেই সমাধিবাজ সন্নিসিটাকে পেতাম—বুঝিয়ে দিতাম তাকে—

—মহাপুরুষদের নামে অমন বোলো না, ছিঃ! তিনি যে ভূমিতে উঠে জগৎকে মায়া দেখেচেন, তোমার সে জ্ঞান কোথায়? যে অবস্থা যার, তাই তার কাছে সত্যি আর সহজ। তোমার কাছে এই সত্যি। বদ্ধ জীব তুমি।

—তাহোলেই পুষ্প, জগৎটা কি কতকটা ভেল্কির মত লাগচে না? বদ্ধ জীব বলে গালাগালি তো দিচ্চ—

—আবার তোমার বোঝবার ভুল। যাক্ ওসব বড় বড় কথা। তিনি যখন বোঝাবেন তখন বুঝো। এখন তোমার মায়ের সেবা করো—আমি যাই পাশের বাড়ীর বৌটির কাছে—জ্বরের ঘোরে বমি করচে ওই শোনো—আহা!

—তার ওপর বাড়ীতে তো দেখচি এক খাণ্ডার পিস্‌শাশুড়ী ছাড়া মুখে জল দেবার কেউ নেই—

যতীন বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। অতি দরিদ্রের ঘরকন্না, ময়লা কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর আর মাটির হাঁড়িকুঁড়ির গেরস্থালি। খানিক আগে পাশের ঘরের মেজেতে কে পান্তাভাত খেয়ে এঁটো থালা-বাসন ফেলে রেখেচে—একটা বেড়ালছানা থালার আশেপাশে ঘুরচে। হয়তো তার মা জ্বর আসবার আগে পান্তাভাত ক'টা খেয়ে থাকবেন, গরীবের ঘরে জ্বরের উপযুক্ত পথ্য জোটে নি। কেন তাকে পুষ্প নিয়ে গেল এখান থেকে? এই ঘরে মায়ের কোলটি জুড়ে সে বেশ থাকতো। তারপর একদিন সুখেদুঃখে বড়ো হয়ে উঠতো, ভাল চাকুরি করে এই দরিদ্রের ঘরণী মায়ের সেবা করতো। ভাঙা বাড়ী সারাতো, মাকে ভালো ভালো শাড়ী, কানের দুল, হাতের বালা চুড়ি কিনে দিতো, ম্যালেরিয়ার সময় এখান থেকে নিয়ে যেতো দেওঘর মধুপুরে। ওইখানে সজ্‌নেতলায় বড় রান্নাঘর তৈরি করে দিত, সানাই বাজনার মধ্যে একদিন বিয়ে করে বৌ এনে মায়ের বুকে সুখের ঢেউ তুলতো, নানা দিক দিয়ে মায়ের শত সাধ পূর্ণ করতো। আজ এই যে অসহায়া অশিক্ষিতা পল্লীবধূ জ্বরের ঘোরে তাকেই স্মরণ করে কিছুক্ষণ আগেও কেঁদেচে—কি অপূর্ব! স্নেহের অমৃতই ওর বুকে জমা রয়েচে তার জন্যে। এর জন্যে তার মন পিপাসিত—কি হোল তার স্বর্গে গিয়ে? স্বর্গ তো পালাচ্ছিল না?

এই সময় ডাকপিওন বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—মনিঅর্ডার আছে।

বাড়ীতে আর কেউ নেই, যতীনের মা ধড়মড় করে উঠে বল্লে—ও শৈল, শৈল—কোথায় গেলি ? মাগো, আমায় সবাই মিলে খেলে। কেউ যদি বাড়ী থাকবে—ও শৈল—

রোগিণীর আহ্বানে কোথা থেকে আট দশ বৎসরের একটি বালক ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—কি কাকীমা—কি হয়েচে ?

—আমার মাথামুণ্ডু হয়েচে। দুপুর বেলা বেরোয় কোথায় সব, বাড়ীতে কেউ নেই—মনিঅর্ডার এসেচে, নে পিওনের কাছ থেকে ; আমার এমন জ্বর এয়েচে যে মাথা তুলতে পারচিনে—শৈল কোথায় ?

—দিদি তাস খেলচে পাঁচুদের বাড়ী—

বালক মনিঅর্ডারের ফর্মখানা হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো। ওর কাকীমা বল্লে—ক'টাকা ?

বালক ঘাড় নেড়ে বল্লে—সে জানে না। বাইরে থেকে পিওন চেঁচিয়ে বল্লে—সাত টাকা মা ঠাকরুণ—সইটা করে দেন—

পিওন ফর্ম সই করিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল। বালক টাকা নিয়ে এসে রোগিণীর হাতে দিতে রোগিণী তিন চার বার গুনে গুনে বালিশের পাশে রেখে দিলে। যে ভাবে বৌটি আদরে যত্নে সতর্কতার সঙ্গে টাকা কয়টি বার বার গুনলে তাতেই যতীনের মনে হোল এই দরিদ্র সংসারে গৃহলক্ষ্মীর কাছে ওই সাতটি টাকা সাতটি মোহর। সে যদি বড় হয়ে মায়ের হাতে থলিভর্তি টাকা এনে দিতে পারতো! আজ সত্যিই তার মনে হোল, পুষ্প তাকে যতই টানুক, উচ্চ স্বর্গের উপযুক্ত নয় সে। মাটির পৃথিবী তাকে স্নেহময়ী মায়ের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় শত বন্ধনে, তার মনে অনুভূতি জাগায় এই সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশাহত অসহায় নরনারীর ব্যথা। তার এই মাকে একলা ফেলে, আশালতাকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে সে কোন্ স্বর্গে গিয়ে সুখ পাবে ?

যতীনের অদৃশ্য উপস্থিতি ও স্পর্শহীন স্পর্শ ওর মাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করে তুললে। পুষ্প এসে বল্লে—তোমার মাকে ছবি দেখাবো যতীনদা ? যেন এক অদৃশ্য দেবতা ওঁর ছেলের মত এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চে—মিষ্টি কথা বলচে—দেখাবো ?

—পাশের বাড়ীর বৌটি কেমন ?

—ঘুম পাড়িয়ে এলুম। মাথা ধরেছিল, সারিয়ে দিয়ে এলুম।

—ওর খাণ্ডার পিস্‌শাশুড়ী কি করচে ? বুড়িটা ?

পুষ্প হেসে বল্লে—পিস্‌শাশুড়ীর অত দোষ দিও না। বৌটির চরিত্র ভাল না।

যতীনের মনে পড়লো আশালতার কথা—সে একটু তিক্তস্বরে বল্লে—মেয়েমানুষ কিনা, তাই অপর মেয়েমানুষের চরিত্রের দিকটাতে আগে নজর পড়ে। কই আমাদের তো পড়ে না ? দেখেই বুঝে ফেল্লে ?

পুষ্প বল্লে—তা নয়, ওর মনে সব কথা লেখা রয়েচে আমি পড়ে এলুম। ও চিন্তা করচে ওর একজন প্রণয়ীকে, নাম তার হরিপদ, এই দুপুরে নদীর ঘাটে গিয়ে তার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা

করার কথা ছিল, জ্বর এসেচে ঠেসে দুপুরের আগেই।

—যেতে পারেননি বলে ভাবচেন বুঝি ? আহা !

—হঠাৎ অত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলে যে ওর ওপর ? এত দরদই বা এল কোথা থেকে ? জানো, যতীনদা—আমার একটা ব্যাপার হয়েচে আজকাল, লোকের কাছে কিছুক্ষণ বসলে বা থাকলে আমি তার মনের চিন্তা সব বুঝতে পারি। ও বৌটির পাশে গিয়ে বসে দেখি ও শুধু কে হরিপদ, তার কথাই ভাবচে। যাক্ গে, তোমার মা কেমন ?

—এখন একটু ভালো। মায়ের মনিঅর্ডার এসেচে সাত টাকা কোথা থেকে। দেখতে যদি মায়ের আনন্দ ! পুষ্প, কেন আমাকে নিয়ে গেলে ? এ দরিদ্র সংসারের উপকার করতে পারতাম বেঁচে থাকলে। আমি হয়তো চাকরি করে—

—আমি নিয়ে যাই সাধ্যি কি আমার ? যিনি দীনদুনিয়ার মালিক তাঁর ইচ্ছে না থাকলে—

—তুমি কি দীনদুনিয়ার মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করেছিলে পুষ্প ?

এই সময় যতীনের মা বিছানা থেকে উঠে বাইরের রোয়াকে রোদ্দুরে গিয়ে বসলেন। ম্যালেরিয়া-রোগীর ভাল লাগে রোদ্দুরে বসতে। দুটি প্রতিবেশিনী এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো যতীনের মায়ের সঙ্গে। একজন বলচে—জ্বরটা কখন এল আজ বৌ ?

—দুটো ভাত খেয়ে উঠেচি, থালা তুলিনি—অমনি সে কি ভূতোনন্দি জ্বর। কিন্তু এখন যেন ভালো মনে হচ্চে। হঠাৎ জ্বরটা আজ যেন কমে গেল।

—হ্যাঁরে, আজ নাকি টাকা এসেচে তোর ? ক'টাকা এল ?

—হ্যাঁ দিদি, সাত টাকা।

—বাঁচা গেল ! ক'দিন তো একরকম না খেয়ে ছিলি। বট্ঠাকুর টাকা পাঠাতে অত দেরি করেন কেন ? সামনে পুজো—অত দেরি করেই যখন পাঠালেন তখন আরও কিছু—

—কোথায় পাবে দিদি যে পাঠাবে। এই তো সেদিন বাড়ী থেকে গেল। পনেরো টাকা তো মোটে মাইনে—মনিব যে উনুপাঁজুরে লোক, দু-এক টাকা আগাম চাইলে তা দেবে না। ওরও তো শরীর ভাল না, সবই জানো। সেবার সেই বড় অসুখের পরে আর শরীর ভাল সারলো না। ওই মানুষকে একা পাঠিয়ে যে কত অশান্তিতে ঘরে থাকি—তার উপর আমার খোকা যাওয়ার পর উনি একেবারে—

যতীনের মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনার কথা বলতে লাগলো। একজন বল্লে—যাও বৌ, রোদ্দুরে বোসো না, বমি হবে। ঘরে শোওগে। কি করবে বলো, সবই অদেষ্ট।

যতীনের মা চোখের জলে ভেজা সুরে বল্লেন—তোমরা আশীর্বাদ করো দিদি, উনি ভালো থাকুন। ওই সাত টাকাই আমার সাত মোহর। পুজোর সময় আসতে পারবেন না বলে লিখেচেন কুপনে—সেই কি কম কষ্ট আমার। পোড়ারমুখো মনিব মহালে পাঠাবে খাজনা আদায় করতে—ছুটি পাবেন না—

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—আমি বলচি তিনি বাড়ী আসবেন, আসবেন!

যতীন অবাক হয়ে পুষ্পের দিকে চেয়ে রইল। পুষ্পের মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতি ফুটে উঠেছে, ওর কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণীর মত শক্তিমান্ ও অমোঘ।···

কথা শেষ করে যখন পুষ্প ওর দিকে চাইলে তখন পুষ্পের চোখে জল।

যতীন বল্লে—কি হোল তোমার, পুষ্প?

পুষ্প তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। বল্লে—সতীলক্ষ্মী উনি—জয় হোক ওঁর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করো মাকে।

তারপর দুজনে আরও অনেকক্ষণ সেখানে রইল। যতীনের মায়ের জ্বর ছেড়ে যায় নি, তিনি আবার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে তিনি জ্বর কমবার সঙ্গে সঙ্গে নির্জীবভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যতীন বল্লে— ভালো কথা, মাকে এবার সেই ছবিটি দেখাও না? যেন এক দেববালক ওঁর মাথার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চে—এই অবস্থার স্বপ্ন বেশ স্পষ্ট হবে।

পুষ্প বল্লে—না। কি জানো যতীনদা, ভেবে দেখেচি তারপর। ওসব ছবি যে দেখে সে সংসার করতে পারে না। মন চঞ্চল হয়ে যায়। পৃথিবীর মন একরকম, ভূবর্লোকের মন আলাদা। এর সঙ্গে ওকে জড়াতে নেই। ওসব দর্শন হয় তাদের, যারা আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করবে। সংসারী লোকদের অমন ছবি দেখাতে নেই। আমি দেখাতে পারি, তোমার মা জেগে উঠে কাঁদবেন, উদাস হয়ে থাকবেন দিনকতক, সংসারের কিছু ভাল লাগবে না। প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে মন দিতে পারবেন না। কি দরকার সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নয়তো মাকে একবার ঘুমের মধ্যে ভূবর্লোকে নিয়ে যাই না কেন? বেড়িয়ে দেখে আসুন।

—উনি এখনও তার উপযুক্ত হন নি। কিছু বুঝতে পারবেন না, হয়তো ওঁর সূক্ষ্ম শরীর অজ্ঞান হয়ে পড়বে সেখানে। সব এক গাঁজাগুবী স্বপ্ন বলে ভাববেন। বৃথা পরিশ্রম। চলো যাই, বেলা গেল।

নিকটেই এক ঝোপে তিৎপল্লার হলুদ ফুলে রঙীন প্রজাপতির ঝাঁক উড়তে দেখে ওরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লে—কি সুন্দর, না? শুঁয়োপোকা থেকে কেমন চমৎকার রঙীন জীব তৈরি হয়েচে ছাখো। শুঁয়োপোকা মরে যায়, গুটি কেটে প্রজাপতি উড়ে বেরোয়! মাটিতে কত আস্তে চলে শুঁয়োপোকা—আর কেমন ছাখো প্রজাপতি নীল আকাশের তলায় ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্চে। শুঁয়োপোকা কল্পনা করতে পারে মরবার পরে সে প্রজাপতি হবে?

যতীন হেসে বল্লে—মানুষ কল্পনা করতে পারে মৃত্যুর পর সে বিশ্বের নীল আকাশের তলায় বিদ্যুদ্গতিতে উড়ে বেড়াতে পারবে? শুঁয়োপোকার মন অন্ধ, মানুষও তেমনি অন্ধ।

প্রদোষালোকে ম্রিয়মাণ ধরণী গতির বেগে ওদের পায়ের নীচে কোথায় অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল! সেই ধরণীর এক প্রান্তে যতীনের দরিদ্রা জননী গভীর ঘুমে অচেতন রইলেন, জানতেও পারলেন না তাঁর ভাঙা ঘরে এ অদ্ভুত আত্মিক আবির্ভাবের রহস্য।

সেদিন পুষ্পই প্রথম তাঁকে দেখলে। সেদিন ওরা বুড়োশিবতলার ঘাটে ফিরে আসছিল পৃথিবী থেকে—ফেরবার পথে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর বসেচে—হঠাৎ আকাশে বিদ্যুৎ-লেখার মত উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে পুষ্প বল্লে—গ্যাখো গ্যাখো—কোন্ দেবতা আসচেন! যতীনও দেখতে পেলে। একটা বিশাল উল্কা যেন আগুনের অক্ষরে শূন্যের গায়ে তার বার্তা ঘোষণা করচে।...

চক্ষের পলকে সেই পথিক দেবতা কায়া ধারণ করে ওদের সামনে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প ও যতীন উভয়েই চিনলে—যে দেবতা একবার মহাশূন্যে পথ হারিয়ে ওদের কুটির-প্রাঙ্গণে বিভ্রান্ত অবস্থায় এসে পড়েছিলেন, সেই ভ্রাম্যমাণ আবিষ্কারক দেবতা।

দেবতা বল্লেন—তোমাদের কথা স্মরণে রেখেচি। আবার দেখা করবো বলেছিলাম, মনে আছে কন্যা?

পুষ্প ও যতীন দেবতার পাদবন্দনা করলে। পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি ভ্রমণের গল্প করুন।

যতীন বল্লে—একটা কথা, দেব। আমাদের পৃথিবীর পণ্ডিতরা অনুমান করচেন আমাদের এই সৌর-জগতের বাইরে অন্য কোনো নক্ষত্রে কোনো গ্রহ নেই। একথা কি সত্য?

দেবতা হেসে বল্লেন—ভুল কথা। বিশ্বের এই অঞ্চলেই বিভিন্ন নক্ষত্রে লক্ষ লক্ষ গ্রহ বর্তমান। বহু শ্রেণীর জীব তাতে বাস করচে। তোমাদের পৃথিবী যতটুকু এর চেয়ে অনেক বৃহত্তর ও সুন্দরতর গ্রহ বিশ্বের এই অঞ্চলে বহু নক্ষত্রে বর্তমান।

যতীন বল্লে—দেব, বিশ্বের এই অঞ্চল বলে আপনি কতটুকু জিনিসের কথা বলচেন?

—বিদ্যুতের বেগে যদি যাও, তবে এক কোটি বৎসর লাগবে তোমাদের এই নক্ষত্রমণ্ডল পার হতে। এ রকম লক্ষ লক্ষ নাক্ষত্রিক বিশ্ব ছড়ানো রয়েচে চারিধারে। আমি বিশ্বের এ অঞ্চল বলতে তোমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী অঞ্চলের কথা বলচি।

পুষ্প বল্লে—আমাদের একবার নিয়ে যাবেন বলেছিলেন ওই সব দূর দেশে?

—চক্ষু মুদ্রিত কর। গতির প্রচণ্ড তেজ তোমরা সহ্য করতে অভ্যস্ত নও—জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দুজনেই চক্ষু মুদ্রিত করো—প্রস্তুত হও—মধ্যপথের অন্য কোনো নক্ষত্র বা গ্রহলোক তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না।

গতির কোনো অনুভূতিই ওদের হোল না, চক্ষের পলক ফেলতে যত বিলম্ব হয়, ততটুকুও বোধ হয়নি—পথিক দেবতা বল্লেন—চোখ চেয়ে দেখতে পারো—

পুষ্প ও যতীন সম্মুখের দৃশ্য দেখে চমকে উঠলো। তারা এ কোথায় এসেচে—এক বিরাট অগ্নিমণ্ডল তাদের সামনে—সে অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে বহুলক্ষ বিশালকায় কটাহে যেন লক্ষ কোটি মণ ধাতু বিগলিত হচ্চে একসঙ্গে—লক্ষ লক্ষ মাইল উর্ধ্বে উঠচে রক্তবর্ণ স্বয়ম্প্রভ বাষ্পশিখা—রক্ত-আগুনের শিখার মত। বাল্যকালে জলস্তম্ভের ছবি দেখেছিল যতীন পৃথিবীর পাঠশালার কোনো পুস্তকে—এখন ওর চোখের সামনে ধারণার অতীত বিশালকায় অগ্নি ও প্রজ্বলন্ত বাষ্পের খাড়া সোজা উঁচু স্তম্ভ চক্ষের নিমেষে উঠে যাচ্চে যেন দশ হাজার মাইল, যেদিকে চাওয়া যায়

দাউ দাউ করচে শুধু আগুন—অথচ পৃথিবীর আগুনের মত নয় ঠিক—জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হয়তো। অগ্নিমণ্ডলের চারিদিকে শুভ্র- ও রক্ত-আগুনের ছটা—গ্রহণ যোগে দৃশ্যমান সূর্যের চারিপাশে দৃষ্ট সৌরকিরীটের (corona) মত। কোন্ রুদ্র ভৈরবের প্রচণ্ড আবির্ভাব এ! এখানে না আছে নারী, না আছে শিশু, না আছে বনকুসুমের শোভা, না আছে জীবের জীবনস্বরূপ বারি। কিন্তু এই রুদ্রের বামমুখ প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ ঘটে না কারো—এ ভয়ঙ্কর মূর্তিকে দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা যেমন থর থর কেঁপে উঠলো ওদের, তেমনি ওদের মনে হোল, এই অদ্ভুত ভয়ঙ্করের আবির্ভাবের ও অস্তিত্বের সামনে তাদের সকল ক্ষুদ্রত্ব ও সংকীর্ণতা এখানকার বাষ্পমণ্ডলের কটাহে বিগলিত বহু লৌহ, তাম্র, নিকেল, এলুমিনিয়ম, কোবাল্ট, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্যের মতই দ্রবীভূত হয়ে নয় শুধু, বাষ্পীভূত হয়ে যায়—যেমন যাচ্চে ঐ সব ধাতু নিমেষে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

দেবতা বল্লেন—এ একটা নক্ষত্র। কিন্তু কামচারী বা বিদ্যুৎচারী না হোলে তোমরা এর বিরাটত্ব কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমাদের জড়জগতের অবস্থানকালের কোনো মাপকাঠি ব্যবহার করে এ নক্ষত্রের সীমা পাবে না। চেষ্টা করো—চলো—

পুষ্প ও যতীন যে বেগে যেতে ইচ্ছা করলে, তাকে পৃথিবীতে রেলগাড়ীর বেগ বলা যেতে পারে। দেবতা গতির বেগ কমিয়ে ওদের সঙ্গে চলেছেন। ওরা সবেগে যেন উড়ে চলেচে একটা অগ্নির মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে ও একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখার মধ্যে দিয়ে—ওদের চারিপাশে ঘিরে অগ্নি-দেবতার রক্ত-চক্ষু। বহুক্ষণ ওরা গেল, পৃথিবীর হিসেবে দশ বারো ঘণ্টা। ওদেরও ক্লান্তি নেই, যাত্রাপথেরও শেষ নেই—মহা অগ্নিসমুদ্রেরও কূলকিনারা নেই।

দেবতা বল্লেন—তোমরা যদি জড়বস্তুর উপাদানে তৈরি হতে এই জ্বলন্ত নক্ষত্রের বহুদূর থেকে তোমাদের দেহ জ্বলে পুড়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো· আকর্ষণের বলে সে বাষ্পটুকু এই বৃহত্তর বাষ্পমণ্ডলে প্রজ্বলন্ত অবস্থায় প্রবেশ করে মিশিয়ে যেতো···

পুষ্প বল্লে—আর সহ্য করতে পারবো না—আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলুন দেব দয়া করে।

দেবতা প্রসন্ন হেসে বল্লেন—বিশাল বিশ্বের রূপ সবাই সহ্য করতে পারে না, দেখতে চায়ও না। শক্তিমতী হও। ভগবান তাকেই এসব দেখান, যে তাঁর বিশ্বের বিরাটত্ব দেখে ভয় পাবে না। আমি সুদীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তর ধরে এ সাধনা করেছিলাম—তারপর জড়জগৎ থেকে এসে বহুকাল ধরে শুধু বিশ্বভ্রমণ করে বেড়াচ্চি। এই আমার সাধনা—এতে আমি সিদ্ধিলাভ করেচি। কিন্তু আমিই দিশাহারা হয়ে যাই সময় সময়। তোমরা কী দেখেচ, এক কণিকাও নয়।

পুষ্প বল্লে—আর কী দেখাবেন বলুন দেব, এ আগুনের দৃশ্য আমার আর সহ্য হচ্চে না—

—তোমাকে এর চেয়েও বৃহত্তর নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডলে নিয়ে যাবো চলো। শক্তিমতী হও। এবার চোখ চেয়ে চলো। তোমাকে চোখ তখন মুদ্রিত করতে বলেছিলাম কেন জানো? তোমাদের জড়জগতের অতি নিম্ন স্তর অতিক্রম করতে হবে আসবার পথে। সে অতি কুশ্রী স্তর। তোমরা দেখলে ভয় পেতে—তাই দেখাই নি।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নরক? সে দেখতে বড় ইচ্ছে, দেব! দয়া করে—

দেবতা গম্ভীর স্বরে বল্লেন—প্রত্যেক জড়জগতের অমনি নিম্নতর আত্মিক স্তর আছে। জড়জগতের অপুষ্ট আত্মা ওখানে আসে। পৃথিবীর নরক তবুও ভালো, কারণ গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর জীবদের আধ্যাত্মিক প্রগতি অনেক বেশি। তোমাদের দেখে তা মনে হচ্চে। এমন গ্রহ তোমাদের দেখাতে পারি যেখানকার জীবের চৈতন্য নিম্ন স্তরের। তোমাদের পৃথিবীতে তেমন শ্রেণীর জীব নেই।

ওরা অনন্ত ব্যোমের যে অংশ দিয়ে যাচ্ছিল, যতীন তার চারিদিকে চেয়ে কোনো পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে পেলে না—সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, ধ্রুবনক্ষত্র, এমন কি বৃশ্চিক পর্যন্ত না! অসীম বিশ্বের কোন্ সুন্দর অংশে তারা এসে পড়েচে যেখান থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বা বৃশ্চিক কিংবা ক্যাসিওপিয়া দেখা যায় না। প্রশ্নটা সে পথপ্রদর্শক দেবতাকে করলে।

দেবতা হেসে বল্লেন—আমি তোমাদের ওসব নক্ষত্র চিনি না। তোমাদের জড়জগৎ থেকে চিরকাল দেখে আসচো বলে ওগুলো পৃথিবীর জীবের কাছে সুপরিচিত। বিশ্বের পথিক আমি, আমার কাছে ও-রকম লক্ষকোটি ধ্রুব আর সপ্তর্ষি অগণ্য জ্যোতির্লোকের ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েচে।

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল আকাশের ওপরদিকে বকের পালকের মত বহুদূরব্যাপী রঙীন মেঘরাশি এক জায়গায় স্থির ছবির মত দৃশ্যমান।

পুষ্প কৌতূহলী হয়ে বল্লে—ওই মেঘের মত কী ওগুলো দেব?

—আমি জানি কিন্তু কখনো দেখিনি। ওগুলো বহু উচ্চ স্তরের জীবলোক।

—জড়দেহধারী জীব?

—না। তোমরা যাকে বলবে আত্মিক লোক—

—অনেক উঁচু স্তরের আত্মা?

—খুব উঁচু।

যতীন ওদের কথা শুনছিল—সাগ্রহে বল্লে, একটা প্রশ্ন করবো যদি কিছু মনে না করেন স্যার—আই মিন্—মানে, দেব।

পুষ্প ভ্রূকুটি করে বল্লে—তোমার এখনও পৃথিবীর সংস্কার গেল না যতীনদা?

দেবতা ওদের মনোবৃত্তি অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারেন না; রাগ, অশ্রদ্ধা, হিংসা প্রভৃতি মনোভাবের বহু ঊর্ধ্বে তাঁরা। তিনি অনেক পরিমাণে সরল বালকের মত। পুষ্প লক্ষ্য করচে—করুণাদেবীও অনেক সময় বারো বৎসরের পার্থিব বালিকার মত কথা বলেন, ব্যবহার করেন। উচ্চতর দেবচরিত্রের এদিকটা আজকাল বেশি করে ওদের দুজনেরই চোখে পড়চে।

যতীন আরও বিনয়ের সঙ্গে বল্লে—একটা প্রশ্ন ছিল—আপনি ওখানে যান নি কেন?

দেবতা বল্লেন—এর উত্তর খুব সোজা। ওসব লোক আমার নিকট অদৃশ্য।

পুষ্প ও যতীন দুজনেই বিস্ময়ে স্তব্ধ। পুষ্প বল্লে—আপনার কাছেও অদৃশ্য? দেব, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এইবার সামনে বহুদূর থেকে ওরা দেখতে পেলে সারা আকাশ জুড়ে একটা বিশাল অগ্নিক্ষেত্র

ওদের দিকে যেন ছুটে আসচে। ঘোর শুভ্রবর্ণ মহাপ্রজ্জলন্ত বাষ্পপরিবেশ, মাঝে মাঝে তা থেকে সহস্র যোজনব্যাপী বাষ্পাগ্নি বহু উর্ধ্বে উঠে মহারুদ্রের মত সর্বধ্বংসকারী প্রলয়ের হুঙ্কার ছাড়চে। সে দৃশ্য দেখে পুষ্পের চেতনা লোপ পাবার মত হোল।

যতীন সেই কালাগ্নির ভৈরব দৃশ্যের দিকে পেছন ফিরে বল্লে—ভীষণ ব্যাপার, আমাদের পক্ষে এ দৃশ্য না দেখাই ভালো। ভয় করে প্রভু।

দেবতা হেসে বল্লেন—শুধু বিশ্বদেবের মোহনমূর্তিই দেখবে, তাঁর করাল, রুদ্র রূপ দেখলে ভয় পাবে কেন? ধ্বংসদেবের বিষাণ-ধ্বনি শোনাবো তোমাদের। আত্মার দুর্বলতা দূর কর।

—কিন্তু আপনার শিষ্যা যে অচেতন হয়ে পড়েচে! ও মেয়েমানুষ, ওকে ও রূপ আর নাই বা দেখালেন প্রভু?

সেই বিরাট কালাগ্নিবেষ্টিত মহাদেশ তখন ওদের অদূরে। যতীনের দেখে মনে হোল একটা প্রজ্জলন্ত বিশ্বপৃথিবী তার সামনে। অল্প পরেই দেবতার অদ্ভুত শক্তিবলে ওরা দুজনেই সেই বিরাট অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদের চারিধারে শুধু শুভ্র জলন্ত হিলিয়াম ও ক্যালসিয়াম বাষ্পরাশি মহাবেগে ঘূর্ণ্যমান, কোথাও রাঙা শিখা নেই—শুধুই শ্বেতশুভ্র—আবার বহুদূর অগ্নিময় দিগন্তে লকলকে রাঙা হাইড্রোজেনশিখা অজগরের মত ফুঁসে গর্জে তেড়ে উঠচে চক্ষের পলকে লক্ষ লক্ষ মাইল। ধ্বংসদেবের বিষাণ-ধ্বনির মত ভৈরব হুঙ্কার সে কালাগ্নিমণ্ডলের চারিদিক থেকে একসঙ্গে অনবরত শোনা যাচ্চে। একটা গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন দাউ দাউ করে জলচে! অতি ভীষণ, রৌদ্ররূপ প্রকৃতির।

ভয়ে, বিস্ময়ে যতীন আড়ষ্ট হয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। রৌরব নরকের বর্ণনা সে কিসে যেন পড়েছিল তার পৃথিবীর বাল্যজীবনে। এই কি সেই রৌরব নরক? কোন্ দেবতার তাণ্ডবনৃত্যের পদচিহ্ন এর প্রতি অগ্নিশিখাটির গায়ে আঁকা, উদ্ধত ও ভয়াবহ মৃত্যুদহন এর কালাগ্নিপরিবেশের প্রতি অণু প্রতি পরমাণুর মর্মস্থলে?

দেবতা বল্লেন—ভয় পেয়ো না। এই থেকেই সৃষ্টি। দাঁড়িয়ে দেখ।

শুধু অন্ধবেগে ধাবমান অণুপরমাণুপুঞ্জের সংঘর্ষে উৎপন্ন এই বিশাল অগ্নিময় মহাদেশ যেন চারিদিক থেকে ওদের ঘিরেচে—এর শেষ কোথায়? অতি নীলাভ শুভ্র অগ্নিগর্ভ বাষ্পপুঞ্জ, উর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে—ভীমবেগে সঞ্চরণশীল, আলোড়নে ও আক্ষেপে উন্মাদ সে বহ্নিমান ব্রহ্মাণ্ড ধরার মানুষ সহ্য করতে পারে না। যতীন অনুভব করলে সেও উন্মাদ হয়ে যাবে এ দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখলে। মনে পড়লো গ্রহদেবের সেদিনকার কথা, সেই অদ্ভুত সত্য কথা—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জলন্তি—পৃথিবীর প্রাচীন দিনের জ্ঞানীরা যে বাণী উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন তপস্যা দ্বারা সত্যকে অনুভব করে।

হঠাৎ পথিক দেবতা যেন ভাবাবেগে সমাধিস্থ হয়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্যে। সুন্দর চক্ষুদুটি মুদ্রিত করে সেই অগ্নিশিখার মধ্যে তিনি স্থির প্রশান্ত বদনে দাঁড়িয়ে আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন—হে অনল, হে সর্বেশ্বর, হে পরাবরস্বরূপ, কারণে তুমি বর্তমান, কার্যেও তুমি বর্তমান, তুমিই ধন্য—ধ্বংসের মধ্যে তোমার সৃষ্টি সার্থক হোক। জয় হোক

তোমার!

ওদের দিকে ফিরে বল্লেন—চলো। কন্যা এখনও অচেতন? এই নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডল ছাড়িয়ে গেলেই জ্ঞান ফিরে পাবে।

যতীন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে ছিল দেবতার সেই ধ্যানপ্রশান্ত গম্ভীর রূপের দিকে। অদ্ভুত এ মূর্তি। সাক্ষাৎ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী জ্যোতির্ময় নারায়ণ যেন তার সম্মুখে। সে মুখে অনায়াস করুণা ও গভীর মৈত্রীর চিহ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের জরামরণচক্রে বদ্ধ জীবকুলকে যেন অভয় দান করচে। কে বলেছিল এঁকে নাস্তিক?

দেবতা বল্লেন—জানো, প্রত্যেক গ্রহ বা নক্ষত্র, প্রত্যেক জড় বা বাষ্পপিণ্ড যা আকাশে ছড়ানো আছে—তোমাদের সূর্য নামক সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রও এর মধ্যে—প্রত্যেকটি এক এক চুম্বক। এরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করচে। সমস্ত ব্যোম ব্যেপে এই বিরাট চৌম্বক ক্ষেত্রে—কোনো জড়দেহধারী জীবের সাধ্য নেই এই বিশাল চৌম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণশক্তিকে জয় করে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়।

যতীন বল্লে—দেব, আমাদের সূর্যও বড় চুম্বক? পৃথিবীও?

—তোমাদের পৃথিবীও। সূর্য তো বটেই। প্রত্যেক নক্ষত্রও।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা বহুদূর চলে এল নক্ষত্রটা থেকে—ওদের মাথার ওপরে বহুদূরে সেটি একটি বিশাল বহ্নিগোলকের মত জ্বলচে তখনও।

হঠাৎ যতীনের মনে পড়লো সেই পূর্বের কথাটি।

সে বল্লে—দেব, আপনি তখন বলেছিলেন ওই সব মেঘের মত দেখা যাচ্চে যা, ওগুলো আপনার কাছেও অদৃশ্য জীবলোক?

দেবতা বল্লেন—জীবলোক বলিনি—স্থূলদেহধারী জীব নেই ওতে। আত্মিকলোক বলেচি।

পুষ্পের এবার জ্ঞান হয়েচে। সে বিস্ময়ের সঙ্গে ওদের দিকে চেয়ে চোখ খুলে বল্লে—এ কোথায় চলেচি?

যতীন হেসে বল্লে—তার চেয়ে কোথা থেকে আসচি বল্লে প্রশ্নটা সুষ্ঠু হোতো। আমরা আসচি বহুদূরের নক্ষত্রলোক দেখে।

—আমি কোথায় ছিলাম?

—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

পুষ্পের এবার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে বল্লে—মনে পড়েচে এবার। দূর থেকে যা দেখেচি, তাই যথেষ্ট। উনি দেবতা—তা বলে আমরা সামান্য মানুষ—ও সহ্য করতে পারা কি—

যতীন প্রতিবাদ করে বল্লে—আমরা এখনও সামান্য মানুষ? এতকাল স্থূলদেহ ছেড়ে এসে এখনও সামান্য মানুষ?

পথিক দেবতা হেসে বল্লেন—তোমার পূর্ব প্রশ্নের উত্তর আর এ প্রশ্নের উত্তর একসঙ্গেই দিচ্চি শোনো। ওই যে সব মেঘের মত দেখা যাচ্চে বহুদূরে, ওগুলো বহু উচ্চ স্তরের আত্মিক

লোক। ওতে যাঁরা বাস করেন তাঁরা এবং তাঁদের বাসভূমি দুই-ই আমার কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। অথচ আমি কতকাল ধরে শুধু ভ্রমণ করেই বেড়াচ্চি—কত যুগ যুগ এসেচি আত্মিক লোকে—আর তোমরা দুদিন এসেই—

যতীন বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেল। এই মহান্ দেবতা—ইনিও ছোট? তাহোলে তারা কোথায় আছে? কীটস্য কীট—তাই বুঝি অত অহংকার? কিন্তু কি বিশাল, অনন্ত সময় এ ব্রহ্মাণ্ড—কত অসংখ্য জীবলোক, আত্মিক লোক, অনাদি, অনন্ত সময় ব্যেপে কি অনন্ত বিবর্তন! তাদের সবারই ওপর সেই বিশ্বনিয়ন্তা। সত্যিই ভগবানের নাগাল কে পাবে? তিনি কোথায় আর তারা কোথায়!

যতীন বল্লে—আপনি শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন, দেব?

—কেন বলো তো?

—আজ আপনাকে যে চোখে দেখলাম—অনুগ্রহ করে কিছু মনে করবেন না স্যার—মানে —মানে—

পুষ্পের ভ্রূকুটি ওকে নির্বাক করে দিলে।

দেবতা নিজেই বোধ হয় ওর মন বুঝে জবাব দিলেন।

—এই ভ্রমণই আমার উপাসনা। কত সৌন্দর্য দেখেচি, কত ভয়ানক রূপ দেখেচি তাঁর —যেমন তোমরা আজ দেখলে। এও কিছু নয়—এর চেয়ে অতি ভীষণ রূপ আছে সৃষ্টির। সে সব সহ্য করতে পারবে না তোমরা। আমি এর মধ্যেই তাঁকে দেখি।

যতীনের চেয়ে পুষ্পের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বেশি, সে বল্লে—প্রভু, আপনি তাঁকে দেখেচেন?

ওরা একটা অপরিচিত গ্রহের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আকাশপথ থেকে তার বিচিত্র ধরনের গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সব দেখা যাচ্ছিল। গ্রহে তখন রাত্রি গভীর। লোকালয় বড় কম তাতে, কেবলই ভীষণ অরণ্যানীসমাচ্ছন্ন শৈলমালা ও উপত্যকা। ওর একটা সাথী উপগ্রহ থেকে নীল জ্যোৎস্না পড়ে সে সব এমন একটা সৌন্দর্যে ভূষিত করেচে—পৃথিবীতে কেন, এ পর্যন্ত স্বর্গলোকেও সে রকমটা দেখেনি ওরা। অপার্থিব তো বটেই, অদৈবও বটে। বনে বনে নীল জ্যোৎস্না—মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা সে গ্রহের গভীর রাত্রির নীলজ্যোৎস্নাস্নাত গভীর উত্তুঙ্গ শৈলারণ্যের রূপে।

দেবতা বল্লেন—কি দেখচো? এ একটা জীবজগৎ। খুব উঁচু স্তরের জীব এতে বাস করে। চলো, এর বনের মধ্যে বসি। তোমাদের পরিচিত স্থূল জগৎ থেকে বহু জন্মের পর যখন লোকের মন তাঁর দিকে যায়, তখন তারা এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। শুধু তোমাদের পৃথিবী থেকে নয় —ওই ধরনের আরও অনেক নিম্ন স্তরের স্থূল জগৎ থেকে। আত্মার সেই বিশেষ অবস্থা না হোলে এই সব গ্রহে আসা চলে না। এখানে কর্মবন্ধন কম। ভগবানে যারা আত্মসমর্পণ করেচে, তাদের মন বুঝে অন্তর্যামী বিশ্ব-দেবতা এখানে—এবং আরও এর মত বহু গ্রহ আছে, সেই সব লোকে—জন্মগ্রহণ নির্দেশ করেন। দেখচো না এখানে জীবের বসতি কম। ভিড় নেই। জীবনের যুদ্ধ সরল ও সহজ। সব রকম ভ্রম, কুসংস্কার, অজ্ঞানতার বাঁধন যারা

কাটিয়েচে, তারাই এখানে আসে শেষ জন্মের জন্যে। আর স্থূল শরীর গ্রহণ করতে হয় না তাদের এখানকার মৃত্যুর পর।

—তাহোলে পৃথিবীর লোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ ক'রে শুধু যে পৃথিবীতেই ফিরে আসবে তা নয়?

—পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় কম—তবুও আমি জানি, কোনো জীবাত্মা পুনর্জন্মের সময় সে যে-স্থূলজগৎ থেকে এসেছিল, সেখানেই জন্মাবে—তার কি মানে আছে! অবস্থা অনুসারে জীবের গতাগতি নির্দিষ্ট হয়। যেখানে পাঠালে যে উন্নতি করতে পারবে, তাকে সেখানেই পাঠানো হয়। অনন্ত উন্নতিতে জীবাত্মার অধিকার তিনিই দিয়েচেন, যিনি এই বিশ্ব রচনা করেচেন। কে বুঝবে তাঁর করুণা ও মৈত্রী! খুব উচ্চ অবস্থার আত্মা না হোলে বোঝা যায় না।

ছায়াশীতল শিলাতট ঘন বনশ্রেণীতে ঘেরা। ওরা এসে সেখানে বসেচে। যতীন আর পুষ্প চেয়ে চেয়ে দেখলে এসব গাছপালা তাদের চেনা নেই, পৃথিবীতে এত বড়, এত অদ্ভুত চমৎকার তরুশ্রেণীর সমাবেশ কোথায়? উগ্র লোভ এখানকার বন নষ্ট করেনি, ব্যবসাতে টাকা উপার্জনের জন্যে। বনকুসুমের সুগন্ধ, ঝর্ণার কলধ্বনি, পক্ষী-কূজন, অব্যাহত শান্তি ও পবিত্রতা—সব মিলিয়ে জায়গাটা যেন তপোবনের মত মনে হচ্চে। উনি যা বলচেন সে হিসেবে দেখলে সমগ্র গ্রহটাই তাহোলে একটা সুবিশাল তপোবন। পুষ্প সময় বুঝে আগের প্রশ্নটি এখানে আবার করলে। বল্লে—আপনি তাঁকে দেখেচেন প্রভু?

পথিক দেবতার মুখ সহসা সম্ভ্রমে ও ভক্তিতে কোমল হয়ে এল। তিনি বালকের মত সরল স্বরে বল্লেন—না।

—আপনিও দেখেন নি তাঁকে!

পুষ্পের স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠেচে।

—আমি তাঁর রূপ দেখেচি তাঁর বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে। তাঁকে চোখে দেখা যায় আমি জানি। কিন্তু আমি তপস্যা করিনি তাঁকে সে ভাবে পেতে। আমি ভবঘুরে, তাঁকে দেখে বেড়াতে চাই তাঁরই সৃষ্ট লোক-লোকান্তরে। ভ্রাম্যমাণ আত্মা হয়েই আমার আনন্দ। তাই অনেকে আমাকে নাস্তিক বলে।

যতীনের হঠাৎ মনে পড়লো করুণাদেবীর কথা। তিনিও তাই বলেছিলেন।

পুষ্প বল্লে—প্রভু, এই গ্রহে স্ত্রীলোক আছে?

—কেন থাকবে না? নারী বিশ্বে শক্তির অংশ। এসো—দেখবে। গ্রহে এ অংশটাতে রাত্রি। অন্য অংশে দিনমান—এদের ঘর সংসার দেখাবো—খুব শান্ত জীবন-যাত্রা এদের। বহু প্রবৃত্তি ও বাসনার সঙ্গে, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে অভিজ্ঞ হয়ে এ জন্মে পূর্ব-জন্মের জ্ঞান ও সংযমের প্রভাবে এরা সমাহিত ও আত্মস্থ হয়েচে।

—এদের সমাজ কেমন? ইচ্ছে করে প্রভু—জানি—

—এই গ্রহের কথা আমি ঠিক জানি না—তবে বিশ্বের এই অঞ্চলে এ রকম বহু আছে।

সব উচ্চ স্তরের জীবজগৎ। জীবে জীবে যুদ্ধ রক্তপাত নেই এই সব গ্রহে। অত্যন্ত পরার্থপর এখানকার মানুষ। পরের জন্যে প্রাণ দেবে। অনেক জাতি নেই, ভেদবুদ্ধি অত্যন্ত কম। সহজে খাদ্য মেলে স্থূল-দেহ ধারণের উপযুক্ত। আয়ু দীর্ঘ নয় কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে হয়—কাজেই আলস্যের স্থান নেই। অসার বস্তুতে লোভ নেই—যেমন অত্যন্ত খাদ্যসঞ্চয়, বড় আবাসবাটী, উজ্জ্বল পরিচ্ছদ—মান, যশ—অহঙ্কার, অভিমান।

যতীন বল্লে—কিন্তু নারী রয়েচে যে প্রভু, ওরা থাকলেই—

পুষ্প ভ্রূকুটি করে বল্লে—কি রকম যতীনদা?

দেবতা হেসে পিতার ন্যায় সস্নেহে পুষ্পের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে বল্লেন—কন্যার মনে আঘাত দিও না—ও ঠিক বলেচে। ওরা থাকলেই হয় না গোলমাল। বাসনা থেকে পাপ, গোলমাল। এখানকার জীব বাসনা ক্ষয় করে এসেচে বহু জন্ম ধরে। এদের নিম্ন স্তরের বাসনা জাগে না তীব্রভাবে। উচ্চ জ্ঞানের, শিল্পের, সংগীতের সাধনা বা ভগবৎসাধনা নিয়ে এরা থাকে। ভগবানের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-দর্শন এদের অনেকের হয়েচে। সুতরাং যে সব জিনিস জীবনে স্বপ্নের মত অস্থায়ী তাদের অসারত্ব এরা বুঝেচে। অত্যন্ত সাধু, নিস্পৃহ, সরল উচ্চ স্তরের জীবন এখানকার—মানে, এই সব গ্রহের।

যতীন বল্লে—বাঃ, চমৎকার জীবন তো এখানকার—ইচ্ছে হয় জন্ম নিই—

দেবতা ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে এখানে একদিন তো জন্ম নিতেই হবে। কারণ এই স্বর্গলোক, যেখানে তোমরা আছ, এও মায়ার অধীন। হয়তো বহুকাল এখানে থাকবে, স্তর থেকে স্তরান্তরে যাবে—কিন্তু স্বর্গও দুদিনের। ব্রহ্মচক্রে জন্ম-মৃত্যু আবর্তিত হচ্চে, মানুষ আবার জন্মাবে, আবার মরবে, আবার জন্মাবে—যতদিন বাসনার শেষ না হয়, অসত্য থেকে সত্যে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে না যায়। ভগবানকে জানলে জীব নিজেকে জানতে পারবে—তখন ছুটি। স্থূল দেহে শেষ জন্ম সাধারণত এই সব গ্রহে হয়—এখানে আত্ম-দর্শনের ও সাধনার সুযোগ ও সময় অনেক বেশি। দয়া করে বিশ্বের অধিদেবতা জ্ঞানী ও মুমুক্ষু জীবদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করান।

—দেব, আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন? আপনি এত উচ্চ—

—ঐ রজনীর তারালোকের ব্যাপ্তির মধ্যে, বনপুষ্পের সুবাস ও এই সব অদ্ভুত গ্রহের বনানীর নির্জনতা ও বনবিহঙ্গের কূজনের মধ্যে, বিশ্বের রহস্যের মধ্যে আমি তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকবার প্রার্থনা জানিয়েছিলাম মনে মনে। তিনি অসীম করুণায় সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেচেন। নইলে সাধ্য কি এই অগণ্য লোকালোকে ভ্রমণ করি? এ শক্তি তো সকলের হয় না। আমি দেখচি এভাবে তাঁর লীলা-সৌন্দর্য দেখে বেড়ানোর বাসনা কারো নেই, এ নেশা আর কারো দেখিনি, কেবল বহুকাল আগে আর একটি আত্মার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—দুটি নক্ষত্রের বিরাট সংঘর্ষের দৃশ্য দেখেছিলাম দুজনে—তা থেকে তৃতীয় একটি নূতন প্রজ্বলন্ত তারকার সৃষ্টি হোল। ওঃ, সে সব দৃশ্য তোমাদের শক্তি নেই সহ্য করো। আমাকে তিনি ভ্রমণের শক্তি দিয়েচেন, সুপর্ণের মত বিরাট পাখা দিয়েচেন লোকে লোকান্তরে উড়তে—এই আমার তাঁকে উপাসনা। জয় হোক তাঁর।

পুষ্প হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, দেখাদেখি যতীনও। এই মনোরম জগতের নৈশ সৌন্দর্যের মধ্যে উচ্চ স্তরের এই পথিক দেবতার বাণী স্বয়ং ভগবানের প্রতিনিধির বাণী বলে মনে হোল হঠাৎ ওদের মনে। সুস্পষ্ট সত্য বাণী—চন্দ্রমা অস্তমিত হোলে, বাক্ শান্ত হোলে, পৃথিবীর ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের আশ্রমে যেমন একদিন বাণী উচ্চারিত হয়েছিল।

পুষ্প মাথা নীচু করে বল্লে—আশীর্বাদ করুন দেব—

ওর অশ্রুপ্লাবিত চোখ দুটির দৃষ্টি নতুন গ্রহের মৃত্তিকার দিকে আবদ্ধ রইল।

দেবতা বল্লেন—আশীর্বাদ করচি কন্যা, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের দেব-আত্মার সাক্ষাৎ পাবে। আমি ভবঘুরে মাত্র। সত্যিকার জ্ঞানীর দর্শন পাবে। তবে তোমার ভাগ্যে এখনও অনেক সংগ্রাম আছে। কিন্তু তুমি বিশ্বদেবের করুণা লাভ করবে। আমি যাদের পাদস্পর্শ করবার যোগ্য নই, এমন আত্মার দর্শন পেয়ে ধন্য হবে।

এমন সময় রাত্রি প্রভাত হয়ে এল সেখানকার বনে-বনানীতে। আকাশের নক্ষত্ররাজি ম্লান হয়ে এল—সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না মিলিয়ে অস্পষ্ট হয়ে এল। পক্ষী-কূজন জেগে উঠলো বনভূমির বুকে।

পুষ্প ভাবছিল, কোনো এক সুদূর জন্মান্তরে এই গ্রহলোকে যদি সে জন্ম নেয়, সাথী তারার নীল জ্যোৎস্নায় এরই শৈলারণ্যে, উপত্যকায়, গিরিসানুদেশে, শান্ত উপত্যকায় সে হাত-ধরাধরি করে বেড়াবে যতীনদার সঙ্গে—দুজনে মিলে ভগবানের উপাসনা করবে সারাজীবন এই তপোবনসম গ্রহলোকের পবিত্র আশ্রয়ে, কোনো গিরিনির্ঝরিণীর কূলে কুটীর বেঁধে। জগতের বিশাল পথে ঘুরতে ঘুরতে কবে এখানে এসে হয়তো পড়তে হবে, তা কেউ জানে কি? মহা-পুরুষের আশীর্বাদ বৃথা যাবে না।

দেবতা বল্লেন—চলো, এখুনি লোকে জেগে উঠবে। এরা আমাদের হয়তো দেখতে পাবে—এদের ক্ষমতা বেশি। তোমাদের তো নিশ্চয় দেখতে পাবে। সরে পড়ি তার আগে।

ওদের বুড়োশিবতলার ঘাটে পৌঁছে দিয়ে পথিক দেবতা পুষ্পের চোখের জলের মধ্যে অদৃশ্য হোলেন। তার অনুনয় ও অনুরোধের উত্তরে বলে গেলেন, সময়ে আবার দর্শন দেবেন।

১৭

বুড়োশিবতলার ঘাটে আজ দীপান্বিতা অমাবস্যা। ওপারে হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে ছাদে ছাদে প্রদীপ দিয়েচে মেয়েরা। এদের প্রাচীন ঘাটের রানায় পুষ্প নিজের হাতে ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বেলেচে। গঙ্গাবক্ষ অন্ধকার, দু-একটা নৌকোর ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্চে—ছপ্‌ ছপ্‌ দাঁড়ের শব্দও পাওয়া যাচ্চে।

পুষ্প বল্লে—এসো যতীনদা, আমরা আমাদের ছেলেবেলার কথা ভাবি বসে বসে। মনে পড়ে কেওটা-সাগঞ্জের দিন? আমি পিদিম দিচ্চি, তুমি এক পয়সার কুচো গজা কিনে আনলে—

—কুচো গজা না জিবে গজা—

—না, কুচো গজা। বেশ মনে আছে, ময়রা বুড়ীর দোকান থেকে। নিতাইএর ঠাকুরমা, মনে আছে?

—খুব। বটতলায় দোকান ছিল। আহা, সে তো কতদিন মরে এসেচে এখানে—তাকে কখনো দেখিনি।

—তারপর সেদিন দুজনেই মার খেলুম বাড়ী ফিরে। অত রাত পর্যন্ত তুমি আর আমি ঘাটে বসে ছিলুম পিদিম দেওয়ার পরে। মনে পড়ে যতীনদা?

—খুব। আমি মার খাইনি। মাসীমা তোকে মারলেন। আমিই বরং উত্তরের কোঠায় —যতীন হঠাৎ খাড়া হয়ে উঠে বসলো। বল্লে—পুষ্প, আমি এখুনি কলকাতায় যাবো—

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—কেন?

—তোর বৌদিদির কিছু হয়েচে। একটা আর্তনাদ শুনলাম তার গলার। দেখে আসি—পুষ্প, সত্যি বল্চি, ও আমায় শান্তি দিলে না। তুই যতই চেষ্টা করিস, আমার ভাগ্য ওর সঙ্গে বাঁধা। চল্লুম আমি—

—বা-রে, আমিও বুঝি বসে থাকবো? দাঁড়াও—

মনে মনে পুষ্প বড় হতাশ হোল। তারও জীবন যেন কেমন। কিছুতেই কি কিছু সুরাহা হয় না? সব সময় দেওয়ালের ওপর দিয়ে কোন বিকটমূর্তি কঙ্কাল উঁকি মারে, অমঙ্গল ভরা দৃষ্টিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এত কষ্ট করে আজ সে দীপান্বিতা অমাবস্যার সন্ধ্যাটিকে প্রাণপণে সাজালে—সব বৃথা!

নামবার পথে পুষ্প বল্লে—কলকাতায় আসতে পারিনে, কষ্ট হয়। উঃ, দেখেচ কেমন কালো কালো কুয়াশার মতো জিনিস! মানুষের অর্থলোভ, বিলাসিতা—নানারকম খারাপ চিন্তা—সকলের ওপর লোভ—এই সব এক ধরনের কালো কুয়াশা সৃষ্টি করেচে। ওর মধ্যে দিয়ে আসতে দম বন্ধ হয়ে যায় যেন—সব বড় শহরেই এরকম দেখেচি—এখানে মানুষ সব ভুলে শুধু ভোগ নিয়ে আছে।

সেই বাসাবাড়ী—যতীন এর আগেও দুবার লুকিয়ে এসে দেখে গিয়েছিল আশাকে। পুষ্প তা জেনেও কিছু বলেনি। যতীনদা ভাবে, পুষ্প পোড়ারমুখীকে লুকিয়ে কোনো কিছু করা যায়! যতীনদার বয়স হয়েছে বটে কিন্তু এখনও ছেলেমানুষি ঘোচেনি।

আশার অবস্থা ভাল নয়। নেত্যনারায়ণ ওকে ফেলে আজ মাস চার পাঁচ হোল চলে গিয়েচে দেশে। নিজের গ্রামে গিয়ে সে মুদির দোকান খুলেচে—কিন্তু আশার ফেরবার মুখ নেই। বাড়ীওয়ালীর দয়ায় এবং হাতের দু'একগাছি সোনার চুড়ি বিক্রির টাকায় এতদিন যা হয় চললো। কিন্তু তার মধ্যে বাড়ীওয়ালী নানারকম উপার্জনের ইঙ্গিত করেচে। এক মারোয়াড়ী লোহাওয়ালা তাকে দেখেচে দোতলার ছাদ থেকে—আশা যখন ওদের বাসার তেতলার ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিল। বেলঘরে না সোদপুরে তার বাগানবাড়ী, মস্ত বাগান—ইত্যাদি।

তাকে সদুপদেশও দিয়েচে—এই তো বয়েসখানা চলে যাচ্চে গো—আর দুটো বছর। তার পর কেউ ফিরে চাইবে? না বাপু। বলে, মেয়েমানুষের রূপ আর জোয়ারের জল। হ্যাঁ,

দেমাক থাকতো যদি সোয়ামী পুত্তুর থাকতো। নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখেচ একবার ?

আশা একা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আছে—তার মনে যে নিরাশার অন্ধকার ছেয়েচে, কোনোদিন তা ফুটে আলো বেরুবার সম্ভাবনা আছে কি ? হাতের পয়সা ফুরিয়েচে, আর বড় জোর দশটা দিন। তারপর ?

গভীর রাত্রি কলকাতায়। আশা এখনও ঘুমোয়নি—দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই চোখে।

যতীন আকুল হয়ে ওর শিয়রে বসে ডাকলে—আশা আশা, লক্ষ্মীটি—আমি এসেচি আশা—

পুষ্পও বসলো পাশে। পুষ্প যে ভবিষ্যৎ দেখচে, যতীন তা দেখবার শক্তি রাখে না। পুষ্প খুব দুঃখিত হোল। কর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আশা-বৌদির সঙ্গে যতীনদার গাঁটছড়া বস্ত্র-আঁটুনিতে আঁটা। দুঃখ হয়, কিন্তু সে জানে, কিছু করবার নেই তার। সে এখানে গাড়ীর পঞ্চম চক্রের মত অনাবশ্যক। সে না থাকলেও কর্মের রথ দিব্যি চলবে।

যতীন বল্লে—পুষ্প, আমায় সাহায্য করো—

—ভাবচি—

—কি ভাবচো ?

—ভাবচি তোমার অদৃষ্ট যতীনদা—

—এখন কি হেঁয়ালি উচ্চারণ করবার সময় পুষ্প ?

হায়! সে যা বলতে চাইচে, যতীনদাকে যদি কেউ তা বুঝিয়ে দিতে পারতো! যতীনদা চিরকাল তাকে ভুল বুঝে আসচে, এখনও বুঝবে তা সে জানে। কিন্তু কি করবে সে, এ তারও অদৃষ্টলিপি।

পুষ্প দুঃখিত সুরে বল্লে—তা বলিনি। তুমি বল্লে বুঝবে না আমার কথা। আশা-বৌদির এ অবস্থা দেখে—আমি মেয়েমানুষ—আমার কষ্ট হচ্চে না তুমি বলতে চাও ? কিন্তু কিছু সাহায্য করতে পারবো না তুমি আমি। আশা-বৌদিদির কর্মফল—এক ভগবান যদি বাঁধন কাটেন তবেই কাটে। তোমার আমার দ্বারা হবে না।

—এই রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যাই কি করে তোর বৌদিদিকে—বল্ পুষ্প—তা পারি ? যতীনের কাতর উক্তিতে পুষ্পের চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো—আশালতার দুরবস্থার জন্যে নয়, অন্য কারণে। সে বল্লে—পৃথিবীতে থাকলে উপকার করতে পারতে। এ অবস্থায় আমি তো কোনো উপায় দেখচিনে। আচ্ছা—দেখি,—একটু ভাবতে দাও—

পুষ্প একটু পরে বল্লে—এখানে থাকবে না। চলো যতীনদা। এখান থেকে যেতেই হবে। নইলে তোমার আসন্ন বিপদ।

যতীন বল্লে—তুমি বড় ভয় দেখাও, পুষ্প। চলো করুণাদেবীর কাছে যাই, তাঁকে সব বলি।

—বলবে কি, তিনি অন্তরের কথা জানতে পারেন। ওঁরা হোলেন উচ্চ স্বর্গের দেবদেবী। স্মরণ করলেই বুঝতে পারেন—কিন্তু সময় না হোলে আসেন না। বৃথা দেখা দেন না। তা ছাড়া কলকাতার এই বিশ্রী পাড়ায় তাঁকে আমি এনে এর সঙ্গে জড়াতে চাইনে।

সারারাত যতীন ও পুষ্প আশার শিয়রে বসে রইল। পাশের একটা বাড়ীর খোলা জানালা দেখিয়ে বল্লে—দ্যাখো যতীনদা, ওখানে ওরা কি করচে! দেখে এসো না?

—কি?

—তুমি গিয়ে দেখে এসো, অমন জায়গায় যাবো না। দম বন্ধ হয়ে আসে।

যতীনের কৌতূহল হোল, সে গিয়ে দেখলে, কয়েকটি ভদ্রলোক, সাজে পোশাকে বেশ অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয় একটি ঘরে বসে তাসের জুয়ো খেলচে। পাশের টেবিলে একটি বোতল, কয়েকটি গ্লাস—এক টিন সিগারেট, দু-চারটি শূন্য চায়ের কাপ ডিস—একটা বড় প্লেটে খানকতক অর্দ্ধভুক্ত পরোটা ও অন্য একটা পাত্রে কিছু ডালমুট। সিগারেটের ছাই ও ডালমুট ঘরের মেজের দামী কার্পেটের ওপর ছড়ানো—যদিও সিগারেটের ছাই ফেলবার পাত্র টেবিলের ওপর রয়েচে কিন্তু আধপোড়া সিগারেট আর সিগারেটের ছাইতে পাত্রটা বোঝাই। ওরা ছোট ছোট তাকিয়া পাশে রেখে একমনে খেলেই চলেচে। বিছানার পাশে রাশীকৃত দশটাকার নোট একটার পর আর একটা হিসেবে সাজানো, ওপরে একটা পেপারওয়েট্ চাপানো। ওরা মাঝে মাঝে বোতল থেকে ঢেলে মদ খাচ্চে, সিগারেট ধরাচ্চে, মাঝে মাঝে একখানা কাগজে পেন্সিল দিয়ে হারজিৎ-সূচক হিসেব রাখচে। এদের মধ্যে একজনের বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েচে, দেখলেই বোঝা যায়, মাথার চুলে কালো রং খুঁজে বের করা কঠিন। ফুলফোর্সে মাথার ওপর ইলেকট্রিক পাখা ঘুরচে, দেওয়ালের ঘড়িতে রাত দেড়টা বাজে।

একজন ডেকে বল্লে—ও প্রমীলা,—টুসু—খাবার দিয়ে যাও।

দু'তিনবার ডাকের পর একটি সুন্দরী রমণী ঘুম-ঢুলুঢুলু চোখে একটা বড় প্লেটে কতকগুলো কাটলেট নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বল্লে—নাও সব—রাত কম হয়নি, আমার ঘুম পেয়েচে—কাল আবার হাসপাতালের ডিউটি সকাল থেকে শুরু—

একজন বল্লে—সোডা ফুরিয়েচে—টুসু। লক্ষ্মীটি, একটা সোডা আমাদের যদি দিয়ে যাও—

আর একজন বল্লে—অমনি ওই সঙ্গে গোটাকতক পান—

সুন্দরী মেয়েটি রূপে ঘর আলো করেচে, ওর পরনে দামী সিল্কের শাড়ী, কাজকরা ব্লাউজ, অনাবৃত কণ্ঠদেশ ও বক্ষঃস্থলে জড়োয়ার কাজ করা নেকলেস্ চিক্ চিক্ করচে। সে যেতে যেতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কৌতুক-মিশ্রিত সুরে বল্লে—পারবো না এত রাত্রে পান সাজতে বসতে—

পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের সেই লোকটি কপট মিনতির সুরে বল্লে—আমার দু'হাত বন্ধ, মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে যদি দিয়ে যেতে টুসু—

যতীন সেখানে আর দাঁড়ালো না। পুষ্পকে এসে বল্লে—তাস খেলচে। তাসের জুয়ো—টাকা জিত্‌চে।

পুষ্প বল্লে—একবার দেখে এসেচি জানালা দিয়ে। ওরা অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক—দেখে মনে হয় টাকার ভাবনা নেই—অথচ টাকার এমন নেশা?

—তুমি এসব বুঝবে না পুষ্প। টাকার নেশা নয়, জুয়োর নেশা—

—ঐ হোল। ওই মেয়েটি কে?

—মেয়েটি টুনু। ভাল নাম যেন প্রমীলা—

পুষ্প হেসে বল্লে—তা তো বুঝলাম, ওদের কে? কি সম্বন্ধ ও বাড়ীর সংসারে?

যতীন কিছু বল্লে না, সরলা পুষ্প কত কথা জানে না সংসারে। ওর নিষ্পাপ মনে—দরকার কি?

পুষ্প আপন মনেই যেন বল্লে—কিন্তু ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ওর মধ্যে কেন? ওঁকে দেখে কষ্ট হয়। এখনও ভোগের নেশা এত! পরকালের চিন্তা করবার সময় হয়নি আজও?

—তোমার মত সবাই হবে? বাদ দাও না, বাজে কথা বলো কেন?

পুষ্প দুঃখিত কণ্ঠে বল্লে—আমার বাবার মত দেখতে। সত্যিই কষ্ট হোল। ভগবানের দিকে মন দেবার ওঁর সময় যে পার হয়ে গেল।

—তোমার তাতে কি? বড্ড বাজে কথা তোমার পুষ্প—

—আশাবৌদি ঘুমিয়ে পড়চে।

—কি হবে ওর পুষ্প? সত্যি কথা বল্। তুই আমার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাস্।

—দেখতে পাই কে বলেচে?

—আমি সব জানি—

পুষ্প গম্ভীর স্বরে বল্লে—কেউ কিছু নয়। মানুষের মিথ্যে অভিমান। তিনি যা করবেন, তাই হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এসো দুজনে।

—এখানে?

—এখানেই। তাঁর নামে সব পবিত্র হয়ে যাবে। তিনি এখানেই কি নেই? কে বলেচেন নেই? তিনি তাঁর অসীম কৃপা ও করুণায় এই হতভাগিনী আশাবৌদির মঙ্গল করুন।

করুণাদেবীর বিনা সাহায্যেও আজকাল পুষ্প মহর্লোকের সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে, এমন কি আরও উর্ধ্বতর লোক পর্যন্ত। যতীনকে অত উচ্চস্তরে কোনো শক্তিমান আত্মার বিনা সাহায্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে পুষ্প অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাই মাঝে মাঝে যায়। সে বলে এতে অনেক কিছু সে দেখে, শোনে ও শেখে। অনেক ভাল ভাল আত্মার সংস্পর্শে এসে মানসিক ও আত্মিক শক্তির প্রসার হয়।

সেদিন যতীন ছাড়লে না, বল্লে—আমি যদি উচ্চ স্তরে অজ্ঞান হয়ে পড়ি—তুমি সেখানে আমাকে ফেলে যেও। যতদূর জ্ঞান থাকে ততদূর নিয়ে যাও না? আমিও বেড়িয়ে দেখতে, জানতে ভালবাসি না কি ভাবচো? রেলভাড়ার টিকিট তো লাগচে না।

—ভাখো যতু-দা, এখনও পৃথিবীর ওই উপমা ও চিন্তার ধরনটা ছেড়ে দাও। তোমায় এই জন্যেই বারণ করি বার বার পৃথিবীতে যেতে। ওখানে নানা আসক্তি, ইচ্ছা, ভোগপ্রবৃত্তি সর্বত্র ছড়ানো রয়েচে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। স্থূল দেহ ভিন্ন ওই সব ইচ্ছা পূরণ করা যায় না।

স্থূল জগতের স্থূল প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম দেহে কি করে চরিতার্থ করবে ? কাজেই ওই সব আসক্তি যেমন তোমার মনে আসন গেড়ে বসবে, তখনই তোমাকে স্থূল দেহ ধারণ করতে বাধ্য করবে। সুতরাং আবার পুনর্জন্ম।

—তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই তোমার মত।

—সে আমি জানি। সেজন্তেই তো তোমার জন্তে ভয় হয়—চলো তোমাকে মহর্লোকে নিয়ে যাই—

ওরা ব্যোমপথে অনেক উর্ধ্বে এমন এক স্থানে এল, যেখানে উচ্চলোকের জ্যোতির্ময় অধিবাসীদের যাতায়াতের পথ। তার পরেই এক অদ্ভুত সুন্দর দেশ ; অতি চমৎকার বন-পর্বতের মেলা, বনকুসুমের অজস্রতা। অথচ এখানে কোনো অধিবাসী নেই, অনেকদূর গিয়ে একটা নীল হ্রদ, চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। পুষ্প বল্লে—চলো যতু-দা, ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে একটি গ্রাম আছে, অনেক জ্ঞানী মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে বাস করেন—তোমায় দেখিয়ে আনি।

বনবীথির অন্তরালে শুভ্র স্ফটিকসদৃশ কোনো উপাদানে তৈরী একটি বাড়ী, দেখতে অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মত। হ্রদের নীলজলের এক প্রান্তে কুসুমিত লতাবেষ্টিত এই সুন্দর গৃহটি যতীনের এত ভাল লাগলো! এমন সুন্দর পরিবেশ আর্টিস্টের কল্পনায় ছাড়া যতীন অন্তত পৃথিবীতে কোথাও দেখেনি। আপন মনেই সে বলে উঠলো—কি সুন্দর !

একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র সবই অপরিচিত ধরনের। পৃথিবীতে ব্যবহৃত কোনো আসবাব সে ঘরে যতীন দেখলে না। লোকটিকে দেখেই মনে হোল অনেক উচ্চ অবস্থার আত্মা ইনি। ওদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে তিনি বল্লেন—তোমরা কোথা থেকে আসচো ?

যতীন বল্লে—ভুবর্লোকের সপ্তম স্তর থেকে।

তিনি বিস্মিত হয়ে বল্লেন—না, তা কেমন করে হবে ? তা হোলে তো আমাদের এই জনপদ, এই ঘরবাড়ী বা আমাকে কিছুই দেখতে পেতে না ? নিশ্চয় তোমরা উচ্চতর স্তরের অধিবাসী।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ লোক ?

—মহর্লোকের প্রথম স্তর। ভুবর্লোকের অধিবাসীদের পক্ষে এখানকার বাড়ীঘর, মানুষ, বন, পর্বত সব অদৃশ্য। আমার অবস্থার আত্মা না হোলে আমার এ গৃহে আমাকে পাবেই না। মহর্লোক কোনো একটা স্থানও বটে, বিশেষ একটা অবস্থাও বটে। স্থান ও অবস্থার একত্র যোগ না ঘটলে এ লোকে চৈতন্য জাগরিতই হবে না যে। তা নয়, তোমাদের মধ্যে একজন কেউ উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েচ, নইলে এখানে আসতে পারতে না।

—সে এই মেয়েটি। আমি নই—

পুরুষটি হেসে বল্লেন—আমিও তা অনুমান করেচি।

পুষ্প সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বল্লে—আমি কি-ই বা—ওঁর জন্তেই—

যতীন বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করলে—আপনি পৃথিবী চেনেন তো স্যার ?

—আমি আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম। সেই আমার শেষ জন্ম। সেবার ছিলাম গ্রীসে, তার পূর্বে দুই জন্ম ভারতবর্ষে ও এক জন্ম সুপ্রাচীন মিশরে কাটাই।

—তার পূর্বে ?

—তার পূর্বে পৃথিবীতে ছিলাম না। অন্য গ্রহে সৌর-জগতে বহু জন্ম নিয়েচি। কত অদ্ভুত গ্রহ আছে, অদ্ভুত জীবকুল আছে! বিচিত্র লীলা ভগবানের।

হঠাৎ পুষ্প বল্লে—আপনি ভগবানকে দেখেচেন, দেব ?

—না।

—আপনি বিশ্বাস করেন তিনি দেখা দেন ?

—না।

—আশ্চর্য! ভগবানে বিশ্বাস করেন না ?

—তাঁর কোনো রূপে আমার বিশ্বাস নেই, এই কথা বলচি। ভগবানকে তোমরা যে চোখে ত্বাখো, আমরা সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখি। তিনি অচিন্ত্যনীয় মহাশক্তি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান। দেহধারী হয়ে দেখাও দেন, আমার এই গ্রামের একটি মেয়ে প্রায়ই তাঁর দেখা পায়।

পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বল্লে—তবুও আপনি বিশ্বাস করেন না ?

—যে যেভাবে কল্পনা করে, তাকে সেইভাবেই তিনি দেখা দেন। এতে আমি বুঝি, এই তোমরাই আমার ভগবান হতে পার। নিত্যমূর্তি কি আছে তাঁর ? সবই তাঁর মূর্তি—এই গাছপালা, এই বনভূমি, এই তুমি মেয়েটি—ঐ অনন্ত আকাশ, ব্রহ্মাণ্ডকুল—

কথা বলতে বলতে ভক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতার জ্যোতিতে তাঁর মুখের শ্রী হোল অপূর্ব ; তীক্ষ্ণ নীল আলোক বড় বড় চোখ দিয়ে কখনো ঠিকরে বেরুতে লাগলো—কখনো শান্ত হয়ে আসতে লাগলো। ভগবানের কথায় তাঁর কণ্ঠস্বর ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে এল।

পুষ্প তার ভুল বুঝে বল্লে—আমায় ক্ষমা করুন দেব, আমি বুঝতে পারিনি আপনাকে। আপনি তাঁকে ভক্তি করেন।

যতীন বল্লে—পৃথিবীতে বহুদিন যান নি ?

—পৃথিবীর বসন্তকালে পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ফুল ফোটে, সেই সময় পৃথিবীর মহা-অরণ্যে পর্বত-সানুতে নদীতীরে বেড়িয়ে দেখে আসি। কখনো কোনো অসহায়া নারীর দুঃখ দেখি কোনো জনপদে, তার দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা করি। নীপনদীর জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জন-তটে বসে ভগবানের ধ্যান করি। শুধু পৃথিবী নয়, বহু গ্রহে এমনি আমাদের যাতায়াত।

—আপনি যা করচেন, শুধু আপনাদের মত উচ্চলোকের অধিবাসীরাই তা করতে পারেন। আচ্ছা, পৃথিবীর মানুষের কর্তব্য কি ?

—প্রেম—এক ওর মধ্যেই সব।

—আপনি একথা পৃথিবীতে প্রচার করেন না কেন ?

—কতবার প্রচার করা হয়েচে। আমার চেয়ে উচ্চতর ও শক্তিধর দেবতারা মানুষের দুঃখে পৃথিবীর শত কষ্টের মধ্যেও দেহ ধরে একথা বলতে গিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান অবতার গ্রহণ করে নেমে গিয়েচেন বলতে। প্রেম—একটি কথা। কেউ শোনেনি।

—তাহোলে কি আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন?

—অদ্ভুত চরিত্র ভগবানের। বার বার সুযোগ দেন। বিরক্ত হন না। অপূর্ব তাঁর ধৈর্য, অপূর্ব তাঁর ক্ষমা। অন্য কেউ হোলে আর সুযোগ দিত না—কিন্তু নাছোড়বান্দা তিনি। আবার লোক পাঠান অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে। তোমাদের পৃথিবীতে ভগবানের তুল্য অবহেলিত প্রাণী আর কে? কেউ তাঁর কথা ভাবে না।

এই পর্যন্ত বলেই অপূর্ব ঈশ্বরীয় প্রেমে মহাপুরুষের চোখ দুটি নক্ষত্রের মত জলজল করতে লাগলো। পুষ্প শ্রদ্ধায় ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে বল্লে—আপনি ঠিক বলেচেন দেব, পৃথিবীতে কেউ ভাবে না ভগবানের কথা। যে ভাবে সেও টাকা চায়, যশ চায়, সাংসারিক সুখ চায়। প্রেমভক্তি দুর্লভ হয়ে পড়েচে।

মহাপুরুষ বল্লেন—প্রেমভক্তি ছেড়ে দাও। ও অনেক উঁচু কথা। অতি সাধারণ ভাবেও ক'জন ভগবানের চিন্তা করচে। আমি পৃথিবীতে যাই, জনপদে বা তোমাদের বড় বড় নগরে যাই না। দুর্নিবার লোভ, অর্থাসক্তি, ঐশ্বর্য-কামনা, নারী, সুরা, কাম, হিংসা-দ্বেষ বাতাসে ছড়ানো ঘন ধোঁয়ার মত। ভাই ভাইএর বুকে ছুরি বসাচ্চে। সত্য বিদায় নিয়েচে। পৃথিবীর এখনকার দর্শন হচ্চে খাওয়া-পরার দর্শন। কিসে ভাল খাবো, ভাল পরবো। আমি আপন মনে মরুভূমিতে বেড়াই জ্যোৎস্নারাত্রে, হিমালয় কি অন্য কোনো পর্বতচূড়ায় বসে থাকি, নীলনদ বড় ভালবাসি তার তীরে একা বসে থাকি। অথচ এক কথা—প্রেম, এই যদি ওরা শিখতো—জীবে প্রেম, ভগবানে প্রেম!

তিনি এই পর্যন্ত বলে চুপ করতে পুষ্প বল্লে—বলুন দেব, অমৃতের মত বাণী আপনার।

—আমার? আমার কিসের কন্যা? এ বাণী স্বয়ং ভগবানের। তিনি অনেক উঁচু, তাই মানুষের দেহ ধরে পৃথিবীতে গিয়ে একথা বলে এসেছিলেন। কেননা মানুষের দেহ ধরে না গেলে মানুষের সাধ্য কি যে অসীমকে গ্রহণ করে? একবার নয়, বার বার গিয়েছিলেন। ক্লান্তি-হীন তাঁর আশীর্বাদ। কিন্তু কে শুনচে? ধনজনের মোহে, লোভের মোহে, বিলাসের মোহে—স্থূল ভোগের মোহে সবাই উন্মত্ত। একবারও যদি নির্জনে উচ্চতর সত্যের ধ্যান করতো মানুষে!

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। আজ এখানে আসা তার সার্থক হয়েচে বটে। সে বল্লে—তবে কি তাদের উদ্ধার নেই, দেব?

—একটা কথা মনে রেখো। জোর করে মানুষের ওপর কোনো সত্য, কোনো বাণী চাপানো যায় না। মানুষে তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের বাণী অন্তরালে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে। বুদ্ধিহীন বা স্থূলবুদ্ধি ভোগাসক্ত মন হঠাৎ ভগবানকে গ্রহণ করতে পারে না। পারলেই যে মুক্তি—যে ভগবানকে ভালবাসে, সে ভগবানের সমান হয়ে যায়। এত সহজে তা

হবে কোথা থেকে ? কাজেই মহাযুগ মন্বন্তর চলে যায় স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের মুক্তি পেতে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে যারা মানুষ হয়ে জন্মেছিল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম—এইবার তারা মানব-আবর্ত কাটিয়ে দেবযান-পথে মহর্লোকে যেতে শুরু করচে। ওদের এতদিন পরে পৃথিবীতে গতাগতি শেষ হোল।

—এর চেয়ে আগেও হয় ?

—তুমি বুঝলে না—এ তো হোল স্বাভাবিক নিয়মে, লক্ষ বৎসর পরে। এক জন্মেই মুক্তি হয়—যদি সত্যের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, ভগবৎপ্রেমে বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে মনে। এদের জন্যে ভগবান কত সাহায্যের ব্যবস্থা করেচেন, তা যদি জানতে ! যে সত্যকে জানতে চায়, ভগবান তাকে জানবার সব রকম সুযোগ দেন। চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখিয়ে আনি—ক'দিন থেকে আমি দেখছি তোমাদের পৃথিবীতে—

যতীন ও পুষ্পকে নিয়ে সেই উচ্চলোকের পুরুষটি চক্ষের নিমিষে পৃথিবীতে নেমে এলেন। সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে। যে নদীতীরে এসে ওঁরা দাঁড়ালো, সে নদীটি খরস্রোতা, তীরে শস্যক্ষেতের মধ্যে এক জায়গায় বড় একটা গাছ। পুষ্প ও যতীন নদীটি চিনতে পারলে না। বৃক্ষের তলে একটি তরুণ যুবক ধ্যানমগ্ন। যুবকের রং টকটকে গৌর, মুখের চেহারা লালিত্যপূর্ণ, বেশ বড় বড় চোখ—কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে দাড়ি রেখেচে—রেশমের মত নরম, চকচকে দাড়ি। যতীনের মনে হোল যীশুখ্রীষ্টের ছবির মত মুখখানা ওর দেখতে।

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—এ কি নদী দেব ?

—এ রাভি নদী। এটি ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশ। ছেলেটির বাড়ী ওই জনপদে, সবাই ঘুমুলে গভীর রাত্রে নদীতীরে বৃক্ষতলে ও রোজ একা এসে ভগবানের চিন্তা করে, গান করে আপন মনে। ওই ছাখো ওর মা খাবার দিয়ে যায় এ সময়—আসচে—

একটি মেয়ে—মেয়েটি প্রৌঢ়া বটে, কিন্তু সুন্দরী—দূরের গ্রাম থেকে একটা পাত্রে খাবার নিয়ে এসে ছেলেটির সামনে রাখলে। জিজ্ঞেস করলে—বাড়ী যাবি ?

ছেলেটি বল্লে—তুমি যাও মা, আমি এক ঘণ্টা পরে যাবো।

—ঠাণ্ডা লাগাস্‌নে বেশি, বাচ্চা।

ওর মা সস্নেহে ছেলের দিকে দু'তিন বার চেয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল এবং অতি অল্পক্ষণ পরে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়লো যতীন ও পুষ্পর। আকাশপথ আলো হয়ে উঠলো ক্ষণকালের জন্যে এবং সেই আলোর রেখা ধরে এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ নেমে এসে ওই ধ্যানরত যুবকের পাশে দাঁড়ালেন। আগন্তুক দেবতার রূপে ও দেহজ্যোতিতে স্থানটি যেন আলো হয়ে উঠলো, যদিও যুবকটি তার কিছুই বুঝতে পারলে না।

পুষ্প ও যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—উনি কে ?

—উনি সত্যলোকের প্রাণী। পৃথিবীতে ওঁর তো দূরের কথা, আমাদেরই আসতে কষ্ট হয়, অথচ ছাখো ওই সত্যপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত যুবকটিকে প্রেরণা দিতে নিজে এসেচেন। যেখানে ভগবানের নামগান হয় সেখানে ভগবান স্বয়ং আসেন—এ তোমরা অবিশ্বাস ক'রো না।

তারপরে ওরা তিনজনেই দূর থেকে সত্যলোকের সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করলে। তিনি ওদের দিকে চেয়ে সদয় হাস্য করলেন ও দুটি আঙুল ওপর দিকে তোলার ভঙ্গিতে আশীর্বাদ করলেন। পুষ্পর চোখে জল এল। কি সুন্দর রূপ দেবতার।

পরক্ষণেই তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পুষ্পদের সঙ্গী পুরুষটি বল্লেন— দেখলে? নীলনদের তীরে বহু হাজার বৎসর পূর্বে যাপিত আমার একটি গোপন রাত্রির কথা আজও আমার মনে হয়। একা ছিলাম সে রাত্রে। বসন্তকাল ছিল, পুষ্পিত হয়ে ছিল নদীতলের ওষধি ও বনতরুরাজি—ক্ষুদ্র একটি পর্বতের চূড়ায় নদীর অপর পারে আমি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমার সারাজীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়—দশ জন্মের প্রগতি একজন্মে সাধিত হয়। ভগবানের কৃপা নইলে হয় কি? কিন্তু তার জন্য ক্ষেত্র তৈরী হওয়া দরকার। পরকে ভালবাসো, জীবকে সেবা করো। আসক্তি ত্যাগ করো। ভগবানে মন দাও। মনের কুয়াশা না কাটলে সত্যের আলোকপাত কি হয়?

—আপনারা দয়া করুন পৃথিবীর জীবকে—তাহোলেই হবে।

—আমার ইচ্ছা আছে, আর একবার পৃথিবীতে দেহধারণ করবো। যা পারি প্রচার করে করে আসি।

—পৃথিবীতে গিয়ে ভুলে যাবেন না?

—দেহ ধরলেই বিস্মৃতি আসে। তবে তার ব্যবস্থা আছে। অন্য দিব্য পুরুষেরা গিয়ে আমায় বাল্যে ও যৌবনে নানাভাবে মনে করিয়ে দেবেন। ওঁরা দেখা দিতে পারেন আমায় স্বপ্নে কিংবা রাত্রিকালে, নয়তো ঘটনার এমন যোগাযোগ ঘটাবেন যে আমার আত্মা ক্রমশ জেগে উঠে বুঝতে পারবে পৃথিবীতে সে কেন এসেচে; ভোজ খেতে, নারী ও সুরা নিয়ে আমোদ করতে আসেনি। ভগবানের বিশ্বে এসবের ব্যবস্থা আছে—যে ভাল কাজ করতে চায়, তাকে সাহায্য দেওয়া হয়। তিনি যে বিরাট মহাশক্তি, সেই শক্তিকে তুষ্ট করতে পারলে জীব পলকে প্রলয় করতে পারে, অসাধ্য সাধন করতে পারে, মহাশক্তির সদয় সাহায্য সে পায়। এ রহস্য কে বোঝে? পৃথিবীতে সবাই অর্থ নিয়ে ব্যস্ত, সর্বত্র অনুপ্রাবিষ্ট এই করুণাময়ী মহাশক্তির রহস্যভেদ করতে ব্যস্ত ক'জন?

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আপনি বলছিলেন আপনার গ্রামে একটি মেয়ে ভগবানের দেখা পায়— সে কি রকম?

—সে উচ্চ অবস্থার মেয়ে। তার শেষ জন্ম হয় পৃথিবীতে, সাতশো বছর পূর্বে। মানব-আবর্ত কাটিয়েচে। স্বামী-ভাবে ভগবানকে চিন্তা করে। ভগবানের দেখা পায় সেইভাবে। আমি জানি ভগবানের এসব মায়িক রূপ। তাঁর রূপের কি কোনো সীমা আছে? ভগবানকে যে আন্তরিকভাবে ডাকে, তিনি তার কাছে যাবেনই। যে রূপে চায়, সে রূপেই যাবেন। এ একটা অমোঘ নিয়ম। যেমন চুম্বকের কাছে লোহা ছুটে যাবেই—তেমনি। ভগবান যাবেনই ভক্তরূপ চুম্বকের কাছে। তাঁকে টেনে নেবে আকর্ষণ ক'রে। ভগবান লোহা, ভক্ত চুম্বক। এ ওকে টানচে ও একে টানচে। পৃথিবীর লোককে এসকল কথা বিশ্বাস করানো কঠিন।

বিশ্বাস করলে তো মানুষ আর মানুষ থাকে না, ভগবান হয়ে যায়।

ওরা সব মহর্লোকের সেই গ্রামটিতে ফিরে এল। তারপর তিনি ওদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন আবাস-বাটী দেখালেন জনপদের। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে নানা রঙের ফুল, কোনো স্থানে কোনো অপার্থিব পশুর মূর্তি, স্ফটিকে তৈরি। কোথাও বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও সরোবর। দূরে দূরে এইসব বনবীথি ও উদ্যানের মধ্যে মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা। শুভ্র স্ফটিক প্রস্তর ছাড়া অন্য কোনো উপাদান এই প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়নি। গাছে গাছে কুসুমিত লতা মালার আকারে জড়িয়ে, আরতির পঞ্চপ্রদীপের শিখার মত কোনো কোনো রক্ত-বর্ণ পুষ্প ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ফুটে আছে। জনপদের কিছুদূরে নিভৃত অরণ্য শিলাবাঁধানো পথের দুপাশে, অথচ সে সব অরণ্যে জুঁই, গোলাপ, কাঞ্চন ফুলের মত দেখতে আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর আকারের সুগন্ধি বনকুসুম অজস্র ফুটে আছে। পাহাড়ের কোলে গুহা ও প্রস্তরনির্মিত মন্দির—যেন বহুকালের বলে মনে হয়।

ওদের সঙ্গী বল্লেন—ওই সব গুহাতে মহর্লোকের প্রাচীন সাধুরা ভগবানের চিন্তাতে নিমগ্ন থাকতেন। এখন বহুদূর পথে, অনেক ঊর্ধ্বলোকে তাঁরা চলে গিয়েচেন, পৃথিবীর হিসেবে হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। এখন ওগুলি তীর্থস্থান হিসেবে বিদ্যমান আছে, তবে ওই বনস্থলী, নিভৃত গিরিগুহা ও মন্দিরগুলিতে বসলেই আত্মা স্বভাবত অন্তর্মুখী ও আবৃতচক্ষু হয়ে নিজের হৃদয়কন্দরের অন্ধকার গহনে ডুব দিয়ে নিজের স্বরূপ বুঝতে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, আপনাদেরও কি ধ্যানধারণা সাধনার প্রয়োজন হয়?

· আমরা তো অনেক নিম্নলোকের জীব! সত্যলোকের ঊর্ধ্বস্তরের দিব্য মহাজ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপ জীবেরাও ধ্যান ও সাধনা দ্বারা আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করেন। ভগবানের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ সাধিত করেন। আমরা ধ্যান-ধারণা দ্বারা জন, তপঃ ও সত্য লোকের অধিবাসীদের সঙ্গে আদানপ্রদান চালাই। তাঁদের অদৃশ্য সাহায্য প্রার্থনা করি।

—তাঁরা কি আপনাদের কাছেও অদৃশ্য?

—সম্পূর্ণ। বিনা ধ্যান-ধারণায় তাঁদের মত উচ্চ জীবদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব নয়। আমাদের চোখে তাঁরা সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

—তাঁদেরও ঊর্ধ্বে লোক আছে?

—আছে, অনেক আছে। সত্যলোকেরই ঊর্ধ্বতন স্তরের জীবেরা ঐ লোকের নিম্ন স্তরের জীবদের নিকট অদৃশ্য। তার ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক তার ঊর্ধ্বে সর্বলোকাতীত পরব্রহ্মলোক বা গোলক। তারও ঊর্ধ্বে নিগুর্ণ ব্রহ্মলোক—কিন্তু সেখানকার খবর কেউ দিতে পারে না—কেউ জানে না। এসব লোকের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য—সাধারণ জীবেরা এর খবর রাখে না বা তাদের কোনো আবশ্যকও নেই এসবে। তবে আমারও এইসব লোক সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই—কারো থাকে না। ঊর্ধ্বলোকের কোনো কোনো দেবতা দয়া করে দেখা দিয়ে যেমন বলেচেন, তেমনি জানি।

—গ্রাম নগর বেঁধে বাস করেন কেন?

—আমরা বহুযুগ পূর্ব্বের আত্মা। আমাদের সমসাময়িক আত্মা এ লোকে আর নেই। আমরা পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরে উন্নতিলাভ করচি। নিজেদের মনের সাহায্যে এই জনপদ নির্মাণ করে একত্র বাস করি, ভগবানের উপাসনা ধ্যানধারণা করি—সাধ্যমত পৃথিবীতে বা অন্য গ্রহে গিয়ে স্থূল জগতের জীবদের উপকার করবার চেষ্টা করি। পৃথিবীতে যেমন গ্রাম জনপদ, সূক্ষ্ম জগতের এই সব জনপদ, বনবীথি, উদ্যানেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র সে সব। তাদের বিকার আছে, এদের বিকার নেই।

পুষ্প বল্লে—ভগবানকে স্বামী রূপে পেয়েচে সেই মেয়েটিকে একবার দেখাবেন না? ওঁর ভাগ্য অদ্ভুত তো!

দেবতা হেসে বল্লেন—ও সব হোল নারীর সাধনা। প্রেমভক্তির সাধনা—ভগবানের মায়িক রূপে দেখা পায়। তুমিও দেখা পেতে পারো কন্যা, যদি তোমার প্রেম জন্মে থাকে তাঁর প্রতি। ভগবান কল্পতরু-স্বরূপ, যথার্থ পিপাসু ও আকুল ব্যক্তিকে নিরাশ করেন না। তবে আমি ওগুলোকে পুতুলখেলা বলে বিবেচনা করি। নারীর ধর্ম, পুরুষের নয়। পুরুষ হবে জ্ঞানী, বীর, ত্যাগী।

পুষ্প বল্লে—কিন্তু মনে রাখবেন দেব, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমভক্তির সাধনা শিখিয়েচেন—

—জ্ঞানেরও, কর্মেরও। তাঁতে তিনেরই অপূর্ব সমন্বয়।

—শ্রীকৃষ্ণকে আপনি যাই বলুন, তিনি প্রেমের দেবতা। প্রেমময়, ভাবময়, সৌন্দর্যময়—এই তাঁর আসল রূপ।

—তুমি নারী, তোমার পক্ষে ওট ভাবই স্বাভাবিক বটে। তবে জেনে রেখো, জগতের বহু গ্রহে বহু জীবকুল বাস করে। ভগবান্ প্রত্যেক গ্রহে অসীম বিশ্বের সমস্ত জীবকুলের সম্মুখে তাদের ভাবানুযায়ী মায়িক রূপ নিয়ে দেখা দেন। তিনি অসীম, অনন্তরূপী, তাঁর কোনো শেষ নেই। কত লক্ষ শ্রীকৃষ্ণ আছেন, কত লক্ষ রামচন্দ্র আছেন তোমাদের পৃথিবীর তাঁর মধ্যে—একথা মনে রেখো।

—তাতে কি। সসীম মানুষ তাঁর কোটি কোটি মায়িক রূপ ধারণা করতে পারবে না। একটিমাত্র সুন্দর রূপের ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করুক। তাহোলেই তাঁকে পাবে তো?

—নিশ্চয়। এ তো হোল সহজ পথ। ভক্তির পথ সহজ পথ, নারীর পথ। জ্ঞানের পথ বীরের পথ, পুরুষের পথ—সে কথা তোমাকে তো আগেই বলেচি। ভগবানকে পাবে—ও পথেও, এ পথেও।

পুষ্প বল্লে—সেই সহজ সুন্দর পথের সহজ সুন্দর দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার মনের গোপন মন্দিরে বিরাজ করেন, তবে আমার জন্মমরণ ধন্য হবে, দেব। জীবনের এপারে বা ওপারে আর কিছুই চাইনে।

এই সময়ে একটি সুন্দরী নারী সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ অপূর্ব দিব্যভাবপরিপূর্ণ। অঙ্গকান্তি তরল জ্যোৎস্নার মত, বড় বড় চোখ দুটিতে অসীম সারল্য ও অন্তর্মুখিতা। মহাপুরুষ

পুষ্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন—এই সেই কন্যা। এর নাম সুমেধা—ভারতবর্ষেরই কন্যা।

পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেবি, ভগবানের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল—

নারী হেসে বল্লেন—আমি সব শুনেচি—তাঁর স্বরূপ কি শুনবে? আমি খুব ভাল করে দেখেচি। তিনি বালকস্বভাব, পথের বাঁকে বসে থাকেন উৎসুক হয়ে, ধরা দেবার জন্যে। কিন্তু তাঁর পেছনে ছুটতে গেলে তিনি বালকের মত হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে যান—

যতীন অভিভূত ও মুগ্ধভাবে বলে উঠলো—বাঃ মা, বাঃ, কি সুন্দর অনুভূতির কথা!

পুষ্পও মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী ভাবময়ী নারীর দিকে চেয়ে রইল। রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে বল্লে—তারপর? তারপর?

—তারপর কি জানো? সেই সময় যদি তুমি হতাশ হয়ে ছুট দেওয়া বন্ধ করো—তবে ভগবান নিরাশ হবেন, দাঁড়িয়ে যাবেন, বালকের মত। তিনি চান জীব তাঁর পেছনে পেছনে খানিক ছোটে, হাঁপায়। ভগবান জীবের সঙ্গে বালকের মত খেলা করেই মহাখুশি। না থেমে তবুও ছুটলে ভগবান শেষে অকারণেই আবার ফিরে আসবেন, হাসতে হাসতে ধরা দেবেন। অতএব ভগবানকে নিরাশ করো না, তাঁকে একটু জীবকে নিয়ে খেলা করতে দাও তিনি বড্ড একা—

দেবীর চোখ স্নেহে ও প্রেমে ছলছল করে উঠলো।

পুষ্প বল্লে—চমৎকার! আজ অতি সুন্দরভাবে বুঝলাম। সহজভাবে বুঝলাম। আপনার অনুভূতি সহজ বলেই সহজভাবে বুঝেচেন তাঁকে।

যতীনের মন পুষ্পের এ কথায় সায় দিলে।

ওদের সঙ্গী কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন উদাসীনের মত—যেন তিনি এসব ভাবালুতার বহু ঊর্ধ্বে, জ্ঞান ও তপস্যার দৃঢ়ভূমির উপর স্বপ্রতিষ্ঠ।

যতীন ও পুষ্প তাঁকেও প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করলে।

মেয়েটি ওদের হাসিমুখে বল্লে—আবার এসো তোমরা। আমি এখানে শীগগির উৎসব করবো—বনকুসুম-উৎসব। জনলোকের অনেক নারীপুরুষ আসে, সবাই বনফুলের মালা দেন আমার বিগ্রহের গলায়। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাবো।

পুষ্প বল্লে—দেবি, কল্প-পর্বতের সঙ্গীত শুনতে যান না আপনি? আবার তো সেদিন আসচে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

—আমি প্রতিবারই যাই। আমাদের গ্রামের সকলেই যায়। ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মায় ওই সঙ্গীত শুনলে—অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির দরজা খুলে যায় বলে অনেক উচ্চ স্তরের নরনারী আসেন সেদিন। যেও সেখানে—আমিও যাবো।

[illegible] গ্রামের প্রান্তে বনবীথির অন্তরালে একটি শুভ্র স্ফটিকের মন্দিরে মেয়েটি ওদের দুজনকেই নিয়ে গেল। সেখানে পা দিয়েই পুষ্প বুঝতে পারলে এ অতি পবিত্র স্থান দেবতার আবির্ভাব দ্বারা এর অণু-পরমাণু ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে গিয়েচে, এখানে এসেই তারমনে হোল এখানে

নির্জনে বসে ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান করি। রঘুনাথদাসের আশ্রমের মত এর পুণ্যময় প্রভাব।

মেয়েটি হঠাৎ বল্লে—সমুদ্র দেখবে ভাই ?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কোথায় ?

—ওই ছাখো—

পুষ্প সত্যই দেখলে, সেই বনবীথির ওপারে বিশাল সুনীল মহাসাগর ঢেউএর ওপর ঢেউ তুলে বহুদূরে দিগন্তে মিশে গিয়েচে—কোনো কূল নেই, কিনারা নেই। তার অনন্ত জলরাশির ওপর নীল মহাব্যোমের প্রতিচ্ছায়া—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, সমুদ্রতীরে এক শিলাখণ্ডে বিশাল বৃক্ষতলে মেয়েটি ওর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে। পুষ্পের মনে হোল ওর সমস্ত সত্তা এই অনন্ত মহাসমুদ্রের কূলরেখা ধরে বহুদূর অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্চে, জগৎস্বপ্ন যেন লয় হয়ে যাচ্চে স্বসংবেদ্য আত্মানুভূতির শান্ত গভীরতায়। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো মুখে আঁচল দিয়ে। কি মধুর হাসি তার সুন্দর মুখের। বল্লে—কেমন ঠকিয়েচি ভাই ?

পুষ্প বল্লে—সমুদ্র কোথা থেকে এল এখানে ? আমিও তাই ভাবচি।

—সমুদ্রতীরে এই গাছতলায় বসলে তাঁর কথা বড় মনে হয়—তাই তৈরি করে রেখেচি।

—সব সময় থাকে ?

—সব সময়। তবে অন্য কেউ আমার মনের ভূমিতে না পৌঁছুলে দেখতে পায় না। আমার কাছে সর্বদাই সত্যি—অন্যের কাছে অবাস্তব।

—এ গ্রামের অন্য লোকের কাছেও ?

—আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। তুমি ভাই ভালবাসবে বলে তোমাকে আমার ভূমিতে নিয়ে এসে দেখালাম। বলো ভালো ?

—আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো জানিনে দেবী। কত ভালো যে লাগচে এই বন, এই পাথরের বেদী, এই নীল সমুদ্র—এখানে ভগবানের আসাযাওয়ার পায়ের চিহ্ন আছে।

—আছেই তো। উনি যে আসেন লুকিয়ে আমার কাছে। জানো না ভাই ?

মেয়েটির গলার সুরে পুষ্পের মমতা জাগলো। শ্রদ্ধাও। এই শিলাস্তৃত সমুদ্রবেলায় দেবতার শুভঙ্কর আবির্ভাবের কথা লেখা রয়েচে। পুতুলখেলা হয়তো। হোক্ পুতুলখেলা। সে নারী, এই তার ভাল লাগে।

সে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, একটা কথা বলুন। মেয়েরা কি খারাপ ? পৃথিবীতে কেন একথা সাধু-মহাজন বলে এসেচেন ?

—মেয়েরা সাধনপথের বিঘ্ন, তাই।

—কেন ?

—বিভ্রান্ত করে দেয় পুরুষের মন। প্রকৃতির কাজ করবার জন্যে মায়ার সৃষ্টি করে। পুরুষেরা মজে অতি সহজেই। সখি, তোমার এই মুখখানি নিয়ে এই মহর্লোকেই একবার পরীক্ষা করে ছাখো না ?

—সত্যি আমরা কি এতই হেয় ?

— হেয় বা খারাপ এমনি হয়তো কিছু না, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। যে ভগবানকে পেতে চায়, যে জ্ঞানের সাধনা করতে চায়, ভক্তির সাধনা করতে চায় —সে নারী থেকে দূরে থাকবে, এই বিধান। অন্ত লোকে যত খুশি মিশুক —কে বারণ করচে? সাধনার পথের পথিক যারা নয় তাদের কি বাধা আছে নারীসঙ্গের? নারী প্রেমের সাধিকা হয় অতি সহজে, পুরুষে তা পারে না। নারী পাপের পথেও নিয়ে যায়, কল্যাণের পথেও নিয়ে যায়। কারণ, চিত্তনদী উভয়তোমুখী, বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায়। খুব সাবধানে না চললে সর্বনাশ আসে ওদের থেকে। সাপ খেলাতে সবাই জানে না। আনাড়ী সাপুড়ে সাপের হাতে মরে।

— স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি চিরকালের?

—যেখানে প্রেম থাকে। নয়তো কিসের সম্বন্ধ? যেখানে প্রেম আছে, প্রেমের দেবী মিলিয়ে দেন। স্বামী-স্ত্রী না হোলেই বা কি। প্রেম নিয়ে বিষয়—কিন্তু এ ধরনের প্রেম সাধনা-লব্ধ বস্তু। দেহের বা রূপের মোহ এ প্রেমের জন্ম দিতে পারে না। রূপজ প্রেম দিয়ে প্রকৃতি তার কাজ করিয়ে নেয় মাত্র।

—আপনি কি করে এসব জানলেন?

মেয়েটি হেসে বল্লে—কত যে ঠকেচি ভাই কত শত জন্ম ধরে। কত নেমে গিয়েছিলাম, কত ভুগেছিলাম—জন্ম-জন্মান্তরের সে সব স্মৃতি ও সংস্কার আমাকে জ্ঞানী করেচে। একজন্মে দুজন্মে সাধু হওয়া যায় না ভাই—মহর্লোকেও আসা যায় না।

—আবার আপনি জন্মাবেন?

—পৃথিবীতে আমার শেষ জন্ম হয় বহুকাল আগে—পৃথিবীর সে হিসেব ভুলে গিয়েচি। আর সেখানে যাবো না। ভগবান আমায় দয়া করেচেন।

—যদি আপনার মত মেয়ের দরকার হয় পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার?

—সে অবস্থায় ভগবানের নির্দেশ পাবো। জীবের সেবা করবার ভার—সৌভাগ্যের কথা সে। তিনি যদি আমায় না ছাড়েন ভাই, নরকে যেতেই বা কি? উনি হাত ধরে নিয়ে গেলে নরক আর বলি কোথায়! কিসের স্বর্গ কিসের নরক? থাকুন তো উনি আমার সঙ্গে!

মেয়েটির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দর-দর ধারে।

পুষ্প অবাক হোল ওঁর অনুভূতির তীব্রতায়। শ্রদ্ধায় ভক্তিতে ভ'রে উঠলো তার মন।

মেয়েটি আবার বল্লে—ভগবান এই আলোর কমল বিশ্বজগৎ হয়ে ফুটে আছেন। তাঁর করুণার আলো। কাউকে তিনি ভোলেন-না, অবহেলা করেন না ভাই—তাঁর মত প্রেমিক কে? যে ডাকে, যে তাঁর শরণ নেয়, তিনি তারই দোরে ছুটে যান, পাপী-পতিত মানেন না। কিন্তু ভাই, কেউ কি তাঁকে চায়?

সমুদ্রতীরের বিশাল বৃক্ষতলে নীল উর্মিমালার দিকে চেয়ে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে। মেয়েটি সুন্দর ভঙ্গিতে হাত তুলে দূরে দেখিয়ে বল্লে—ওই মহাসমুদ্রের মত অন্তহীন তাঁর করুণা! কেউ বুঝতে পারে না, বলে তাঁকে নিষ্ঠুর। তিনি দু'তিন জন্মের মঙ্গল করেন একজন্মের কর্মক্ষয় ক'রে। পৃথিবীর লোকে সন্ত সন্ত ফল চায়। বোঝে না তিনি কি করতে চাইচেন। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে

অনেক সময় আসে তাঁর করুণা। কাজেই অবুঝের গালাগালি তাঁকে সহ্য করতে হয়।

পুষ্প বল্লে—আপনি দেবী, কি আনন্দ হোল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমার সঙ্গী মহর্লোকে বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। আজ আমি যাই—

—আবার এসো ভাই, আসবে ঠিক? আমার পায়ে হাত দেওয়া কি ভাই? তুমিও তো কম নও। আমি তোমাকে চাই। এসো—আনন্দে থাকো ভাই।

মেয়েটির অব্যর্থ আশীর্বাদ। সত্যিই এক অপূর্ব আনন্দের প্রসন্ন হিল্লোল বয়ে গেল পুষ্পের মনে। এ জগতে ভয় নেই, অমঙ্গল নেই—মেয়েটি বলেচে, ভগবানের আশীর্বাদ রয়েচে বিশ্বের ওপরে।

ফিরে এসে বুড়োশিবতলার ঘাটে বসে সেদিন সন্ধ্যায় পুষ্প যতীনকে ওই অদ্ভুত মেয়েটির গল্প শোনালে।

সেদিন ফিরে আসবার পর আরও কিছুকাল কাটলো। বুড়োশিবতলার ঘাটে যে সংসার পেতেছিল পুষ্প, তাতে যেন ভাঙন ধরেচে। আজ সাত বছর আগে প্রথম যেদিন যতীন এখানে আসে, সেদিনটি থেকে পুষ্পের কত সাধ, কত আনন্দ, ছেলেবেলার সেই প্রিয় সাথীকে নিয়ে এখানে সংসার পাতবে। তাই অনেক আশা করে সাজিয়েছিল বুড়োশিবতলার ঘাটের সংসার।

ওপারের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে আরতি-ঘণ্টাধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প আগে নিজেদের ঘরে প্রদীপ দেখায়, গৃহদেবতার সামনে সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে ফলফুলের অর্ঘ্য নিবেদন করে, মনে মনে দেবদেবীকে স্মরণ করে। রঘুনাথদাস ওকে একটি সুন্দর স্ফটিক-বিগ্রহ এনে দিয়েচেন, তিনি বলেন একজন শিল্পী মননশক্তি দ্বারা ভুবর্লোকের পদার্থে ইচ্ছামত রূপান্তর ঘটিয়ে এই সব দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করেন—এই লোকেরই চতুর্থ স্তরে কোথায় তিনি থাকেন। পুষ্প বলেছিল একদিন সেখানে গিয়ে দেখে আসবে।

কিন্তু কি জানি পুষ্পের ভাগ্যে কোথায় যেন কি গোলমাল আছে। সব মিথ্যে হয়ে যায় কেন? হঠাৎ আশা-বৌদিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেচে।

সেই মুহূর্তেই পুষ্প টের পেয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যতীন তার কিছুই জানে না। যতীনের মুখের দিকে চেয়ে ওর কষ্ট হোল। আশা প্রারব্ধ কর্মের ফলে ভুবর্লোকের কোনো নিম্ন-স্তরে হয়তো ঘুরচে—যতীনদার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়, পুষ্প এতা বুঝেচে।

সুতরাং মিছিমিছি কেন যতীনদাকে আশার মরণের কথা জানিয়ে কষ্ট দেওয়া। পৃথিবীতে থাকলেও তারা যেমন কোনো সাহায্য করতে পারেনি, এখানেও ঠিক তেমনি অবস্থা দাঁড়াবে। এ-লোকেও নিম্ন স্তরের অধিবাসী আশার কাছে সে ও যতীনদা যেমনি অদৃশ্য ছিল পৃথিবীতে থাকতে, তেমনিই থাকবে।

কিন্তু আশা কোথায় আছে একবার দেখা দরকার।

সেদিন সে রঘুনাথদাসের কাছে গেল, যতীনকে কিছু না জানিয়ে। দেখা পাবে কিনা সন্দেহ ছিল, কারণ এ সব মহাপুরুষ নিজের খেয়ালে থাকেন, আজ আশ্রম আছে, কাল নেই। সর্বপ্রকার

মায়াবন্ধনের অতীত এঁরা। ভগবানের দেহে লয় না হয়ে ভক্তিসেবার জন্যে চিন্ময় আশ্রমে চিন্ময় বিগ্রহ স্থাপন ক'রে সেবামৃত আস্বাদ করচেন মাত্র। আজ আছেন, কাল হয়তো নাস্তি। দেখাই যাক্।

রঘুনাথদাস আচার্যকে তার বড় ভাল লাগে। প্রেমে স্নেহে বালকস্বভাব বৃদ্ধ সাধু ঠিক যেন তার বাবার মত। আজ তার মনে হোল এ বিপদে এঁরই আশ্রয় নিতে হবে। অতি উচ্চ স্তরে সাধুর আশ্রম, সেখানে পৌঁছোনো তার পক্ষে সব সময় সহজ নয়—তবে ভগবানের কৃপা ভরসা।

আশ্রমটি একটি বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। সাধুর আবাসস্থানের মাহাত্ম্যে দূর থেকেই পুষ্পের মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হোল—এ ভাব সে পূর্বেও এখানে আসবার সময় গাঢ় ভাবেই অনুভব করেচে। সে অপূর্ব আনন্দরস···বার বার জন্মমৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত, কোন্ লীলাময়ের অনন্ত লীলারাজ্যে সে নিত্য অভিসারিকা চিরযৌবনা প্রেমিকা···জগন্মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের পার্শ্বচারিণী।

সেই শ্বেত স্ফটিকের দুগ্ধধবল গোপাল-মন্দিরটি দূর থেকে দেখেই পুষ্প উদ্দেশে প্রণাম করলে। মন্দিরের চারিপাশের পুষ্পবাটিকাতে কত ধরনের ফুল ফুটে আছে, পূর্ব-পরিচিত এই সুন্দর লতাকুঞ্জটিতে রঘুনাথদাস বসে নামগান করচেন। এবার তিনি একা নন, দুটি বালক ও দুটি উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কুমারী সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে হাততালি দিয়ে গানে যোগ দিয়েচে। কেমন চমৎকার সুগন্ধ এখানকার! সেবারও এখানে আসতেই পুষ্প পেয়েছিল—অগুরু, চন্দন, সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া, কত কি ফুলের সুবাস মিলে এই স্বর্গীয় সুগন্ধটার সৃষ্টি করেচে। আশ্চর্য, কোনো পার্থিব ধরনের বাসনা একেবারে থাকে না এই সুমধুর গন্ধময়, নিস্তব্ধ, চিরশান্তিময় পরিবেশের মধ্যে।

ওকে দেখে রঘুনাথদাস বল্লেন—এসো মা। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম, বোসো।

পুষ্প ওঁকে প্রণাম করতেই আচার্য বল্লেন—অপুনর্ভব হও।

বিস্ময়ে পুষ্প শিউরে উঠে বল্লে—কি বল্লেন আচার্যদেব! ওকি কথা?···জানেন—

তিনি হেসে বল্লেন—ঠিক বলেচি মা।

—আপনি তো জানেন, আমার বাসনা কামনা কিছুই এখনো যায়নি, পৃথিবীতে আমার যাতায়াত বন্ধ হোলে কি করে চলবে? বলুন আপনি। জন্ম এখন থেকেই বন্ধ হবে?

রঘুনাথদাস পুষ্পের গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে অনেকটা যেন আপনমনে সুর করে বল্লেন—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী, অথবা কীটপতঙ্গে
করমবিপাকে গতাগতি পুনপুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।

এমন দিব্য মধুর সুরের সে গান, বিদ্যাপতির বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠলো সুগায়ক রঘুনাথ-দাসের কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে।

তারপর পুষ্পকে বল্লেন—যাও, গোপালকে দেখা দিয়ে এসো। বড় অভিমানী—সামলে রাখতে হয়।

পুষ্প হেসে বল্লে—ওসব আপনার সঙ্গে, কই আমাদের সঙ্গে তো কোনোদিন একটা কথাও—

· হবে। দেখতে পাচ্চি মা, দেখতে পাচ্চি। গোপালের চিহ্নিতা সেবিকা তুমি। সাধে কি বলেচি অপুনর্ভব হও? আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা বার হয়নি।

—আপনি বুড়ো দাদু হয়ে বসে আছেন, দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্চেন কেন? ও রকম বল্লে মেয়ের অপরাধ হয় না?

বৃদ্ধ প্রসন্নমুখে বল্লেন—ঠিক মা ঠিক। যাও দেখে এসো—

একটু পরে পুষ্প আবার এসে তাঁর কাছে বসলো। এখানে সে কিজন্যে এসেছিল তা যেন ভুলে গিয়েচে। এ পবিত্র আশ্রমে বসে কি করে ঐ সব কথা বলবে! হয়তো শেষ পর্যন্ত বলতে পারতো না, কিন্তু রঘুনাথদাসই বল্লেন—তোমাকে অন্যমনস্ক বলে মনে হচ্চে কেন?

—আপনি অন্তর্যামী, সব জানেন। লজ্জা করে আপনাকে মুখে বলতে—

রঘুনাথ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর গম্ভীরভাবে বল্লেন—কি চাও মা?

—সেই হতভাগীর সঙ্গে দেখা করতে বড় ইচ্ছে হয়। কি ভাবে আছে,—যদি কোনো উপকার করতে পারি।

—সেই মেয়েটি প্রেতলোকে রয়েচে। তার চোখ খোলেনি, মনও অপরিণত। তার ওপর আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপের ফলে প্রকৃতি একটা প্রতিশোধ নেবে।

— একবার দেখা হয় না?

—সে কোথায় আছে জানি না। ভুবর্লোকের নিম্নস্তর, যাকে সাধারণত নরক বলে থাকে পৃথিবীর ভাষায়—সে অনেক বড় জায়গা। তারও আবার অনেক স্তর আছে—চলো দেখি—

—প্রভু, আমার সঙ্গে তার একভাবে খানিকটা যোগ আছে, সুতরাং আমি গেলে তাকে বার করা সহজ হবে।

—ওসব না। সে মেয়েটি পৃথিবীর যে গ্রাম থেকে এসেচে—তারই নিকটবর্তী কোনো নিম্নলোকে ভ্রাম্যমানা। স্থূল ধরনের বাসনা-কামনা নিয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ ছেড়ে উর্ধ্বলোকে ওঠা অসম্ভব।

একটু পরে পুষ্প রঘুনাথদাসকে নিয়ে প্রথমে এল কুড়ুলে-বিনোদপুর, সেখানে কোনো সন্ধান না পেয়ে গেল আশার বাপের গ্রাম রসুলপুরে। কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর ধূসরবর্ণের আত্মা গ্রামের বাঁশবনে, তেঁতুলগাছের ডালে, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছে পা ঝুলিয়ে বসে হাওয়া খাচ্চে। একটি দুষ্ট আত্মা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণপাড়ার পুকুরপাড়ের এক নোনা গাছে বসে স্নানরতা স্ত্রীলোকদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। প্রায় তুরীয় অবস্থায়। পুষ্প মনে মনে হেসে বল্লে—ছ্যাখো পোড়ার-মুখোর কাণ্ড! ইচ্ছে হয় গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে আসি—হাঁ করে যেন কি গিলচে—হি হি—

অবিশ্যি ওই সব নিম্ন স্তরের আত্মার কাছে তারা অদৃশ্যই রইলো।

রঘুনাথদাস বল্লেন—চলো, এখানকার কাছাকাছি নিম্নলোকে—এখানেই আছে।

অল্প পরেই ওরা এক বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরের ন্যায় উষর স্থানে এসে পড়লো। তার চতুর্দিকের চক্রবাল-রেখা ধূম্রবাষ্পে সমাচ্ছন্ন—যেন মনে হয় কাঁচা বনে লতাপাতা পুড়িয়ে অজস্র ধূম সৃষ্টি করে দাবানল জ্বলছে। অথচ অগ্নিশিখা দৃশ্যমান নয়—শুধুই মরুময় ধূ ধূ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বৃক্ষলতাহীন প্রস্তরস্তূপ। ওরা সেই জনহীন মরুদেশের ওপর দিয়ে শূন্যপথে ধীরগতিতে যেতে যেতে দেখলে সে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে জনহীন, বৃক্ষলতাহীন। সেখানকার আকাশ নীল নয়, ঘোলাটে ঘোলাটে শুভ্র লঘু বাষ্পে ঢাকা। পুষ্পের মনে হোল ভাদ্র মাসের গুমটের দিনে পৃথিবীর আকাশে যেমন সাদা মেঘ জমে থাকে—অনেকটা তেমনি।

পুষ্প বল্লে—এই জায়গাটা যেন কেমন বিশ্রী—

রঘুনাথদাস বল্লেন—এই সব ভুবর্লোকের নীচু স্তর, পৃথিবীতে যাকে নরক বলে। এ অনেক দূর ব্যেপে রয়েচে—হাজার হাজার ক্রোশ চলে যাও, পৃথিবীর ঠিক ওপরে পৃথিবীর চারিপাশ ঘিরে এ রাজ্য বর্তমান। অথচ পৃথিবীর লোকের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এখানকার বাসিন্দারা আবার ভুবর্লোকের কোনো উচ্চ স্তর দেখতে পায় না।

—হাজার হাজার ক্রোশ! এমন জনহীন!

—তারও বেশি। যতদূর চলে যাও, এ অদ্ভুত লোকের আদি অন্ত পাবে না। বহু হাজার ক্রোশ চলে যাও, এমনি। এ কোনো বাইরের অবস্থা নয়। এখানকার বাসিন্দাদের মানসিক-অবস্থা-প্রসূত। এরাও অনেক সময় যতদূর যায়—এ জনহীন মরু-পাথরের দেশের আদি-অন্ত পায় না খুঁজে, অন্য কোনো প্রাণীকেও দেখতে পায় না। চন্দ্র নেই, সূর্য নেই, তারা নেই—এই রকম চাপা আলো—কখনো কালো হয়ে আসে, ঘোর কালো, পৃথিবীর অমাবস্যার মত। উপনিষদে এ লোকের কথা বলে গিয়েচে—অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা—এই সে ভীষণ অন্ধ-তমিস্রা লোক—একশো বছর পর্যন্ত হয়তো টিকে যায় সেই অন্ধকার কোনো কোনো পাপী আত্মার কাছে। সে হতভাগ্য আশ্রয় ও আলো খুঁজে, সঙ্গী খুঁজে হয়রান হয়ে পড়ে।

পুষ্প শিউরে উঠলো। অস্পষ্ট স্বরে বল্লে—একশো বছর ধরে অমাবস্যা!

রঘুনাথদাস হেসে বল্লেন—কন্যা, জন্ম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশী শ্রীকৃষ্ণমুরারির শরণ নাও—যেন এখানে কোনোদিন আসতে না হয়। এ হোল হিরণ্যগর্ভদেবের রাজ্য, তিনি এখানে শাসক ও পালক।

—তিনি কে?

—ব্রহ্মের তিন রূপ—স্থূলরূপে বিরাট, সূক্ষ্মরূপে হিরণ্যগর্ভ, কারণ-স্বরূপ ঈশ্বর।

—প্রভু, পৃথিবীর গ্রহদেব বৈশ্রবণ কে?

—তিনি পূর্বকল্পের মহাপুরুষ। পৃথিবীর প্রজাপতি।

—তবে আপনার গোপাল কে?

রঘুনাথদাস প্রসন্ন হাস্যে বল্লেন—গোপাল সব। আমি ওকেই জানি। ওই ব্রহ্ম, ওই আত্মা, ওই ভগবান। আমি আর কারো খবর রাখিনে। ব্রহ্মের সাকার রূপ, জ্ঞানচক্ষে দেখলে মায়িক রূপ বটে। কিন্তু আমার চোখে গোপাল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করে রেখেচে। আমার আর

কোনো তত্ত্বে দরকার কি। ভক্তির চোখে ভাবের চোখে দেখতে শেখো ভগবানকে। তাঁর ঐশ্বর্য ভুলে যাও। তাঁকে বন্ধু ভাবো পুত্র ভাবো পতি ভাবো—এমন কি দাস ভাবো।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—দাস ভাববো? কি বলেন ঠাকুর!

রঘুনাথ চাৎকার করে বল্লেন—কেন ভাববে না? দাবি করে ভাবো। প্রেমের সঙ্গে দাবি করে ভাবো। তিনি ভক্তের দাসত্ব করেচেন—করেন নি? তিনি যে প্রেমের কাঙাল—তাঁকে যেভাবেই ডাকো, ডাকলেই সাড়া দেবেন। তবে প্রেমের সঙ্গে ডাকা চাই। ভয় করে ডেকো না। ভয় করবার কিছু নেই তাঁকে।

পুষ্প মেয়েমানুষ, এ সব কথায় ওর চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়লো। যুক্ত করে নমস্কার করে বল্লে—আপনার আশীর্বাদ, ঠাকুর। নরকে এ কথা বল্লেন, নরক যে পুণ্যস্থান হয়ে উঠলো!

এমন সময় পুষ্প দেখতে পেলে আশাকে। একটা কালো পাথরের অনুর্বর টিলার ওপর সে মলিনমুখে চুপ করে বসে আছে।

রঘুনাথদাস বল্লেন—তুমি যাও মা। আমি এখানে থাকি।

—কিন্তু আমাকে যে ও দেখতে পাবে না?

—পাবে, যাও। কিন্তু একটা কথা মা—

—কি?

—ওই কন্যাটির এখনও জ্ঞান হয়নি।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—সে কি প্রভু! ও তো দিব্যি জেগেই বসে আছে।

—ও মেয়েটি ধূম্রযান দক্ষিণমার্গের পথিক। ওর গতির পথ বেঁকে আছে ধনুকের মত পৃথিবীর দিকে। তুমি দেখতে পাচ্ছ না মা! ও অল্পদিন হোল পৃথিবী থেকে এসেচে—তার ওপর স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হয়নি। আত্মহত্যা করেচে। ওর মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণাই হয়নি। যাও, কাছে গিয়ে বুঝতে পারবে।

পুষ্প কাছে যেতেই আশা বল্লে—তুমি আবার কে গো? হ্যাগো, এটা কি আলিপুরের বাগান?

পুষ্প সস্নেহে বল্লে—কেন বৌদি? এটা কি বলে মনে হচ্চে?

—বাড়ীওয়ালী মাসী বলেছিল আলিপুরের বাগান দেখাতে নিয়ে যাবে। সেখানে একটি কোন্ বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। আমি বলি, ছি ছি, কি ঘেন্না, বলি—নেত্যদার সঙ্গে চলে এসেছিলাম সে আলাদা কথা। অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছিলাম, কে খেতে পরতে দেয় সংসারে ...না হ্যাঁ, সত্যি কথা বোলবো। মা বুড়ো হয়েচেন, তাঁর ঘাড়ে আমার আর একটি বিধবা দিদি ...আচ্ছা, মাহেশের রথতলা এখান থেকে কত দূর? তুমি কে?

পুষ্প ওর পাশে গিয়ে বসলো। ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আমি তোমাকে চিনি। তুমি আমার বৌদিদি হও।

—তা এখানে কি মানুষ নেই? এটা কোন্ জায়গা? খিদে-তেষ্টা পেয়েচে কিন্তু একখানা খাবারের দোকান নেই। মাহেশের রথতলাতে আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি থাকে। সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় যেতে লজ্জাও করে—

—তুমি এখানে এলে কার সঙ্গে?

—এলাম কার সঙ্গে তা মনেই পড়ে না। একদিন বাড়ীওয়ালী মাসী বল্লে—তোমায় আলিপুরের বাগানে নিয়ে যাবো—সেখানে একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চায়। ঘরে সেদিন কিছু খাবার নেই। বাড়ীভাড়া কুড়ি টাকার জন্যে তাগাদা করে করে বাড়ীওয়ালী তো আমার মাথা ধরিয়ে দিতে লাগলো। রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুলাম, তারপর যে কি হোল, আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

—বাড়ীওয়ালী তোমায় আলিপুরে নিয়ে গিয়েছিল?

—কি জানি ভাই, তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। এখানে আজ ক'দিন আছি তাও মনে নেই। খিদে-তেষ্টা পেয়েচে—অথচ খাবার পাইনে। না আছে একটা লোক, না আছে একটা দোকান-পসার। আচ্ছা, এর বাজারটা কোন্ দিকে?

পুষ্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—আশা বৌদি, যতীনদাকে মনে পড়ে?

আশা কেমন যেন চমকে উঠে, ওর দিকে অল্পক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে বল্লে—তুমি তাঁকে কি করে জানলে?

—জানি আমি। দেশের লোক যে গো! একগাঁয়ে বাড়ী।

আশার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। হাত দিয়ে মুছে বল্লে—তিনি স্বর্গে চলে গিয়েচেন, তাঁর কথা আর আমার মুখে বলে কি লাভ?

—সে কথা বলচিনে বৌদি, সত্যি কথা বলো তো আমার কাছে, তাঁর কথা তোমার মনে হয় কি না?

আশা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—হয়। যখন হয় তখন বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে—

—কেন বৌদি?

—আমি হতভাগী তাঁকে একদিনও সুখ দিইনি। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, বুঝতাম না—কেবলই বাপের বাড়ী এসে থাকতাম শ্বশুরবাড়ী থেকে—

—কেন?

—শ্বশুরবাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট পেতাম। ছেলেমানুষ তখন—

—তোমার একথা সত্যি নয় বৌদি। আমার কাছে সব খুলে বলো না ভাই?

আশা চুপ করে নখ খুঁটতে লাগলো। এ কথার কোনো জবাব দিলে না। পুষ্প বল্লে—বলবে না ভাই?

আশা বল্লে—কি হবে শুনে সে সব কথা। আমার বুদ্ধির দোষেই যা কিছু সব হয়েচে। আমি আমাদের গ্রামের মজুমদার-পাড়ার একটা ছেলেকে ভালবাসতাম।

—বিয়ের আগে থেকে, না বিয়ের পরে ?

—বিয়ের আগে নয়, কিছুদিন পরে।

—বিয়ের পরে অন্য কারো সঙ্গে ভাব করতে গেলে কেন ? এটা খুব অন্যায় হয়েচে তোমার বৌদিদি। হিন্দুর মেয়ে, দ্বিচারিণীর ধর্ম কে শেখালে তোমায় ?

আশা চুপ করে রইল। পুষ্পের কড়াসুরে বোধহয় একটু ভয় খেয়েই গেল।

—কথার উত্তর দিলে না যে ?

—আমার অদেষ্ট ভাই। ও কথার কি উত্তর দেবো ?

—কিন্তু আমি তোমায় বলচি তুমি এখনও সেই লোকটাকেই ভালবাসো। যতীনদার ওপর তোমার কোনো টান নেই। আমি সব বুঝতে পারি ভাই। আচ্ছা, তোমার ঘেন্না হয় না ? যার জন্যে এত কষ্ট, যে তোমাকে ফেলে চলে গেল, যার জন্যে তোমাকে আফিং খেয়ে মরতে হোল, আবার সেই ইতর লোকটার জন্যে এখনও ভাবনা ? যতীনদা দেবতার মত স্বামী তোমার, তাকে একদিন দেখলে না মরবার সময়ে, তার কুলে কালি দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এলে—

আশার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বল্লে—আফিং খাওয়ার কথা তো কেউ জানে না—তুমি কি করে জানলে ? আমি তো—

—আফিং খেয়ে তুমি মারা গিয়েচ বৌদি। তুমি বেঁচে নেই—মরে প্রেতলোকে এসে কষ্ট পাচ্চ—

আশা এবার যেন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এটা তাহলে ঠাট্টা! তবুও আফিং খাওয়ার কথা এ কি ভাবে জানলে! পরক্ষণেই একথা ওর মনে হোল—কে এ মেয়েটা, গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেচে ? এত হাঁড়ির খবরে ওর কি-ই বা দরকার ? ওর গলা ধরে কে কাঁদতে গিয়েচে তা তো জানি নে। সে যা খুশি করেচে, তার জন্যে ওর কাছে এত কৈফিয়ৎ দেবার বা কি গরজ। শ্বশুরবাড়ীর লোক বোধ হয়, ওই গাঁয়েরই মেয়ে—তাই এত গায়ে ঝাল।

মৃদু এসে বল্লে—তা যাই বলো ভাই—মরে ভূত হওয়াই বই কি এক রকম—

পুষ্প দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে—তা নয়। আমি ঠাট্টা করিনি। মারা তুমি গিয়েচ। আফিং খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে ছিলে কলকাতার বাসায়, মনে নেই ? তারপর তুমি মরে যাও, মরে এই প্রেতলোকে এসেচ।

আশার মুখে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধতার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ও বল্লে—এখনও বিশ্বাস হোল না বৌদি ? আচ্ছা, তোমায় বিশ্বাস করাবো। চলো—তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের বাড়ী যাবে ?

আশা কিছু না ভেবেই ঝোঁকের মুখে বল্লে—সেখানে আর কি মুখ নিয়ে যাবো—

—গেলেও কেউ টের পাবে না। সত্যি-মিথ্যে চলো চট্ করে পরীক্ষা করে নিয়ে আসি। তোমার প্রেতদেহ হয়েচে। এ দেহ পৃথিবীর মানুষের চোখে অদৃশ্য।

পুষ্পের কথার ভাবে ও সুরে আশা কি বুঝলে যেন, ওর হঠাৎ ভয়ানক আতঙ্ক হোল। কি সব কথা বলে এ! যদি সত্যিই তাই হয় ? সে যদি সত্যিই মরেই গিয়ে থাকে ?

ঠিক সেই সময় একটি নিম্নশ্রেণীর প্রেত দুটি অল্পবয়সী মেয়েকে একাকী দেখে পূর্বসংস্কার-বশত ওদের দিকে ছুটে এল। মুখে দু-একটি অশ্লীল কথাও উচ্চারণ করলে, ঘোর কামাসক্তিতে তার চোখ ও মুখের অবস্থা উন্মত্ত পশুর মত।

ওর বিকট হাবভাব দেখে আশা ভয়ে পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বল্লে—এই দ্যাখো ভাই কে একটা আসচে—মাগো—

পুষ্পও ভয় পেয়েছিল, সেও প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটলো, লোকটা ওদের কাছে এসে পড়ে পুষ্পের দিকে চেয়েই জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য ভাবে ছুট্ দিলে সোজা।

হঠাৎ আশা ভয়ে ও বিস্ময়ে পুষ্পের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বল্লে—ওকি! তোমার কপাল দিয়ে আগুন বেরুচ্চে যে!...এ কি! ওমা—কি সর্বনাশ!

পুষ্প অবাক হয়ে নিজের কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেল। সে আবার কি। পরক্ষণেই ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দরদর করে। সে হাত দিয়ে মুছে বল্লে—ভাই বৌদি—

আশার ভয় ও বিস্ময় তখনও যায়নি। সে দূর থেকেই আপন মনে বললে—বাবাঃ—কি এ! আর দেখা যাচ্চে না। কি আগুন!...

তারপর সে ছুটে এসে পুষ্পের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বল্লে—কে আপনি? আমায় বলুন কে আপনি? আপনি তো সহজ কেউ নয়। স্বর্গো থেকে দেবি এসেচেন আমার দয়া করতে?

আশার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে একটা বড় সত্য কথা বেরুলো।...

যতীন সব শুনলে। আশার এই পরিণতি। সেই আশা! কি জানি কেন শুধুই মনে পড়ে ওদের কাঁটালগাছের দিকের ঘরের সেই ফুলশয্যার বৃষ্টিধারামুখর রাত্রিটি, সেই সব দিনের কথা আজও যেন মনে হয় কাল ঘটে গেল। কেন এমন অসারতা সংসারে, কেন এমন মিথ্যার উৎপাত! যা ভালো বলে মনে হয়, জীবন যাতে পরিপূর্ণ হোল মনে হয়—তা কেন দুদিনও টেকে না? অমৃত বলে যা মনে হয়, তা থেকে বিষ ওঠে কেন?...

এই ঘোর বিষাদের দুর্দিনে যতীন সবদিক থেকে সব আলো একেবারে হারিয়ে ফেললে। কালো কালিতে সব লেপে একাকার হয়ে গেল। কেবল পুষ্প তাকে কত করে বুঝিয়ে রাখতো।

যতীন বল্লে—জীবনে আর কি রইল আমার? ওর সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দাও—

—তোমাকে ও দেখতে পাবে না।

—তবে তোকে দেখতে পেলে যে?

—সে রঘুনাথদাস ঠাকুরের মহিমায়। তুমি কষ্ট পাবে। বৌদির সে কষ্ট তুমি কি করে দেখবে?

তখনকার মত যতীন বুঝে গেল। পুষ্পও কিছু নিশ্চিন্ত হোল। একটা অন্য ঘটনাতেও যতীনের মন একটু অন্যদিকে চলে গেল। ওদের গ্রাম কুড়ুলে-বিনোদপুরের রায় সাহেব

জয়সারাম কুণ্ডুর বড় ছেলে রামলাল কুণ্ডুকে একদিন ও খুব বিষণ্ণ অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরে উদ্দেশ্য-হীনভাবে ঘুরতে দেখলে। একটা গাছের তলায় সে বসে আছে গালে হাত দিয়ে, যতীন দেখে ওকে চিনতে পেরে তখনই ওকে দেখা দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলে—নয়তো ওর দেহ রামলালের নিকট অদৃশ্যই থাকবে।

রামলাল ওকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। বল্লে—যতীন না?

—হ্যাঁ। তুমি কবে এলে?

—আসা-আসি বুঝিনে, এ জিনিসটা কি বল তো? বাড়ী যাই, সবাইকে দেখি—বাবা, মা, বৌ—কেউ কথা বলে না। আমি মরে গিয়েচি বলে আমার নাম নিয়ে সবাই কাঁদচে!

—ঐ তো তুমি মরে এখানে এসেচ! এ জিনিসটাই মৃত্যু।

—আমারও সন্দেহ হয়েছিল, বুঝলে? কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।

—কেন, তোমাকে কেউ নিয়ে আসেনি?

—আমার ঠাকুরদাদা এসেছিল, এখনও মাঝে মাঝে আসে। বড় বক্ বক্ করে, আমার পছন্দ হয় না।

রামলাল যতীনের বয়সী, বড়লোকের ছেলে। সুরা ও নারীর পেছনে গত দশ বছরে লাখখানেক টাকা উড়িয়ে দিয়েচে। অত বড় ব্যবসা ওদের, কখনো কিছু দেখতো না, বৃদ্ধ বাপ দোকান আগলে বসে থাকতো, রামলাল দোকান বা আড়তের ধারেও যেতো না। যতীন এসব জানে।

তারপর রামলাল হি-হি করে হেসে বল্লে—ঠাকুরদাদা কি করে জানো? রোজ দোকানে গিয়ে বাবার পাশে বসে থাকে, বেচাকেনা দেখে। বাবা হাত-বাক্সের সামনে যেখানে বসে না, ঠিক ওর পাশে রোজ ঠাকুরদা গিয়ে দুঘণ্টা তিনঘণ্টা করে বসে। মানে, ঠাকুরদাদার নিজের হাতে গড়া আড়তটা, ওর মায়া বড় বেশি।

—বলো কি! উনি তো মারা গিয়েচেন আজ কুড়ি বাইশ বছর। তখন আমি কলেজে পড়ি, বেশ মনে আছে। এখনও রোজ তোমাদের আড়তে গিয়ে বসেন?

রামলাল আবার হি-হি করে হাসতে লাগলো। বল্লে—আচ্ছা ভাই, সেকথা থাক্‌গে। এখানে কেমন করে মানুষ থাকে বলতে পারো? আজ কতদিন এসেচি ঠিক মনে নেই, তবে মাস দুইএর বেশি হবে না। একটা মেয়েমানুষের মুখ দেখতে পাইনি এর মধ্যে। এক ফোঁটা মাল পেটে যায়নি—স্ফূর্তি করবার কিছু নেই। ছ্যাঃ, নিরিমিষ জায়গা বাপু, যা বলো। মানুষ এখানে টঁ্যাকে?

পরে চোখ টিপে বল্লে—বলি, সন্ধানে-টন্ধানে আছে?

যতীন ওর পাশে বসলো। মনে মনে ভাবলে—A wasted life! আমার নষ্ট হচ্চে বেজায়, তা আমার নিজের দোষ নয়, কিন্তু এ নিজে জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়ে এসেচে নিজের হাতে।

রামলাল বল্লে—আছ কোথায় ?

—এখানেই।

—মাঝে মাঝে এসো। বড্ড একা পড়ে গিয়েচি। আচ্ছা, হরিমতিকে দেখতে পাও ? বুঝতে পেরেচ ? গাঙ্গু গোসাঁই-এর মেয়ে হরিমতি। তাকে এসে পর্যন্ত খুঁজচি—এক সময়ে তার সঙ্গে ছিল কিনা!

যতীন একটু অবাক হয়ে গেল। গাঙ্গু গোসাঁইএর যে মেয়ের কথা এ বলচে, তাকে নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী হিসেবে সে জানতো। তবে সে যুবতী এবং সুন্দরী ছিল বটে। আশালতা যেবার বাপের বাড়ী চলে গেল, সেই বছর সে কি জানি কেন গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়। হরিমতির চরিত্র ভালো ছিল বলেই তার ধারণা আছে এ পর্যন্ত।

যতীন বল্লে—না, ওসব দেখিনি। তুমি এখন ওসব ছাড়। মরে চলে এসেচ পৃথিবী ছেড়ে। মদ মেয়েমানুষ এখানে কি কাজে লাগবে তোমার ? হরিমতিকে তা হোলে তুমিই নষ্ট করেছিলে, তোমারি জন্যে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয় ?

—না ভাই। তোমায় পা ছুঁয়ে বলতে পারি। সে ভালো চরিত্রের মেয়ে গোড়া থেকেই ছিল না। অঘোর কুণ্ডুর সঙ্গে তার গোলমাল হয় তা আমি জানি। জানাজানি পাছে হয় তাতেই সে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। আমায় অত খারাপ ভেবো না। ফূর্তিটুর্তি করতাম বটে, তা বলে—

—বেশ, তবে ও পথ একেবারে ছেড়ে দাও, নইলে যেমন কষ্ট পাচ্চ এমনি কষ্ট পাবে।

যতীন সেইদিন থেকে প্রায়ই রামলালের স্তরে গিয়ে তাকে বোঝাতো। রামলাল বাড়ীঘর পায়নি, গাছতলাই তার আশ্রয়স্থান। যতীন তাকে উপরের স্বর্গের কথা বলতো, ভগবানের কথা বলতো—কিন্তু রামলাল নিম্নস্তরের আত্মা, অতি স্থূল আসক্তিতে ওর মন বাঁধা। সে সব ও কিছুই বোঝে না, ভালও লাগে না।

একদিন রামলালের ঠাকুরদাদা ৺কেবলরাম কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা। কেবলরাম ঘুঘু ব্যবসাদার, সামান্য অবস্থা থেকে বিখ্যাত ধনী ও আড়তদার হয়েছিল। ওকে দেখে বল্লে—আরে, তুমি ভবতারণের ছেলে! খুব মনে আছে তোমায়। আহা-হা, অল্প বয়সে তোমরা সব চলে এলে, বড্ড দুঃখের কথা। আমার নাতির দেখো না, ভবসারাম মরে গেলে অত বড় ব্যবসাটা গেল। কে দেখবে ? এই তো সন্দে পর্যন্ত আড়তে বসে ছিলাম। রোজ গিয়ে দেখি। বড্ড মায়া ঐ আড়তটার ওপর। ভবসারাম তো বাঁধা আসরে গাইলে। কষ্ট কাকে বলে তা তো জানলে না। এক লক্ষ আশি হাজার টাকা ক্যাশ রেখে আসি ব্যাঙ্কে, উইলে দুভাইকে সমান ভাগে ভাগ করে—

যতীন বল্লে—কুণ্ডু মশাই, এখন ওসব ছেড়ে দিন। আপনি আজ কুড়ি বছর এসেছেন, আজও দোকান আড়ত নিয়ে আছেন কেন ? আপনি না গলায় তুলসীর মালা দিতেন ? হরিনাম করতেন ?

—সে এখনও করি। তা বলে—

—আচার্য রঘুনাথদাসের নাম জানেন?

কুণ্ডু মশাই দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লে—কে তাঁর নাম না জানে? আমরা তাঁর দাসানুদাস—

—আপনি যদি আড়ত দোকানে যাওয়া ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সেখানে নিয়ে যাবো। তাঁর কাছে।

কেবলরাম কথাটা বিশ্বাস করলে না। ভাবলে এ একটা কথার কথা বুঝি। উচ্চ স্বর্গের অনেক কথা যতীন সুতরাং ওকে বোঝাতে বসলো। পুষ্পের সঙ্গে একদিন দেখা করিয়ে দিলে। কেবলরাম হাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তুমি কে মা?

পুষ্প হেসে বল্লে—তোমার নাতনী, দাদু—

কেবলরাম কেঁদে ফেললে। বল্লে—আমি পাপী, নরাধম। আমার সে ভাগ্যি কি আছে মা?

—মা নয়, আমায় দিদি বলে ডাকো দাদু—পুষ্প আবদারের সুরে বল্লে।

কেবলরাম সেদিন থেকে পুষ্পের ক্রীতদাস হয়ে গেল। পুষ্প ম্যাজিক জানে নাকি? যতীন এক এক সময়ে ভাবে। পুষ্প কেবলরামকে ভরসা দিলে, একদিন উচ্চ স্বর্গের বৈষ্ণব ভক্তদের লোকে ওকে নিয়ে যাবে। কেবলরাম মানুষটা সরল। বলে—দিদি, তুমিই তো দেবী, তুমি কম নও। ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার ওপর আগুনের মতো আভা তোমার রূপের। আমি আর কোথাও যেতে চাইনে—তুমি দাদু বলে ডাকলে এই আমার স্বর্গ হয়ে গেল। আমরা কীটস্য কীট।

আত্মা ওঠে ভালবাসায়। ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে। পুষ্প পিতামহের সমান বৃদ্ধ কেবলরামকে পৌত্রীর মত ভালবেসে ওকে তোলবার চেষ্টা করচে—যতীন বুঝতে পারলে। যতীনের শত লেকচারেও এ কাজ হোত না। যতীন ভাবে—নাঃ, এসব কাজ পুষ্প পারে। পতিত-উদ্ধার কাজ আমার নয়। আমার নিজের কুকুর পথ্যি করে কোথায় তার ঠিক নেই।

কিন্তু রামলালের সাহায্য পুষ্পকে দিয়ে হবে না। পুষ্প অতি সুন্দরী নারী। রামলালের আসক্তি এখনও নিম্নমুখী, মোহে পড়ে যাবে, রামলালের মন গড়ে উঠতে অনেক দেরি। অন্যভাবে ওকে সাহায্য করতে লাগলো যতীন।

রামলালের দেখা পেয়ে যতীনের খানিকটা ভাল লাগে। হাজার হোক দেশের লোক, সমবয়সীও বটে। দুটো পৃথিবীর কথাবার্তা বলা যায়। দেবদেবীদের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে। শুধু বড় বড় কথা আর কাঁহাতক শোনা যায়—পুষ্পের মুখেই, কি, বা অন্য যেখানে মাঝে দু-দশবার গিয়েচে, সেখানেই কি! পুষ্প বোঝে সব, বুঝে দুঃখিত হয়। রামলালের সঙ্গে অত মেলামেশা সে পছন্দ করে না।

যতীন রামলালের কাছে এসে বলে—রামলাল-দা, কি তোমার ইচ্ছে করে?

—একটা ইচ্ছে আছে, অন্য কিছু হোক না হোক, একটা সিগারেট যদি খেতে পারতাম, একেবারে কিছু নেই—ছ্যাঃ, এখানে মানুষ থাকে কি করে?

—তোমার স্ত্রীকে তো রেখে এসেচ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না?

রামলাল ইতস্তত করে বল্লে—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ—সে তো প্রায়ই দেখচি।

—যাও সেখানে ?

—হ্যাঁ, তা—যাই। যাবে—চলো না গাঁয়ে একবার।

যতীন গেল কুড়ুলে-বিনোদপুরে। পুষ্পের বারণ আছে এসব জায়গায় আসবার। এলেই পার্থিব আসক্তি ও তৃষ্ণা আত্মাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরে। রামলাল ওর নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল, যতীন নিজের বাড়ী এল ; ওর ছেলেমেয়ে আছে শ্বশুরবাড়ীতে, কিন্তু তাদের ওপর এতদিন যতীনের কোনো বিশেষ মায়া ছিল না, এখানে এসে তাদের জন্যেও মন কেমন করে উঠলো। ওদের বাড়ীটা একদম ভেঙেচুরে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে এই সাত আট বছরে। ঐখানে ঐ ঘরে সে আর আশা থাকতো, আশার হাতের চুনের দাগ এখনও ইঁট-বের-করা দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায়। ওখানে বসে আশা পান সাজতো, ষোল বছর আগের চুনের দাগ, কি তারও আগের হবে।

বিয়ের পরে প্রথমে আশা খুব পান খেতো এবং ওইখানটিতে বসে রোজ সকালে এক বাটা পান সাজতো সমস্ত দিনের মত। গুজব উঠলো এই সময়, পানে একরকম পোকা হয়েচে, অনেক লোক মারা যাচ্চে পোকা-ধরা পান খেয়ে, যতীন আর বাজার থেকে পান আনতো না পাঁচ ছ' মাস। আশা বলতো—তুমি না খাও, আমার জন্যে এনো, না হয় মরে যাবো পান খেয়ে, তোমার আবার বিয়ে বাকি থাকবে না। পান না খেয়ে থাকতে পারিনে—লক্ষ্মীটি—

কাল যেন ঘটে গিয়েচে সে সব দিন। আশা, আশালতা। স্বপ্ন·· ···বহুদূর অতীতের স্বপ্ন আশালতা।

সন্ধ্যা হয়েচে। বোষ্টম বৌ ছাগল নিয়ে যাচ্ছে বাড়ীতে তাড়িয়ে—আহা, বুড়ো হয়ে পড়েচে বোষ্টম বৌ। তা তো হবেই, আট বছর হয়ে গেল। আচ্ছা তাকে যদি এখন দেখে বোষ্টম বৌ তো কি না জানি ভাবে!

হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠলো—তুমি কখন এলে গো ?

যতীনের অন্তরাত্মা পর্যন্ত বিস্ময়ে শিউরে চমকে উঠলো সে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে। সে পেছন ফিরে চাইলে, আশা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পেছনে। পরনে লালপাড় শাড়ী, ঠিক যেমনটি পরতো কুড়ুলে-বিনোদপুরের এ ঘরে ; বয়েস তেমনি, চোখে না বুঝতে পারার বিস্ময়ের মূঢ় দৃষ্টি।

—আশা! তুমি এখানে! কি করে এলে!

আশা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। যেন এখনো ভাল করে বিশ্বাস করতে পারচে না।

যতীন ওর দিকে এগিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে। বল্লে—আশা, চিনতে পারচো না আমায় ?

আশা ওর মুখের দিকে তখনও চোখ রেখে বল্লে—খু-উ-ব।

—তুমি কোথা থেকে এলে ?

—কি জানি কোথা থেকে যে এলুম। আজকাল কেমন হয়েচে আমার, সবই যেন কি মনে হয়। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা স্বপ্ন বুঝতে পারিনে। সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েচে কেমনতর।

হ্যাগো, তুমি ঠিক তো ?···

পরে ব্যস্ত হয়ে বল্লে—দাঁড়াও, একটা প্রণাম করে নিই তোমায়—

প্রণাম করে উঠে বল্লে—কতকাল দেখিনি। ছিলে কোথায় ? সংসার যে ছারেখারে গেল, বাড়ী ঘরদোরের অবস্থা এ কি হয়েচে ! আমি এতকাল আসিনি। বাপের বাড়ী থেকে আমাকে আনলেও না। নিজেও ভবঘুরে হয়ে বেড়াচ্ছ। ছেলেমেয়ে দুটোর কথাও তো ভাবতে হয়।

যতীন সস্নেহ কণ্ঠে বল্লে ঠিক, ঠিক। তুমি ভাল আছ আশা ?

—আমি ভাল নেই।

—কেন, কি হয়েচে ? আশা, আমায় খুলে বলো সব—

—মাথার মধ্যে সব গোলমাল। কিছু বুঝতে পারিনে। সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। কত কি যে ঘটে গেল জীবনে, বুঝিনে কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা সত্যি। এই তুমি দাঁড়িয়ে আছ সামনে, আমার যেন কেমন মনে হচ্চে। যেন মনে হচ্চে কে বলেছিল, তুমি—না ছিঃ, সে কথা বলতে নেই।

—আশা, আবার ঘর সংসার পাতাই এসো—

—পাততেই হবে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে—এক জায়গায় ছিলাম, মরুভূমি আর পাহাড়, লোক নেই জন নেই, কি ভয়ানক জায়গা। সেখানে যেন এক দেবীর সঙ্গে দেখা হোল, তাঁর কপাল দিয়ে আগুনের মত হল্‌কা বেরুচ্চে। কি তেজ ! বাবাঃ—কি রকম সব ব্যাপার। ও সব স্বপ্ন, কি বলো ?

—নিশ্চয়ই, আশা।

—তুমি এলে ভালই হোল। ঘরদোর ঝাঁটপাট দিই। উনুনগুলো ভেঙে জঙ্গল হয়ে গিয়েচে। চড়ুই পাখীর বাসা হয়েছে কড়িকাঠে। হাটবাজার করে এনে দাও। সেই মরুভূমির মত জায়গা থেকে কে যেন আমায় এখানে টেনে নিয়ে এল। থাকতে পারলাম না।

পরে কাছে এসে অপরাধীর সুরে বল্লে—হ্যাগো, আমায় বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখেছিলে কেন এতদিন ? রাগ করেছিলে বুঝি ?

যতীন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল, সে দৃষ্টিতে গভীর অনুকম্পা, অতলস্পর্শ অনুকম্পা—সর্ববাসনাশূন্য উদার ক্ষমা···কোনো কথা বল্লে না।

আশা মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বল্লে—বেশ চেহারা হয়েচে তোমার।

হঠাৎ আশা চীৎকার করে উঠলো—একি ! ওমা, একি হোল ! কোথায় গেলে গো ? এই যে ছিলে ? ওমা এ সব কি !

যতীন বুঝলে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে আশার কাছে। পৃথিবীতে কতক্ষণ সে থাকবে, পৃথিবীর আসক্তি ও চিন্তায় তার দেহ স্থূলস্তরের দর্শনযোগ্য হয়েছিল অল্প সময়ের জন্যে, ওর চিন্তার প্রবল আকর্ষণ নরক থেকে আশাকে এনেছিল এখানে। আশাও আর থাকতে পারবে না। এখুনি ওকে চলে যেতে হবে। উভয় স্তরে জীবের কোন যোগাযোগ নেই।

রামলাল পর্যন্ত এসে যতীনকে আর দেখতে পেলে না। যতীনের দেহ আবার তৃতীয়

স্তরের মত হয়ে গিয়েচে।

রামলাল বল্লে—কোথায় গেলে, যতীনদা? থাকো থাকো, যাও কোথায়? ও যতীনদা—

ততক্ষণে নরকের প্রবল আকর্ষণে আশাও তার নিজের স্তরে নীত হয়েচে।

যতীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। এ জগতের এই নিয়ম।

আশা সত্যিই বলেচে, কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা আসল তা বোঝবার যো নেই।

সে কোন্ দেবতা, যাঁর শরণ সে নিতে চায়, এ স্বপ্নের শেষ করতে চায়। করুণাময় এমন কে মহাদেবতা আছেন, যাঁর কৃপাকটাক্ষে আশা তো আশা, কত মহাপাপী উদ্ধার হয়ে যায় চোখের এক পলকে, মহারুদ্রের জ্যোতিস্ত্রিশূলের এক চমকে অনন্ত ব্যোম ঝলমল করে ওঠে পুণ্যের আলোয়, পাপতাপ পুড়ে হয় ছারখার, অবাস্তব স্বপ্নের অবসানে। হে অনন্তশয়নশায়ী নিদ্রিত মহাদেবতা, জাগো, জাগো!

ওদের বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে কর্কশ স্বরে পেঁচা ডাকচে। শীতকালে রাধালতায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে বেড়ার ঝোপজঙ্গলে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে ডোবার ধারে। মনে হয় চাঁদ উঠচে পূর্বদিকের আকাশে। আকাশে নক্ষত্রদল পাৎলা হয়ে এসেচে। বোধহয় পৃথিবীর কৃষ্ণা প্রতিপদ কিংবা দ্বিতীয়া তিথি।

পুষ্প করুণাদেবীর দেখা পায়নি বহুদিন।

তিনি নানা ধরনের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, পুষ্প সেজন্যে তাঁকে তেমন ডাকে না। আজ অনেক দিন পরে পুষ্পের মনে হোল করুণাদেবীর একবার খোঁজ করা দরকার। সে ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উচ্চ স্বর্গে উঠে গেল, তাঁর সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে, সেই কুসুমিত উপবনে। যখনই সে এখানে আসে তখন কি এক বিস্ময়কর আবির্ভাবের আশায় সর্বদা সে থাকে, কি সৌন্দর্য ও শান্তির লীলাভূমি এই পবিত্র দেবায়তন। সুগন্ধ কিসের সে জানে না, কোন্ ফুলের সে সুগন্ধ তাও জানে না—কিন্তু অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়, সারা মন খুশি হয়ে ওঠে হঠাৎ।

মহারূপসী দেবী ওকে হাসিমুখে হাত ধরে একটি বিশাল বনস্পতিতলে স্ফটিকবেদীতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পুষ্প চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবলে—এ গাছ তো এত বড় দেখিনি, এত বড় গাছই তো ছিল না।

করুণাদেবী মৃদু হেসে বল্লেন—কি ভাবচ, গাছটার কথা? ও তৈরি করেচি। বনস্পতিতে ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। তাই দেখি সারা সময় চোখের সামনে।

—কি গাছ?

—পৃথিবীতে ছিল না কোনোদিন, নাম নেই।

—আমি আপনার কাছে কোনো অপরাধ করেছিলাম কি? দেখা দেননি কতদিন। আমার কষ্ট তো জানেন সব। আপনি একবার চলুন, যতীনদা বড় কাতর হয়ে পড়েচে, আশা-বৌদি নরকে। আত্মহত্যা করেছিল।

করুণাদেবী অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসলেন। বল্লেন···সব জানি। আমার পৃথিবীর ছেলে-

মেয়েদের সন্ধান রাখিনে আমি ! আমিই যতীনের ব্যাকুলতা দেখে তার সঙ্গে ওর স্ত্রীর দেখা করিয়ে দিই। নইলে নরক থেকে পৃথিবীতে গিয়ে দেখতে পেতো না যতীনকে। এই দেখাতে আশার উপকার হবে—

—যতীনদা সেই থেকে কিন্তু পাগলের মত হয়েচে—

—যতীন অজ্ঞান।

—আপনি ভাল বোঝেন সব, দেবী। আপনি যতীনদা'কে সুখী করুন। ওর কষ্ট দেখতে পারিনে। আশা-বৌদির ভাল হয় কিসে ?

করুণাদেবী ওকে কাছে টেনে নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে ওর গালে হাত বুলিয়ে অতি ধীর শান্ত স্বরে বলতে লাগলেন—পুষ্প, তোকে ভালবাসি বড়। মনে আছে সব। ভাল হবে শেষে, কিন্তু—লক্ষ্মী পুষ্প —

—কি দেবী ?

করুণাদেবীর চোখে জল ! পুষ্প অবাক হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কেমন মায়া হোল এই রাজ-রাজেশ্বরীর মত রূপবতী মহাশক্তিধারিণী দেবীর ওপর, কোলে শায়িতা ছোট্ট খুকী যেন, তার মেয়েটির মত। ভগবান এমন ভাবেই বোধ হয় মানুষের কাছে ধরা দেন ঐশ্বর্য লুকিয়ে। সে নিজের অজ্ঞাতসারে অসীম স্নেহে করুণাদেবীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে নিজের বস্ত্রাঞ্চলে।

দেবী বল্লেন—তোকে বড় দুঃখ পেতে হবে—

পুষ্পের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠলো। কেন, কিসের দুঃখ ? কি কথা বলতে চাইচেন দেবী ?

দেবী আবার বল্লেন—যতীন ও তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। তার দরকার আছে। তুই চলে যা পুষ্প, আমি যাবো তোরই বাড়ীতে একটু পরে। তারপর আমার সঙ্গে তোদের পৃথিবীতে একবার যেতে হবে।

—দেবী, গুরুদেবের দেখা পাবো ?

—সময়ে পাবে পুষ্প। তিনি কিছু পূর্বে এখানে ছিলেন।

উচ্চ স্বর্গে দেবলোকের প্রেমিক-প্রেমিকা। পুষ্প যতই এঁদের দুজনকে দেখে, ততই আনন্দে ও শান্তিতে মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পুষ্প ও যতীনকে সঙ্গে নিয়ে করুণাদেবী একটি পুরাতন শহরে এলেন।

বাড়ীঘর সব পুরোনো ধরনের, পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেচে, রাস্তাঘাট সেকালের ধরনের সরু সরু। একটা পুরানো বাড়ী গলির মধ্যে, সেই বাড়ীর পাশে ছোট্ট একটা বাগান। বেলা গিয়েচে, সন্ধ্যার কিছু আগে। বাড়ীটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুষ্প ও যতীন দুজনেরই মনে হোল, এখানে ওরা যেন এর আগে এসেচে। যেন কতকাল আগে, ঠিক মনে করতে পারচে না।

হঠাৎ যতীন বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দেবী, আমি এ বাড়ী চিনি বলে মনে হচ্চে—

তার মন আজ আনন্দে পূর্ণ, কারণ বহুদিন পরে আজ সে করুণাদেবীর দেখা পেয়েচে। এ

যে কত সৌভাগ্যের কথা, এতদিন এখানে থেকে সে ভাল বুঝেচে।

দেবী বল্লেন—বেশ, বাড়ীর ভেতর যাও—

যতীনের মনে হোল এ বাড়ীর ভেতরের উঠোনে একটা পেয়ারার গাছ আছে, সে কতকাল আগে সেই গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খেতো। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই একটি ছোট ঘর। একটা কুলুঙ্গির দিকে চাইতেই যেন বহু পুরোনো দিনের সৌরভের মত কোথাকার কত হারানো দিনের বহু অস্পষ্ট স্মৃতির সৌরভ এল কুলুঙ্গিটা থেকে। এক সুন্দরী নববধূর মুখ যেন মনে পড়ে, ঐ কুলুঙ্গিতে সে তার মাথার কাঁটা রাখতো শোবার আগে, এই ঘরের সঙ্গে যেন এক সময়ে কত সম্পর্ক ছিল ওর। বাড়ীটাতে অনেক ছেলেমেয়ে চলাফেরা করচে, দুটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক রান্নাঘরে কাজকর্ম করচে। ঐ তো সেই পেয়ারা গাছটা। ওর তলায় বসে সে কত খেলা করেচে একটি মেয়ের সঙ্গে—মেয়েটিকে সে বড় ভালবাসতো। আজও যেন তার মুখ মনে পড়ে—কোথায় যেন চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

পুষ্প ওর পেছনে পেছনে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকচে। সে বল্লে—যতীনদা, ওই সেই পেয়ারা গাছ—

—কোন্ পেয়ারা গাছ—

—মনে পড়চে ওর তলায় তুমি আর আমি খেলা করতাম, অনেক কাল আগে—স্পষ্ট মনে হচ্চে—

—তুই তবে সেই মেয়ে পুষ্প- আমারও সব মনে পড়েচে। তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে। সে সব দিনের দুঃখুও যেন মনে আসচে।

—তুমি মারা গিয়েছিলে যতীনদা। আমায় ওই বলে গালাগালি দিও না, বালাই ষাট, আমি মরবো কেন?

—দেবী সঙ্গে নেই তাই তোর বাড় হয়েচে, তুই যা তা বলচিস আমায় পুষ্প! আচ্ছা, বল্ তো, এক জায়গায় এ বাড়ীতে এক বুড়ো লোক বসে থাকতো, তার কি যেন হয়েছিল, বসেই থাকতো। মনে পড়চে তোর?

—মনে হয়েচে, দেওয়ালের গায়ে বালিশ ঠেস্ দিয়ে।

যতীনের মনে হচ্ছিল যেন সে একটি সুপরিচিত স্থানে বহু, বহু কাল পরে আবার এল। এ বাড়ীর সব ঘরদোর সে চেনে, অনেক কাল আগে এ বাড়ীতে সে বেড়িয়েচে প্রত্যেক ঘরদোরে। বহু প্রিয়জনের দূরাগত স্মৃতি যেন একটি গুরুভার বেদনার মত বুকে চেপে বসেচে।

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে খেতে বসেচে। খুব গোলমাল করচে নিজেদের মধ্যে। ওদের প্রতি এমন একটি স্নেহ হয়েচে যতীনের, ওরা অতি আপনার জন, কতদিনের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে। যতীন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়ে গেল, ওদের মা এবার হাতায় করে দুধ পাতে পাতে দিচ্চে। অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েচে বাড়ীটা, তার জানা বাড়ী এর চেয়ে ভাল, নতুন ছিল। সে সব বুঝতে পেরেচে, করুণাদেবী তাদের কেন এখানে এনেচেন।

পুষ্প বল্লে—যতুদা, আমাদের পূর্বজন্মের দেশ। কোন্ গ্রাম এটা বলতে পারো? তুমি আমি

এখানে জন্মেছিলাম।

—তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে—রাগ করিস্‌নি বলচি বলে।

—আমার মনে পড়েচে।

—গত জন্মেও তাই। এই রকমই হচ্চে জন্মে জন্মে। তুই মারা যাচ্চিস, আমি তোর পেছনে যাচ্চি। কিন্তু আর একটি মেয়ের কথা বড় মনে পড়চে। তাতে আমাতে কিছুদিন এখানে ছিলাম। তারপর সেও কোথায় গেল চলে।

ওরা বাইরে এল। করুণাদেবী বল্লেন—মনে পড়লো?

কিন্তু এ যে অদ্ভুত মনে পড়া। কত নিবিড় বর্ষারাতের টিপ টিপ জলপতনের সঙ্গে, কত বসন্তের প্রথম রোদে পোড়া মাটির গন্ধের সঙ্গে জীবনের মস্ত বড় যাত্রাপথ একসুরে বাঁধা, আনন্দের নিবিড় স্মৃতি সেখানে বেদনার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে—গভীর বেদনা, যা শুধু জন্ম-জন্মান্তরের হারানো প্রিয়জনের বার্তা বহন করে আনে অন্তরতম অন্তরে। মনে হয়, সবই কি তবে মিথ্যে, সবই স্বপ্ন?

যতীনের দিশেহারা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর মনের কথা পরিস্ফুট হোল। করুণাদেবী বল্লেন ওই জন্যে তোমাদের এনেচি। এখানে তোমাদের ঠিক এবারকার জন্মের আগের জন্মভূমি।

পুষ্প বল্লে—এ কোন্‌ গ্রাম দেবী? নাম মনে নেই।

—ত্রিবেণী। গঙ্গার তীরে। ঐ গঙ্গা—

—তা হোলে গত দুই জন্মে আমরা কাছাকাছিই ছিলাম, গঙ্গারই ধারে। এবার তো হালিসহরের এ পার সাগঞ্জ-কেওটায়।

—স্থানের আকর্ষণ অনেক সময় এমন হয় যে গত জন্মের ভূমিতে কোনো না কোনো সময় আসতেই হবে। তবে জন্মান্তরীণ স্মৃতি সব আত্মার থাকে না পৃথিবীর স্থূল দেহে। কখনো কেউ জাতিস্মর হয়। জাতিস্মর হওয়া উচ্চ অবস্থার লক্ষণ।

যতীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। তার মন ভাল নেই। জগৎ ও জীবন দেখচি সব ভেল্‌কির মত। কোন্‌টা সত্যি? কোন্‌টা মিথ্যে? বাজে জিনিস সব। বাঁচা মরা কিছুরই মধ্যে কিছু নেই। কেন এ বিড়ম্বনা?

সে জিজ্ঞেস করলে—দেবী, এরা আমার কে? এখন যারা আছে?

—তোমার পৌত্রের পৌত্র।

—আর পুষ্পের?

—পুষ্প অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। আশা এ বাড়ীতে তোমার প্রথমা স্ত্রী ছিল। সে অল্পবয়সে তোমায় ছেড়ে চলে যায় এবারের মত। আমিই তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছিলুম তিনজনকে আবার এ জন্মে। কিন্তু কর্মের ফল আমি খণ্ডন করতে পারিনি তোমাদের—চেষ্টা করলাম, কিন্তু কর্মশক্তি নিজের পথ ধরল ঠিক।

যতীন হতাশ সুরে বল্লে—আপনি যখন পারলেন না, তখন আর কি উপায় দেবী। আপনি স্বয়ং যখন—

করুণাদেবী বল্লেন—কর্মের বন্ধন স্বয়ং ভগবান কাটতে পারেন চোখের পলকে। তিনি ছাড়া আর কে পারে।

—আমি কি করেছিলাম দেবী, কেন আমার এ দুর্ভাগ্য দুই জন্ম ধরে?

—এরও আগের জন্ম দেখবে? কিন্তু ছবি দেখাবো। সামনের আকাশে চাও—সে স্থান এখন আর নেই, প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। সে জন্মে প্রথমা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে দুবার বিবাহ করেছিলে। সে তোমায় বড় ভালবাসতো। সেজন্যে তাকে আর আপনার করে পেলে না পর পর দু'জন্মেও। সতীলক্ষ্মীর মনে বড় কষ্ট দিয়ে ত্যাগ করেছিলে।

—সেও কি আশা?

—না।

—তবে সে কে দেবী? বলুন দয়া করে—সে কি অন্যত্র চলে গিয়েচে?

—সে এই তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে। সতীলক্ষ্মী তোমায় ছাড়েনি, কিন্তু তোমার কর্মফলে তুমি ওকে পাচ্ছ না। আমি পর পর দু'জন্ম চেষ্টা করচি, কিন্তু পেরে উঠচি কই!

পুষ্প অবাক হয়ে দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ সব কথা তার মনে নেই।

করুণাদেবী বল্লেন—তারও পূর্ব জন্মে তোমার কর্ম আরও খারাপ। থাক্ এ সব কথা। তোমাকে তিন জন্মের কথা জানতেই হবে, এর কারণ আছে। পুষ্প, তুই কষ্ট পাবি আমি জানি। আমি চেষ্টা করবো সে দুঃখ দূর করতে। যতীনকে ওর পূর্বজন্ম দেখালাম, কারণ ওর আত্মার প্রয়োজন হয়েচে।

পুষ্প বিবর্ণ মুখে বল্লে—কেন দেবী?

করুণাদেবী ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—যতীনকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

পুষ্প জানে। সে জানে তার প্রশ্ন নিরর্থক। সে অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেচে। এই জন্যই তার মন করছিল।

যতীন চমকে উঠলো। এত অল্পদিনে আবার পুনর্জন্ম কেন? কোথায় রইল আশা, কোথায় রইল পুষ্প—কার কাছে যাবে সে পৃথিবীতে?

তখনি তার মন বলে উঠলো—কেন, মায়ের কাছে। যার কোল আঁধার করে সে চলে এসেচে।

করুণাদেবী বল্লেন—যতীন, তোমার অন্তরাত্মা চাইচে ঐ দুঃখিনী মায়ের কোলে আবার ফিরে যেতে। তোমার মায়ের অন্তরাত্মা কাঁদচে তোমার জন্যে। সেখানে যেতে হবে তোমাকে। এ বাঁধন এড়াবার যো নেই। মাতৃশক্তি জগতের মধ্যে খুব বড়। তা ছাড়া আশার জন্যে তোমাকে যেতে হবে ভূলোকে। ভুবর্লোকের কোনো উচ্চ স্তরে ও যেতে পারবে না—বেচারী! গ্রহদেবকে আমি বলেচি, আশার অন্তরাত্মা কাঁদচে, অনুতাপে সব পাপ মোচন হয়। আশাকেও আবার পৃথিবীতে পাঠাবো—তুমি জন্মগ্রহণের কিছু পরে। এই পাঁচ ছ' বছর ওকে নরকেই থাকতে হবে। তার আত্মা তাতে উন্নতি করবে। নিজের ভুল ক্রমশ বুঝবে। এই জন্মে আমি আবার তোমাদের মিলিয়ে দেবো। বোধ হয় তোমাদের প্রারব্ধ ও জন্মে কেটে যাবে।

পুষ্প পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে সব শুনলে। আকাশ পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে ততক্ষণে। জন্ম-জন্মান্তর যে জীবনের মাস, ঋতু ও বৎসর মাত্র, তাও যে শূন্য, অন্ধকার। ভূমা নয়, অল্পেই তার সুখ ছিল।

করুণাদেবী সব জানেন। পুষ্পকে তিনি বুঝিয়ে বল্লেন। আশার জন্যও স্বার্থত্যাগ তাকে করতে হবে, যতীনের জন্যেও। এই জন্যে আশার সব ভুল মুছে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করবেন। আচার্য রঘুনাথদাস আশার আত্মার জন্যে তাঁর ইষ্টদেবকে জানিয়েছিলেন।

ভক্তের ক্ষমতা বড় তুচ্ছ নয়। গ্রহদেবের আসন টলেচে।

পুষ্প বল্লে—বুঝেচি। তিনি মহাপুরুষ, সেদিন যখন নরকে নিয়ে গেলেন আমায়, তখনই আমার মনে হোল নরক পবিত্র হোল। আপনারও আসন টললো—আমি ডাকলে আপনি ছাই আসেন।

করুণাদেবী বালিকার মত সকৌতুকে খিল্ খিল্ করে হাসলেন। বল্লেন—তুই আমার ওপর রাগ করলি বুঝি? ছিঃ—লক্ষ্মী দিদি—

পুষ্পের অভিমান তখনও যায়নি। সে দুষ্টু মেয়ের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল।

দেবী বল্লেন—তোকে আমার কাছে নিয়ে যাবো পুষ্প—

—না। আমাকেও পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন না, দিন না দয়া করে। সত্যি বলচি। স্বর্গে আমার দরকার নেই।

—পৃথিবীতে পাঠিয়ে কি হবে? এবার যে চেষ্টা করবো ওদের দুজনকে মিলিয়ে দিতে। পৃথিবীর মিলন না হোলে আশার প্রারব্ধ কিছুতেই কাটবে না। এ আত্মত্যাগ তুই করতে পারবি আমি জানি। ওরা জন্ম নিলেই তো সব ভুলে যাবে, কোনো কথা মনে থাকবে না এ জন্মের। আমি আবার দেখা করিয়ে দিই, যে যাকে চায় মিলিয়ে দিই। নতুবা জীবের কি সাধ্য?

পুষ্প বল্লে—আমাকেও পাঠিয়ে দিন, সব ভুলে থাকি।

করুণাদেবী ওকে কাছে নিয়ে এলেন আদর করে। পুষ্পের দেহ শিউরে উঠলো, কি অপূর্ব সুগন্ধ দেবীর সারাদেহে, কি অপূর্ব স্পর্শসুখ! সে মেয়েমানুষ, তবুও এই রূপসী দেবীর স্নিগ্ধস্পর্শে ওর সারাদেহে যেন তড়িৎসঞ্চার হোল। অমৃতস্পর্শে আত্মা যেন নিজের অমরত্ব, অনন্তত্ব অনুভব করলে এক মুহূর্তে।

সস্নেহে বল্লেন—পুষ্প, তোকে পৃথিবীতে আর জন্ম নিতে হবে না। শুক্লা গতির পথে তোর অনাবৃত্তি লাভ ঘটেচে। ওরা এখনও অপরিণত, শেখবার বাকি আছে, কর্ম এবার নষ্ট হয়ে যাবে হয়তো। পৃথিবীর জীবন বেশিদিনের নয়। আত্মার পক্ষে চোখের পলক মাত্র। আমি এবার যাই পুষ্প।

পুষ্প বল্লে—আমায় পৌঁছে দিয়ে যান—

—নিশ্চয়, চল যাই।

যাবার সময় করুণাদেবী বলে গেলেন, তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি আসবেন।

যতীন একা বসে ছিল বাড়ীতে। পৃথিবীতে আবার জন্ম নিতে হবে। শত সুখদুঃখের বন্ধনে আবার জড়ানো, মন্দ কি? সেই গরীব ঘরের বৌটির কোল আলো করে আবার শিশু হয়ে কত বাল্যলীলা করবে, নতুন আস্বাদ, আবার আসবে আশা—হতভাগিনী আশা—নববধূরূপে তার ঘরে, আবার কত বর্ষারাত্রি, কত বসন্তপ্রভাত ওর সাহচর্যে কাটবে। পৃথিবীতে যেতে তার কষ্ট নেই, মধুর সেখানকার শৈশব, মধুর কৈশোর, মধুর যৌবন। চিরযৌবনের হাওয়া যেন বয় তার অমর আত্মায়, পৃথিবীতে মাস যাবে মাস আসবে, নতুন ধানের গন্ধ বেরুবে ক্ষেতে ক্ষেতে, ক্ষুধায় বনের মেটে আলু তুলে নুন দিয়ে পুড়িয়ে খাবে, তার মা যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে তাকে খাওয়াবে, আশা সংসার পাতবে নতুন লক্ষীর হাঁড়িতে ধান দিয়ে।……

কেবল কষ্ট হয় পুষ্পের জন্যে। এতদিন ওর সঙ্গে থেকে কি মায়াই হয়েচে ওর ওপরে। কেন এমন বিচ্ছেদ? কি কষ্ট পাবে পুষ্প, তা সে জানে। আশা যদি কষ্ট না পেতো, যতীন কিছুতেই যেতো না।

পুষ্প এসে ওর হাত ধরে বল্লে—যতীনদা!

—কি পুষ্প?

—আমায় ভুলো না।

—আচ্ছা, পুষ্প—তুই বলতে পারিস, কেন আমাদের জীবনে এ দুর্ভাগ্য, কেন বার বার তোকে হারাচ্ছি? তোর বৌদিদিকে হারাচ্ছি?

—আমায় নিয়ে যাও সঙ্গে—

—ছিঃ, পুষ্প। দেবী যা বলেন তাই তোমার আমার পক্ষে শুভ। ওঁর কথা শোনো।

—আমি কারো কথা শুনবো না, আমি যাবো।

—কি, এবারও একসঙ্গে খেলা করবি পুষ্প? তেঁতুলিধারা সাগর-কেওটার ঘাটে? বেশ—অদ্ভুত সে সব দিন।

যতীন চোখ বুজে ভাবতে লাগলো। পুষ্প ওর হাত ধরে বসে রইল, বল্লে—তাই তো সাগর-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট এ লোকেও ভুলতে পারিনি। জন্মান্তরের স্মৃতিতেও অক্ষয় যেন হয়। তোমার যাওয়ার পথে দেবতারা ফুল ফেলুন যতুদা—আমি হতভাগিনী চিরকাল একাই থাকবো। এই আমার ভাগ্য।

যতীন ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আমার মুক্তিতে দরকার নেই, কোনো কিছুর দরকার নেই। সমাধি-টমাধি, দেবী-টেবী সব বাজে। তোকে ছেড়ে যাবো না।

—আশা?

—তার অদৃষ্টে যা হয় হবে পুষ্প।

—ঠিক কথা যতুদা?

—প্রাণের সত্য কথা বল্লাম। এখন আমার অন্তর যা বলচে। সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে আমার কাছে—তুই থাক্ পুষ্প আমার!

—জগতের, বিশ্বের বহুদূর সীমানায় চলে যাও যতুদা, তোমায় মুক্তি দিলাম। ভালবেসো,

ভুলো না।

—ওসব থিয়েটারী ধরনের কথা কোথায় শিখলি রে? তোদের দোহাই, মুক্তি-টুক্তির কথা আমায় শোনাস্‌নে। চল্‌ তুই আর আমি পৃথিবীতে যাই, ছোট্ট নদীর ধারে কুঁড়েঘরে সংসার পাতবো। সেই আমাদের স্বর্গ, সেই আমাদের সব।

পুষ্পের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ঝরঝর করে। সে কোনো কথা বল্লে না।

সেদিনই যতীনের মনে হোল কে যেন কোথায় তাকে ডাকচে···সব সময় তার প্রাণের মধ্যে কিসে যেন মোচড় দিচ্চে···আশা, অভাগিনী আশা, ভুবর্লোকের নীচের স্তরে অসহায়া, একাকিনী পড়ে আছে, কেউ নেই তাকে দেখবার।

সত্যি আশা তাকে ডাকচে। তার অন্তরাত্মা শুনতে পেয়েচে অভাগিনীর ডাক।

সে পুষ্পকে কথাটা বল্লে।—তোর বৌদিদি বড্ড কাঁদচে পুষ্প। সেদিন কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ীতে হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে ওর ডাক প্রায়ই শুনি।

—আমি যাই সেখানে যতুদা, তুমি যেও না। দেখে আসি।

—কিছু ভাল লাগে না ওর জন্যে।

—কেন তোমাকে যেতে বারণ করি, ও সব নীচের স্তরে তোমায় যেতে দিতে আমার মন সরে না।

—তুই তো যাস্‌ দিব্যি।

—আমি গিয়েছিলাম আচার্য রঘুনাথের কৃপায়। মহাপুরুষদের বিশেষ দয়ায় বিশেষ শক্তি হয়। নয় তো ওই সব স্তরে নানান রকমের নিম্নশ্রেণীর শক্তি খেলা করচে সর্বদা, মহাপুরুষদের কৃপায় বিশেষ শক্তি লাভ করে সেখানে গেলে ওই সব দুষ্ট শক্তি কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। নয়তো বিপদ পদে পদে—এই জন্যেই তোমাকে ওখানে যেতে দিতে চাইনে যতুদা। চলো দেখি কি উপায় হয়।

রঘুনাথদাসের আশ্রমে যাবার পথে কবি ক্ষেমদাসের সঙ্গে দেখা। তিনি আপন মনে একটি বৃক্ষতলায় চুপ করে বসে; অতি সুন্দর নির্জন স্থানটি, বনপুষ্প ফুটে আছে ঝর্ণার ধারে। ওরা কাছে গিয়ে দেখলে পৃথিবীর দিকে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে কি যেন দেখছেন। ওদের দেখে সস্মিত মুখে সম্ভাষণ করলেন। যতীন ও পুষ্প দুজনেই ওঁকে প্রণাম করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কোথায় যাচ্চ তোমরা?

পুষ্প বল্লে—রঘুনাথদাসের আশ্রমে। বড় বিপদে পড়ে যাচ্ছি। আপনিও শুনুন দেব—যদি কিছু উপায় হয়। তারপর সে আশার কাহিনী সব খুলে বল্লে।

ক্ষেমদাস সব শুনে ধীরভাবে বল্লেন—এই দুঃখ সনাতন। আত্মা নিরন্তর সাধনা করচে নিজেকে জানবার। আমার নিজের জীবনেও এমনি হয়েছিল। আমি তাই এখানে বসে বসে ভাবছিলাম, আবার পৃথিবীতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উঠচে যেমন উঠতো পাঁচশো বছর আগে, অনাদ্যন্ত মহাকাল নিজের কাজ করে চলেচে যেমন করতো হাজার বছর কি দু-হাজার বছর

আগে—আমি পৃথিবীতে একটি মেয়েকে কত ভালবাসতাম, আমাদের গ্রামের সদানন্দী মঠের ফুলবাগানে কত বেড়াতাম দুজনে এমনি জ্যোৎস্নারাত্রে—লুকিয়ে লুকিয়ে,—এখন সে কোথায় ?

অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবেই কবি মাথা দুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—সত্যি তাই ভাবি, কোথায় সে ?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কেন, আপনি তাঁর দেখা পাননি আর ?

—না। এ বিশ্বের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল। গ্যাখো, আমরা কবি, জগতে রূপরসের উপাসক। এঁকেই বড় করেচি জীবনে। যাঁরা বলেন সব মায়া, তাঁদের কথা বুঝি না। মায়া লয় হোলে এই রূপরসের জগৎটাও লয় হয়। তা আমরা চাইনে—তাই দুঃখ পাই, কিন্তু দুঃখের মধ্যেও জানি ভগবানই সৃষ্টি করেচেন এই জগৎ। সবই তিনি। কষ্ট পেলেও জানি তাঁর হাতে কষ্ট পাচ্ছি। প্রেমময়ের তাড়নায় কষ্ট কি ? সব মুখ বুজে সহ্য করি। এটাও মানি, এই রূপ-রসের সাধনার মধ্যেই আমাদের সিদ্ধি। এ পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। চলো, নরকে আমি নিজে যাবো, খুঁজে বার করি তোমাদের সেই মেয়েটিকে। তার দুঃখ আমি কবি আমি বুঝি—

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার পুনর্জন্ম ঠিক হয়ে গিয়েচে সেই মেয়েটিকে নিয়ে। করুণাদেবী জানিয়েচেন—

ক্ষেমদাস বল্লেন—তিনি যা করেচেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই। তিনি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী—তাঁকে তোমরা করুণাদেবী বল, সীতা বল, দুর্গা বল, লক্ষ্মী বল, সরস্বতী বল—সবই এক। তবে এখন মেয়েটির কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। উপায় হয়ে গিয়েচে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে গেল শুনে। অত বড় বড় পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে সে করুণাদেবীকে এক আসনে বসায়নি। উনি যদি দুর্গা হন, কালী হন, সীতা হন, লক্ষ্মী হন—তবে তার আর জন্মমরণের ভয় কিসের ? আশারই বা ভয় কিসের ? হাসিমুখে সে মহাগৌরবে নরকে যেতেও প্রস্তুত।

ক্ষেমদাস ওর মনের ভাব বুঝে বল্লেন—জন্ম নিতে দুঃখ কিসের ? পৃথিবীর রূপরস আবার আস্বাদ করে এসো। সেই জ্যোৎস্না, সেই বনবিতান, কোকিলের কুহুতান, সেই মায়ের কোলে যাপিত একান্তনির্ভরতার শৈশব, প্রথম যৌবনে প্রিয়ার প্রথম দর্শন—যাও যাও, ওরই মধ্যে ভগবানে মন রেখো—কর্ম যতদিন না কাটে।

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী অথবা কীটপতঙ্গে
করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে।

মেয়েটির কাছে যাবার কোনো দরকার নেই। দেবী যখন তার ব্যবস্থা করেচেন, তখন আমাদের সেখানে যাওয়া ধৃষ্টতা হবে। দেবী সর্বমঙ্গলা তাকে শ্রেয়ের পথে চালিত করবেন।

ঠিক সেই সময় একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের আবির্ভাব হোল বৃক্ষতলে। যতীন তাঁর দিকে চেয়েই চমকে উঠলো, ইনি সেই সন্ন্যাসী, যিনি একদিন স্পর্শদ্বারা তার মধ্যে সবিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলেন! সেই যোগী পুরুষই—নীল বিদ্যুতের মত আভা বেরুচ্চে, ছায়াদেহ থেকে ওঁর।

যতীনের দিকে চেয়ে তিনি মৃদু হেসে বল্লেন—মনে আছে ?

যতীন তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিলে, পুষ্পও তাই করলে। ক্ষেমদাস চুপ করে বসে রইলেন।

তিনি আবার বল্লেন—মনে আছে? বলেছিলাম সময় পেলে দেখা দেবো। এই সেই মেয়েটি বুঝি? এঁর তো খুব উচ্চ অবস্থা দেখচি। ক্ষেমদাসের দিকে চেয়ে বল্লেন—কবি যে! কি করচ বসে বসে ?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমাদের মত সমাধির চেষ্টায় আছি—

—ও তোমাদের অনেক দূর। মায়িক-জগতের বন্ধন তোমাদের এখনও কাটেনি। আবার এদেরও মাথা খাচ্চ কেন ও কথা বলে ?

—আমিও ঠিক ওই কথাই তোমায় বলতে পারি। অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান-ট্যান এই সব কচি কচি ছেলেদের মাথায় ঢোকাচ্চ কেন ?

সন্ন্যাসী হেসে ক্ষেমদাসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহ স্বরে বল্লেন—তুমিও ঐ দলেরই একজন। কবি কিনা, মিথ্যা কল্পনার রাজ্যে বাস করো।

পুষ্প সময় বুঝে বল্লে—প্রভু, জানেন এঁর প্রতি পুনর্জন্মের আদেশ হয়েচে !

সন্ন্যাসী বল্লেন—নয়তো কি ভেবেচ ইনি মায়ার অতীত হয়ে যাতায়াতের চক্রপথ এড়িয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করেচেন ? আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জানো—আত্মাকে না জানলে যাতায়াত বন্ধ হবে না—

ক্ষেমদাস বলে উঠলেন—বয়েই গেল। ক্ষতিটা কি ?

—বাজে কথা বলো না কবি। তোমার ক্ষতি না হতে পারে। তোমার মত চোখ আর মন নিয়ে ক'জন পৃথিবীতে যাবে ? সাধারণ লোক গিয়ে অর্থ, যশ, মান, নারী নিয়ে উন্মত্ত থাকবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য মায়ার খেলা হোক—তবুও স্বীকার করি, দেখতে জানলে তা দেখেও সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভের প্রতি মানুষের মন পৌঁছতে পারে। ও যে একটা সোপান। কিন্তু তা ক'জনের চোখ থাকে দেখবার ? আর্তের সেবা করে ক'জন ? কাজেই মানুষের দুঃখ যায় না। মনে আনন্দ পায় না ; ভোগ করতে করতে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে জরার অধিকার শুরু হয়েছে ! তখন মৃত্যুভয়ে বলির পশুর মত জড়সড় হয়ে থাকে। তা ছাড়া আছে শোক, বিচ্ছেদ, বিত্তনাশ, অপমান, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। কোথায় সুখ বলো ?

—দুঃখের মধ্যেই আনন্দ হে সন্ন্যাসী—দুঃখ ভোগ করতে করতেই আত্মা বড় হয়ে ওঠে, বীতস্পৃহ হয়, বীতমন্যু হয়, বীতশোক হয়। ভগবানের দিকে মন যায়। জন্মে জন্মে আত্মা বললাভ করে, জন্ম-জন্মান্তরের চিতার আগুনে পুড়ে সে ক্রমশ নির্মল, শুদ্ধ, জ্ঞানী হয়ে ওঠে। ভগবানেরই এই ব্যবস্থা—এ তুমি অস্বীকার করতে পারো ? ক'জন তোমার মত নর্মদাতীরে সারাজীবন তপস্যা করে ভগবানের দর্শন পেয়েচে ? বহু ভুগে, বহু ঠকে, বহু নারী, সুরা, অর্থ রিক্ত ভোগ করে মানুষ ক্রমশ বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আসে—বহু জন্ম ধরে এমন চলে—তখন জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতি তাকে বলে আবার কোনো নতুন জন্মে—ও থেকে নিবৃত্ত হও,

ও পথ তো দেখলে গত কত শত জন্ম ধরে, আবার সেই একই ফাঁদে পড়ো, সেই রকম কষ্ট পাবে। ভোগের দ্বারা আত্মাও তখন অনেকটা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেচে—তখন সে ভোগ ছেড়ে ত্যাগের পথ খোঁজে।

—হ্যাঁ, তোমার কথা কাটি কি করে? তুমি কবি, অন্য পথে গিয়ে সত্যদৃষ্টি লাভ করেচ। কিন্তু একটা কথা বোঝো—যদি একজন্মেই হয় তবে ভগবানের ওপর বোঝা চাপিয়ে শত শত জন্ম ধরে এ অনাগত চক্রে ঘোরাঘুরি কেন?…

ক্ষেমদাস সুকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন হাত দুটি সুন্দর ভঙ্গিতে নেড়ে নেড়ে—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী অথবা কীটপতঙ্গে

করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহুঁ তুয়া পরসঙ্গে—

সন্ন্যাসী বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, ও সব ভাবুকতা রাখো। আমার কথার উত্তর দাও।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ—কলিতে বহু দোষ, কিন্তু একটা গুণ এই যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেই পরামুক্তি। তাই বলেচে—

এই পর্যন্ত বলেই আবার সুর করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সন্ন্যাসী ধমক দিয়ে বল্লেন—আবার ওই সব! গান আসচে কিসে এর মধ্যে? তা ছাড়া আমি তোমাদের ওই কৃষ্টৃষ্ণ মানিনে জানো? ওসব মায়িক কল্পনা—ভগবানের আবার রূপ কি!

—তুমি শুষ্ক পথে ভগবানের সঙ্গে নিজের সত্তা মিলিয়ে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেচ। ভক্তি-পথের কিছুই জানো না। প্রেমভক্তি এখনও বাকি তোমার।

—মরুক গে। আমার কথার উত্তর দাও—

—উত্তর কি দেব? ভোগ না হোলে নিবৃত্তি হয় না। ভগবান তা জানেন, তাই শত জন্মের মধ্যে দিয়ে জীবকে তিনি ভোগ আস্বাদ করিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন। সবারই হবে, তবে বিলম্বে।

সন্ন্যাসী শান্তভাবে বল্লেন—হাঁ, ঠিক।

—তুমি মেনে নিলে?

—নিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথার ঠিক উত্তর দিলে কৈ? যদি একজন্মে হয় তবে হাজার জন্মের মধ্যে দিয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটি কেন?

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—তার কারণ, সবাই তোমার মত মুক্তিকামী নয়, তোমার মত জ্ঞানী নয়—গতজন্মে তুমি যে উচ্চ অবস্থা নিয়ে জন্মেছিলে, যে জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতির ফলে তোমার মন মুমুক্ষু হয়েছিল, সংসারের আসক্তির বন্ধন কাটিয়েছিল—তুমিই বলো না, সে কি তুমি একজন্মে লাভ করেছিলে? তুমি তো ষড়ৈশ্বর্যশালী—মুক্তপুরুষ—তোমার অজানা তো কিছুই নেই—বলো তুমি?

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বল্লেন—তা ঠিক। গতজন্মের পূর্ব তিনজন্মেও আমি যোগী ছিলাম। আমার সে সময়ের গুরুভ্রাতা এখনও হিমালয়ের দুর্গম শিখরে তুষারাবৃত গুহায় দেহধারী হয়ে বাস করচেন। প্রায় আটশো বছর বয়েস হোল। লোকালয়ের কিছুই জানেন না। গত সাতশো

বছরের মধ্যে তিনবার নীচে নেমে গিয়েছিলেন ভারতের লোকালয়ে। একবার নেমে শুনলেন শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করচেন। দ্বিতীয়বার নামলেন অনেকদিন পরে ; নামতে নামতে শুনলেন যবনেরা ভারতে প্রবেশ করেচে—শুনে আর না নেমে গিয়ে উঠে নিজের আসনে চলে গেলেন, অনেকদিন আর নামেন নি।

পুষ্প ও যতীন রুদ্ধকণ্ঠে শুনছিল। পুষ্প অধীর কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—আর একবার কখন নেমেছিলেন ?

—আমি তখন এ জন্মের পরেও দেহত্যাগ করেচি—এই সেদিন, পৃথিবীর হিসেবে বড়জোর সত্তর আশি বছর হবে। বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ভারতব্যাপী, আমরা অনেকে দলবদ্ধ হয়ে নেমে যাই ভারতে যদি কোন প্রতিকার করতে পারি। ওঁকেও নিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে। কুম্ভমেলা সেবার প্রয়াগে। উনি মেলা দর্শন করে দশদিন থেকে ওপরে উঠে যান—সেই শেষ, আর লোকালয়ে যান নি।

ক্ষেমদাস প্রশ্ন করলেন—এখনও দেহে রয়েচেন কেন ?

—যোগ-প্রক্রিয়ায় দেহ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গিয়েচে, তাই দেহ ধারণ করেই আছেন। বাসনা-কামনা-শূন্য মুক্তপুরুষ তিনি, দেহে থাকাও যা, দেহে না থাকলেও তা। তাঁর পক্ষে সব সমান। স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বের সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। আমিও তাঁকে বলেছিলাম—আর দেহে কেন ? উনি বল্লেন—হাম্ তো আত্মানন্দ আত্মারাম, হামারা ওয়াস্তে যো হ্যায় ব্রহ্মলোক, সো মেরা হিমবান, মেরা আসন। এহি পর পরমাত্মা বিরাজমান হ্যায়। লোকালোক তো মায়া—

ক্ষেমদাস বল্লেন—হ্যাঁ, ওসব অনেক উচ্চ অবস্থার কথা। আমাদের জন্যে নয় ওসব। আমরা ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পাই, এই অপূর্ব সৌন্দর্যরসের আস্বাদ করবে কে আমরা ছাড়া ? তোমরা তো ব্রহ্ম হয়ে বুড়ি ছুঁয়ে বুড়ি হয়ে বসে আছ।

পুষ্প কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলে—প্রভু, আমাদের একবার সেই সাধুর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন ?

সন্ন্যাসী বল্লেন—না মা। তিনি লোকের ভিড় পছন্দ করেন না। তবে চলো আমার পূর্বজন্মের আর একটি গুরুভগ্নীর কাছে তোমায় নিয়ে যাবো—তিনিও আজ পর্যন্ত দেহে আছেন। গভীর বনের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকেন—প্রায় সময়ই সমাধিস্থ থাকেন। চলো হে কবি, সমাধি দেখলে তোমার জাত যাবে না—

ক্ষেমদাস বল্লেন—না হে, আমি যাবো না। তুমি এদের নিয়ে যাও—আমার ও ধর্ম নয়। কবির ধর্ম স্বতন্ত্র।

সন্ন্যাসী হেসে এসে ক্ষেমদাসের হাত ধরে বল্লেন—ভগবানের মহিমা সর্বত্র। কেন যাবে না ? চলো—

—বেশ, তাহলে তুমি কথা দাও আমার সঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের আশ্রমে যাবে ? যদি শ্রীকৃষ্ণকে দেখাতে পারি সেখানে ? প্রেমভক্তি নেবে ?

সন্ন্যাসী পুনরায় হেসে বল্লেন—হবে, হবে। আচ্ছা যাবো, কথা দিলাম। প্রেমভক্তি নিই না নিই স্বতন্ত্র কথা। তোমাকেও তো আমি ষট্‌চক্র ভেদ করে অদ্বৈতজ্ঞান পাইয়ে দিচ্ছি না জোর করে?

কিছুক্ষণ পরে ওরা সবাই সন্ন্যাসীর পিছু পিছু পৃথিবীর একস্থানে নেমে এল। স্থানটি দেখেই ওরা বুঝলে, লোকালয় থেকে বহু দূরে কোনো এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে। সম্মুখে একটি পার্বত্য নদী, কিন্তু নদীগর্ভে কোথাও মাটি বা বালি নেই—সমস্তটা পাষাণময়, চওড়া সমতল, মসৃণ। প্রায় একশো হাত পরিমিত স্থান কি তার চেয়ে বেশি এমনি আপনা-আপনি পাথর বাঁধানো। তারই মধ্যভাগ বেয়ে ক্ষুদ্র নদীটি ক্ষুদ্র একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে মর্মর কলতানে বয়ে চলেচে। উভয় তীরে নিবিড় জঙ্গল, মোটা মোটা লতা এ-গাছ থেকে ও-গাছে দুলচে; গভীর নিশীথকাল পৃথিবীতে, আকাশে ঠিক মাথার ওপরে চাঁদ, গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত অরণ্যভূমি মায়াময় হয়ে উঠেচে।

ওরা মুগ্ধ হয়ে সে অপূর্ব অরণ্য-দৃশ্য দেখচে, এমন সময়ে বনের মধ্যে বাঘের গর্জন শোনা গেল, দ্বিতীয়বার শোনা গেল আরও নিকটে। যতীন সভয়ে বলে উঠলো—ওই! চলুন পালাই—

অল্প পরেই ওপারের বনের লতাপাতা নিঃশব্দে সরিয়ে প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হাঁড়ির মত মুখ করে নদীজলে নামতে দেখা গেল এবং তার জল খাওয়ার 'চক্ চক্' শব্দ বনের ঝিল্লী-রবের সঙ্গে মিলে এই গম্ভীর রহস্যময় রজনীর নৈঃশব্দ মুখর করে তুলতে লাগলো।

পুষ্প বল্লে—ভয় কি যতীনদা তোমার এখন বাঘের?

ক্ষেমদাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব শোভাময় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন বনকান্তারের দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। দুহাত জুড়ে নমস্কার করে বল্লেন—সুন্দর। সুন্দর! নমস্কার হে ভগবান, ধন্য তুমি, আদি কবি তুমি জগৎস্রষ্টা! কর্ণামৃতে ঠিকই বলেচে :—মধুগন্ধি···

সন্ন্যাসী বল্লেন—ব্রহ্মই জগৎ হয়ে রয়েচেন, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু—তিনিই সর্বত্র। সামনে যা দেখচো এও তিনি, তাঁর বিশ্বরূপের এক রূপ—তবে অত ভাবুকতা আমাদের আসে না, ইনিয়ে-বিনিয়ে বর্ণনা করা আসে না।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—আসবে কি হে! তাহোলে তো তুমি উপনিষদ তৈরী করে বসতে। তোমাদের সঙ্গে উপনিষদের কবিদের তফাৎ তো সেইখানে। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, আবার কবিও ছিলেন। তোমার মত নীরস ব্রহ্মবিৎ ছিলেন না। ভগবানও কবি। উপনিষদে কি বলেনি তাঁকে, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ?

সন্ন্যাসী বল্লেন—চলো চলো, যে জন্যে এসেচি। উপনিষদে কবি বলেচে যিনি দ্রষ্টা তাঁকে। যিনি প্রজ্ঞার আলোকে এক চমকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দর্শন করেন, চিন্তা দ্বারা যাঁকে বুঝতে হয় না, তিনিই কবি।

যতীন বল্লে—প্রভু, এ কোন্ জায়গা পৃথিবীর?

—এ হোল বাস্তার রাজ্য, মধ্যভারতের। এই নদীর নাম মহানদী, উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে সমুদ্রে পড়েচে। এখানে নদীর শৈশবাবস্থা দেখচ, সবে বেরিয়েচে অদূরবর্তী পাহাড়শ্রেণী

থেকে। এখন এসো আমার সঙ্গে—

নদীর ওপারে কিছুদূরে ঘন বনে একটি পর্ণ-কুটীরের কাছে ওরা যেতেই একটি সন্ন্যাসিনী তাড়াতাড়ি বার হয়ে এসে ওঁদের অভ্যার্থনা করলেন। বল্লেন—আসুন আপনারা। আমার বড় সৌভাগ্য আজ—

যতীন ও পুষ্পের মনে হোল ইনি যেন ওদের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখে যতীন অবাক হয়ে গেল, সন্ন্যাসী বলেচেন ওঁর পূর্বজন্মের গুরুভগিনী—অথচ ইনি তো কুড়ি বৎসরের তরুণীর মত সুঠাম, সুরূপা, তন্বী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রূপ যেন ফেটে পড়চে, মাথায় একঢাল কালো চুলের রাশ।

সন্ন্যাসী বল্লেন—ভাল আছ ভগ্নী ?

সন্ন্যাসিনী হেসে হিন্দীতে বল্লেন—পরমাত্মা যেমন রেখেচেন। এ'রাও তো দেখচি বিদেহী আত্মা। এঁদের এনেচ কেন ?

পুষ্প ও যতীন সন্ন্যাসিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। ক্ষেমদাস যুক্তকরে নমস্কার করলেন।

সন্ন্যাসী বল্লেন—এঁরা এসেচেন তোমায় দেখতে। ইনি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আইয়ে মহারাজ, আপকা চরণধূলিসে হামারা আশ্রম পবিত্র হো গিয়া—পরমাত্মাকি কৃপা।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, আপনি দেবী, আপনার দর্শনে আমরা পুণ্যলাভ করলাম।

সন্ন্যাসিনীর সুন্দর মুখের লাবণ্যময় হাসি অরণ্যভূমির জ্যোৎস্নাস্নাত সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেচে। কুটীরের দ্বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন—এহি নদীমে আজ পূর্ণিমাকী রাতমে স্বর্গসে উতার কর্ অপ্সরীলোগ্ নহ্‌তে থে। হাম বহুৎ বরষসে দেখতে হেঁ। আপকো মালুম হ্যায় ?

ক্ষেমদাস বল্লেন—না মা, আমরা তো জানি না। আমাদের দেখাবেন ?

—আপ দেখনে মাংতা ?

—হাঁ মা, দেখালেই দেখি।

সন্ন্যাসী বল্লেন—এঁর বয়েস কত বল তো যতীন ?

যতীন সঙ্কুচিত ভাবে বল্লে—আমি কি বলবো ? দেখে তো মনে হয় কুড়ি-বাইশ।

সন্ন্যাসিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন বালিকার মত।

সন্ন্যাসী বল্লেন—তুমি তোমার জ্ঞান-মত বলেচ, তোমার দোষ নেই। তোমার ধারণা নেই এ বিষয়ে।

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—তুম ক্যা বোলতা হ্যায় রে বাচ্চা ? হামারা তো এহি আসন পর পচিশ বরষ বীত গিয়া—ইসকা পহ্‌লে পঞ্জাবমে রাভি নদীকী তীরমে করিব সত্তর বরষ আসন থা। গুরুজীকা অনুজ্ঞাপর এহি বনমে মহানদীকে কিনারপর আশ্রম বনায়া।

যতীন মনে মনে হিসেব করে বল্লে—তা হোলে আমার প্রপিতামহীর চেয়েও আপনি বড়—

সন্ন্যাসী বল্লেন—ওঁর বয়েস দেড়শো বছরের কাছাকাছি—বরং কিছু বেশী হবে তো কম নয়।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, দেহধারী হয়ে আছেন যে এখনো?

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—বহুৎ নেতি ধৌতি কিয়া -ইসিসে শরীর বন্ গিয়া। আভি ধ্বংস নেহি হোগা কোই পান্ ছ'শো বরষ। কোই হরজ নেই, রহে তো রহে।

যতীন আপন মনে ভাবলে—বাবাঃ, এই দুর্গম বনের মধ্যে উনি একা কি করে থাকেন! বাঘের ভয় করে না? এ তো বাঘের আড্ডা দেখে এলাম।

সন্ন্যাসিনী ওর মন বুঝেই যেন বল্লেন—যখন সমাধিতে থাকি তখন বাঘ আসে, বিষাক্ত সাপ এসে মাথায় ওঠে। গায়ে বেড়ায়। সমাধি ভাঙলে ওদের যাতায়াতের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারি।

সন্ন্যাসী বল্লেন—আজকাল কি আহার ছেড়েচ?

—না। কন্দমূল খাই, বেলগাছ আছে আশ্রমের পেছনে অনেক, বেল খাই। সামান্যই আহার।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, তুমিও কি প্রেমভক্তির বিপক্ষে? তুমিও নীরস অদ্বৈতবাদী?

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—মাৎ পুছিয়ে। প্রেমভক্তি বহুৎ কৃপাসে লাভ হোতা হ্যয়—হামারা তো তিন যুগ গুজার গিয়া, ও বস্তু নেহি মিলা। কাঁহা মিলেগা বাৎলাইয়ে মহাত্মা কৃপা কর্। আপ দিজিয়ে হামকো!

ক্ষেমদাস বল্লেন—আমার শক্তি নেই মা। আমি কবি, এই পর্যন্ত। ও সব দেওয়া নেওয়ার মধ্যে আমি নেই। তবে তোমাকে আমি ঊর্ধ্বলোকে বৈষ্ণবাচার্যদেবের আশ্রমে নিয়ে যেতে পারি, তাঁদের কাছে উপদেশ পেতে পারো। তবে দরকার কি মা? তোমরা তো প্রতিক্ষণে সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মকে আস্বাদ করচো—কি হবে প্রেমভক্তি?

—আমার কাছে গৃহস্থদের নানা দেবদেবী আসেন, নানা দেশ থেকে আসেন—একা থাকি বলে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিতে আসেন। লম্বদামোদর, গোপাল, উগ্রতারা, মৃন্ময়ী, শ্যামরায়, অষ্টভুজা—আরও কত কি নাম। এসে গল্পগুজব করেন, সুখদুঃখের কথা বলেন। সেদিন এক ঠাকুর এসে হাজির আপনাদের বাংলাদেশের মুরশিদাবাদ জেলার কি গ্রাম থেকে—নাম শ্যামসুন্দর। আমায় এসে ছলছল চোখে বল্লেন—যে গ্রামে আছেন, সেখানে নাকি গৃহস্থেরা অনাদর করচে, ঠিকমত ভোগ দিচ্চে না, খেতে পান না—এই সব। তা আমি বল্লাম—আমার কাছে কেন তুমি? আমি তোমাদের মানিনে। যারা মানে তাদের কাছে গিয়ে প্রকট হও, তোমার নালিশ জানাও, আমাকে বলে কি হবে? বালক বিগ্রহ, ওর চোখে জল দেখে কষ্ট হোল—পাষণ্ডী গৃহস্থেরা কেন সেবা করে না কি জানি। ওই সব দেখে আমার মন-কেমন করে, মনে হয় প্রেমভক্তি হোলে এঁদের নিয়ে আনন্দ করতাম।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—মায়া, মায়া, নির্বিকল্প ভূমি থেকে নেমে এসে তুমি আবার ঐসব মায়িক ঠাকুরদেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ পাততে চাও?

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, তোমাকে প্রেমভক্তি দেবার জন্তই ওই সব দেবদেবী আসেন—আরও আসেন তুমি মেয়েমানুষ বলে—হাজার অদ্বৈতবাদী হোলেও এখন তোমাদের মন এই এঁদের মত কঠোর, নীরস, শুষ্ক হয়ে ওঠেনি। তাই তোমার কাছে আসেন, কই এঁর কাছে তো আসেন না? এলে আমল পাবেন না বলেই আসেন না। ভগবানও প্রেমভক্তির কাঙাল, যে ভক্ত তারই কাছে লোভীর মত ঘোরেন। যে প্রেমভক্তি দিতে পারবে না, তার কাছে তো তিনি—

সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, তোমার ওই সব অসার, ফাঁকা ভাবুকতা-গুলো রাখবে দয়া করে? শুতে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে সত্যি বলচি। যত খুশি প্রেমভক্তি বিলোও গিয়ে তোমার সেই বৈষ্ণবাচার্যের আখড়ায়—আমাদের আর শুনিও না—যত খুশি কাব্যরচনা কর বৃন্দাবন আর চাঁদের আলো আর কদম্বমূল নিয়ে সেখানে বসে।

ক্ষেমদাস বল্লেন— তোমাকেও একদিন ভক্তির ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবে হে কঠোর জ্ঞান-মার্গী সন্ন্যাসী। আমার নাম যদি ক্ষেমদাস হয়—

সন্ন্যাসী বল্লেন—আচ্ছা, এখন বন্ধ করো। তুমি আমাকে বলচো নীরস। তোমাকে আমি এমন এক জ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাবো যিনি সম্পূর্ণ নাস্তিক, জড়বাদী। পঞ্চভূতের বিকারে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েচে বলেন। ঈশ্বর মানেন না, সৃষ্টিকর্তা মানেন না; আত্মাকে বলেন পঞ্চভূতের বিকার, জড়ের ধর্মে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েচে, আপনা-আপনিই একদিন লয় হবে—এই মত পোষণ করেন।

—কে? লোকায়ত দর্শনের কর্তা চার্বাক?

—চার্বাক নন, তাঁর প্রভাবান্বিত কোনো শিষ্য।

—কি অবস্থা লাভ করেচেন?

—স্থাণুবৎ অচলাবস্থা। খুব উচ্চ স্তরেই আছেন, পুরুষকারের বলে উন্নত ভূমি লাভ করেচেন, কিন্তু মুক্তি হয়নি। এর মধ্যে দুবার পৃথিবী ঘুরে এসেছেন। বলেন, এও জড়ের ধর্ম! মুক্তি বলে কিছু নেই। ঈশ্বর মিথ্যা! কাকে তিনি উপাসনা করবেন? পুনর্জন্মে দুঃখিত নন। জন্মান্তরীণ স্মৃতি জলজল করচে মনে।

—কি অবলম্বনে আছেন?

—জড়ের ধর্ম পরীক্ষা করেন। তরুণ শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন। পৃথিবীতে বহু তরুণ-দলকে যুগে যুগে প্রভাবান্বিত করচেন জড়ধর্মের একচ্ছত্রত্ব প্রতিপাদনের জন্যে। ব্যাসক্তি-শূন্য, উদার পুরুষ।

—মৃত্যুর পরে দেহধ্বংসে আত্মা থাকে দেখেও জড়বাদী?

—হাঁ। বলেন, ওটাও জড়ের ধর্ম। গুটিপোকা দেহত্যাগ করে প্রজাপতি হচ্চে এও তো দেখা যায়। আবশ্যক কি ঈশ্বরকে টেনে আনবার?

ক্ষেমদাস কানে আঙুল দিয়ে বল্লেন—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু, শুনতে নেই এসব কথা।

—কেন শুনতে নেই? এই ভাখো তোমাদের অনুদারত্ব। আমরা বলি, ব্রহ্মই জগতের সব হয়ে আছেন। নাস্তিক যিনি তিনি ব্রহ্মের বাইরে নন। ব্রহ্মের মধ্যে থেকে তিনি একথা

বলচেন। এমন একদিন আসবে, ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করবেন। বাদ পড়বেন না।

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আমারও তাই মত।

ক্ষেমদাস অধীরভাবে বল্লেন—বেশ, বেশ। ওসব আলোচনা এখন থাক। চলো যাওয়া যাক্। রাত্রি প্রভাত হয়ে এল—জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে আসচে। ওই শোনো ময়ূর ডাকচে বনে।

সন্ন্যাসিনীকে পুনরায় বন্দনা করে সকলে সেই গভীর বন পরিত্যাগ করলেন। কুটীরের আশেপাশে অনেক বন্য দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে। অদূরের শৈলচূড়া শেষরাত্রের হিমবাষ্পে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। বন্য কুক্কুটের রব রজনীর শেষ যাম ঘোষণা করচে।

ক্ষেমদাস আকাশপথে বল্লেন—কি সন্ন্যাসী, যাবে তো রঘুনাথদাসের আশ্রমে?

সন্ন্যাসী রাজী হওয়াতে ওরা চক্ষের নিমেষে বৈষ্ণবাচার্যের আশ্রমের সামনে এসে পড়লো। ওরা সকলে রঘুনাথদাসের আসনের দিকে গেল—পুষ্প গেল গোপাল-বিগ্রহ দেখতে ও তার প্রাণের ব্যথা গোপালের পায়ে নিবেদন করতে। নীল স্ফটিকের অপূর্ব বিগ্রহের মুখে যেন করুণার হাসি লেগেই আছে। পুষ্প বাইরে এসে দাঁড়ালো, ঐ বিরাট অনন্ত বিশ্ব, আকাশের পটে কোটি কোটি নক্ষত্ররাজি (বৈষ্ণবাচার্যের আশ্রমে এখন রজনীর প্রথম যাম)—সেই যে সেদিন মহাপুরুষ উপনিষদের বাক্য উচ্চারণ করে শুনিয়েছিলেন—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে আরও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জ্বলচে—সব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর, সেই বিরাট দেবতা কেন এখানে ক্ষুদ্র বিগ্রহে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন কিসের টানে কে বলবে?

পুষ্প প্রণাম করলে সাষ্টাঙ্গে। সে বিরাটের কতটুকু ধারণা করতে পারে, মেয়েমানুষ সে। সে অতি ক্ষুদ্র নারী মাত্র। দয়া করে মধুররূপে ধরা না দিলে সে ক্ষীরোদসাগরশায়ী মহাবিষ্ণুর কিংবা তাঁর চেয়েও এককাটি সরেশ নিরাকার পরব্রহ্মের কি ধারণা করতে সমর্থ? মন্দিরে প্রণাম করে উঠে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করলে—হে ঠাকুর, আশা-বৌদিদিকে কৃপা কর। এবার যতীনদা ও আশার জন্ম তোমার আশীর্বাদে যেন সার্থক হয়ে ওঠে। আর যেন আশার কুপথে মতি না হয় হে ঠাকুর। ওর প্রারব্ধ কর্ম এবার যেন ক্ষয় হয়। ওকে দয়া কর।

মন্দিরের নিভৃত কুঞ্জতলে অপূর্ব পুষ্পসুবাস। যেন বহু জাতী, যূথী, মালতী, হেনা, নাগকেশর একসঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়েচে। সন্ন্যাসী ও ক্ষেমদাস শ্বেতপ্রস্তরের চত্বরে বৃক্ষতলে বসে রঘুনাথদাসের সঙ্গে আলোচনা করচেন।

রঘুনাথদাস বলচেন—আপনি আমার বিগ্রহটি দর্শন করে আসুন। আপনার ভক্তি হবে। উনি ভক্তি আকর্ষণ করেন। আপনার আগমনে আমার আশ্রম আজ ধন্য হয়ে গেল। কিছুকাল এখানে থাকুন।

সন্ন্যাসী বল্লেন—আপনি মহাপুরুষ, আপনার নিকটে থাকবো এ তো পরম সৌভাগ্য। তবে এবার নয়, আমি ঘুরে আসবো। বিগ্রহ দর্শন করে আসি।

বিগ্রহ দর্শন করে একটু পরেই ফিরলেন। বল্লেন—আপনার বিগ্রহ দেখচি বড় বিপজ্জনক বস্তু—সত্যিই আমাকে উনি আকর্ষণ করচেন। আমায় বল্লেন—আমায় কেমন লাগচে? আমি

বল্লাম—আমি তোমাকে মানি না। একরকম জোর করে চলে এসেচি—

বলে আপন মনেই হাসতে লাগলেন।

রঘুনাথদাস বল্লেন—আমার গোপাল আপনার ভক্তি আকর্ষণ করতে চাইচেন। আপনি দেবেন না?

—ক্ষমা করবেন আচার্যদেব। আমার সংশয় যেদিন ছিন্ন হবে সেদিন এসে আপনার আশ্রমে দীক্ষা নেবো প্রেমভক্তির। এখন ওসব আমি পুতুল-পুজোর সমান মনে করি।

রঘুনাথদাসের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে মৃদুমন্দ হাসি ফুটলো। ঈষৎ দর্পভরে বল্লেন—আমার গোপালের ক্ষমতা থাকে, আপনাকে তিনি ভজাবেন। পুতুল কি কথা বলে? আপনি ব্রহ্মবিৎ, ভেবে দেখুন। আপনার মত ভক্ত উনি চাইচেন। ব্রহ্মভূমি থেকে নেমে এসে ভগবানের লীলাসঙ্গী হয়ে থাকুন।

—আপাতত আমার একটি গুরুভগ্নী প্রেমভক্তির জন্যে ব্যাকুলা। তাকে দিন দয়া করে।

—কোথায়?

—সম্প্রতি দেহে বর্তমান আছেন, মহানদীর তীরের বনমধ্যে তাঁর আসন। পরমাত্মার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েচেন। বহুকাল থেকে দেহধারিণী। আপনি আহ্বান করলে তিনি এখানেই আসবেন।

—আমি অকিঞ্চন। আমার কি সাধ্য প্রেমভক্তি দিই। গোপাল দেবেন—

পুষ্প এই সময়েই হঠাৎ জানু পেতে বসে করজোড়ে বিনীত কণ্ঠে বল্লে—ওই সঙ্গে আমাকেও দিন আচার্যদেব। আমার একমাত্র অবলম্বন।

ক্ষেমদাস উৎসাহে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন - সাধু! সাধু!

রঘুনাথ পুষ্পের মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন—আমি কে মা? গোপালের কাছে চাও। আমি আশীর্বাদ করি তুমি পাবে।

পুষ্প যতীনকে দেখিয়ে বল্লে—এঁকে আশীর্বাদ করুন। ইনি শীঘ্র পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন। আদেশ হয়ে গেছে।

রঘুনাথ যতীনের দিকে ভাল করে চেয়ে বল্লেন—পুনর্জন্ম হচ্চে? খুব ভাল। ভগবানে মন যেন থাকে আশীর্বাদ করচি। পুনর্জন্মে ভয় কি, যদি কৃষ্ণপদে মতি থাকে।

যতীন পুষ্প ভিন্ন উপস্থিত সকলের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আবার আপনাদের দেখা ইনি পাবেন?

সন্ন্যাসী বল্লেন—নিশ্চয়, দেহ অন্তে। আমরা আর কোথায় যাচ্চি।

রঘুনাথ বল্লেন—ইচ্ছা করে প্রভু, আর একবার পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ভক্তিধর্ম প্রচার করে আসি। জীবের বড় কষ্ট। দেখে শুনে বড় কষ্ট পাই। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন বুঝলে একবার ছেড়ে শতবার যেতে প্রস্তুত আছি। সেদিন মহাপ্রভুকে বলেছিলাম, উনি বল্লেন—এখন পৃথিবীতে অন্য সময় এসেচে, লোকজনের অন্যপ্রকার মতি। এখন আমাদের পূর্বতন পন্থায় কাজ হবে না। গ্রহদেব বৈশ্রবণ এ বিষয়ে সেদিন মহাপ্রভু ও আরও উচ্চ

লোকের কয়েকটি মহাপুরুষের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন। তাঁরা বলেন, পৃথিবী এখনও তৈরী হয়নি। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কয়েকজন শক্তিমান আত্মা পাঠাচ্চেন পৃথিবীতে, এঁরা ধ্বংস ও দুর্দৈব আনবেন পৃথিবীতে গিয়ে। পৃথিবী আলোড়িত হবে—লোকের দৃষ্টি ঊর্দ্ধমুখী হবে। ভোগবাদ ও জড়বাদের অবসান না হোলে জীবের মঙ্গল নেই। ঢেলে সাজাতে হবে গোটা পৃথিবীটাকে। আপনিই তো ইচ্ছা করলে করতে পারেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন।

যতীন অসতর্ক মুহূর্তে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কে? ইনি!

ক্ষেমদাস বল্লেন—হাঁ, ইনি। অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ, ওঁরা গ্রহদেবের সমান। ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাতে পারেন। ব্রহ্মসূত্রে বলেচে—সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ। মুক্তপুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্য সংকল্পমাত্র উদয় হয়।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—ঝোঁকের মাথায় একটু বেশি বল্লে কবি। ভোগমাত্রমেষাম্ অনাদি-সিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্—শঙ্করাচার্য কি বলেচেন প্রণিধান কর। মুক্তের ভোগ ঈশ্বরের সমান হয়, শক্তি কি তাঁর সমান হয়?

—আমি ঈশ্বরের কথা বলিনি, গ্রহদেবের কথা বলেচি।

—গ্রহদেব শক্তিমান বটে কিন্তু ঈশ্বরের বিনা অনুজ্ঞায় তিনি কিছুই করতে পারেন না।

—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে সমর্থ কিনা?

—হ্যাঁ। কিন্তু ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে।

—আপনি?

—না। আমার ওপর সে ভার ন্যস্ত নেই। আমি আদার ব্যাপারী, সৃষ্টি স্থিতির খোঁজে আমার দরকার কি? সৃষ্টি বলচোই বা কাকে? নির্গুণ ব্রহ্ম যখন দেশ ও কালের সীমার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেন, তখন তাকে বলে সৃষ্টি—ঊর্ণনাভ যেমন নিজের দেহনিঃসৃত রস তন্তু-রূপে প্রসারিত করে।

রঘুনাথদাস বল্লেন—মহাপুরুষ, ক্ষেমদাস ঠিকই বলেচেন। আপনি পারেন সব, অসাধারণ শক্তি আপনাদের। সেই শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কোনো কাজে আসচে না। ভগবানের দাসভাবে ভক্তভাবে তাঁকে সেবা করে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করুন। কিংবা পৃথিবীর বা অন্য গ্রহলোকের জীবকুলের সেবা করুন। জীবের সেবায় স্বয়ং ভগবান তাঁর পার্শ্বচরদের নিয়ে সর্বদা নিযুক্ত। আপনি মহাজ্ঞানী, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব?

সন্ন্যাসী বিনীতভাবে নমস্কার করে বল্লেন—আপনার আদেশ শিরোধার্য।

যতীন অবাক হয়ে ভাবলে, এত বড় লোক, কিন্তু কি অদ্ভুত বিনয় এদের। সত্যি, বড় ভাল লাগচে।

ক্ষেমদাস হঠাৎ বলে উঠলেন—বৃন্দাবনে আরতি হচ্চে গোপাল-মন্দিরে। আমি আর থাকতে পারবো না। চল।

আজও পৃথিবীতে সুন্দর জ্যোৎস্না। বৃন্দাবনের বনপথে আলোছায়ার খেলা দেখে ওরা সবাই

মুখ। শহরে ইলেকৃট্রিক আলো জলচে, মোটর যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে, লোক গিজ্‌গিজ্‌ করচে। চানাচুরওয়ালা সুর করে মোড়ে দাঁড়িয়ে সওদা ফিরি করচে। গোপালের মন্দিরের আরতির সময়ে কত অশরীরী ভক্ত, কত জ্যোতির্ময় আত্মা সেদিনকার মত মন্দিরের মধ্যে উপস্থিত। অনেকে স্বর্গীয় পুষ্প বিগ্রহের অঙ্গে বর্ষণ করতে লাগলেন আরতির সময়ে।

পুষ্প চেয়ে দেখতে দেখতে ওঁদের মধ্যে করুণাদেবীকে দেখে চমকে উঠলো। আরও একটি দেবী আছেন ওঁর সঙ্গে। দুজনে মন্দিরের এক কোণে সাধারণ গৃহস্থঘরের নারীদের মত শান্ত-ভাবে দাঁড়িয়ে আরতি দর্শন করচেন। পুষ্পকে তাঁরা ডাকতেই সে কাছে গেল। পুষ্প দেখলে, অপরা দেবীটি তারই পূর্বপরিচিতা প্রণয়দেবী।

প্রণয়দেবী বল্লেন—অনেকদিন তোমায় দেখিনি। আরতি শেষ হয়ে যাক্‌, বাইরে চলো, কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পের মনে পড়লো কেবলরাম কুণ্ডুর কথা। প্রণয়দেবীর 'অনেকদিন দেখিনি' এই কথাতে ওর মনে পড়লো। সেই নিম্নস্তরের বিষয়াসক্ত আত্মাকে সে দাদু বলে ডেকেচে। অথচ অনেকদিন তার কাছে যাওয়া হয়নি বটে। তাকে আজ এখুনি বৃন্দাবনে এনে গোপাল-মন্দিরে আরতি দেখাতে হবে। ধন্য হয়ে যাবে কেবলরাম—স্বর্গ-মর্তের মিলনদৃশ্য এভাবে দেখার সৌভাগ্য আর তার হবে না।

আচ্ছা, আশা-বৌদিকে আনলে হয় না? ধন্য হয়ে যায়, উদ্ধার হয়ে যায় একদিনে সে।

করুণাদেবীকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করলে। দেবী বল্লেন—আশার আধ্যাত্মিক বুদ্ধি এখনও সুপ্ত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে, দেখেও দেখবে না এ সব। অত সহজে পাপী উদ্ধার হয় না পুষ্প, তাহোলে আমরা বসে থাকতাম না—নরক উজাড় করে পাপী হাজারে হাজারে নিয়ে এসে ফেলতাম।

পুষ্প লজ্জিত হোল।

প্রণয়দেবী বল্লেন—তোমাদের তিনজনের ওপর আমার দৃষ্টি বহু জন্ম আগে থেকে রেখেচি। এখনও অনেক গতাগতি বাকি ওদের দুজনের। পুনর্জন্ম ভিন্ন আশার আত্মা কিছুতেই কর্মক্ষয় করতে পারবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না পুষ্প, যা করবার তিনিই করবেন। আমরা তাঁর দাসী মাত্র।

পুষ্প ওঁদের অনুমতি নিয়ে চক্ষের নিমেষে কেবলরামের স্তরে এসে দেখলে, বৃদ্ধ সেখানে নেই। তবে বোধহয় আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরে ওর ছেলেদের আড়তে গিয়ে বসেচে। কিন্তু একা যেতে পুষ্পের বড় ভয় করে। পৃথিবীর স্থূল স্তরে নিম্নশ্রেণীর দুষ্ট আত্মাদের উপদ্রব বড় বেশি, এরা অনেক সময় দেহধারী ও বিদেহী সকলকেই বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। বৃন্দাবনে ছিল এতক্ষণ, পৃথিবীর হোলেও সে একটা পবিত্র দেবস্থান, ওখানে প্রেতযোনির উপদ্রব খুব কম।

ভগবানের নাম স্মরণ করে সে কুড়ুলে-বিনোদপুরে কুণ্ডুদের গদিতে এসে দেখে বৃদ্ধ কেবলরাম তার বড় ছেলে বিনোদের পাশে হাতবাক্স সামলে বসে আছে। সন্ধ্যার সময়, হাটুরে খরিদ্দারের

ভিড় দোকানে। বিনোদের ছুই কর্মচারী হেঁকে বলচে—তুজোড়া ফুলন শাড়ী, ছ' নং—

বিনোদ খাতায় টুকতে টুকতে মাথা তুলে বলচে—টাকা না নোট্?

খরিদদার বলচে—আজ্ঞে নোট্ কুড়ু মশায়। ছ'মণ পাট ব্যাচ্‌লাম রাম তেলির আড়তে—সব নোট্ দেলে। নোট্ এখন ক'নে ভাঙাতি যাই আপনাদের দোকান ছাড়া? বাবু, কিছু কম নেন্ দামটা।

বিনোদের কিছু বলবার পূর্বেই তার পার্শ্বোপবিষ্ট কেবলরাম বলে উঠলো—ওতে লাভ নেই এক পয়সাও। তুমি পুরোনো খদ্দের বলে শুধু কেনা-দামে দেওয়া।

পুষ্প বুঝতে পারলে, এ অতি কপট কথা। বৃদ্ধের মন বলচে জোড়াপিছু দেড় টাকা লাভ হয়েচে এই পাড়াগাঁয়ে মূর্খ খদ্দেরের কাছে। এই সময় বিনোদ বল্লে—যাও, ছ'আনা কম দাওগে জোড়ায়, তুমি পুরোনো খদ্দের, তোমার সঙ্গে অন্তরকম।

কেবলরাম পুত্রের ওপর চটে উঠে বল্লে—তবেই তুমি ব্যবসা করেচ! খদ্দেরের এক কথায় অমনি জোড়ায় ছ' আনা ছাড়!

অবিশ্যি ওর কথা দোকানদার বা খরিদ্দার কেউ শুনতে পেল না। পুষ্প ওর পাশে গিয়ে ডাকলে—ও দাদু! পুষ্পের কণ্ঠস্বর শুনে বৃদ্ধ চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে। পুষ্প হাসিমুখে বল্লে—আচ্ছা, কেন এই সন্দেবেলা বসে বসে মিথ্যে কথাগুলো বেমালুম কইচ দাদু? ছিঃ—

কেবলরাম অপরাধীর ন্যায় উঠে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লে—আবার তুমি এই দোকানে এসে বসে আছ। পৃথিবীর আসক্তি তোমার গেল না? কি হবে তোমার দোকানপসার আর খদ্দেরে? টাকার লাভলোকসানেই বা তোমার কি হবে?

কেবলরাম বিষণ্ণভাবে বল্লে—যাই কোথায় দিদি বলো? এই গদি আর আড়ত ছাড়া গত পঞ্চাশ বছর আর কিছু চিনিনি। কোথাও ভাল লাগে না। এখানটাতে এলে পুরোনো অভ্যেসের বশে আড়তের কাজ করে যাই। নইলে কি করি বলো? তুমিই তো দিদি দর্শন দাওনি কতদিন!

—আচ্ছা এখুনি চলো আমার সঙ্গে—দেরি ক'রো না, বেরিয়ে এসো।

মুহূর্তের মধ্যে কেবলরামকে নিয়ে পুষ্প গোপাল-মন্দিরে এল। ধূপধুনার সুগন্ধি ধূমে মন্দিরের গর্ভগৃহ ভরে গিয়েচে, আরতি তখনও পূর্ববৎ চলচে—পাঁচমিনিটের জন্য মাত্র পুষ্প অনুপস্থিত ছিল। কেবলরাম পুষ্পের কৃপায় সজ্ঞান অবস্থায় আছে, জ্যোতির্ময় মহাপুরুষদেরও সে দেখে ভয়ে সম্ভ্রমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। সন্ন্যাসীর তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তির দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখলে। আরতির শেষে যখন সবাই মন্দির-দ্বারপথে বেরিয়ে আসচে, তখন একজন বিদেহী ভক্ত ক্ষেমদাসকে জিজ্ঞেস করলে—প্রভু, শুনেচি বৃন্দাবনে যমুনাতীরে জ্যোৎস্নারাত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা হয়—আমি কি দেখতে পাবো? আমি এখানে নতুন এসেচি।

ক্ষেমদাস বল্লেন—আপনি গিয়ে দেখতে পারেন। লোকে দেখে অনেকে, ভাগ্যবান ভক্ত হওয়া চাই।

কেবলরাম অবাক্ হয়ে পুষ্পকে বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দিদি?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তুমি চিনতে পারলে না? এটা বৃন্দাবন, গোপাল-মন্দির।

পুষ্প বল্লে—আর ইনি বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

কেবলরাম থতমত খেয়ে ক্ষেমদাসের পায়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলে। তারপর করুণা-দেবীর সামনে ওকে এনে ফেলতেই ও আরও আড়ষ্ট ও কাঁচুমাচু হয়ে গেল। করুণাদেবী রহস্য করে বল্লেন—তোমার নাতনীর দৌলতে স্বর্গ পাবে তুমি।

কেবলরামের চোখ ধাঁধিয়ে গেল এই দুই দেবীর অপরূপ রূপের জ্যোতিতে। সে হাতজোড় করে বল্লে—স্বর্গ তো এখানে। আমার মত পাপী যে বৃন্দাবনে এসে আরতি দেখেচে, আপনাদের মত দেবী, এঁদের মত মহাপুরুষের দেখা পেয়েচে—আর তো কিছু বাকি নেই স্বর্গের।

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—এখন ছেড়ে দিলে আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরের দোকানে গিয়ে বসবে তো? আর মিথ্যে কথা বলবে!

কেবলরাম জিভ কেটে বল্লে—আর না।

—ঠিক?

—হঠাৎ ছাড়তে পারবো না—মিথ্যে কথা বলে কি হবে। কোথায় যাই বলো তো সন্ধেবেলাটা!

—কেন, এই গোপাল-মন্দিরে এসে আরতি দেখবে রোজ। কবি ক্ষেমদাস রোজ এখানে এ-সময় থাকেন, তোমায় যত্ন করবেন দাদু।

—কেউ কিছু বলবে না?

—না, দেবমন্দিরে সবারই অধিকার। যখনই তোমার দেবদর্শনে স্পৃহা জেগেচে, বুঝতে হবে, তখনই তুমি উচ্চতর স্তরের জীব হয়ে যাবে! ইচ্ছা মাত্রেই সিদ্ধি। চলো যমুনার ধারে দাঁড়িয়ে দেখো—

ওরা চীরঘাটের কাছে যমুনার তীরে এসে জ্যোৎস্নালোকে কিছুক্ষণ বসলো। ওদের সঙ্গে সঙ্গে করুণাদেবী ও প্রণয়দেবীও এলেন। কেবলরাম সরল লোক, ওর মনে কেমন এক ধরনের ভক্তির উদয় হোল। যমুনার দিকে চেয়ে ওর দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। করুণা-দেবীকে বল্লে—মা, আমার কি পুণ্য ছিল পূর্বজন্মের? বৃন্দাবন, যমুনার তীর, আপনাদের মত দেবীর দেখা পাওয়া—আজ আমার হোল কি তাই ভাবচি।

করুণাদেবী বল্লেন—কেবলরামকে রেখে এস পুষ্প, তারপর আমাদের পোঁছে দেবে—

পুষ্প হেসে বক্রদৃষ্টিতে অদ্ভুতভাবে চেয়ে বল্লে—আমি পোঁছে দেবো আপনাদের! কেন ঠাট্টা করেন বলুন তো!

ফেরবার পথে কেবলরাম বল্লে—তোমায় কি যে বলি দিদি। তুমি সাক্ষাৎ দেবী, নইলে এত দয়া! যেখানে নিয়ে গিয়েছিলে, আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি নেই সেখানে যাই। একটা কথা দিদি বলচি। আমার নাতি রামলাল আজ দু বছর হোল এখানে এসেচে পৃথিবী থেকে। তোমায় বলতে লজ্জা হয়, সম্প্রতি রসুলপুরের এক বাগদী মাগীর পিছু পিছু ঘুরচে ছ'মাস। সে যদি জল আনতে যায়, ও তার পিছু পিছু যায়; সে যদি রান্নাঘরে রাঁধে, ও পাশে বসে

থাকে। অন্য সময় সেই মাগীর বাড়ীর উঠোনে এক তেঁতুলগাছে ত্যাখো দিনরাত বসে। কত ধমক দিলাম—কথা শোনে না। একটা উপায় কর়ো তুমি লক্ষ্মীটি। সে মাগী ওকে দেখতেও পায় না, ওর ঘুরেই সুখ। এ কি বন্ধন বলো দিকি, দিদি? ওই তো নরক। তুমি দেবী, ওকে তুমি বাঁচাও এ নরক থেকে।

গভীর রাত্রিকাল। পুষ্প একা সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে দেখা করতে গেল। ওঁকে দেখা পর্যন্ত কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করচে ওঁর প্রতি। না দেখা করে যেন ও থাকতে পারচে না। সন্ন্যাসিনী ওকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। বল্লেন আপনি সেদিন এসেছিলেন না?

—হ্যাঁ, মা। আপনার দর্শনে পুণ্য, তাই দেখতে এলাম।

সন্ন্যাসিনীর প্রজ্ঞানেত্র উদ্ভাসিত, সুতরাং পুষ্পকে স্থূল আবরণে নিজ দেহকে আবৃত করতে হয়নি। সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আপনি বিদেহী, পৃথিবীর ফলমূল নিয়ে অতিথি-সৎকার করতে পারলাম না। ত্রুটি মার্জনা করবেন।

পুষ্প লজ্জিত হয়ে বল্লে—ওকথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না মা। আমি কত ক্ষুদ্র।

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—আপনি ক্ষুদ্র কে বল্লে—আপনি এখানে আসবেন আমি সমাধিতে জেনেচি। আপনি আমার প্রেমভক্তি শিক্ষার উপায় করবেন।

পুষ্প সবিস্ময়ে বল্লে—আমি!

—বিশ্বের ভগবান কাকে দিয়ে কি কাজ করান, তা তো বলা যায় না।

—মা, আপনার বাড়ী কোথায় ছিল? পিতামাতা কে ছিলেন? জানবার বড় কৌতূহল হচ্ছে।

—আমার দেশ ছিল পাঞ্জাবে। অল্পবয়সে আমি দীক্ষা নিই, বিবাহ হয়নি, চিরকুমারী। নানাস্থানে ঘুরে অযোধ্যায় আসি। সেখানে সে সময়ে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় এক সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করতেন—সকলে তাঁকে পাগলা বাবা বলতো। পাগলের মত থাকতেন। তিনি আমায় দয়া করে যোগদীক্ষা দেন। যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন আপনারা এসেছিলেন, ওঁরও গুরু তিনি।

—তিনি আছেন কোথায় এখন?

—প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর হোল তিনি দেহ রেখেচেন। তিনি যে কত কালের লোক কেউ জানতো না। আমি কখনো সে প্রশ্ন করিনি। এখন বিদেহী অবস্থায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েচেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। মাঝে মাঝে এখনও দেখা দেন। তিনিই বলেছিলেন, তুমি নারী, তোমাকে প্রেমভক্তি শিখতে হবে। অদ্বৈতভূমি থেকে নেমে তোমাকে লীলারস আস্বাদ করতে হবে। তাই অপেক্ষায় আছি। আপনি যে আসবেন তাও তিনি বল্লেছিলেন।

পুষ্পের চোখ বেয়ে দরদরধারে জল পড়লো। মনে মনে ভাবলে—ভগবানের কি খেলা! আমার মত নিতান্ত দীনহীনা, অতি সামান্য মেয়েমানুষের ওপর তাঁর কি অসীম অনুগ্রহ। এ

কি অদ্ভুত কাণ্ড, কখনো তো এমনি ভাবিনি।

ও বল্লে—আপনার কাছে সেই ঠাকুরেরা আর এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ দেখুন, ওই এক কাণ্ড। কেন আমার কাছে? মৃন্ময়ী বলে এক দেবী সেদিন এসেছিলেন, কোন্ গ্রামে ভাঙা মন্দিরে থাকেন—কতক্ষণ গল্প করে গেলেন। তাঁর সাধ নতুন মন্দিরে কেউ প্রতিষ্ঠিত করে। আমি বল্লাম, কোনো ধনী গৃহস্থকে স্বপ্ন দিন। আমার কি হাত ? আমি কি করতে পারি ?

—ওদের কি আপনি এমনি স্থূলচক্ষে দেখেন ?

—না, সমাধি অবস্থায় দেখা দেন। আমি বলি, আমি তোমাদের মানি না, চলে যাও। ততই আমার কাছে ভিড়। দেখুন তো মুশকিল!

—এও ভগবানের কৌশল আপনাকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়ার। নীরস অদ্বৈতজ্ঞানী মনকে সরস করবার আয়োজন।

—আমি ওসব মানি না।

—তবে প্রেমভক্তি কি করে লাভ হবে ?

—সাকার উপাসনা মায়িক। যে মৃন্ময়ী দেবীর পূজা করবে, সে দেবীকে নিয়েই মশগুল থাকবে; যে শ্যামসুন্দরের পূজা করবে, সে তাঁর দর্শন পেয়েই খুশি থাকবে। ও সব এক প্রকারের বন্ধন। ওতে বদ্ধ হয়ে থাকলে আরও উচ্চ ভূমিতে উঠে ব্রহ্মদর্শন তার হবে না, নিজের আত্মাকে ব্রহ্মে সে লীন করতেও পারবে না। মায়া তাকে আবদ্ধ করবে।

—আপনি যা জানেন, আমি তা জানিনে দেবী। তবে আমি এইটুকু জানি প্রকৃত ভক্ত যে, সে মুক্তি চায় না, ব্রহ্মত্ব চায় না। ভগবানের দাস হয়ে থাকতে চায়, রস আস্বাদ করতে চায়। ভক্তির পথেই সে সমাধি লাভ করে, ব্রহ্মদর্শনও তার হয়। তবে এসব আমার শোনা কথা—আমি অজ্ঞান, কি জানি বলুন। আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলুন, গোবিন্দ-মন্দিরে আরতির সময় কত ভক্তের দর্শন পাবেন। তাঁরা সব বলে দেবেন।

—যাবো, আমায় নিয়ে যাবেন। একটি গৃহস্থের বৌ আছে, বড় উচ্চ অবস্থা। একপাল ছেলেমেয়ে - ছেলেকে কোলে নিয়ে হয়তো আদর করচে—অমনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ে। সেদিন আমার কাছে সূক্ষ্মদেহে এসেছিল। সেও প্রেমভক্তি চায়—তাকেও নিয়ে যাবো।

—কি করে বিনা দীক্ষায় এমন উচ্চ অবস্থা পেলে সংসার থেকে ?

—পূর্বজন্মের অবস্থা ভাল ছিল। কর্মবন্ধনে আটকে পড়ে এ জন্মে সংসার করতে হয়েচে। সামান্য কর্ম ছিল, এ জন্মে শেষ হয়ে যাবে। তার বাড়ী এই জঙ্গলের বাইরে এক লোকালয়ে। আহীর জাতের মেয়ে। ওর অবস্থা দেখে আমি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছি। আমার কাছে এসে কত কাঁদে।

পুষ্প বিদায় নিয়ে চলে এল। মানুষেই দেবতা হয়ে গিয়েচে এ যে সে কত প্রত্যক্ষ করলে এই জগতে এসে! যে মূল বাসনা আসক্তি ত্যাগ করে শুদ্ধ মুক্ত হয়েচে—সে-ই দেবত্ব প্রাপ্ত

হয়েচে, ভগবান তাকেই কৃপা করেচেন। দৃষ্টি উদার ও স্বচ্ছ না হোলে কেউই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অথচ মানুষকে দেবত্বে নিয়ে যাবার জন্যে ঊর্ধলোকে কত ব্যবস্থা, কত আগ্রহ। তবুও কেন অন্ধত্ব ঘোচে না মানুষের, কেন রামলালের মত আশা-বৌদিদির মত জীবেরা ভূর্লোকের অতি স্থূল আসক্তির বন্ধনে দেবত্বের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত আছে?

বুড়োশিবতলার ঘাটে যতীন একা চুপ করে বসে ছিল। পুষ্পকে দেখে খুব খুশি হোল। বল্লে—যত দেখছি, আমিও অবাক হয়ে যাচ্চি, পুষ্প। আমার চোখ খুলে যাচ্চে। তুই কিছু ভাবিসনে, পৃথিবীতে জন্ম নেবো কত বছরের জন্যে? ষাট সত্তর কি আশি? অনন্ত জীবনের তুলনায় ক'দিন? কিসের জন্ম মৃত্যু? সব ছায়া, মায়া—একমাত্র আমি অমর, অনন্ত, শাশ্বত। আমাকে কেউ কোনদিন ধ্বংস করতে পারবে না। আজকাল তোর সংসর্গে থেকে আমার চোখ খুলে গিয়েচে।

পুষ্প ওকে রামলালের কথা বল্লে। যতীন সব শুনে হাসতে লাগলো। আজকাল এই শ্রেণীর লোকের জন্যে তার গভীর অনুকম্পা জাগে। পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই তাই এমনি হয়েচে—ওদের দোষ নেই।

পুষ্প বল্লে—তুমি ওর জন্যে কিছু করো। আমি সেখানে যাবো না, গেলেও তার উপকার হবে না। এক মোহ থেকে আর এক মোহে পড়ে যাবে—

—তোর সাহায্য ছাড়া হবে না পুষ্প, আমি অবিশ্যি গিয়ে দেখচি।

যতীন রামলালকে খুঁজে বার করলে। সে একটি নীচজাতীয়া মেয়ের বাড়ীর উঠানে বসেছিল। মেয়েটি ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানচে। তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়, কালো ও অত্যন্ত কৃশকায়। সম্ভবত মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়াতে ভোগে। মুখখানা নিতান্ত মন্দ নয়, চোখ দুটো বড় বড়—সমস্ত দেহের মধ্যে চোখ দুটোই ভালো।

রামলাল যতীনকে দেখে বল্লে—যতীনদা যে! তোমাকে কে সন্ধান দিলে হে? বুড়োটা নিশ্চয়ই। বেঁচে থাকতে জ্বালিয়েচে আবার মরেও যে একটু ফূর্তি করবো তার যো নেই। হাড় ভাজা ভাজা করলে। সেদিন এসেছিল, আমি হাঁকিয়ে দিয়েচি। বল্লাম—আমি যা ইচ্ছে করবো, তোমার বিষয়ের ভাগ তো পিত্যেশ করিনে যে তোমায় ভয় করবো। এখন আমি স্বাধীন।

যতীন হেসে বল্লে—বুড়োর দোষ নেই। সে তোমার ভালোর জন্যেই সন্ধান দিয়েচে। এই ভাবে বাঁশগাছে তেঁতুলগাছে কতদিন কাটাবে?

—দিব্যি আছি। দোহাই তোমার, তুমি আর লেকচার ঝেড়ো না।

—কিন্তু এতে তোমার লাভটা কি? কেন এর পেছনে পেছনে ঘুরচো—

—আমার দেখেই সুখ। ওর নাম সোনামণি। সোনামণি ধান ভানে, আমি ঐ খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি; আমতলার পুকুরঘাটে নাইতে যায় একা একা—আমি সঙ্গে যাই, যতক্ষণ না নাওয়া হয়, আমি নোনাগাছে বসে বসে দেখি। রাত্রে ও রাঁধে—আমি রান্নাঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকি। বেশ চমৎকার দেখতে সোনা, অমন চেহারা ভদ্দরলোকের ঘরে

হয় না। শরীরের বাঁধুনি কি!···আমি তো কোনো অনিষ্ট করচিনে কারো, বসে থাকি এই মাত্র।

—নিজের অনিষ্ট নিজেই করচো। ওপরে উঠতে পারবে না। পৃথিবীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

—থাকি থাকবো। বেশ ফূর্তিতেই আছি—আমি ওপরে উঠতে চাইনে, নীচেও নামতে চাইনে। স্বগ্‌গে-টগ্‌গে তোমরা থাকো গিয়ে! আর ওই বুড়োটা যে দোকানের গদিতে বসে আছে দিনরাত, তাতে বুঝি দোষ হয় না? ওটাকে পারো তো তোমাদের স্বগ্‌গে নিয়ে যাও টেনে। আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও এখানে, বেশ আছি। কেন আর জ্বালাও দাদা, বেঁচে থেকে এমন আনন্দে থাকিনি। বেঁচে থাকতে এমন করলে আমায় ওর স্বামী লাঠি নিয়ে তাড়া করতো—এ বেশ আছি, কেউ টের পায় না।

—চলো আমার সঙ্গে এক জায়গায়, তোমায় নিয়ে যাবো—

—আমায় মাপ করো ভাই। সোনামণিকে ফেলে আমি পাদমেকং ন গচ্ছামি—

—থাক্, আর দেবভাষাকে ধ্বংস করে লাভ নেই! এখন আমার সঙ্গে চলো—যাবে?

রামলাল যতীনের ইঙ্গিতে সোনা বাগ্‌দিনীর বাড়ীর উঠোন থেকে অল্পদূরে একটা বাঁশঝাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো। কতদিন পরে শীতের দিনে ঝরা শুকনো বাঁশপাতার ধুলোভরা গন্ধ আজ যতীনের নাকে এসে লাগচে। যেন সে দেহেই বেঁচে আছে—পৃথিবী মায়ের বুকের দুলাল। বন-মূলোর গাছ কুচি কুচি সাদা ফুলে ভর্তি—দু'চারটে বাঁশঝাড়ের পরেই দিগন্তব্যাপী ধানের ক্ষেত, সবে ধান কাটা হয়ে গিয়েচে অঘ্রাণের শেষে। শুকনো ধানের গোড়া এখনো ক্ষেতের সর্বত্র।

যতীন বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, রামলাল অধীর ভাবে বল্লে—কি বলচো বলো যতীনদা।

যতীন বল্লে—ও কি? আবার ওপাড়ার পুকুরঘাটের দিকে চাইচো কেন? কে আছে ওখানে?

রামলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—নাঃ—বামুনের মেয়ে।

—আবার কি?

—ওই যে সাদা কোঠাবাড়ীটা—ওই বাড়ী থেকে রোজ বেরিয়ে পুকুরঘাটে নায়। বামুন-বাড়ী।

—তাই হয়েচে কি?

—ষোল সতেরো বছর বয়েস। দেখবে? এসো, এসো—এতক্ষণ নামচে জলে। নামটি বেশ, সন্ধ্যারাণী। ফর্সা, একরাশ চুল, একটু পরে ভিজে কাপড়ে নেয়ে বাড়ী ফিরবে। মুখখানি বড় চমৎকার। ছিপছিপে লিকলিকে সরু বেতের মত হেলে পড়ে পড়ে। মুক্তোর মত ঝকঝক করে দাঁতগুলো যখন হাসে। সর্বদাই হাসচে।

—তাতে তোমার কি?

—আমার কিছু না। বামুনের মেয়ে। ওরা মুখুয্যে।

—মরে গিয়েচ, এখন আবার বামুন-শুদ্দুরই বা কি ? ওতে কি তোমার লাভ ?

রামলাল জিভ্ কেটে দু'হাত তুলে নমস্কার করে বল্লে—বাপ্‌রে ! ও কথা বলতে নেই। বামুন জাত ! আমরা হলাম তেলি তাম্‌লী। আমি শুধু চোখে দেখেই খুঁশি। আমার ও সব উঁচু নজর নেই দাদা। সোনামণির হেঁসেলে বসেই আমার সব। ওকে পেয়েই আমার বেশ চলে যাচ্ছে।

—পেলে আর কি করে তা তো বুঝলাম না।

—ওরই নাম পাওয়া। দেহে নেই, কি করবো বলো। সত্যি, একটা কথা দাদা। পৃথিবীতে জন্মাবার কৌশলটা বলে দিতে পারো ? দেহ না ধরলে কোনো সুখ নেই। মেয়েদের ভালো করে পাইনি জীবনে। ওদের না পেয়ে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে আমার।

—কেন, তুমি তো বিয়ে করেছিলে ?

রামলাল বিরক্তির সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে বল্লে আরে দূর, বিয়ে !—সে ওই বুড়োটার পাল্লায় পড়ে। নাতবৌএর মুখ না দেখে নাকি মরবে না ! আমার ঘাড়ে যা তা একটা চাপিয়ে দিয়ে বুড়ো তো পটল তুললো। আজকাল কেমন সব স্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে দেখিচি কলকাতায় ! তাদের শাড়ী পরবার কায়দাই আলাদা। কথাবার্তার ধরনই আলাদা।—না সত্যি যতীনদা, তুমি আমার যথার্থ উপকার করবে, আমায় জন্ম নেওয়ার কৌশলটুকু বলে দাও দাদা। মেয়েমানুষের সঙ্গে দুদিন প্রাণভরে ভালবাসা করে মিলেমিশে আসি দুনিয়াতে ফিরে। আমার বুকের ভেতরটা সর্বদা হু হু করে দাদা। ও জিনিসটা আমি জানিনি—সত্যিকার মেয়েমানুষ পাইনি। স্বগ্‌গে-টগ্‌গে তোমরা যাও—আমি তো কারো কোনো অনিষ্ট করতে চাইচিনে ভাই। আমার নেয্য অধিকার চাইচি। সবাই দিব্যি কত ফুর্তি করচে—আমি অল্পবয়সে মরে গেলুম, যে বয়সে ভোগ করবার কথা সেই বয়সে। আমার একটা হিল্লে করো, তোমার পায়ে পড়ি দাদা। মেয়েমানুষ না পেলে স্বগ্‌গে গিয়ে আমার কোনো সুখ হবে না। বুড়োটার সঙ্গে দেখা হোলে তাকেও বোলো। তিনি এখন আসেন আমায় উপদেশ দিতে ! তুমি জানো, বিয়ের আগে বঙ্কু পালের মেয়ে সরলার সঙ্গে আমার একটু ভাব হয়েছিল। মেয়েটা কেষ্টনগরে মেয়ে-ইস্কুলে পড়তো। দুবার আমার সঙ্গে লুকিয়ে আলাপ করেছিল। টাকা পাবে না বলে ঐ বুড়ো সেখানে আমার বিয়ে দিতে চাইলে না। সেও দিব্যি মেয়ে ছিল।

—এখন সে কোথায় ?

—কেষ্টনগরে বিয়ে হয়েচে। শ্বশুরবাড়ী থাকে। আমি সেদিন গিয়ে একবার দেখে এসেচি। কষ্ট হয় বলে যাইনে। তার চেয়ে আমার সোনামণিই ভালো। কি চমৎকার একটি তিল ওর নাকের বাঁ-দিকে—দেখনি ?···চল্লে ? তাহলে—শোনো শোনো—তোমাদের তো অন্তর্ধান হোতে সময় লাগে না একমিনিটও। এই আছো এই নেই। তোমরা হোলে স্বগ্‌গের মানুষ। তাহলে—আমার একটা উপায়—

যতীন ততক্ষণে বুড়োশিবতলার ঘাটে এসে পেঁাছেচে। পুষ্পের প্রশ্নের উত্তরে বল্লে—হোল না। একেবারে বুভুক্ষু আত্মা। ওকে পুনর্জন্মে পাঠাবার ব্যবস্থা করো পুষ্প। মেয়েমানুষের

কথা বলতে অজ্ঞান। ভোগ না করলে ওর নারীতে আসক্তি যাবে না।

পুষ্প হেসে বিজয়িনীর মত দর্পিত সুরে গ্রীবা বাঁকিয়ে বল্লে—স্বর্গে মেয়েমানুষের অভাব? যদি বলো আজই তাকে দেখিয়ে দিয়ে আসি কাকে মেয়েমানুষ বলে! করুণাদেবীকেও নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—মূর্ছা হয়ে পড়ে যাবে তক্ষুনি।

যতীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর বিদ্যুল্লতার মত অপূর্ব কান্তির দিকে চেয়ে বল্লে তুমিই যথেষ্ট! আর তাঁকে নিয়ে যেতে হবে কেন। মূর্ছা তো দূরের কথা, একদম পাগল হয়ে ক্ষেপে যাবে। কিন্তু তার দরকার নেই। বিভ্রান্তই করে দেওয়া হবে, উপকার কিছু হবে না তাতে।

পুষ্প কৃত্রিম রাগের সুরের রেশ তখনও টেনেই বল্লে—না, আমার রাগ হয়েচে শুনে যে, সে মূর্খ বলে স্বর্গে নারী নেই! নারীকে খুঁজতে যেতে হবে পৃথিবীতে!

—তোমরা চোখ ধাঁধিয়ে বেচারীকে পাগল করেই দিতে পারো, কিন্তু সে যা চায় তা দেবে কোথা থেকে? ওকে পাঠিয়ে দাও পৃথিবীতে। একজোড়া আগ্রহভরা কালো ভ্রমরচোখের চাউনি ওর দরকার হয়েচে।

—আচ্ছা, যতুদা, আমি যদি ওকে একেবারে আজন্ম ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী করে দিতে পারি?

—জন্ম নেওয়ার পরে?

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে বল্লে—হ্যাঁ। নয়তো কি এখানে?

—কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানো দরকার কি? আত্মাকে তার স্বাভাবিক পথে তার স্বাভাবিক গতিতে যেতে দাও।

—এই কথাটিই আশা-বৌদির বেলা তুমি এতদিন বুঝতে চাইতে না যতুদা। অপরের বেলাতে বেশ বুঝলে।

যতীন চুপ করে রইল।

ওপারের হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে সন্ধ্যার আরতিধ্বনি শোনা গেল। গঙ্গার বুকে সান্ধ্য আকাশের প্রতিচ্ছবি।

সেদিন আশা একা পাথরের ওপরে বসে খুব কাঁদছিল।

একজন বিকটাকৃতি সাধুপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল একদিন এই মরুভূমির ও পাহাড়ের দেশে। তিনি ওকে বলেচেন—পৃথিবীর মৃত্যুর পরে সাত লোক, প্রত্যেক লোকে আবার সাতটা স্তর। প্রত্যেক বার মানুষকে মরে নতুন দেহ ধরে নতুন স্তরে জন্ম নিতে হয় —ইত্যাদি। আশার মাথায় ওসব জটিলতা ঢোকে না—এক এক সময়ে সে বেশ বুঝতে পারে সে মরেই গিয়েচে বটে। কিন্তু মরেও তো নিস্তার নেই, দুবার তো মরা যায় না—না হয় আবার চেষ্টা করে দেখতো। কোথায় গেল মা, বাবা, স্বামী, ছেলেমেয়ে—এ কি বিশ্রী জীবন, না আছে আশার আলো, না আছে আনন্দ, না আছে ভালবাসা, স্নেহ, দয়া। কেন মিছে বেঁচে থাকা? অথচ মরতেও তো পারে না। এ কি বন্ধন!

সেই যে একদিন স্বামীকে সে দেখলে, যেন তার পুরোনো শ্বশুরবাড়ীর ঘরে সে গেল—

কথাবার্তা বলে স্বামীর সঙ্গে। কি অদ্ভুত আনন্দে দিনটা কেটেছিল—যত অল্প সময়ের জন্যেই দেখা হোক না কেন। নাঃ—কোথায় কি যে সব হয়ে গেল ওলটপালট। সংসার গেল ভেঙে। সে হোল অল্পবয়সে বিধবা। কত আশার স্বপ্ন দেখেছিল সে বিয়ের রাত্রে—সব মেয়েই দেখে। কেন তার ভাগ্যে এমন হোল! এই এক জায়গা—এমন ভয়ঙ্কর স্থান সে কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে ওর চারিধারে অন্ধকার ঘিরে আসে, মাঝে মাঝে আলো হয়। গাছ নেই পালা নেই—পাথর আর বালি। চারিধারে উঁচু উঁচু পাথরের ঢিবিমত। যতদূর যাও, কেবল এমনি। মানুষ নেই, জন নেই।

মাঝে মাঝে কিন্তু অতি বিকট আকারের দু-একজন লোক দেখা যায়। অসহায় স্ত্রীলোককে একা পেয়ে তাদের মধ্যে দুবার দুজন আক্রমণ করতে ছুটে এসেছিল। একবার কে এক দেবী (কোথা থেকে এসেছিলেন, তাঁর নাম পুষ্প—বৌদিদি বলে ডেকেছিলেন তার মত সামান্য মেয়েকে) তাকে উদ্ধার করেন। আর একবার কেউ রক্ষা করতে আসেনি—একা ছুটতে ছুটতে সে এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, যে তার পিছু পিছু ছুটে আসছিল—সে তাকে আর খুঁজে পেলে না।

গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থঘরের বৌ—এ কি উৎপাত তার জীবনে!

কি জানি, সেদিন শ্বশুরবাড়ীতে কি ভাবে যে সে স্বামীকে দেখেছিল···সেই থেকে তার মন অন্যরকম হয়ে গিয়েচে। কেবলই সাধ হয় আবার সেই শ্বশুরবাড়ীর ভাঙা কোঠার ঘরে সে তার ছোট্ট সংসার পাতবে, বাঁশবাগানের দিকের রান্নাঘরটিতে বসে বসে কত কি রান্না করবে। ডাল, মোচার ঘণ্ট, সুক্তুনি (উনি সুক্তুনি বড় ভালবাসেন), কই মাছের ঝোল মানকচু দিয়ে···

উনি এসে বলবেন—কি গো বৌ, রান্না কি হয়ে গেল?

—এসো···হয়েচে। হাত পা ধুয়ে নাও—জল গরম করে রেখেচি। বড্ড শীত আজ।

মাটির প্রদীপ জ্বলচে রান্নাঘরের মেজেতে কাঠের পিলসুজে। তালপাতার চেটাই পেতে স্বামীকে আশা বসতে দিলে। মুখ দেখে মনে হোল উনি খুব ক্ষুধার্ত।—হ্যাগা, একটু চা করে দেবো?

—তা দাও, বড্ডই শীত।

—কাপগুলো সব ভেঙে ফেলেচে খোকা। কাঁসার গেলাসে খাও—ওবেলা দুটো কাপ কিনে নিয়ে এসো না গা কুড়ুলের বাজার থেকে!···চা খেতে খেতে উনি কত রকম মজার গল্প করচেন। সে বসে বসে শুনচে একমনে। সুন্দর দিনগুলি স্বপ্নের মত নেমেছিল তার জীবনে। আনন্দ···অফুরন্ত আনন্দ···সে সতী, পবিত্র, সাধ্বী। স্বামী ছাড়া কাউকে জানে না।

হঠাৎ আশা চমকে উঠলো। সে কার মুখের দিকে চেয়ে আছে? কে তার সামনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করচে? তার স্বামী নয়—এ তো নেত্যনারাণ! কুড়ুলে বিনোদপুরের বাড়ী নয়—এ কলকাতার মানিকতলার সেই বাড়ীউলি মাসীর বাড়ী, সেই রান্নাঘর, তাদের ছোট্ট কুঠুরিটার সামনে ফালিমত রান্নাঘরটা। ওই তো রান্নাঘরে, তার হাতে তৈরী সেই দড়ির শিকে, হাঁড়িকুড়ি ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে সে নিজের হাতে ওটা বুনেছিল মনে আছে। ওই তো

সেই তাদের ঘরখানা, জানালা দিয়ে একটুখানি দেখা যাচ্ছে, মুগের ডালের হাঁড়ি, বিছানার কোণটা।...উঃ! বিছানাটা দেখে ওর গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। এই যে খানিকটা মাত্র আগে সে নিজেকে সতী সাধ্বী, স্বামী-অনুরক্তা, পরম পবিত্রা, আনন্দময়ী রূপে বর্ণনা করে মধুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, কোথায় গেল ওর সে আত্মপ্রসাদের পবিত্রতা ও নির্ভরশীলতা! সে ঐ বিছানায় একসঙ্গে শোয়নি নেত্যদার সঙ্গে? এই পুরু ঠোঁটওয়ালা, চোখের কোণে কালি ইন্দ্রিয়াসক্ত নেত্যদা, যার মুখ দিয়ে এই মুহূর্তে এখনি মদের গন্ধ বার হচ্চে···যার অত্যাচারে তাকে আফিং খেয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে মরতে হয়েছিল। ওই তো সেই তক্তাপোশ, যার ওপরে সে ছট্‌ফট্ করেছিল আফিং খেয়ে।

আশা চমকে শিউরে উঠতেই নেত্যনারাণ দাঁত বার করে বল্লে—বলি, আর একটু চা দেবে, না একেবারে গরম গরম ভাতই বাড়বে? বড় রাত হয়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে চলো শুয়ে পড়া যাক্। যে শীত পড়েচে!

আশা কাঠ হয়ে বসে রইল। এ কোথা থেকে কোথায় সে এসে পড়ল। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস এ!

নেত্যনারাণ বল্লে—সত্যি, আমিও যে দিনকতক তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েচি কত! তারপর—

আশার মুখ দিয়ে আপনা-আপনিই বেরুলো—কি তারপর?

—তারপর কে যেন টেনে নিয়ে এল আমায় এখানে। উঃ, সে কি আকর্ষণ! আমি বলি কোথায় যাচ্চি—তারপরেই দেখি আমি একেবারে বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীতে মানিকতলায়। একেবারে তোমার কাছে। চল গিয়ে শুইগে যাই। রাত হোল অনেক।

বিরক্তি, ভয়, হতাশা ও অপবিত্রতার অনুভূতিতে আশার সর্বশরীর যেন জলে উঠলো আগুনের মত। সে যে এইমাত্র তার শ্বশুরবাড়ীর সেই পবিত্র কোঠাবাড়ীতে তার স্বামীর সঙ্গে ছিল—প্রথম বিবাহিত জীবনের সেই স্মৃতিমধুর রাত্রির ছায়ায়; কেন এই অপবিত্র কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে তার আহ্বান? এ কি নিষ্ঠুরতা।

ও বলে উঠলো—আমি যাবো না। তুমি তো আমায় ফেলে বাড়ী পালিয়ে ছিলে? কেন আবার এলে তবে? আমায় ছেড়ে দাও। আমি যাবো না ঘরে।

নেত্যনারাণ ঝাঁঝালো সুরে বল্লে—যাবে না শুতে? তবে কি সারারাত এখানে বসে থাকতে হবে নাকি?

—আমি আর মানিকতলায় নেই—আমরা মরে গিয়েচি। তুমি আর আমি দুজনেই। চলে যাও তুমি আমার কাছ থেকে—তুমিও মরে গিয়েচো।

নেত্যনারাণ অবাক হয়ে বল্লে—কি যে বলো তুমি। ঠাট্টা করচো নাকি? এই তাখো সেই মানিকতলায় আমাদের ঘর, চিনতে পারচো না? যাবে কোথায় নিজেদের আস্তানা ছেড়ে? ক্ষেপলে নাকি? চলো—চলো—

আশা কলের পুতুলের মত ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানাটিতে শুয়ে পড়লো। ওর সর্বশরীর

ঘৃণায় রি রি করচে, বমি হয়ে যাবে যেন এখনি। সমস্ত দেহ মন যেন অপবিত্র হয়ে গিয়েচে ওর, সকালে উঠে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে না এলে এ ভাব যেন যাবে না। যাবে সে গঙ্গাস্নানে—, ভোরে উঠেই যাবে বাড়ীউলি মাসীকে নিয়ে।

নেত্যনারাণ ঘরে ঢুকে দোরে খিল বন্ধ করে দিলে।

আশা অসহায় আর্ত স্বরে বলে উঠলো—ও কি! খিল দিলে যে?

নেত্য ওর দিকে চেয়ে কড়া, নীরস কণ্ঠে বলে উঠলো—কী ন্যাকামি করচো সন্দে থেকে! সরে শোও, ওপাশে যাও!

আশা বিদ্রোহিণীর ভঙ্গিতে বিছানাতে উঠে বসে বল্লে—খিল খুলে দাও বলচি। আমি থাকবো না এ ঘরে। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো না এক ঘরে—বাড়ীউলি মাসীর সঙ্গে শোবো—

নেত্যনারাণ ভীষণ রেগে আশার চুলের মুঠি ধরে বিছানায় ঘুরিয়ে ফেলে দিয়ে বাজখাঁই স্বরে বল্লে—তোর মেয়েমানুষের না নিকুচি করেচে —ভালো কথার কেউ নও তুমি। যত বলচি রাত হয়েচে শুয়ে পড়। তোমার হাড় ভেঙে চূর্ণ করবো বেশি নেকুগিরি যদি করবি। ভুলে গিইচিস্ নেত্যনারাণকে—হাত ধরে একদিন বেরিয়ে এসেছিলি মনে নেই? সেদিন কে আশ্রয় দিত তোকে, আমি যদি না এখানে আনতাম! কোন্ বাবা ছিল তোর সেদিন?

—খবরদার, বাবা তুলো না বলচি—আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে।

—তবে রে বেইমান মাগি—তোকে মজা না দেখালে—

কথা শেষ না করেই নেত্যনারাণ আশাকে আথালি-পাথালি কিলচড় মারতে লাগলো। খাট থেকে মেজের ওপর ফেলে দিলে তলপেটে লাথি মেরে।...

কেউ নেই কোনো দিকে। আশা মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো, আর্ত অসহায় স্বরে—ওর বেদনার্ত পশুর মত চাপা রুদ্ধ চীৎকারে মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল যেন। কেন এমন হোল? সে যে ভাল হোতে চেয়েছিল, সে যে সব ভুলতে চেয়েছিল, সে যে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েছিল প্রথমযৌবনের বিবাহিত দিনের স্মৃতিমধুর অবকাশে···সেই মাধবী রাত্রির শুভ আহ্বান কেন এ কলঙ্কিত বাড়ীর কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে উপপতির নিষ্ঠুর আহ্বানে পরিণত হোল? হা ভগবান।

পরদিন সকালে উঠে আশা ছুট্ দিলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে।

কেউ ওঠেনি বাড়ীতে। বাড়ীউলি মাসী ঘুমুচ্ছে, পাশের ঘরে পাল মশাই এরা ঘুমুচে··· এই ফাঁকে খিল খুলে আশা পালাচ্চে সুপ্ত কলকাতা শহরের রাস্তা দিয়ে। সে কোথায় যাচ্ছে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। গতরাত্রির অপবিত্র স্মৃতিতে ওর গা ঘিন ঘিন করচে···না, আর এসব নয়। তাকে ভালো হতে হবে। সে চায় না এ পাপ সঙ্গ। উপপতির আসঙ্গলিপ্সা তার মন থেকে মুছে ধুয়ে গিয়েচে কবে, বমি হয় সে কথা ভাবলে, মরার পরেও যেন গা বমি বমি করে। যতদূর হয় চলে যাবে, গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হবে, এ পাপপুরীর ত্রিসীমানায় আর সে আসবে না। ভগবান তাকে রক্ষা করুন। সে বেঁচে নেই, যেখানে খুশি সে যেতে পারে।

কলকাতা শহর অনেকদূরে মিলিয়ে গেল।

পৃথিবীর পাপস্মৃতি আর তাকে কষ্ট দেবে না। অনেকদূর সে চলে এসেচে বাড়ীউলি মাসীর কাছ থেকে। এ তার শৈশবের নিষ্পাপ দিনগুলিতে সে ফিরে গিয়েচে।

সে যেন তাদের গ্রামে মুখুয্যেদের পুকুরপাড়ে নিতাই ভড়দের বাড়ী নিতাই ভড়ের মেয়ে সুবির সঙ্গে খেলা করতে গিয়েচে। ঐ তাদের পাড়ার পুকুরপাড়ের সেই বড় তেঁতুলগাছটা। ওই নিতাই ভড়ের বাড়ীর উঠোনের ধানের গোলা। নিষ্পাপ, সুন্দর শৈশবকাল। এখানে শুধু তার মাকে সে জানে, কোনো স্মৃতি তার মনে নেই—হেমন্তের প্রথম শিশিরাদ্র গ্রাম্য মাঠে নব ধান্তগুচ্ছের আন্দোলনের মত তার জীবনের আনন্দে চঞ্চল, ঝরা শিউলিফুলের সুবাস-সুরভিত জীবনের অতি মধুর প্রভাত···

—সুবি—ও সুবি—খেলবিনে আজ, বাইরে আয় ভাই—

সুবি বাইরে এসে বল্লে হাসিমুখে—আশাদি, কোথায় ছিলি রে? ক'দিন খেলতে আসিসনি—

আশা খুশি হোল। এ তার সত্যিকার শৈশব। সে বেঁচে গেল। এই তার সুন্দর, মধুর আশ্রয়। তার মা—এখুনি তার মা ডাকতে আসবে তাকে। খুশির সুরে পরম নির্ভরতার সঙ্গে আশা ডাকলে সুবিকে। সুবি ছুটে এল, ওর হাতে একটা পেঁপের ডাল।

—কি হবে রে পেঁপের ডাল?

—বাজাবো। এই ছাখ্—

সুবি পেঁপের ডালের ফুটোতে মুখ দিয়ে পোঁ পোঁ করে বাজাতে লাগলো।

আশা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো খুশি হয়ে। কি মজা! কি মজা!

সুবি বললে—চল্, মুখুয্যেদের নন্দিনী দিদি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে—দেখে আসি।

—না ভাই, মা বকবে।

—বাড়ীতে বলে আয় না? নন্দিনী দিদিকে দেখেই চলে আসবো—

—চল্ তবে। কিন্তু ভাই দেরি করা হবে না—

ওরা কত জায়গায় খেলা করে বেড়ালে। বনমুলো-ফুলের বড়া ভেজে খাওয়ার অভিনয় করলে।

শৈশবের অতিপরিচিত সব খেলার জায়গা। নন্দিনী দিদি কত বড়, ওদের মায়ের বয়সী, ওদের দুজনের আর কি বয়সটা? নদীর ওপর মেঘ আসচে, কতদূর থেকে অকালবর্ষার মেঘ ভেসে আসচে আকাশ ভরে। হেমন্তে কাশ ফুলের শোভা।

সুবি বল্লে—বেলা বেশি হয়েচে—বাড়ী ফিরি—

—হ্যাঁ চল্ ভাই—মা বকবে—

মা তাকে বকবে সে জানে। টক কাঁচা তেঁতুল খাওয়ার জন্তে বকবে, এতক্ষণ বাইরে থাকার জন্তে বকবে। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ওকে খাইয়ে দেবে। উত্তরের ঘরে ওর জন্তে মাদুর পেতে অন্নপূর্ণা দিদি ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। খেয়ে গিয়ে অন্নপূর্ণা দিদির

পাশে ও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

সুবি বল্লে—আমাদের বাড়ী দুটি ভাত খাবি আশা?

—দূর, তোরা জেলে। জেলের বাড়ী বুঝি বামুনের মেয়ে খায়?

—লুকিয়ে?

সুবি হাসলে। ওর বড্ড বন্ধু সুবি। কষ্ট হয় সুবির মনে দুঃখু দিতে। তবু সে বল্লে—না ভাই সুবি, কিছু মনে করিস্ নি। আমার বাড়ীতে ভাত তো হয়েইচে—

—বড়ি-ভাতে ভাত খাবিনি আমার সঙ্গে? মা নতুন বড়ি দিয়েচে—

—দূর, বড়ি বুঝি এখন দেয়? বড়ি দেয় সেই মাঘ মাসে। নতুন কুমড়ো নতুন কলাই-এর ডাল উঠলে। মিথ্যে কথা বলিস্‌নি সুবি।

—মিথ্যে বলিনি। পুরোনো ডালের বুঝি বড়ি হয় না? চল্ আমার সঙ্গে—

আশা বাড়ী ফিরচে। বেলা অনেক হয়ে গিয়েচে। মুখুয্যেদের পুকুরঘাটে আর কেউ নাইচে না, সবাই নেয়ে বাড়ী চলে গিয়েচে। তেঁতুলের ডালে মোটা মোটা কাঁচা তেঁতুল ঝুলছে দেখে ওর জিবে জল এল।

দুটো তেঁতুল পাড়লে হোত। কিন্তু কি করে পাড়ে? সুবিকে বল্লে হোত, সে অনেক রকম বুদ্ধি ধরে, একটা কিছু উপায় করতে পারতো।

পুকুরপাড়ের সরু রাস্তা ধরে খানিকদূর গিয়ে ওদের বাড়ী। সারি সারি পেঁপে গাছ। একটা ধানের গোলা। তাদের মুচিপাড়ার ধানের ক্ষেত থেকে বছরের ধান এসে গোলা ভর্তি হয়। এখুনি সব চোখে পড়বে।

কিন্তু একটু যেন অন্যরকম।

পেঁপে গাছের সারি নেই। ধানের গোলা নেই। তাদের বাড়ীর চটা-ওঠা ভাঙা পাঁচিলটা নেই। এ কোথায় সে যাচ্ছে? তাদের বাড়ীটা নয়। আতঙ্কে ওর বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে লাগলো। বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীর সেই দোরটা। মানিকতলার বাড়ীউলি মাসী। আশা চীৎকার করে পেছনে ফিরে পালাবার চেষ্টা করতেই নেত্যনারাণ দোর খুলে বের হয়ে এসে বল্লে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ চাঁদ? কাল দু'এক ঘা দিয়েছিলাম বলে রাগ হয়েচে বুঝি?

তারপরেই সে আশার মুখের কাছে হাত নেড়ে নেড়ে ইতরের ভঙ্গিতে গাইলে তুড়ি দিতে দিতে—

দুটো কথা কি তোমার প্রাণে সয় না?
একঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি, প্রাণ, হয় না?
দুটো কথা কি—

এসো এসো শোবে এসো—বেলা হয়ে গিয়েচে।

ব্যাধবিদ্ধা হরিণীর মত আশা ছট্‌ফট করতে লাগলো নেত্যনারাণের হাতে।

তারপর সে দুম দুম করে নিষ্ঠুরভাবে মাথা কুটতে লাগলো ঘরের চৌকাঠে। সে আজ মরে যাবে। এ কলঙ্কিত জীবন সে রাখতে চায় না। ব্যথা লাগচে, রক্তারক্তি হচ্ছে—কিন্তু সে মরতে

পারবে না। সে অমর। অনন্ত কাল ধরে সে মাথা কুটলেও মরবে না।

নেত্যনারাণ তাকে হাত ধরে ওঠাতে লাগলো। বলতে লাগলো—কি পাগলামি করো, ক্ষেপলে নাকি? চলো শুই গিয়ে—

সন্ধ্যাবেলা উনুনে আঁচ দিয়েচে ঘরে ঘরে। নেত্যনারাণ বাড়ী নেই, কোথায় গিয়েচে। ও এসে বাড়ীউলি মাসীর দরজায় দাঁড়ালো। কোথায় সে পালাবে তাই ভাবচে। এ কি ভয়ানক নাগপাশের বন্ধনে তাকে পড়তে হয়েচে। আর সে এ বাড়ীতে থাকতে পারবে না। ঐ ঘরে কত রাত্রে কুলবধূর জীবন কলঙ্কিত হয়েচে। তারপর ঐ ঘরের ঐ তক্তপোশে বিষ খেয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে তার সে শোচনীয় মৃত্যু! আবার সে বেরিয়ে পড়লো।

এই কলকাতা শহরের সর্বত্র তার স্মৃতির বিষ ছড়ানো। কালীঘাট? কালীঘাটে কি করে যাবে, নেত্যদা সেখানেও একবার তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিষ ছড়িয়ে এসেচে। আবার সে ছুটে চলে যাবে কুড়ুলে-বিনোদপুরে স্বামীর ঘরে। সেখানে যেতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু একদিন কেমন করে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল—সেইদিন গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যাবার পথ সে জানে না। চিনে আজ আর যেতে পারবে না। ভুলে গিয়েচে সে পথটা।

তার এক সইএর বাড়ী আছে সুবর্ণপুরে। সেখানকার রজনী ডাক্তারের মেয়ে। কুমারী-জীবনের বন্ধু। রজনী ডাক্তারের বাড়ীর পাশে ছিল ওর বড়দিদির শ্বশুরবাড়ী, যে বড়দিদি বিধবা হয়ে ইদানীং ওদের সংসারে ছিলেন। জামাইবাবুর সঙ্গে একবার দিদির ওখানে বেড়াতে গিয়ে সুবর্ণপুরে রজনী ডাক্তারের মেয়ে বীণার সঙ্গে আলাপ হয়।

তাদের কাঁটালতলায় দুর্গাপিঁড়ি পাতা দেখে আশা বলতো—ভাই সই, কাঁটালতলায় দুর্গা-পিঁড়ি কেন?

বীণা বলতো—দুর্গাপিঁড়ি ঘরে তুলতে নেই আমাদের। বাপঠাকুরদার আমল থেকে কাঁটালতলাতেই থাকে—

সইএর বিয়ে হয়েছিল কাঁচরাপাড়ার কাছে বাগ বলে গ্রামে। বাগের দত্তদের বাড়ী, তারা ওখানকার নাম-করা জমিদার। সই যদি তাকে আশ্রয় দেয়, সেই পবিত্র কুমারী-জীবনে সে লুকুতে পারে। কলকাতার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ী থেকে সে চলে যাবে সোজা—সুবর্ণপুর গ্রামের সেই কাঁটালতলায়, যেখানে সইয়ের দুর্গাপিঁড়ি পাতা থাকে সারা বছর।

উনুনের আঁচের ধোঁয়ার অন্ধকারে অস্পষ্ট সিঁড়ির পথ বেয়ে সে নেমে এল রাস্তায়। কি জানি কেন, বাড়ীটা থেকে সামান্য একটু দূরে চলে এলেও ও নিজেকে পবিত্র মনে করে। মনের সব গ্লানি কেটে যায়···সে নির্মল, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আত্মা··· এতটুকু পাপের বা মলিনতার ছোঁয়াচ লাগেনি তার সারা দেহমনে।

হঠাৎ কেমন করে সে রজনী ডাক্তারের কোঠাবাড়ীটার উঠোনে নিজেকে দেখতে পেলে। সেই কাঁটালতলায়।

—ও সই!

—ও মা—কত কাল পরে এলি তুই ? ভাল আছিস্ সই ?

বীণার বিয়ে হয়নি, সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বীণা এসে ওকে জড়িয়ে ধরলে কত আদরে। আশা আনন্দে ও উৎসাহে অধীর হয়ে উঠলো। বীণাকে বল্লে—সই, তুই আমাকে ধরে রাখ্ ভাই। কোথাও যেতে দিস্ নি।

—না, থাক্ এখানে। কোথাও যেতে দেবো না—

—ভাই, এ সত্য না স্বপ্ন ?

—কেন রে ?

—আজকাল আমার কি যে হয়েচে, কোন্‌টা স্বপ্ন, কোন্‌টা সত্যি বুঝতে পারিনে। দুটোতে কেমন যেন জড়িয়ে গিয়েচে।

—না ভাই। ওই সেই দুর্গাপিঁড়ি-পাতা কাঁটালতলা। আমাদের ইতুপুজোর ঘট ওখানে সাজানো আছে। এখন সন্দেহ গেল রাজকুমারী ?

—ঠাট্টা করিস্ নি। আমার ভয়-ভয় করে সর্বদা। কি হয়েচে আমার বলতে পারিস্ ?

—তোর মাথা হয়েচে। নে, আয় দুটো মুড়ি আর ফুট-কলাই ভাজা খা। তুই ভালবাসিস্ —মনে আছে ?

—খুব।

সারাদিন দুই সইএ কত গল্পগুজব কতকাল পরে। সব ভুলে গিয়েচে আশা—সে পবিত্র, পবিত্র। সামনে তার সুদীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। সইএর সঙ্গে গল্পে কত ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন স্বপ্ন আঁকে সে রজনী ডাক্তারের বাগানের বাতাবীলেবুতলার ছায়ায় বসে। শ্বশুরবাড়ী হবে পাড়াগাঁয়ে বড় গেরস্থ ঘরে, আট-দশটা ধানের গোলা থাকবে বাড়ীতে, সে বাড়ীর বৌ হিসেবে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাবে গোলার সামনে বেদীতে ধান মেপে মেপে গোলায় তুলবে। স্বামী হবে উকিল বা ডাক্তার। সারাদিন পরে খেটেখুটে এসে বলবে—ও বড়-বৌ—আলো দেখাও—

বীণা হাসে। সেও তার মনের কথা বলে।

গ্রামের একটি ছেলেকে সে ভালবাসে। যদি তার সঙ্গে বিয়ে হয়—

ওসব কথা কেন ? ও কথা সে শুনতে আসেনি। তবুও সে জিজ্ঞেস্ করলে—কে ভাই ছেলেটি ?

—ব্রাহ্মণ। সত্যনারাণ চাটুয্যের মেজছেলে। তাকে দেখাবো একদিন।

যতক্ষণ সে সইএর বাড়ী রইল, সে হয়ে গেল একেবারে ঠিক তেরো চোদ্দ বছরের সরলা মেয়েটি। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল। কাঁটালতলায় ছায়া পড়লো, রাঙা রোদ একটু একটু দেখা যায় গাছের তলায়। এ সময়ে আশাকে বাড়ী ফিরতে হবেই।

সইকে বল্লে—আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে চল্ না আমাদের বাড়ী পর্যন্ত সই ?

—চল্ এগিয়ে দিয়ে আসি—

বাঁশবাগানের তলা দিয়ে অন্ধকার সন্ধ্যার পথে দুই সই-এ চলেচে। ওই জামাইবাবুদের বাড়ীটা। বড়দি এতক্ষণ চা করে নিয়ে বসে আছে ওর জন্যে।

বীণা বল্লে—ওই তোদের বাড়ীর দরজাটা—আমি চলি সই। এর পরে একলা যেতে পারবো না—

বীণা চলে গেল অন্ধকার বাঁশবনের পথটা দিয়ে একা একা। আশা সই-এর অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে রইল—তারপর যখন আর দেখা গেল না তখন সামনের দিকে চেয়েই ভয়ে ওর বুক কেঁপে উঠলো · কি ওখানে ?

ও চীৎকার করে ডাক দিলে—ও সই—ও বড়দি—

ওর সামনে বাড়ীউলি মাসীর দরজা, যে দরজাটা খুলে সকালে আজই পালিয়ে গিয়েছিল লুকিয়ে। ওর চীৎকার শুনে দরজাটা খুলে নেত্যনারাণ দু'পাটি দাঁত বের করে এগিয়ে এসে বল্লে - বাপরে ! কি তোমার কাণ্ড ! কোথায় গিয়েছিলে সারাদিন ?···

তার পর ওর হাত ধরে টানতে টানতে বল্লে—চলো, চলো, রাত হয়ে গিয়েচে—শোবে এসো, শোবে এসো···

কতকাল যে কেটে গেল মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর সেই বাড়ীটাতে। তার কোন হিসেব নেই, কোনো লেখাজোখা নেই—আশার মনে হয় বাল্যকাল থেকে তার বিবাহের সময়, তারপর তার সমস্ত বিবাহিত জীবন নিয়ে যতটা সময়ের অভিজ্ঞতা তার আছে—তেমনি কত বাল্যজীবন, কত বিবাহিত জীবন, কত বৈধব্যজীবন এবং কত মানিকতলার জীবন তার কেটে গেল—সে কিন্তু সেই এক ভাবেই রইল একই জায়গায় স্থাণুবৎ অচল।

নেত্যদা তাকে ছাড়ে না। কতবার সে পালিয়ে গিয়েচে—জীবনের কত জানা অজানা কোণে। কত বছরের ব্যবধান রচনা করেচে সে বর্তমান জীবনের ও সেই সব অতীত দিনের শান্তি ও পবিত্রতামণ্ডিত অবকাশের।

কিন্তু কোনো ব্যবধান টেঁকে না।

সব এসে মিশে যায় বর্তমানের এই কলকাতা মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীর দরজার এই ঘরটাতে, ওই তক্তপোশটাতে।

এখন যেন তার মনে হয়—এসব যা ঘটেচে, এ আসল নয়, সব যেন অবাস্তব, স্বপ্নবৎ···এ সব ছায়াবাজি···জীবনটাই যেন একটা মস্ত ছায়াবাজি হয়ে গেল তার···

সই, মা, ভাই, বোন, স্বামী, ছেলে-মেয়ে কিছুই নিত্য নয় তার জীবনে···আসে আবার চলে যায় ··বাড়ীউলি মাসীর এ বাড়ীটাই কি এদের মধ্যে একমাত্র সত্যি ? আর নেত্যদা, আর এই সরু রান্নাঘরটা···আর ওই ছোট ঘরের ছোট তক্তপোশটা ? এর কি কোনো শেষ হবে না, এ দিনের এই সব টিঁকে থেকে যাবে চিরকাল ?

কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা স্বপ্ন আজকাল সে বুঝতে পারে না। যেটাকে সত্যি ভেবে হয়তো আঁকড়াতে যায়—সেটাই মিথ্যে হয়ে স্বপ্ন হয়ে যায়। তার কি কোনো রোগ হোল ? এমন সাধের, এমন আদরের, এমন আশা-আনন্দের জীবনের শেষকালে এ কি ঘটলো ? কোথায় চলে গেল স্বামী, কোথায় গেল বাপের ভিটে, শ্বশুরের ভিটে ? এ কি-ভাবে পাগল বা বুদ্ধিহীন কিংবা

রোগগ্রস্ত অবস্থায় সে পড়ে রইল ?

নেত্যনারাণ এসে বল্লে—রান্না করবে না আজ ? বসে আছ যে—

—আমি জানিনে। তুমি আমায় বিরক্ত করতে এসো না—

—কেন, আজ আবার রাজরাণীর কি মেজাজ হোল ?

—তুমি চলে যাও এখান থেকে—

নেত্যনারাণ ওর কাছে এসে বল্লে—বড্ড ঠাট্টা কর তুমি মাঝে মাঝে। কোথায় যাই বল তো ? এখন আমি চলে গেলে তুমি খাবে কি ? রূপের বাবসা যে খুলবে, সে আর হবে না। আয়নাতে চেহারাখানা দেখেচো এদানীং ?

আবার কি-সব যাচ্ছেতাই কথা। অনবরত অপবিত্র অশ্লীল ধরনের এই সব কথা কেন তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বদা শুনতে হয়। ও ভেবে ভেবে বল্লে—আমরা তো মরে গিয়েচি—খাবার আর দরকার কি ?

নেত্যনারাণ ওর দিকে চেয়ে বল্লে—মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? তবে খাচ্চ কেন ? রোজ রোজ রান্নাবান্না করচো কেন ? বাজার করচি কেন ?

—কেউ খাচ্চে না। কেউ বাজার করচে না। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন।

কিন্তু নেত্যনারাণের চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টি এত অকপট যে, নিজের বিবেচনার ওপর আশা আস্থা হারালে। নিজে যা বলতে চাইছিল, শেষ করতে পারলে না। মিনতির সুরে বল্লে—আচ্ছা নেত্যদা, তোমার কি মনে হয় ? এমন কেন হচ্চে বলতে পারো ? এ সব কি সত্যি, না স্বপ্ন ?

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—তাই বলে কি তোমার বিশ্বাস ?

—নইলে আবোল-তাবোল বকবে কেন ? স্বপ্ন কিসের ? আমি রইচি, আমি হাটবাজার করচি, খাচ্চি দাচ্চি—সব স্বপ্ন হোল কি ভাবে ? এই ঘরবাড়ী দেখতে পাচ্চ না ?—বাড়ীউলি মাসী, ও বাড়ীউলি মাসী—শুনে যাও এদিকে। কি বলচে শোনো ও !

বাড়ীউলি মাসী বল্লে—কি গা ?

—ও বলচে এ সব নাকি মিথ্যে। তুমি, ঘড়বাড়ী, এই বিছানা—সব স্বপ্ন।

—কি জানি বাপু, ও সব তোমরা বসে বসে ভাবো। আমাদের খেটে খেতে হয়, শখের ভাবনা ভাববার সময় নেই। বেলা হোল দুপুর, উনুনে আঁচ পড়েনি। পালেদের বৌ সেই কোন্ সকালে একবাটি চা খাইয়েছিল ডেকে। যাই—

নেত্য ওর দিকে চেয়ে বল্লে—শুনলে ?

আশা বোকার মত শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে হতাশ হয়ে বল্লে—কি জানি বাপু ! আমার যেন এক এক সময় মনে হয় এ সব স্বপ্ন দেখচি তুমি আর আমি। এ ঘর নেই, বাড়ী নেই, খাট নেই, বিছানা নেই—ওই রাস্তা, লোকচলাচল সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। কেবল তুমি আর আমি আছি—আর এই যে সব দেখচি সব স্বপ্ন দেখচি আমরা দুজনে।

—বা রে, বাড়ীউলি মাসি এলো, কথা বলে গেল, ও-ও কিছু নয় ?

পরে বিভ্রান্তকে বোঝাবার সুরে সদয়ভাবে বল্লে—ও সব তোমার মাথার ভুল। সব সত্যি—দেখচো না বাড়ীউলি মাসী এসে কি বলে গেল। একবার তোমাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়াতে হবে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হচ্চে না, না কি ?

আশা বল্লে—তবে মাঝে মাঝে পাই আবার হারাই কেন ?

অনেকটা অন্যমনস্ক সুরে কথাটা বলে ফেলেই ও চাপতে চেষ্টা করলে। বল্লে—কি জানি, যা বলচো, তাই বোধ হয় হবে। আচ্ছা আমরা এখানে কতকাল থাকবো ? কবে চলে যাবো এখান থেকে ?

—কেন যাবো ? বেশ আছি।

—আমাকে আমার গাঁয়ে রেখে এসো—লক্ষ্মীটি !···

নেত্য রেগে উঠে বল্লে—মেরে হাড় গুঁড়ো করবো। সেই শম্ভু বাঁদরটার জন্যে মন-কেমন করচে বুঝি ? আমি সব জানি।

—না না, সত্যি না নেত্যদা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমার এখানে থাকতে ভাল লাগচে না। ভয় হচ্চে। মনে হচ্চে যেন একটা জায়গায় এসে পড়েচি, এখান থেকে বেরুবার পথ নেই। এই ছোট্ট ঘরটা, ওই তক্তপোশটা···এ বাড়ীর যেন চারিদিকে দেয়াল দিয়ে আমাদের কে আটকেচে। এখান থেকে কেউ বেরুতে দেবে না। এ সবও সত্যি নয়, এ সব মিথ্যে, সব ছায়াবাজি। যা এই সব দেখচি না ?···সব ভুল।

নেত্য ব্যঙ্গের সুরে বল্লে- আবার আবোল-তাবোল বকুনি ? মাথা কি একেবারে গেল ?

আশা আপন মনেই বলে যাচ্ছিল—এ থেকে তোমার আমার কোনোদিন উদ্ধার নেই। জানো, আমি অনেক চেষ্টা করেচি পালাবার, বাইরে যাবার। কিন্তু পারিনি—কে আবার এই সবের মধ্যে আমার এনে ফেলেচে। অথচ আমি চাই উদ্ধার পেতে এ সব থেকে, এখান থেকে অনেক দূরে চলে যেতে—যেখানে এসব নেই। কেন পারিনে জানো ? অনেক চেষ্টা করেচি আমি পালাবার—পারিনি।

আশা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো। নেত্য না-বোঝার দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল উদ্বিগ্ন ভাবে।

•

নেত্য নানারকম অত্যাচার শুরু করলো ক্রমে ক্রমে আশার ওপর। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে, মারধোর তো করেই। বাড়ীউলি মাসী যোগ দিয়েচে নেত্যদার দিকে। ওকে বলে—বল্লুম এক মাড়োয়ারী বাবু জুটিয়ে দিচ্ছি—তা হোল না। লোকে কি যার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার সঙ্গেই ঘর করে চিরকাল ? কত দেখনু আমার এ বয়সে। ওই যে পাশের বাড়ীর বিন্দি, আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, তা কই এখন ? কোথায় গেল সে রসের নাগর দেওর ? নোয়াওলা খোট্টা বাবু রাখেনি ওকে ? কেমন ছাপর খাট, গদি, এক পিলসুজ রূপোর বাসন ! দু'পয়সা গুছিয়েচে—

কি ঝকমারি করেচে আশা। এই কথাবার্তা তার গায়ে ছুঁচের মত বেঁধে আজকাল। কেউ ভাল কথা যদি বলতো ছুটো এখানে। কালি ঢেলে ঢেলে তার সারা গায়ে কালি মাখিয়ে দেয় এরা।

কিন্তু কাটলো বহুকাল। অনেক দিন, বৎসর, মাস—অনেক জীবন, জন্ম মৃত্যু যেন জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েচে। সত্যিতে স্বপ্নতে জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েচে। এমন শক্ত হয়ে পাক জড়িয়ে গিয়েচে এবং আরও যাচ্চে দিন দিন যে, কেউ খুলতে পারবে না। একদিন সে আফিং আনিয়ে নিল পালেদের ছেলের হাত দিয়ে। সেদিন নেত্যনারাণ কোথায় বেরিয়েচে—ভালোই হয়েচে, একেবারে সব যন্ত্রণার অবসান সে আজ করবে। ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল আফিং খেয়ে—তারপর ক্রমে ঝিমিয়ে পড়লো। পেটে কোথায় যেন ভীষণ বেদনা করচে… সব যন্ত্রণার আজ একেবার শেষ হবে। সকলের মুখে অশ্লীল কথা শুনতে হবে না। কিন্তু কোথা থেকে নেত্যনারাণ ফিরে এসে ওর ঘরের দোর ভেঙে খিল খুলে ওর মাথার চুল ধরে সারা বারান্দা হাঁটিয়ে বেড়াতে লাগলো। কিছুতেই ওকে বসতে দেয় না, গালে চড় মারে—বলে—বসতে চাও? ন্যাকামি করে আবার আফিং খাওয়া হয়েচে ওঠো বেঁচে, তারপর তোমার হাড় আর মাস—

বাড়ীউলি মাসী কোন্ ফাঁকে কাছে এসে চুপি চুপি বল্লে—বয়, বাপু, দিব্যি মাড়োয়ারী বাবু জুটিয়ে দিচ্চি। অমন কত হচ্চে আজকাল। কেন মিছিমিছি আফিং খেয়ে কষ্ট পাওয়া। …দিব্যি সুখে থাকবে। ওই পাশের বাড়ীর বিন্দি। ছাপর খাট, কলের গান বাসনকোসন। ও যে আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল—

ওর মন আর পারে না। অবসন্ন, ক্লান্ত মন যেন বলে ওঠে—ভগবান, আমি আর পারিনে। আমায় বাঁচাও—এ থেকে উদ্ধার করো—

কে যেন ওর কথা শোনে। আশার স্বপ্নাচ্ছন্ন, অবসন্ন মন বোঝে না কে সে। অনেক দূরের, অনেক আকাশের পারের কোন্ দেশ থেকে সে যেন উড়ে আসে পাখায় ভর করে। একবার আশার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী, মহিমময়ী দেবীমূর্তি ভেসে ওঠে। বরাভয়করা, স্মিতহাস্যমধুরা…অপরূপ রূপসী জ্যোতির্ময়ী নারী। আর মনে আছে এক সাদা বড় পাহাড়ের ছবি, সবাই মিলে তাকে ছুঁড়ে যেন সেই সাদা পাহাড় থেকে বহুদূরে নীচের দিকে ফেলে দিচ্চে।

দেবী যেন হাসিমুখে বল্লেন—যাও, ভাল হও—ভুল আর কোরো না।

কে যেন প্রশ্ন করলে—আশা-বৌদি স্বামীর সঙ্গে মিলবে কি করে? ও তো সব ভুলে যাবে।

দেবী বল্লেন—আমি সব মিলিয়ে দিই। ওরা তো নতুন মানুষ হয়ে চললো, ওদের সাধ্য কি?

তারপর গভীর অতলস্পর্শ অন্ধকার ও বিস্মৃতি। অন্ধকার…অন্ধকার।

পুষ্প একদিন সেই নির্জন গ্রহটিতে একা গেল। ওর বড় কৌতূহল হয়েছিল বনকান্তার, অরণ্যানী ও শৈলমালায় পরিপূর্ণ ওই ছায়াভরা গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে।

এবারও রাত্রি নেমেচে গ্রহটিতে।

জীবকুল সুপ্ত। অপূর্ব সুন্দর দেশ। বোধহয় ঐ গ্রহে তখন বসন্ত ঋতু। সেই দিক্‌দিশাহীন অরণ্যে কান্তারে নাম-না-জানা কত কি বন-কুসুম-সুবাস। বনে বনে ছাওয়া সারা দেশ। বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে বেঁকে এসে ওর সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না পড়েচে। নৈশ পক্ষীকুলে ক্বচিৎ পক্ষ-বিধূনন।

গ্রহের দিকবিদিক সে চেনে না। পৃথিবীতে গেলে তবে উত্তর দক্ষিণ দিক বুঝতে পারে। এ গ্রহের লোকে কাকে কোন্ দিক বলে কে জানে? কিন্তু এরং মাঝামাঝি থেকে একটু বাঁ দিকে ঘেঁষে এক উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী বহুদূর ব্যেপে চলে গিয়েচে, অনেক ছোট বড় নদী এই শৈলগাত্র থেকে নেমে চলেচে নীচেকার বনাবৃত উপত্যকায়। দু'একটি বড় জলপ্রপাত বনের মধ্যে।

ওর আকাশে বাতাসে বনে বনানীতে কেমন একটি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আনন্দ। এর বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যে নেবে, সে-ই যেন হয়ে উঠবে আনন্দময় ব্রহ্মদর্শী ভক্ত, ধীর ও নির্লোভ, তৃষ্ণা-হীন ও উদার। এর বনতলে জীবের অমরত্বের কথা লেখা আছে, লেখা আছে এ বাণী যে এই বনতলে তাঁর আসন পাতা। উচ্চ জগৎ বটে।

হঠাৎ ও দেখলে একটি বনপাদপের তলে শিলাসনে স্বয়ং কবি ক্ষেমদাস বসে।

ও দেখে বড় খুশি হয়ে কাছে গেল। ক্ষেমদাস বল্লেন—এসো এসো, যিনি আদি কবি, বিশ্বস্রষ্টা, তাঁর বিষয়ে আমি কবিতা রচনা করচি।

—আপনি এ গ্রহ জানেন?

—কেন জানবো না? এ রকম একটা নয়—দীর্ঘ বনফুলের মালার মত একসারি গ্রহ আছে বিশ্বের এ অংশে। আমি জানি। তবে এখানে আসতে হয় যখন এ গ্রহে রাত্রি।

—কেন?

—এখানকার লোক উচ্চশ্রেণীর জীব। ওরা আমাদের দেখতে পাবে দিনের আলোয়। এখন ওরা সুপ্ত। ব'সো ওই শিলাসনে। বেশ লাগে এখানে। লোকালয় এ গ্রহে খুব কম। বনে হিংস্র জন্তু নেই। কেমন নীল জ্যোৎস্না পড়েচে দেখেচো? বড় ভালবাসি এ দেশ।

—আপনি এখানে আসেন কেন?

—একটি তরুণ কবি আছে এ গ্রহে, তাকে প্রেরণা দিই। ভগবদ্ভক্ত। এই শিলাসনেই সে খানিক আগেও বসে ছিল। প্রতি রাত্রে নির্জনে এসে বসে। সৃষ্টির এ সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে। ওই তার উপাসনা। তুমি জানো আমারও ওই পথ। তাই তার পাশে এসে দাঁড়াই।

—তিনি দেখতে পান আপনাকে?

—না। আমাকে বা তোমাকে দেখতে পাবে না। তোমার সঙ্গী যতীনকে দেখতে পেতো। সে এখন কত বড় ছেলে?

পুষ্প সলজ্জভাবে বল্লে—ন'বছরের বালক।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—আবার নব জন্মলীলা। বেশ লাগে আমার। আবার মাতৃক্রোড়ে যাপিত শৈশব। চমৎকার!

পুষ্প হেসে বল্লে—সন্ন্যাসী এখানে উপস্থিত থাকলে আপনার কথা মেনে নিতেন?

—জানি, সে বলে বার বার দেহ ধারণ করা মুক্তির পথে বাধা। সে বলে, ও থেকে উদ্ধার নেই। সেই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি, চক্রপথে উদ্দেশ্যহীন গতাগতি। সেই একই লোভ, তৃষ্ণা, অহঙ্কার নিয়ে বার বার অসার জন্ম ও মরণ। এই তো?

—কথাটা কি মিথ্যে?

—না। মানি। কিন্তু সে কাদের পক্ষে? যারা জীবনের উদ্দেশ্যকে খুঁজে পায়নি বা ভগবানের দিকে চৈতন্য প্রসারিত করেনি তাদের পক্ষে। যারা জানে না স্থূল দেহের পরিণাম ধূমভস্ম নয়, জন্মের পূর্বেও সে ছিল, মৃত্যুর পরেও সে থাকবে, ভূলোকে শুধু নয়, ব্রহ্ম থেকে জীবে নেমে আসতে যে সাতটি চৈতন্যের স্তর আছে, এই সাত স্তরের প্রত্যেকটি স্তরে এক একটি লোক, সে এই সব লোকেরই উত্তরাধিকারী, ভগবানের সে লীলা-সহচর। যারা এ কথা জানে না, জানবার চেষ্টা করে না, জেনেও গ্রহণ করে না বিষয়ের মোহে—তাদের পক্ষে সন্ন্যাসীর কথা পরম সত্য। কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

পুষ্প একমনে শুনছিল। এই পবিত্র গ্রহের তপোবনসদৃশ অরণ্যকান্তারে এ দেশের ঋষি-কবিরা যেখানে নিদ্রাহীন গভীর রাত্রে ভগবানের স্তবগাথা রচনা করেন—এ গ্রহের উপনিষদ জন্ম-লাভ করে তাঁদের হাতে—এই স্থানই ক্ষেমদাসের উপদেশ উচ্চারিত হবার উপযুক্ত বটে। পুষ্প ব্যগ্রস্বরে বল্লে—বলুন, দেব, বলুন—

ক্ষেমদাস আবার বল্লেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—যে তাঁকে জেনেচে সে দেহধারণ করেও মুক্ত, যেমন দেখেছিলে সন্ন্যাসীর গুরুভ্রাতাকে, বন-মধ্যস্থ সেই সন্ন্যাসীকে। যাঁদের চৈতন্য জাগ্রত হয়েচে, দেহ থেকেও তাঁরা জীবন্মুক্ত। ভগবানকে যারা ভালবাসেন মনপ্রাণ দিয়ে, দেহধারণ করেও তাঁরা জীবন্মুক্ত। তাঁরা জানেন এই বিশ্বের সমস্ত গ্রহ, সব তারা, সব বসন্ত, সব জীবলোক আমার। আমি এদের মাধুর্য উপভোগ করবো। তাঁর সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে যাবো। আমি তাঁর চারণ-কবি। আমি ছাড়া কে গান গাইবে এই বিশ্বদেবের অনন্ত সৌন্দর্য-শিল্পের? তাঁর গান গেয়েই যুগে যুগে অমর অজর হয়ে আমি বেঁচে থাকবো। শত জন্মের মধ্যেও যদি তাঁর সেবা করে যাই আর আসি আমার তাতে ক্ষতি কিসের?

ক্ষেমদাস চুপ করলেন।

পুষ্প বল্লে—এ দেশের সেই কবিকে দেখা যায় না?

—এতক্ষণ সে ছিল এখানেই। সেও ভগবানের চারণ-কবি। এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের সে স্তবগীতি রচনা করে। সে এখন ঘুমিয়েচে।

—বিবাহিত?

—এ দেশের নিয়ম বুঝি না। স্ত্রীলোকদের অদ্ভুত স্বাধীনতা এখানে। তারা যার ঘরে যতদিন ইচ্ছা থাকে। আবার যেখানে সত্যকার প্রেম আছে, সেখানে পৃথিবীর স্বামী-স্ত্রীর মত আজীবন বাস করে। আমাদের কবির সঙ্গে তিন-চারটি নারী থাকে—কিন্তু তারা কেউই পৃথিবীর তুলনায় সুন্দরী নয়। এদেশের মেয়েরা সুশ্রী নয়। অবশ্য নারী তিনটির সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক জানি না। এদেশে হয়তো তাতে দোষ হয় না। যে দেশের যে নিয়ম।

ওরা কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলে বনের মধ্যে গাছতলাতে দু-তিনটি লোক নিদ্রিত। ক্ষেমদাস বল্লেন—ঐ ভাখো কবি শুয়ে। ঐ পাশেই তিনটি নারী।

পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বল্লে -গাছতলাতে কেন সবাই?

—এখানে লোকের ঘরবাড়ী নেই পৃথিবীর মত। ওদের দেহ অন্য ভাবে তৈরী। রোগ নেই এখানে, হিংস্র জন্তু বা সর্প নেই। দেহের কোনো ক্ষতি হয় না। অল্প আয়ু বলে ঘরবাড়ী করে না কেউ।

—তবে মরে কিসে?

—এদের স্বেচ্ছামৃত্যু। জ্ঞানী ও নিস্পৃহ আত্মা কিনা! নির্দিষ্ট সময় অন্তে যেদিন হয় এরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হবে। মন যেদিন এদের তৈরী হবে সেদিন স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবে। মৃত্যুতে এরা শোক করে না। এরা জানে মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র।

—পুনর্জন্ম?

—এখানে যারা জন্ম নেয়, তারা অনেক জন্ম ঘুরে এসেচে। পৃথিবীতে বহু জন্ম কেটেচে এদের। শেষ জন্ম এখানে কাটায়। তার পরেই মহর্লোকে চলে যায় একেবারে, আর ফেরে না। কিন্তু তুমি একটা কথা বোধ হয় জানো না—পৃথিবীর চেয়ে নিকৃষ্টতর গ্রহও অনেক আছে। নিম্ন-শ্রেণীর আত্মাদের পুনর্জন্ম অনেক সময় ওই সব নিকৃষ্টতর লোকে হয়।

—সে সব স্থান কি রকম?

—একটাতে তোমাকে এখুনি নিয়ে যেতে পারি। চোখেই দেখবে, না কানে শুনবে? তবে একটা কথা। সে সব দেখে কষ্ট পাবে। মেয়েমানুষ তুমি, সে সব গ্রহলোক দেখলে তোমার মনে হবে ভগবান বড় নিষ্ঠুর।

চক্ষের পলকে ওরা একস্থানে এসে পৌঁছলো। সে স্থানটির সর্বত্র ঊষর মরুভূমি ও কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর স্তূপ। কিন্তু সে স্তূপ প্রস্তর নয় --তা কি, পুষ্প জানে না। উলঙ্গ বিকটদর্শন অর্ধমনুষ্যাকৃতি জীব দু'একজনকে সেই কৃষ্ণবস্তু স্তূপের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। মাঝে মাঝে তারা উঠে মাটির মধ্যে হাত দিয়ে গর্ত খুঁড়ে কি বার করচে ও পরম লোলুপতার সঙ্গে মুখে পুরচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—চলো এখান থেকে। ওরা কীটপতঙ্গ খুঁজে খাচ্চে। ওই ওদের আহার। ওই ওদের আহার সংগ্রহ রীতি। একজনের বস্তুস্তূপে আর একটি জীব যদি আসে, তবে দুই জীবে মারামারি করবে। এ ওকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। এ জগতে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া, সেবা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা, সংগীত কিছু নেই। আছে কেবল দুর্দান্ত আহার-প্রচেষ্টা। জীবে জীবে কলহ।

পুষ্প বল্লে—চলুন এখান থেকে। হাঁপ লাগচে। কি জড়পদার্থে গড়া এ দেশ, প্রাণ যেন কেমন করে উঠলো। এও কি ভগবানের রাজ্য? উঃ—

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—এখনও দেখোনি। চলো আরও দেখাই—এর চেয়েও ভয়ানক স্থান দেখবে। যেখানে পিতামাতা পুত্রকন্যার সম্বন্ধ পর্যন্ত নেই। যেখানে—না সে তোমাকে বলব না।

পুষ্প অধীর ভাবে বল্লে—কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলেন? উঃ—বলেই সে ঝরঝর করে

কেঁদে ফেললে। হাত জোড় করে বল্লে—আমার একমাত্র সম্বল ভগবানে ভক্তি, আর আমার কিছু নেই জীবনে। দেব, দয়া করে সেটুকুও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না—কৃপা করুন—আমি নিতান্ত অভাগিনী।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—পাগল! সেই অনন্ত মহাশক্তির এক দিকই কেবল দেখবে? রুদ্র-দেবের বাম মুখ দেখলেই ভক্তি চটে যাবে অত ঠুনকো ভক্তি তোমার অন্তত সাজে না। তুমি আমি তাঁর উদ্দেশ্যের কতটুকু বুঝি? চলো ফিরি। ওই জন্য আনতে চাইনি তোমাকে এখানে। এতেই এই, এর চেয়েও নিকৃষ্ট লোকে নিয়ে গেলে—

—না দেব। আমায় পৃথিবীতে অন্তত নিয়ে চলুন। আমাদের পৃথিবীতে—চলুন গঙ্গাতীরে—

মহাশূন্য বেয়ে সেই মুহূর্তে ওরা এসে পৃথিবীতে একস্থানে বৃক্ষতলে দাঁড়ালো। বর্ষাকাল পৃথিবীতে, ভীষণ বৃষ্টি হচ্চে। স্থানটা পাহাড়ে ঘেরা, পাহাড় ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েচে বৃষ্টির ধারায়।

ক্ষেমদাস বল্লেন—নিয়ে এলাম গঙ্গাতীরে। ওই অদূরে গঙ্গা—

—এটা কোন্ স্থান?

—হরিদ্বার।

পুষ্পের চোখ জুড়িয়ে গেল ধারামুখর অপরাহ্নের বহুপরিচিত, অতি প্রিয় শোভায়। তার মন বলে উঠলো—এই তো আমাদের পৃথিবী, আমাদের স্বর্গ। ভগবান এখানে কত ফুলে ফলে নিজেকে ধরা দেন, কত জ্যোৎস্নার আলোয়, কত অসহায় শিশুর হাসিতে। আজ চিনলাম তোমায় ভাল করে, আমাদের মাটির স্বর্গকে, আর চিনলাম মানুষকে। মানুষই মাটি দিয়ে গড়া দেবতা—দুদিন পরে সত্যিকার দেবতা হয়ে যাবে। জয় নীলারণ্য-কুন্তলা অতল-সাগর-মেখলা চিরন্তনী সুন্দরী পৃথিবীর। জয় জয় মানুষের। জয় বেণুরব-শিহরিতা দিগন্তলীন-প্রান্তর-শোভিতা ভূতধাত্রী মাতার।

ক্ষেমদাস বল্লেন—এবার তোমার মন শান্ত হয়েচে। বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এখন একটা কথা বলি। কি দেখে অস্থির হয়ে উঠলে?

পুষ্প সলজ্জ হেসে চুপ করে রইল। ক্ষেমদাস বল্লেন—না, বলো, বলতেই হবে। ভগবান কি নিষ্ঠুর—এই ভেবেছিলে। না?

—হাঁ।

—তিনি কি নিষ্ঠুর—ওঃ! এই তো?

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে নির্বাক।

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমার মত মেয়েরও বিস্মৃতি? তোমারও ভুল? এ'কেই বলে মোহিনী মায়া। মায়ায় কে না ভোলে? ব্রহ্মা বিষ্ণু তলিয়ে যান।

—কেন দেব, বলুন!

—না, তাই দেখচি। নতুবা তোমারও ভুল!

—থাক্ আমার ব্যাখ্যা। আমি তৃণের চেয়েও হীন। আপনি কি উপদেশ করচেন, তাই করুন না?

ক্ষেমদাস হাসিমুখে বল্লেন—ভগবান কার উপর নিষ্ঠুর হবেন ? সবই তো তিনি। নিজেই নিজের লীলায় তন্ময় হয়ে আছেন বিভিন্ন রূপে। তিনিই সব। সে জ্ঞান যেদিন হবে সেদিন ওই নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট জীব দেখেও বলে উঠবে আনন্দে—তেজো যৎ তে কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি—

ক্ষেমদাস চলে গেলেন। যাবার সময় বল্লেন—বৃন্দাবন থেকে ঘুরে আসি। তোমার সঙ্গে আবার শীঘ্রই দেখা করবো—একদিন চলো সেই সন্ন্যাসিনীর কাছে যাবো।

পুষ্প স্থির ভাবে বসে রইল শৈলশিখরে। এখানে তার যতুদা আছে, কত জন্মের প্রিয় সাথী সে ; তাকে ফেলে কোথায় কোন্ লোকে গিয়ে সুখ পাবে সে ? একটি গোয়ালার মেয়ে দুধ দুয়ে নিয়ে আসচে বাজারে। নরনারী প্রদীপ ভাসাচ্ছে গঙ্গাবক্ষে। দূর থেকে আলো দেখা যাচ্চে জলের ওপর।

বুড়োশিবতলার পুরানো ঘাটের সামনে গঙ্গাবক্ষে পালতোলা নৌকোর দল চলেচে। গোধূলির আব্‌ছায়া আকাশে শুভ্রপক্ষ বকের দল উড়ে চলেচে ওপারে হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর ঘাটের দিকে। প্রাচীন দেউলমন্দিরের চূড়া সান্ধ্য দিগন্তের বননীলরেখায় এখানে ওখানে যেন মিশে আছে।

পুষ্প ঘাটের রানায় বসে ক্ষেমদাসের সঙ্গে কথা বলছিল।

ক্ষেমদাস বৃন্দাবন থেকে এইমাত্র ফিরেচেন ; জ্যোৎস্নারাত্রে যমুনাতীরে কিছুক্ষণ বসে ছিলেন চীরঘাটের কাছে। আরতি দর্শন করবার পরে। মন ভূমানন্দে বিভোর।

পুষ্প বল্লে—কবি, স্ফটিকের কথা কি বলছিলেন ?

ক্ষেমদাস গঙ্গার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই দ্যাখো, রাঙা আকাশের ছায়া পড়েচে জলে ; জল যদি ঘোলা হোত, আকাশের ছায়া পড়তো না। স্ফটিককে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্মল হতে হবে, তবে আলো তার মধ্যে দিয়ে আসবে।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ আত্মাতে যদি এতটুকু ত্রুটি থাকে কোথাও, তবে ভগবানের আলো তার মনে নামে না। সম্পূর্ণ নির্মল স্ফটিক হওয়া চাই, এতটুকু খুঁৎ থাকলে চলবে না।

—ভগবানের দাবি এত বেশি কেন ?

—উপায় নেই। ভগবানের আলো যদি মনের দর্পণে ঠিক অখণ্ড ভাবে পেতে কেউ চায়, তার জন্যে এই ব্যবস্থা। লোকে মুখে বলে সাধুতা ও পবিত্রতার কথা। কিন্তু জেনো এ দুটি বস্তু অতি ভীষণ, ভয়ঙ্কর।

পুষ্প বল্লে—বুঝতে পারচি কিছু কিছু। নিজের জীবনে দেখচিনে কি ? তবুও বলুন।

—সাধুতা, পবিত্রতা—শুনতে খুব ভালো। কিন্তু এদের আবির্ভাব বিষয়ী লোকের পক্ষে কষ্টকর। কামনাকলুষিত আধারে ভগবানের জ্যোতি অবতরণ করবে কি ভাবে ? এ জন্যে আধার-শুদ্ধির প্রয়োজন। যাকে ভগবান কৃপা করেন, শুদ্ধ আধার করে নিতে তার সব কিছু

ভোগ কামনার জিনিস ধ্বংস করে তাকে নিঃস্ব, রিক্ত করে দেন। ভগবানের কৃপা সেখানে বজ্রের মত কঠোর, নির্মম, ভয়ঙ্কর। সর্বনাশের মূর্তি ধরে তা আসে জীবনে, ধ্বংসের মূর্তিতে নামে। সে রকম কৃপার বেগ সামলাতে পারে ক'জন ?

পুষ্প চুপ করে রইল। এর সত্যতা সে নিজের জীবনে বুঝেচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—ভাখো, আমি ভক্তিপথের পথিক, তুমি জানো। সন্ন্যাসী যে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলে, তাঁকে বুঝতে হোলে জ্ঞানের পথ দরকার। জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। আমি সাকারের উপাসক, মধুর ভাবে মধুর মূর্তিতে তাঁকে পেতে চাই—তাই আমি বৃন্দাবনে গিয়ে সেই রস আস্বাদ করি। সন্ন্যাসী বলে, ও অপ্রাকৃত মূর্তির উপাসনা কর কেন ? আমি বলি, তোমার নিয়ে তুমি থাকো, আমার নিয়ে আমি থাকি। ও বলে, ব্রহ্ম আবরিত হতে হতে জীব হয়েচে, জীব হয়ে স্বরূপ ভুলে গিয়েচে। ব্রহ্ম দেশ-কালের মধ্যে ধরা দিয়ে জীব হয়েচে। কেন হয়েচে ? লীলা। আমি বলি, বেশ, এক যখন বহু হয়েচেন লীলার আনন্দকে আস্বাদ করতে, তখন আমিও তাঁর লীলাসহচর তো ? আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর লীলা চলে না। এই তো প্রেমভক্তি এসে গেল। কেমন ?

পুষ্প বল্লে—বনের সেই সন্ন্যাসিনী কিন্তু প্রেমভক্তির কাঙাল। আমি সেবার রঘুনাথদাসের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলাম, বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেই থেকে গোপাল-বিগ্রহের ভক্ত হয়ে উঠেচেন।

—সে যে মেয়েমানুষ। শুষ্ক জ্ঞানপথে সে তৃপ্তি পায় না—লীলারস আস্বাদ করতে চায়। আমি চল্লাম খুকি, তুমি আজ তো বৃন্দাবনে গেলে না, কাল এসে নিয়ে যাবো। সন্ন্যাসী তোমাকেও কি বলেছিল না ?

—বলেছিলেন, এখনও অপ্রাকৃত লোক আঁকড়ে আছ কেন ? তোমার তো উচ্চ অবস্থা, উচ্চ স্তরে চলো।

পৃথিবীর হিসেবে আজ কয়েক বছর হোল পুষ্প এই স্বরচিত বুড়োশিবতলার ঘাটে সম্পূর্ণ একা। করুণাদেবীও ওকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তত উচ্চ স্তরে গমন করলে আর সে পৃথিবীতে যাতায়াত করতে পারবে না বলেই এই গঙ্গার ঘাট আঁকড়ে পড়ে আছে। এই তার পরম তীর্থ—তার মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক—লোকাতীত পরমকারণ পরব্রহ্মলোক। কোথাও পোষাবে না তার। কত সহস্র স্মৃতিতে ভরা এই প্রাচীন ভাঙা ঘাটটি।

কেউ নেই আজ এখানে।

যতীনদা চলে গিয়েচে আজ দশটি বছর।…

উর্ধ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়—আজ এতকাল পরে তার কাছে শূন্য অর্থহীন !

এক এক সময়ে মনে হয় সেই ভ্রাম্যমাণ বহুদক দেবতা যদি আসেন ! তাঁর মুখে বহু জগতের, বহু নক্ষত্রলোকের, বহু বিশ্বের গল্প শোনে। নিজে তিনি বেড়িয়ে দেখেচেন, এখনও

দেখচেন—শেষ করতে পারেন নি।

সন্ন্যাসী এসে প্রায়ই বলেন—মহর্লোকে তোমার আসন, এখানে কি নিয়ে পড়ে আছ কন্যে? সেই পৃথিবীর গঙ্গা, পৃথিবীর হালিসহর সাগঞ্জ, নৌকো—এসব মায়িক কল্পনা তোমার সাজে না। ছি ছি—

পুষ্প সকৌতুকে বলেছিল—নিয়ে যান না তার চেয়েও উচ্চতর লোকে, যাচ্চি এখনি।

সন্ন্যাসী বলেন—জ্ঞান থাকবে না বেশিক্ষণ। কারণ এসব লোক আত্মিক অবস্থা মাত্র। কোনো স্থান নয়। সে উচ্চতর চৈতন্য জাগ্রত হোলে পৃথিবীতে জড়দেহধারী হলেও তুমি সত্যলোকের অধিবাসী। যেমন দেখেছিলে আমার সেই গুরুভ্রাতাকে। চিদানন্দময় আত্মা সেখানে আপনার অস্তিত্বের আনন্দে বিশ্বের সঙ্গে এক সুরে গাঁথা। মুখে বলা যায় না সে অনুভূতির কথা।

পুষ্প বল্লে—বুঝবার ক্ষমতা নেই আমার দেব। তবে শুনলাম বটে। আপনার দয়া।

—বিধাতৃপুরুষদেরও উচ্চ স্তরের দেবতাদের দেখা পাওয়ার জন্যে তপস্যা করতে হয় জানো তো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাতজন বিধাতৃপুরুষ আছেন, এঁদের ওপর ঈশ্বর। বিধাতৃপুরুষেরা ইচ্ছা করলেই ভগবানের লোকে যেতে পারেন না—গেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এজন্যে তপস্যা দ্বারা শক্তি অর্জন করতে হয়—তবে সেই সাময়িক তপস্যার সাময়িক শক্তি নিয়ে ঈশ্বর সমীপে যেতে পারেন। অথচ বিধাতৃপুরুষেরা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করচেন।

—ভগবান তবে কি করচেন, তিনি কি ঠুঁটো জগন্নাথ?

—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্চে, কন্যে। একটা তৃণও নড়ে না তাঁর ইচ্ছা না হোলে।

—তিনি দয়ালু? ডাকলে সাড়া দেন?

—এখনও এ সন্দেহ? এইজন্যে আমি বলি, প্রার্থনা ক'রো না তাঁর কাছে কিছু। প্রার্থনা করলেই তিনি মঞ্জুর করেন। তিনি পরম করুণাময়। জীবের দুঃখ দেখে থাকতে পারেন না। হয়তো এমন অসঙ্গত প্রার্থনা করে বসলে, যা মঞ্জুর হোলে তোমার আত্মার অমঙ্গল। এইজন্যে কিছু চাইতে নেই তাঁর কাছে—তিনি আমাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে সব কিছু করে যাচ্চেন বা বিধাতৃপুরুষদের কর্মে সম্মতি দিয়ে যাচ্ছেন। এইজন্যে অনেক সময় ভগবানকে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। জীবের কল্যাণের জন্যে তিনি ব্যবস্থা করচেন, আমাদের তা মনঃপুত হচ্চে না।

—ক্ষেমদাস তাই বলেন।

—কে? আমাদের কবি? ওর কথা বাদ দাও। আজ এত বছরেও ওর ভাবালুতা ওকে ছেলেবেলার ওপরে উঠতে দিলে না! গোপাল আর বৃন্দাবন, আর আরতি, আর চোখের জল—আর চাঁদের আলো…

সন্ন্যাসী সেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পুষ্পের হাসি পায় ওঁর সব কথা ভেবে। মেয়েমানুষের মনের কথা এরা কি করে জানবে? শুদ্ধ, বুদ্ধ আত্মা ওরা—ব্রহ্মের মত হয়ে গিয়েচে। শত স্নেহ প্রেম প্রীতির বাঁধনে যে মেয়েমানুষের মন বাঁধা। এও সেই বিধাতৃপুরুষদেরই গড়া নিয়ম তো, সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়।

পৃথিবীতে কি সন্ধ্যা হয়ে এসেচে?

পুষ্প একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর পৃথিবীর সন্ধ্যায় দেহ মিলিয়ে নেমে এল কোলা-বলরামপুর গ্রামে। যতীনের মা রান্নাঘরের মধ্যে ভাত চড়িয়ে উনুনের পাশে বসে আলু-বেগুন কুটচে। সে আর ঠিক তরুণী নয় এখন, বিগত-যৌবনের চিহ্ন সারা দেহে পরিস্ফুট। নতুন ধান এসেচে সামনের উঠানে, শীতের সন্ধ্যা, পাশের বাড়ীর আমতলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগুন জ্বেলে পোয়াচ্চে।

যতীনের মা রান্নাঘর থেকে বল্লে—ও অভয়—কোথায় গেলি?

পাশের বাড়ীর আমতলায় যে সব ছেলেমেয়ে আগুন পোয়াচ্চে, তাদের ভেতর থেকে একটি আট-ন' বছরের বালক উত্তর দিলে—কেন, কি হয়েচে?

—ঠাণ্ডা লাগাস্ নি বাইরে। ঘরের মধ্যে আয়।

বালকের এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সমবয়সীদের মজলিস ছেড়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকতে। সে বল্লে—আমি বাইরে বসে ধান চৌকি দিচ্চি যে—

—না, তোমায় ধানচৌকি দিতে হবে না। চলে আয় ঘরে। এই উনুনের পাড়ে বসে আগুন পোয়া। ছেলের লেগেই আছে সর্দি কাসি—আবার রাত পর্য্যন্ত বাইরে বসে থাকা—

আর একটি ছেলে ওকে বল্লে—যা, কাকিমা বকবে—

অভয় মুখ ভার করে মায়ের কাছে উনুনের পাশে এসে বসলো। ওর মা বল্লে—সেই গরম জামাটা আজ গায়ে দিস্ নি?

—আহা-হা—সে তো ছেঁড়া!

—তা হোক, নিয়ে আয়, বড্ড শীত পড়েচে।

—না মা।

অভয়ের মা ছেলের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বল্লে—তোমার একগুঁয়েমিগিরি ঘুচিয়ে দেবো আমি একেবারে। দুষ্টু ছেলে—এখুনি বলবেন, মা আমার জ্বর এয়েচে—তখন নিয়ে এসো সাবু, নিয়ে এসো ওষুধ—যা নিয়ে আয় জামা, মাঝের ঘরের আলনায় আছে—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে—ও যতুদা, কেমন মজা? এ আম নয় যে একগুঁয়েমি করে নিস্তার পাবে—

পুষ্প এই সময়টা মাঝে মাঝে এখানে এসে কাটায়। অভয়ের মা ছেলেকে খাওয়ায়, কাছে বসে পড়ায়—প্রথমভাগ, ধারাপাত—পুষ্প বসে বসে দেখে। বেশ লাগে ওর।

স্বপ্নের মত মনে হয় সংসারের জীবন মৃত্যু···সন্ন্যাসীটি জ্ঞানী, সব মায়া আর স্বপ্ন।

আশা-বৌদিকেও একদিন সে দেখে এসেচে। সে এখন বহুদূর মুরশিদাবাদ জেলায় এক মাঝারি গোছের গেরস্তবাড়ীর ছোট একবছরের খুকি।

সে করুণাদেবীকে বলেছিল সেদিন—এরা মিলবে কি করে দেবী? কি করে জানবে এরা?

দেবী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন—ওদের সাধ্য কি? আমরা সে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবো সময় এলে। দেখতেই পাবি, পুষ্প।

অভয়ের মা ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে পাশের ঘরে ঘুমুতে পাঠায়। পুষ্প এসে সেই সময়

খোকার শিয়রে এসে বল্লে—খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল, ঘুমোও যতুদা, ঘুমোও—দুষ্টুমি করলে মায়ের হাতের চড় মনে আছে তো?

অতন্ত্র ঘুমিয়ে পড়লে, হয়তো এক একদিন কোনো রূপসী দেবীর স্বপ্ন দেখে, মায়ের মত স্নেহে তার শিয়রে বসে ঘুম পাড়াচ্ছে। মায়ের মতই বলে মনে হয় তাকে।

নৈশ আকাশ দিয়ে তারপর পুষ্প উড়ে চলে যায় তার নিজ লোকে। অগণ্য জ্যোতির্মণ্ডল, অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাব্যোমে সর্বত্র ছড়িয়ে,—অগণ্য জীবকুল, অগণ্য জীবনমৃত্যুর প্রবাহ।

পুষ্পের মন বলে ওঠে—কোথায় আছ হে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, মহাদেবতা, মুখের আবরণ অপসারণ কর—অপাবৃণু, অপাবৃণু, আমরা তোমার স্বরূপ দেখি—ধন্য কর আমাদের জন্মমরণ, দয়ালু দেবতা!

স্বর্গ ও মর্ত্যের সেই মোহনায় পুষ্প এসে দাঁড়ালো।

ওর কিছুদূরে নীল শূন্যে আগুনের রেখা এঁকে বিরাট এক ধূমকেতু অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে নিজের গোঁ-ভরে চলে গেল।—সে মুহূর্তের হিসেব নেই। ওদের পায়ের তলায় কোন গ্রহের এক নদীতীর, হয়তো বা পৃথিবীরই—শান্ত অপরাহ্ন, একদল সাদা বক মেঘের কোলে কোলে উড়চে নলখাগড়া বনের ঊর্ধ্বে আকাশে।

আজ পুষ্প যেন দেখতে পেলে সেই দেবতাকে—নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো এই অপূর্ব জীবন-উল্লাসের স্রোতে সে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভেসে চলেচে যে মহাদেবতার ইঙ্গিতে। কোথায় যেন তিনি মহাসুপ্তিমগ্ন, তাঁর অপূর্ব সুন্দর মুখখানি, সুন্দর চোখ দুটি ঘুমে অচেতন। কি সুন্দর দেখাচ্ছে সেই স্বপ্নালসনিমীলিত আয়ত চোখ দুটি! পুষ্প বল্লে—উনি উঠবেন কখন? চরণ বন্দনা করি।

পুষ্পের মনের মধ্যে থেকেই প্রশ্নের উত্তর এল—উনি ওঠেন না। অনন্ত শয্যায় অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন উনি। এক এক নিঃশ্বাসে যুগযুগান্ত কেটে যায়। তুমি ওঁর চরণ বন্দনা করবে? ওঁর উপাসনা হয় না। কে করতে পারে ওঁর উপাসনা? উনি কাউকে দেখেন না, কারো উপাসনা গ্রহণ করেন না। বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন—উনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে জগৎস্বপ্ন লয় হয়ে যাবে যে! সৃষ্টি অন্তর্হিত হবে। কিন্তু তা হয় না—সৃষ্টিও অনন্ত, ওঁর সুপ্তিও অনন্ত। উনিই বিশ্বের আদি কারণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ক্ষীরোদশয়নশায়ী মহাদেবতা ব্রহ্মাণ্ডের। তুমি আমি, স্বর্গ নরক, জন্ম মরণ, দেব দেবী, ঈশ্বর, পাপ পুণ্য, দেশ ও কাল—সবই তাঁর স্বপ্ন। সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই—কে কার উপাসনা করবে? ওঁর স্বপ্ন ছাড়া আর উনি ছাড়া আর কি আছে?

ভক্তিভরে প্রণাম করলে পুষ্প। উপাসনা হয় না তো হয় না।

ঘন ঘুমে অচেতন সেই দেবদেবের সুন্দর চোখ দুটি, স্বর্গ ও মর্ত্যের দূরতম প্রান্তে, শুকতারার অস্তপথে, ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল।

উপলখণ্ড

দেশের ঘরবাড়ী নেই অনেকদিন থেকেই। পৈতৃক বাড়ী যা ছিল ভেঙেচুরে ভিটেতে জঙ্গল গজিয়েছে। এ অবস্থায় একদিন গিয়েচি দেশে কিসের একটা ছুটিতে।

গ্রামের চক্কোত্তি মশায় বাবার পুরাতন বন্ধু। আমায় দেখে খুব খুশি হোলেন। বল্লেন —কতকাল পরে বাবা মনে পড়লো দেশের কথা?

প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিলাম। বল্লেন—এসো, এসো, বেঁচে থাকো, দীর্ঘজীবী হও। বাড়ীঘর করবে না?

—আজ্ঞে সামান্য মাইনে পাই—

—তাতে কি? গ্রামের ছেলে গ্রামে বাস করবে, এতে আর সামান্য মাইনে বেশি মাইনে কি? আমি খড়-বাঁশ দিচ্চি, চালাঘর তুলে ফেলো, মাঝে মাঝে যাতায়াত করো। আহা নরেশের ছেলে, দেখেও সুখ। ক'দিনই বা আছি। বাস করো গাঁয়ে।

আরও অনেকে এসে ধরলে, অন্তত খড়ের ঘর একটা ওঠাতে হবে।

অনেক দিন পরে গ্রামে এসে লাগচে ভালোই। যাদের বাল্যকালে ছোট দেখে গিয়েচি, তাদের আর চেনা যায় না, যাদের যুবক দেখে গিয়েছিলাম, তারা হয়েচে বৃদ্ধ।

বড় আমবাগানের মধ্য দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছি, আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা ভারতচন্দ্র-বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নপূর্ণার মত। কোনো তফাৎ নেই, ডান হাতে নড়ি ঠুক ঠুক করতে করতে বোধ হয় বা বাজারের দিকেই চলেছে। বগলে একটা ছোট থলে।

বুড়ীকে দেখেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এ ধরনের বুড়ীকে দেখে আমার বড় মায়া হয়—নারী-রূপের এক অপূর্ব পরিণতি।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় যাবে?

—বাজারে বাবা—

বুড়ী আমায় ভাল না দেখতে পেয়ে কিংবা না চিনতে পেরে ডান হাত উঁচিয়ে তালু আড়-ভাবে চোখের ওপর ধরলে।

বল্লে—কে বাবা তুমি? চেনলাম না তো?

—চিনবে না। বাঁড়ুজ্যেপাড়ার নরেশ বাঁড়ুজ্যের ছেলে। আমি অনেকদিন গাঁয়ে আসিনি—

—তা হবে বাবা। আমি আগে তো এপাড়া-ওপাড়া যাতাম আসতাম না—তিনি থাকতি অভাব ছেলো না কোনো জিনিসের। গোলা-পোরা ধান, গোয়াল-পোরা গরু—

—তোমাকে তো চিনতে পারলাম না বুড়ী?

—আমার তো তেনার নাম করতি নেই বাবা। করাতের কাজ করতেন।

বলে সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে, অর্থাৎ আমি চিনতে পেরেচি কি না।

কিন্তু আমার পক্ষে চেনা সম্ভব নয়, আমার বাল্যকালে কে এ গ্রামে করাতের কাজ করতো তা আমার মনে থাকবার কথা নয়। বল্লাম—তোমার ছেলে আছে ?

—কেউ নেই বাবা, কেউ নেই। এক নাতজামাই আছে তো সে মোরে ভাত দেয় না। ওই আমার নাতনীকে রেখে মোর মেয়ে মারা যায়। আমার বড্ড কষ্ট, ভাত জোটে না সবদিন। বাজারে যাচ্ছি তিন পয়সার নুন কিনে আনবো—দুটো ক'টা চাল যোগাড় করিচি ও-বেলা।

বুড়ীকে পকেট থেকে কিছু পয়সা বার করে দিলাম।

ব্যাপারটা এখানেই চুকে যাবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তা চুকলো না—উপরন্তু এই বুড়ীকে কেন্দ্র করে আমার জীবনে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার শুরু হলো। নিজের জীবনে না ঘটলে বিশ্বাস করতাম না এমন ঘটনা।

পরের দিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেচি, এমন সময় কালকার সেই বুড়ী লাঠি ঠুক্ ঠুক্ করতে এসে হাজির উঠোনে। থাকি এক জ্ঞাতি খুড়োর বাড়ী। তিনি বল্লেন—ও হলো জমির করাতীর স্ত্রী—অনেকদিন মরে গিয়েচে জমির। তোমাদের খুব ছেলেবেলায়।

বুড়ী উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলে—ও বাবা—

সে বোধ হয় চোখে একটু কম দেখে। ও বয়েসে সেটা অবশ্য তেমন আশ্চর্যই বা কি।

বল্লাম—এই যে আমি এখানে।

—কাল পয়সা কটা পেয়ে ভাবলাম যাই দিনি বাওনপাড়ার দিকি। কে পয়সা দিলে চিনতেও পারলাম না। বিকেলবেলা চোখে ঠাওর পাইনে।

আমার খুড়োমশায় বুড়ীকে বুঝিয়ে দিলেন আমি কে। সে উঠানের কাঁঠালতলায় বসে আপন মনে খুব খানিকটা বকে উঠে গেল। তার যাবার সময় আরও দু-একটা পয়সা দিলাম।

পরদিন কলকাতা চলে গেলাম, ছুটি ফুরিয়ে গেল। আমার জ্ঞাতি খুড়োকে কিছু টাকা দিয়ে এলাম আসবার সময়ে, আমার জন্যে ছোটখাটো দেখে একটি খড়ের ঘর তুলে রাখবার জন্যে।

কয়েক মাস পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে গরমের ছুটিতে আমার সেই নতুন-তৈরী খড়ের ঘরখানাতে এসে উঠলাম। কলকাতাতে কর্মব্যস্ত এই ক'মাসের মধ্যে বুড়ীকে একবার মনেও পড়েনি বা এখানে এসেও মনে হঠাৎ হয়তো হতো না, যদি সে তার পরের দিনই সকালে আমার ঘরের নিচু দাওয়ায় এসে না বসে পড়তো।

বল্লাম—কি বুড়ী, ভাল আছো ?

ময়লা ছেঁড়া কাপড়ের প্রান্ত থেকে গোটাকতক আম খুলে আমার সামনে মাটিতে রেখে বল্লে—আমার কি মরণ আছে রে বাবা !

জিজ্ঞেস করলাম—ও আম কিসের ?

দন্তহীন মুখে একটু হাসবার চেষ্টা করে বল্লে—অ গোপাল আমার, তোর জন্যি নিয়ে

অ্যালাম। গাছের আম কভা বেশ মিষ্টি, খেয়ে দেখো এখন।

আমি ওর সম্বোধনের নতুনত্বে কৌতুক অনুভব করলাম, কিন্তু কি জানি কেন, বড় ভালো লাগলো। গ্রামে অনেকদিন থেকে আপনার জন কেউ নেই, একটা ঘনিষ্ঠ আদরের সম্বোধন করার লোকের দেখা পাইনি বাল্যকালে মা পিসিমা মারা যাওয়ার পর থেকে। প্রতিবেশিনীদের মধ্যে অত বেশি বয়সের স্ত্রীলোক কেউ নেই যে আমাকে 'গোপাল' বলে ডাকে।

বুড়ী বল্লে—খাও কোথায় হ্যাঁ বাবা ?

—খুড়োমশায়ের বাড়ী।

—বেশ যত্ন করে তো ওনারা ?

—তা করে।

—দুধ পাচ্চ ভালো ?

—ঘুঁটি গোয়ালিনী দেয়, মন্দ না।

—ও বাবা, ওর দুধ! আদ্ধেক জল—দুধ খেতি পাচ্চ না ভালো সে বুঝিচি।

পরদিন সকাল হয়েচে সবে, বুড়ী দেখি উঠোনে এসে ডাকচে—অ গোপাল—

বিছানা ছেড়ে উঠে বল্লাম—আরে এত সকালে কি মনে করে ? হাতে কি ?

বৃদ্ধা হাতের নড়ি আমার দাওয়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে বল্লে—এক ঘটি দুধ আনলাম তোর জন্যি।

—সে কি! দুধ এত পেলে কোথায় এত সকালে।

—আমায় মা বলে ডাকে ওই হাজরা ন্যাটার বৌ। তার কেউ নেই, মোর চালাঘরের পাশে ওর চালাঘর। ওরে কাল রাত্তিরে বলে রেখে দিয়েলাম, বলি বৌ, আমার গোপাল দুধ খেতি পায় না। সকালে চা না কি খায়, ওরে খুব ভোরে উঠে গাই দুয়ে দিতে হবে। তাই আজ কুঁকড়ো-ডাকা ভোরে উঠে দেখি আমাদের ডাকচে—মা ওঠো, তোমার গোপালের জন্যি দুধ নিয়ে যাও—

—আচ্ছা কেন বলো তো তোমার এসব! ছিঃ—না এসব ভালো না। এ রকম আর কখনো এনো না। কত পয়সা দাম দিতে হবে বলো। কতটা দুধ ?

আমার গলার স্বর একটু রুক্ষ হয়ে উঠেছিল হয়তো, কারণ মুসলমানের বাড়ীর দুধ আমাদের গ্রামে চলে না, কে কোন্ দিক থেকে দেখে ফেলবে এই ছিল আমার ভয়। কেন আবার এসব ঝঞ্ঝাট জোটে!

বুড়ী আমার কণ্ঠস্বরের অপ্রত্যাশিত রূঢ়তায় যেন একটু ঘাবড়ে গেল, ভয়ে ভয়ে বল্লে—কেন বাবা, পয়সা কেন ?

—পয়সা না তো তুমি দুধ পাবে কোথায় ?

—ওই যে বল্লাম বাবা, আমার মেয়ের বাড়ী থেকে—

—তা হোক, তুমি পয়সা নিয়ে যাও। সেও তো গরীব লোক—

বুড়ী পয়সা নিয়ে চলে গেল বটে কিন্তু সে যে বেশ দমে গিয়েচে তার কথাবার্তার ধরনে বেশ বুঝতে পারলাম।

মনে একটু কষ্ট হোল বুড়ী চলে গেলে, পয়সা দিতে যাওয়া ঠিক হয়েচে কি? বুড়ীর কি রকম হয়তো মন পড়ে গিয়েচে আমার ওপর, স্নেহের দান—এমন করা ঠিক হয়নি।

বুড়ী কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখলো না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতে সে এসে জুটবে।

—অ গোপাল, এই ছুটো কচি শশার জালি মোর গাছের—এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিনি মোর সামনে?

—বুড়ী তোমার চলে কিসে?

—নাতজামায়ের দেবার কথা, তা সে সবদিন দেয় না। ওই যারে মেয়ে বলি, ও বড্ড ভালো। লোকের ধান ভানে, তাই চাল পায়, আমারে ছুটো না দিয়ে খায় না।

—একা থাকো?

—তা একদিন মোর ঘরখানা না হয় দেখতি গেলে, অ মোর গোপাল! আমি নতুন খাজুর-পাতার চেটাই বুনে রেখে দিয়েলাম তোমারে বসতি দেবার জন্তি। বাউনের ছেলে, মোদের এঁটোকাঁটা মাছরে কি বসবে? তাই বলি একটা নতুন চেটাই বুনে রাখি, যখন আসবে এখানেতেই বসবে।

সেবার বুড়ীর বাড়ীতে আমার যাওয়া ঘটে উঠলো না ওর এত আগ্রহ সত্বেও। নানা-দিকে ব্যস্ত থাকি, তার ওপর আছে সমবয়সী বন্ধুবান্ধবদের দাবি। অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছি তো! যে ক'দিন গ্রামে থাকি, বুড়ী রোজ সকালে একবার আসতে ভুলবে না। কিছু-না-কিছু আনবেই—কখনও পাকা আম, কখনও পাতি নেবু, কখনও এক ছড়া কাঁচকলা কি এক ফালি কুমড়ো। দু-আনা চার-আনা প্রায়ই দিই। একদিন একখানা কাপড় দিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করে আসচি, বুড়ী কোনোদিন আমার কাছে কিছু মুখ ফুটে চায়নি। কখনও বলেনি, পয়সা দাও কি অমুক দাও। বরং তার উল্টো, শুধু হাতে কখনও আসে না।

একবার কলকাতা থেকে কয়েকটি বন্ধু গেলেন দেখা করতে।

তাদের নিয়ে ঘরে বসে চা খাচ্চি, স্টোভ ধরিয়ে ঘরেই চা নিজে করেচি, পল্লীগ্রামে এত সকালে কেউ উন্থন ধরায় নি, বুড়ী লাঠি ঠুক্-ঠুক্ করতে করতে এসে হাজির। বাইরে দাঁড়িয়ে ডাক দিল, অ মোর গোপাল!

হঠাৎ আমার লজ্জা করতে লাগলো। কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে, ও আজ না এলেই পারতো ছাই। ভাল বিপদ!

—অ মোর গোপাল! ঘরে আছিস নাকি?

ঈষৎ বিরক্তির সুরেই উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, কেন?

—এই এয়েলাম, বলি যাই গোপালকে দেখে আসি একবার।

বন্ধুদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলেন—ও কে হে?

চাপা দেবার চেষ্টায় বল্লাম—ও এমনি গাঁয়ের লোক।

আর একজন বল্লে—তোমার ডাকনাম কি গোপাল নাকি হে গ্রামে?

—হ্যাঁ—না—এই—

বুড়ী বল্লে—কাল রাত্তিরে কি গরম পড়ল। গোপাল, ঘুমুতে পেরিলি কাল? মুই চোখ বুজিনি সারারাত।

বেশ করনি! ভাল বিপদেই পড়া গেল যে সকালবেলা। আজ না এলে কি চলতো না বুড়ীর?

বন্ধুটি পুনরায় বল্লে—ও গোপাল বলচে কাকে হে?

--ইয়ে – হ্যাঁ, আমাকেই বলচে—

কথা শেষ করে ঈষৎ হেসে মাথার দিকে দুটি আঙুল দেখিয়ে ইঙ্গিত করে বল্লাম—মাথাটা একটু—

বন্ধুটি বল্লেন—ওঁ!

কথা অনুযায়ী কাজের সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে বুড়ীর দিকে চেয়ে যেমন সুরে লোকে দুর্দান্ত পাগলকে সান্ত্বনা দেবার ও স্তোকবাক্য প্রয়োগ করার চেষ্টা করে তেমনি সুরে বলি—আজ যাও, বড্ড ব্যস্ত আছি—বুঝলে? কলকাতার বন্ধুরা সব এসেছেন! হ্যাঁ—

ফল সুবিধেজনক হোল না। বুড়ী একগাল হেসে বল্লে—আজ কি এনিচি বলো দিকি গোপাল? এই ভাখো—

এতক্ষণ টের পাইনি যে বুড়ী তার পেছন দিকে একটা ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি লুকিয়ে রেখেছে। সেটা সামনের দিকে এনে খুলতে খুলতে বল্লে—সেই যে মেয়েটা মোরে মা বলে, সে দুটো চিঁড়ে কুটলো। আমি বল্লাম, ও কি কুটচিস্? ও বল্লে—কামিনী-সরু ধানের ভাল চিঁড়ে। তোমার গোপালের জন্যি দুটো নিয়ে যেও এখন, কাল বেন-বেলা। আমার মনডা বড্ড খুশি হলো—তা সেও আসচে। সেও তোমারে দেখতি চায়। বড্ড দুঃখী কাঙাল মেয়েডা। ধান ভেনে চিঁড়ে কুটে একরকম করে চালাচ্ছে।

একা রামে রক্ষা নেই, বুড়ীর কথা শেষ হোতে না হোতে দেখি একটি আধফর্সা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক অদূরে আমতলায়, এদিকেই আসচে। আরও বিপদে পড়লাম এই জন্যে যে, ঠিক সেই আমার জ্ঞাতি খুড়োমশায়কেও এদিকে আসতে দেখা গেল! সর্বনাশ! তাঁর বাড়ীতে আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা, আর তিনি যদি জানতে পারেন যে এদের হাতে তৈরী চিঁড়ে বা খাবার জিনিস আমি খাই—তাহলেই তো এ পাড়াগাঁয়ে হয়েচে! চিঁড়ে যে ওরা আজই প্রথম এনেচে একথা কি তিনি বিশ্বাস করবেন? আজ দুধ, কাল চিঁড়ে—

রুক্ষ সুরেই বল্লাম—এখন যাও না—দেখচো না ব্যস্ত আছি?

—চিঁড়ে ক'টা নেবার একটা কিছু ভাও বাবা।

—ওসব এখন নিয়ে যাও—হ্যাঁ, হ্যাঁ—পরে হবে। এখন যাও—

বুড়ী একটু অবাক হয়ে বল্লে—তা চিঁড়ে ক'টা—

খুড়োমশায় প্রায় এসে পড়েচেন দাওয়ার ধারে।

হাত নেড়ে নেড়ে ফেলবার ভঙ্গিতে বুড়ীর দিকে চেয়ে বলি—আঃ নিয়ে যাও না—ভাল জ্বালা!

খুড়োমশায় বল্লেন—কি ওতে? কি বলচে জমিরের স্ত্রী?

—কিছু না। ইয়ে বিক্রি করতে এসেচে—যাও এখন—

ভগবান জানেন, বুড়ী আমার কাছে চিঁড়ের বদলে পয়সা নিতে আসেনি!

খুড়োমশায় বল্লেন—তোমার এখানে ওর বড্ড যাতায়াত—

কথাটা চাপা দেবার জন্যে বল্লাম—আমার এই বন্ধুরা একদিন মাছ ধরবার কথা বলছিলেন, তা ভাদুড়ীদের পুকুরে কি সুবিধে হবে?

পুনরায় গ্রামে এলাম মাস পাঁচ-ছয় পরে আশ্বিন মাসের শেষে।

কয়েকদিন পরে ঘরে বসে আছি, বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে কে ক্ষীণ নারীকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে—বাবু ঘরে আছেন গা?

বাইরে এসে দেখি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে যাকে বুড়ীর সঙ্গে দেখেছিলাম সেই মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি। আমায় দেখে সলজ্জভাবে মাথার কাপড়টা আর একটু টেনে দেবার চেষ্টা করে সে বল্লে—বাবু কবে এসেচেন?

—দিন পাঁচ-ছয় হলো। কেন?

—আমিও তাই শোনলাম। বলি একবার যাই। আমার সেই মা পেটিয়ে দেলে, বল্লে দেখে এসো গিয়ে।

—কে?

—ওই সেই বুড়ী—এখানে যিনি আসতো। তেনার বড্ড অসুখ—এবার বোধ হয় বাঁচবে না। গোপাল কবে আসবে, গোপাল কবে আসবে—অস্থির, আমারে রোজ শুধোয়। আমি বলি, তিনি কলকাতায় চাকরি করেন, সব সময় কি আসতে পারেন? কি মায়া আপনার ওপর, আর-জন্মে বোধ হয় পেটে ধরেল। এ-জন্মে তাই এত টান—একবার দেখে আসুন গিয়ে। বড্ড খুশি হবে তাহলি—

উদাসীনভাবে বল্লাম—ও!

মন তখন অন্য চিন্তায় বিব্রত। এবার কাউন্সিল ইলেকশনে দুটি বন্ধুর পক্ষ থেকে ভোট সম্বন্ধে গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে লোককে অনুরোধ করবার গুরুভার নিয়ে এসেচি। কাল থেকেই বেরুতে হবে, ওদের মোটর আসবে। কি ভাবে কি করা যায়, সে কথাই চিন্তা করছিলাম। কোথায় কোন্ বুড়ী অসুখ হয়ে আছে, ওসব দেখবার সময়াভাব।

স্ত্রীলোকটি বল্লে—ওবেলা যাবেন বাবু?

—আচ্ছা—তা—এখন ঠিক বলতে পারচিনে—

স্ত্রীলোকটি অনুনয়ের সুরে বল্লে—একবার যাবেন বাবু ওবেলা। হয়তো বুড়ী বাঁচবে না—

বিকেলের দিকে বেড়াতে যাবার পথে দেখতে গেলাম বুড়ীকে। খুব উঁচু দাওয়া, সেকালের প্রণালীতে তৈরী পাঁচচালা ঘর। বুড়ীর স্বামীর আমলে আমার জন্মগ্রহণের পূর্বে এ ঘর তৈরী হয়েছিল, তখন এদের অবস্থা যে ভাল ছিল, এই প্রশস্ত পাঁচচালা ঘরখানাই তার নিদর্শন। কিন্তু ঘরখানার সংস্কার হয়নি অনেকদিন, খড় উড়ে পড়চে চালা থেকে, দড়ি বাখারি ঝুলচে, মাটির দাওয়া নানা স্থানে ভেঙে পড়চে, বাঁশের খুঁটি নড়্‌বড়্‌ করচে।

বুড়ী শুয়ে আছে একটা ছেঁড়া মাদুরের ওপর, মাথায় তেলচিটে মলিন বালিশ। বুড়ীর সেই পাতানো মেয়েটি পাশে বসে ছিল, আমায় দেখে বুড়ীকে বল্লে—অ মা, কে এয়েচে স্থাখো—অ মা—

আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই বুড়ী চোখ মেলে আমার দিকে চাইলে। পরে আমাকে চিনে ধড়্‌মড়্‌ করে বিছানা ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করতেই বল্লাম—উঠো না, উঠো না—ওকি?

বুড়ী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বল্লে—ভাল আছ অ মোর গোপাল? বসতে দে গোপালকে! বসতে দে গোপালকে—বসতে দে—

—বসবার দরকার নেই, ব্যস্ত হয়ো না। থাক্—

—ওখানা কেন দিচ্চিস্? গোপালেরে ওই খাজুরের চটখানা পেতে দে—

পরে ঠিক যেন আপনার মা কি পিসিমার মত অনুযোগের সুরে বলতে লাগলো—তোর জন্যি খাজুরের চটখানা কদ্দিন আগে বুনে রেখেলাম। ওখানা পুরোনো হয়ে ভেঙে যাচ্চে। তুমি একদিনও এলে না গোপাল—অসুখ হয়েচে তাও দেখতে আলো না—

আমি বল্লাম—আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাকো। ব্যস্ত হয়ো না।

ইতিমধ্যে পাড়ার অনেক লোক এসে জড়ো হলো, আমি এসেচি দেখে। কেউ কেউ বল্লে—বুড়ী কেবল আপনার কথা বলে বাবু। আপনাকে দেখবার বড্ড ইচ্ছে। বুড়ী বোধ হয় এবার বাঁচবে না।

বুড়ীর দুচোখ বেয়ে জল পড়চে গড়িয়ে। আমায় বল্লে—গোপাল, যদি মরি আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস—

পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলাম—সে কি?

—জানেন না বাবু? মাটি দেবার সময় নতুন কাপড় কিনে পরিয়ে দিতে হয়—

—ও বুঝেচি।

আমাকে পেয়ে বুড়ী খুশী হয়েচে। কত কি বলতে লাগলো—ওর নাতজামাই লোক কেমন খারাপ, এমন যে অসুখ একবার চক্ষু দিয়ে দেখেও যায় না। ঘর? তা দশ বছর খড় পড়েনি চালে। পচে গলে গিয়েচে পুরনো খড়। নাতজামাইকে বলেছিল, সে জবাব দিয়েচে, অত বড় হাতী ঘর আমি ছাইতে পারবো না। পাশে একটা ছোট কুঁড়েঘর-মত বেঁধে থাকো।

বুড়ী চোখের জল মুছে বলে—তা থাকত্তি পারি হ্যাঁ বাবা? কি নোকের পরিবার আমি। আজই না হয় কপাল পুড়েচে। তা বলে কুঁড়েঘরে থাকত্তি পারি মুই?

সান্ত্বনা দেবার সুরে বল্লাম—কথা ঠিকই তো।

—বলো তুমি গোপাল!

ঘাড় নেড়ে বলি—সত্যি তো।

আজও সে চালাঘর, সেই ম্লান সন্ধ্যা, ছেঁড়া মাদুরে শোওয়া বুড়ীকে আমার মনে পড়ে! ছেঁচতলার একটা শীর্ণ লাউগাছ, পেছনে কয়েক ঝাড় বাঁশ, এক-আধটা খেঁকি কুকুরের আওয়াজ পাড়ায়। শান্ত ছায়া নেমে এসেচে সামনের সারা উঠোনটাতে। কতকগুলো মেয়ে-পুরুষ দেখতে এসে দাওয়ার ছেঁচতলায় দাঁড়িয়ে আছে।

আসবার সময় বুড়ীর পাতানো মেয়েটির হাতে কিছু দিয়ে এলাম পথ্য ও ফলের জন্যে। হয়তো আর বেশিদিন বাঁচবে না, এই অসুখ থেকে উঠবে না। বুড়ী কিন্তু সেযাত্রা সেরে উঠলো। দিব্যি সেরে উঠলো। আমি কলকাতায় চলে যাবার আগে দু-একবার আমার কাছে লাঠি ধরে গেল। বসে বসে আপনার মনে কত কি বকে, তারপর চলে আসে।

বছর-দুই কাটলো। এই দু-বছরের মধ্যে যখনই গিয়েছি গ্রামে, বুড়ী এসে বসে, কিছু-না কিছু নিয়ে আসবেই। অসুখটা থেকে উঠে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সে দুর্বলতা ওর আর সারলো না।

আমি বলতাম—কেন আসো রোজ রোজ অতদূর থেকে?

—এই পাকা নোনাডা ভাবলাম গোপালেরে দিয়ে আসি—

—তা হোক, তুমি কষ্ট করে এসো না এ রকম।

—তুই তো আমারে দেখতি যাবি নে কোনদিন—

—সময় পেলেই যাবো। এখন বাড়ী যাও।

কখনও বুড়ী বলত—অ গোপাল, তুই বিয়ে করলি নে কেন?

—মেয়ে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, বয়েস হয়ে গিয়েচে।

—কিছু বয়েস হয়নি। কাঁচা ছেলে তোমরা। (আমার বয়েস তখন চল্লিশ।)

—বেশ।

—ওই মুখুজ্যেদের বাড়ী একটা বড় মেয়ে আছে, তোমার সঙ্গে মিল হবে। বলে দেখবানি ওদের।

—আমার ঘটকালি করবার লোকের যখন দরকার হবে, তখন তোমায় ডেকে পাঠাবো। এখন যাও।

কিন্তু বুড়ী আমার কথা শোনে না। একদিন মুখুজ্যেবাড়ীর নরু আমায় ডেকে বল্লে—ওহে, একটা কথা বলি। আজ জমির করাতীর বৌ-বুড়ী বাড়ীর মেয়েদের কাছে গিয়ে বলচে কি, গোপালের সঙ্গে তোমাদের পুঁটির বিয়ে দাও। মেয়েরা তো অবাক, গোপাল কে? শেষে জানা গেল—তুমি! ওরা তো শুনে আশ্চর্য। তা তুমি কিছু বুড়ীকে বলেছিলে নাকি এ সম্বন্ধে?

আমি নিজেকে নিতান্তই বিপন্ন ও অসহায় বোধ করলাম। বল্লাম—সে কি কথা!

কক্ষনো না। তুমি বিশ্বাস কর—

—না—না, বিশ্বাস অবিশ্যি করিনি। যাই হোক, যদি কিছু বলেও থাকো বুড়ীকে বারণ করে দেবে আর না বলে। গ্রাম ভাল নয়, ও নিয়ে মেয়েটার নামে একটা কথাকথি যদি হয়—

—নিশ্চয়। তুমি বিশ্বাস করো ভাই, আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি নে।

বুড়ী তার পরদিন যেমন সকালে এসেচে বকলুম ওকে। কে তাকে এসব কাণ্ড করতে বলেচে। ঘটকালি করতে ডেকেছিল কেউ তাকে ? গাঁয়ে এই নিয়ে শেষে একটা কথা উঠবে, পাড়াগাঁ জায়গা খারাপ। তুমি বাপু এখানে আর এসো না।

বুড়ী ফ্যাল্ ফ্যাল্ চোখ চেয়ে বল্লে—বকিস্ নে অ গোপাল, মোরে বকিস নে। তা তুই ও মেয়েডারে বিয়ে না করিস—অন্য কোনো মেয়ে বিয়ে কর। পুঁটিরে তোর পছন্দ হয়নি, না ?

ধম্‌কে উঠে বল্লাম—আবার ওইসব কথা !

নিতান্ত সরলা সেকেলে বুড়ী, কিছু বোঝেও না।

সত্যিই এই ঘটনা নিয়ে গ্রামে একটু কথাবার্তার সৃষ্টি হলো। বুড়ীর ওপর খুব চটে সকালবেলাটা আর ঘরেই থাকিনে, পাছে বুড়ী এসে জ্বালাতন করে। দশ-বারোদিন পরে একদিন দুপুরে ঘুমিয়ে উঠেচি, বাইরে বুড়ীর গলা শোনা গেল—অ মোর গোপাল !

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লাম—কি ? আবার এসেচ কেন এখানে ?

—একটা বাতাবী নেবু নিয়ে এয়েলাম তোমার জন্যি—

—দরকার নেই বাতাবী নেবুতে। যাও এখন –

বিরক্তি নিতান্ত অকারণ নয়। মাত্র চার-পাঁচদিন আগে মুখুজ্যেবাড়ীর ঘটনা নিয়ে আমার জ্ঞাতি খুড়ো আমায় দুকথা শুনিয়ে দিয়েচেন।

বছরখানেক আর গ্রামে যাইনি এর পরে। বোধ হয় দেড় বছরও হোতে পারে। একবার শেষ শরতে পুজোর ছুটির পর কাশী থেকে বেড়িয়ে ফিরে কলকাতায় এসে দেখি তখনও দিন-দুই হাতে আছে। গ্রামেই গেলাম এই দুদিন কাটাতে। গ্রামে ঢুকতেই প্রথমে দেখা পরশু সর্দারের বৌ দিগম্বরীর সঙ্গে। দিগম্বরী অবাক হয়ে বল্লে—ও মা, আজই তুমি এলে বাবাঠাকুর ? সে বুড়ী যে কাল রাতে মারা গিয়েচে। তোমার নাম করলে বড্ড। ওর সেই পাতানো মেয়ে আজ সকালে বলছেল—

আমি এসেচি শুনে বুড়ীর নাতজামাই দেখা করতে এল।—বাবু এসেচেন ? সাহায্য করুন, কাফনের কাপড় কিনতি। যা দাম কাপড়-চোপড়ের !

আমার মনে পড়লো বুড়ী বলেছিল সেই একদিন—আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস্ বাবা। ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারাণসী থেকে আমায় কি ভাবে আহ্বান করে এনেচে। আমার মন হয়তো ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি।

কাপড় কেনবার টাকা দিলাম। নাতজামাই বলে গেল—মাটি দেওয়ার সময় একবার যাবেন এখন বাবু। বেলা বারোটা আন্দাজ যাবেন—

শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাললতা দোলানো একটা প্রাচীন তিত্তিরাজ গাছের তলায় বুদ্ধাকে কবর দেওয়া হচ্ছে। আমি গিয়ে বসলাম। আবদুল শুকুর মিঞা, নসর আমাদের সঙ্গে পড়তো আবেদালি, তার ছেলে গনি—এরা সকলে গাছের ছায়ায় ব'সে। প্রবীণ শুকুর মিঞা আমায় দেখে বল্লে—এই যে বাবাঠাকুর, এসো। তামুক খাবা? বুড়ীর মাটি দেওয়ার দিন তুমি কনে থেকে এলে, তুমি তো জানতে না? তোমায় যে বড্ড ভালবাসতো বুড়ী। তোমার কাছে কাফনের কাপড় নিয়ে তবে ওর মহাপ্রাণীডা ঠাণ্ডা হলো। খাও তামুক—

একটি গরুর গাড়ীর পুরনো কাঠামোর ওপর বুদ্ধাকে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুইয়ে রেখেচে। দুজন জোয়ান ছেলে কবর খুঁড়চে। কবর দেওয়ার পরে সকলে এক এক কোদাল মাটি দিলে কবরের ওপর। শুকুর মিঞা বল্লে—দাও বাবাঠাকুর, তুমিও দাও—তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠাণ্ডা হবে—

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠতো—অ মোর গোপাল।

একটি ভ্রমণ-কাহিনী

আপিসে পানের আর জর্দার কৌটো দুই-ই ফেলে এসেছেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

বৌবাজারের মোড়ে এসে মনে পড়লো। ছাতিটা আজ আবার আনেননি, বৃষ্টি হবে না ধারণা ছিল, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ছাতি না এনে ভুল করেছেন, মেঘ জমে আছে সেণ্ট্রাল এভিনিউর বড় বড় বাড়ীগুলোর মাথায়। পানের কৌটো ফেলা চলে না, টেবিল থেকে কে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। আবার আপিসে ফিরলেন, ইনচার্জবাবু তখনও কাজ করছেন একমনে, অথচ কেউ নেই ডিপার্টমেণ্টে, খোশামুদে কোথাকার, মরুক খেটে! দেড়শো টাকা মাইনের মত কাজ দেখানো চাই তো সাহেবদের, নইলে যদি তাড়িয়ে দেয়? দিনকাল ভাল না। তাঁদের যে পঞ্চাশটি টাকা সেই পঞ্চাশটি টাকা। কেউ নেবে না, কেউ বাড়তি দেবেও না। এই যুদ্ধের বাজার। চালানো যে কত দায় হয়ে উঠেছে, সে বোঝে যে চালায়। পঞ্চাশটি টাকা মাইনে, একপয়সা উপরি নেই। ওভারটাইম খাটলে একটাকা দৈনিক পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ওভারটাইম ক'দিন হয় মাসে? আপিস থেকে রেশন দেয় তাই রক্ষে, নইলে না খেয়ে মরতে হতো সপরিবারে। খিদে পেয়েছে বড়। মোড়ের ওই দোকানখানায় এবার পানের কৌটো নিতে আসবার সময় দেখে এসেছেন বেশ বড় বড় কচুরী ভাজছে। নিশ্চয় চার পয়সায় একখানা। খেতে ইচ্ছে তো হয়, পয়সায় কুলোয় কই? একটা দোকানে বসে আধ পেয়ালা চা দু পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েই আপাতত খিদের শান্তি করলেন গোপীকৃষ্ণবাবু।

পাশের ওই লাল বাড়ীটা তখন মেস ছিল, পঞ্চাশের দুই ধন্বন্তরি বোসের মেস। গোপীকৃষ্ণবাবু মনে মনে হিসেব করলেন। তেত্রিশ বছর আগের কথা। বঙ্গবাসী কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়েন উনি তখন। সে-সব দিনের কথা—হায়রে হায়, সেই বিপিন, কানু, বিনোদবাবু, শীল, মতি, ক্যাঙলা, ট্যারা শম্ভু, সুশোভন মিত্তির, কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি, কত ভাবের আদান-প্রদান! কত বড় বড় আশা ছিল মনে, বোম্বেতে গিয়ে চাকরি করবো, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবো না, সাহেব হয়ে যাবো, এমন কি পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবো। পার্শী মেয়েকে বিয়ে করবার বড় শখ ছিল তখন, কে জানে কেন। প্রথম যৌবনের নেশায় ইডেন গার্ডেনে দু-চারটি সুন্দরী পার্শী তরুণীকে বেড়াতে দেখবার ফলেই বোধ হয়। আর একটা বড় শখ ছিল, বিলেতে যাবার। সেটা অবিশ্যি তখনই একটু দুরাশার মতই ছিল, তবুও নিতান্ত দুরাশা ছিল না। সম্মুখে বিস্তৃত জীবন আছে। কেন হবে না, হলেও তো হতে পারে। এখন কিন্তু তার আকাশকুসুমত্ব যতটা ফুটে বেরিয়েছে তখন ততটা হয়নি।

ট্যারা শম্ভু (শম্ভুনাথ চক্রবর্তী এম, বি—হোমিও, স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত, বিনামূল্যে সমাগত দরিদ্র রোগীগণের চিকিৎসা করেন) বৌবাজারের মোড়ে একটা ছোট্ট ঘরে ডিসপেন্সারী ফেঁদে বসে আছেন আজ বহু বৎসর—বিশেষ কিছু হয় বলে মনে হয় না।

গোপীকৃষ্ণবাবু মাঝে মাঝে আপিস ফেরত সেখানে বসে চা খান, চায়ের পয়সা বাঁচে। আজও গেলেন। শম্ভু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় রোগীর ভিড় নেই এই একটা সুবিধে। শম্ভু বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, গোপীবাবুকে দেখে কাগজ রেখে বললে—এসো, এসো, একটা খবর দেখেছ—জাপানীরা আবার ছ মাইল—

—আরে ভাই, ওসব রেখে দাও। নিজেরা মরছি নানান্ তালে, আবার পরের খবর রাখতে গেলে বাঁচি কেমন করে? চা খাওয়া ফিনিশ?

—না, বোসো, চা আনাই।

—কেন, স্টোভ কি হলো?

—পিন পাচ্ছি নে, স্টোভটার কি যে হয়েছে কাল থেকে—চা আনাই। ও মধু—। ডিসপেনসারীর চাকর মধু পাশের দোকান থেকে দু-পেয়ালা চা নিয়ে এল ঘরের কেট্‌লি নিয়ে। দু-পেয়ালা ভর্তি করে কেট্‌লিতে একটু বাড়তি চা রইল, সেটুকু আবার পরে ঢেলে দিলে। চা খেতে খেতে শম্ভু ডাক্তার ও গোপীকৃষ্ণবাবু বিদেশ-ভ্রমণের গল্প করেন—অর্থাৎ ভ্রমণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, করা উচিত বা করলে ভাল হয় সেকথা বলেন। এটা এঁরা দুজনে প্রায়ই করে থাকেন, দুই বন্ধুরই খুব বেড়ানোর শখ কিন্তু সংসার নিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন, টাকা পয়সায় কুলোয় না, কোথাও কখনও যাওয়া ঘটে না, বলেই সুখ। শম্ভু ডাক্তার পশ্চিমে গিয়েছে মগরা পর্যন্ত, তাও অনেক কাল আগে, সেখানে ছিল মাসীর বাড়ী। গোপীকৃষ্ণ তার চেয়ে একটু বেশি, বর্ধমান পর্যন্ত। দুই বন্ধুর পশ্চিম-ভ্রমণের এই পর্যন্ত ইতি।

তবে প্রতি বৎসর পূজোর আগে দুজনে বসে বিদেশ-ভ্রমণের প্ল্যান আঁটেন নানারকম—

এবার কোথাও যাওয়া যাক—বুঝলে? কত পয়সা তো কতদিকে খরচ হচ্ছে। টাকা চল্লিশ হলে একবার কাশীটা ঘুরে আসা হয়। তখন তর্ক বাধে দুজনে। কাশী না গয়া কিংবা সাঁওতাল পরগণা। অবশেষে সেদিন ব্যাপার মুলতুবী থাকে। পরদিন আবার শুরু হয় আলোচনা—কি বল, তা হলে ভাগলপুরই ঠিক করা যাক। পাহাড় কখনও দেখা হয়নি। ভাগলপুরে কি পাহাড় আছে? ঠিক সংবাদ দুজনের কেউ জানেন না। এমনিভাবে পুজো এসে পড়ে, এই একমাসে বহু নাম উচ্চারিত হয় ভ্রমণ সম্পর্কে—পেশোয়ার, কাশ্মীর থেকে শুরু করে দিল্লী, জয়পুর, বৃন্দাবন, শিলং, এমন কি বীরভূম জেলার নলহাটি পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত কোনও বার কোথাও যাওয়া ঘটে না, শম্ভু ডাক্তারের তিন মাসের দোকান ভাড়া বাকি পড়তে বাড়ীওয়ালা নালিশের ভয় দেখায়, গোপীকৃষ্ণবাবুর ছোট ছেলে টাইফয়েডে পড়ে—যায় সব ভেস্তে।

বহু বৎসর ধরেই এমন চলেছে। তবুও এঁরা ছাড়বার বা দমবার পাত্র নন। শ্রাবণ মাসের শেষ থেকে শুরু করে পুজোর সময় পর্যন্ত ভ্রমণের সম্বন্ধে আলোচনা এঁদের কামাই নেই। এতে তো পয়সা খরচ হয় না, অথচ টাইমটেবিল ঘেঁটে পাঁচটা দূরের নাম পড়ে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

আজও গোপীকৃষ্ণবাবু চা খেতে খেতে বললেন—আর মাসখানেক বাকি পুজোর। এবার কিন্তু কোথাও যাওয়া নিতান্ত দরকার। ঠিক করে ফেলা যাক্ আজই, বুঝলে? টাইম-টেবিল আছে তো? টাইমটেবিল তৈরী যারা কখনও কোথাও বেড়ায় না, তাদের টেবিলে সর্বদা টাইমটেবিল মজুদ থাকে। শম্ভু ডাক্তার থাপ থেকে চশমা খুলে টাইমটেবিলের পাতা ওলটান।

—আচ্ছা, চিত্রকূট জায়গাটা নাকি খুব ভাল? তুমি জানো কিছু?

এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখায়। গোপীকৃষ্ণবাবু বলেন—হ্যাঁ—তা বেশ ভাল জায়গা।

—ভাড়াটা দেখ হে—এবার ভাই আর অমত কোরো না। চলো চিত্রকূটই যাওয়া যাক্।

গোপীকৃষ্ণবাবু ন্যায্যপক্ষেই বলতে পারতেন, তাঁর মতামতের অভাবেই যে এতকাল ভ্রমণ বন্ধ আছে, একথা সত্যি নয়। কিন্তু তিনি কোনও প্রতিবাদ করেন না। চিত্রকূটের ভাড়া বেরুলো টাইমটেবিল খুঁজে। শম্ভু ডাক্তার বললেন—ওর ওপর ধরো আরও কুড়িটে টাকা—খাওয়া-দাওয়া—পান-সিগারেট—যুদ্ধের বাজার, বুঝলে না?

—সে তো বটেই।

—তা হলে এবার আর অমত কোরো না। এখন থেকে রেডি হওয়া যাক্, কি বলো? পুজো তো এলো।

দুই বন্ধুতে আরও ঘণ্টা দুই বসে ভ্রমণের নানা পরামর্শ করেন। বাড়ী থেকে খাবার তৈরি করে নেওয়া উচিত। সব জিনিস আক্রা। বেডিং কি কি সঙ্গে নেওয়া যায়? শম্ভু ডাক্তার মুখে মুখে বলতে লেগে গেলেন—ধরো একটা মশারি, বালিশ—

গোপীকৃষ্ণবাবু অধীরভাবে বললেন—আহা—আহা মুখে কেন, কাগজে লিখে ফেলো না? কাজ পাকা করা দরকার। মশারি, বালিশ—তারপর? গায়ে দেবার কম্বল—

—কম্বল।

—সুজনি।

একজন লোক ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললে—এটা কি ডাক্তারখানা?

শম্ভু ডাক্তার হাতের কলম ফেলে ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ—ডাক্তারখানা—ডাক্তারখানা—কি দরকার?

লোকটা বললে—হোমিওপ্যাথিক?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—হোমিওপ্যাথিক—ভাল হোমিওপ্যাথিক—কার অসুখ?

—অসুখ কারো না। এমনি জিজ্ঞেস করছি—

সে চলে গেল। শম্ভুবাবু আবার এসে টেবিলে বসে কলম ধরলেন, বিরক্তির সুরে বললেন—মিছিমিছি জ্বালায়! যেমন সব কাণ্ড—হ্যাঁ—তারপর বলো, সুজনি—

রাত দশটার সময় ব্যাপারটি অমীমাংসিত ও মুলতুবী রেখে দুই বন্ধু বাড়ী রওনা হন। কথা হয় আগামীকাল আবার বিকেলে একত্র হয়ে পুনরায় আজকার খেই ধরা হবে। চলবে পরামর্শ। বাড়ী ফিরে গোপীকৃষ্ণবাবু আহারাদি করে শয়ন করেন, কিন্তু উত্তেজনায় ঘুম আসে না। চিত্রকূট কতদূর না জানি! কত পাহাড় জঙ্গল দিয়ে যাওয়া! অনেক দূরের ট্রেন-জার্নি। কত মজা হবে রাস্তায়! ভাল কথা, এক টিন ভাল সিগারেট নিতে হবে সঙ্গে। কত পয়সা তো কত দিকে যাচ্ছে! জীবনের একটা সুখ। বড় বড় পাহাড় দেখা যাবে পথে। পাহাড়ই কখনও দেখা হয়নি। ছুটির আর কতদিন দেরি? গোপীকৃষ্ণবাবু ক্যালেণ্ডার দেখলেন উঠে। ছাব্বিশ দিন বাকী মোটে। টাকার যোগাড় দেখতে হয় এখন থেকেই।

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রীর পিত্রালয় কোলাঘাটের কাছে। তাঁর এক শ্যালক মিলিটারিতে কি চাকরি পেয়ে কানপুরে চলে গিয়েছিল, আজ দুদিন যাবৎ চিঠি এসেছে যে সে শ্যালকটি বাড়ী এসেছে। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে যাওয়া দরকার। গোপীবাবুর স্ত্রী স্বামীকে তাগাদা দিতে লাগলেন। কবে সেখানে যাওয়া হচ্ছে? এবার পুজোর সময়ে কোলাঘাট নিয়ে চল। কতদিন তো যাওয়া হয়নি। ভাইটার সঙ্গেও দেখা হবে। গোপীকৃষ্ণবাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—হ্যাঁ, যাচ্ছি এখন তোমার সেই অজ গণ্ডমূর্খ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে সেই ধপ্‌ধপি জায়গায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুর স্ত্রী ঝাঁঝালো সুরে বলে উঠলেন—হোক গণ্ডমূর্খ, তোমার চেয়ে আর তোমার সেই হোমাপ্যাথি জল-বেচা ডাক্তার বন্ধুর চেয়ে অনেক ভাল। সে তবুও আছে কানপুরে—দেড়শো টাকা রোজগার করছে। তুমি বি-এ পাশ করে ষাট টাকায় ঘষছো, আজ সেই আমার বিয়ে হয়ে পর্যন্ত। বেলুড়ের ওদিক কখনও মাড়ালে না দুজনে। তোমাদের চেয়ে সে অনেক ভাল।

মেয়েমানুষের সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। গোপীকৃষ্ণবাবু চুপ করে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন আবার আপিস থেকে ফেরবার পথে তিনি গেলেন শম্ভু ডাক্তারের ওখানে। চা-পানের পর আবার দুজনে নিবিড় পরামর্শ শুরু। কত টাকা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায়, তার একটা নিট হিসেব করে ফেলতে হবে। শম্ভু ডাক্তার বলেন—আশু সাণ্ডেল কাল এসেছিল তুমি যাওয়ার পরে। তার মুখে শুনলাম পথে নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশনে নেমে পরেশনাথ পাহাড়ে ওঠা যায়। চলো না কেন এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাক্।

—পরেশনাথ পাহাড় ?

—হ্যাঁ। হাইয়েস্ট হিল অন দি বেঙ্গল প্লেন। সেটা দেখা—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব ভাল। তাই যাওয়া যাবে।

—টাকাটার হিসেব ধরো এবার। যাতায়াতে ধরো—রেলভাড়া, খোরাকী—

—টুকিটাকি জিনিসপত্তর কেনা—

—কিনতে গেলে হাতী কেনা যায়—জিনিস কেনা বাদ দাও। শুধু নিট খরচ যেটা—

এইভাবে সেদিনও কেটে গেল। পরদিন আবার পরামর্শ সভা বসে। এদিন কথা ওঠে কি কি জিনিস সঙ্গে নেওয়া যাবে। মশারি নেওয়া যাবে কি না তর্কের সেদিন কোনও মীমাংসা হলো না। শম্ভু ডাক্তার বলেন—যেখানেই যাও মশা থাক না থাক মশারি সঙ্গে থাকাই ভাল। মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হয়, ফাইলেরিয়া হয়, আরও কত কি। মশারি নেওয়াটা এসেনশিয়াল। গোপীবাবুর মতে অতদূর পশ্চিমে পাহাড়ের দেশে মশা-ফশা নেই—এ কি আর বাংলাদেশের খানাডোবাভরা পাড়াগাঁ ? মিছিমিছি ভারবোঝা বাড়ানো। ট্রাভেল লাইট। একগাদা বোঁচকা-বুচকি ঘাড়ে করে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না।

রাত দশটা। দুই বন্ধু সভা ভঙ্গ করে সেদিনের মত যে যার বাড়ী চলে গেলেন।

আবার পরদিন দুজনে মিললেন। আজকার তর্কের বিষয় খাবার জিনিস কি-কি সঙ্গে নেওয়া যাবে। বাড়ীতে লুচি-পরোটা করে নেওয়াই ভাল। খাওয়ার জিনিসের আগুন দর। এক টাকার খাবার খেলে পেট ভরে না। কি কি খাবার নেওয়া যায় ? লুচি না পরোটা ? আলুর তরকারি নেওয়ার দরকার নেই, বড্ড দাম আলুর। কুমড়োর ছোকা আর কচুর ঘণ্ট দিব্যি তরকারি।

আরও কয়েক দিন এইভাবে কাটাবার পরে পূজো নিকটে এসে পড়লো। গোপীকৃষ্ণবাবুর মনে আনন্দ আর ধরে না। স্ত্রীকে বললেন—সব ঠিক যেন থাকে। ছোট মশারিটা সেলাই করে দাও। আর একটা ছোট ঘটী—

দিন সাতেক পরে পূজোর ছুটি হবে। গোপীকৃষ্ণবাবুর ডাক পড়লো একদিন বড়বাবুর ঘরে। বড়বাবু বললেন—একটা কথা বলি। পূজোর বোনাসের লিস্ট হয়েছে, তাতে কিন্তু আপনার নাম নেই।

—আজ্ঞে, কেন ?

—আর-বছর আপনারা ক'জন লিফট্ পেয়েছিলেন। এ বছর আবার তাদের বোনাস দিলে অন্য সবার ওপর অবিচার করা হয়। তাই ঠিক হয়েছে—

—স্যার, এ কেমন যুক্তি হলো ? কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তো আপনারা লিফট্ দিয়েছিলেন, এ বছর তবে এমন কি অপরাধ হলো আমাদের—

বাঙালীর আপিস। যা মনিবের রায়, সেই অনুসারে কাজ হবে। মনিব যা ভাল বোঝেন। যুক্তি-টুক্তি এখনে খাটবে না। হলোও তাই। অন্য সকলে দেড় মাসের মাইনে বোনাস পেয়ে গেল, গোপীকৃষ্ণবাবুর অদৃষ্টে জুটলো শুধু মাইনেটি। সেইদিনই গোপীবাবু অগ্রিম কিছু টাকার দরখাস্ত করলেন, মঞ্জুর হোল মাত্র পনেরোটি টাকা। তাও বজায় রাখা গেল না, দেশের বাড়ী থেকে চিঠি এসে হাজির, বৃদ্ধা পিসিমা লিখেছেন—চৌকিদারি ট্যাক্স বাকি পড়েছে অনেক দিনের, এবার না দিলে ঘরবাড়ী ক্রোক হবে। পত্রপাঠ আট টাকা তের আনা ছ' কোয়ার্টারের ট্যাক্স বাবদ যেন পাঠানো হয়। গোপীকৃষ্ণবাবু প্রথমে রাগ করেছিলেন, যায় যাকগে ক্রোক হয়ে। ভারি তো ভাঙা পৈতৃক বাড়ী, মশা আর জঙ্গলে ভর্তি। কেন, পিসিমা বাঁশ, আম, কাঁঠালের উপস্বত্ব ভোগ করছেন, চৌকিদারি ট্যাক্সটা তিনি দিতে পারেন না ? আমার ঘাড়ে কেন চাপিয়েছেন ? আমি কি সেখানে বাস করি ? পাঠাবো না টাকা।

পরে তাঁর স্ত্রী বোঝালেন, চোরের ওপর রাগ করে মাটিতে ভাত খেয়ে কি লাভ ? তাঁরই দুটি ছেলে, বেঁচে থাকলে ও-সম্পত্তি তাদেরই থাকবে। বুড়ী পিসিমা চোখ বুজবেন আজ বাদে কাল, বাড়ীঘর বজায় রাখবার গরজ তাঁর তত থাকবার কথাও নয়।

শম্ভু ডাক্তারের বৈঠকখানায় গোপীকৃষ্ণবাবু ঢুকলেন একটু মন-মরা ভাবে। দেখলেন শম্ভু ডাক্তারের মনের অবস্থাও তেমন সুবিধে নয়। চা এল, ভ্রমণ বিষয়ে কোনও কথাই ওঠে না, অন্যান্য কথাই চলে। গোপীবাবু সাহসে ভর করে বল্লেন—তারপর যাওয়া সম্বন্ধে কি ঠিক করলে ? শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—ভাই, এ মাসে যা কিছু পেয়েছিলাম, সব গেল ছেলেমেয়ের কাপড়-চোপড় কিনতে। আগে তো ভাবিনি অত টাকা কাপড়ে খরচ হবে, একখানা করে কাপড় কিনতে তেতাল্লিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। আর হাতে টাকা নেই। তবে পাঁচদিন এখনও বাকি, দেখি যদি এর মধ্যে কোনও শক্ত কেস্-টেস্ এসে যায় ভগবানের দয়ায়—

গোপীকৃষ্ণবাবুও নিজের টানাটানির কথা ব্যক্ত করেন। তবে এখনও পাঁচদিন বাকি ঐ যা ভরসা। যদিও এটা মনকে চোখ ঠারা মাত্র, পাঁচ দিনে গোপীকৃষ্ণবাবু কি আর ত্রিশ হাজার টাকা লটারিতে পাবেন, তা কিছু নয়।

শম্ভু ডাক্তার বল্লেন—আচ্ছা, চিত্রকূট যদি না-ও হয়—অতদূর—

—টাইমটেবিলে একটা জায়গা বলছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন থেকে ছ' মাইল। সিনারি বেশ বলে লিখছে—

—আজ আমার শালীও বলছিল, গ্র্যাণ্ডকর্ড লাইনের নিমিয়াঘাট বলে একটা স্টেশন থেকে পরেশনাথ পাহাড় যাওয়া যায়। তাই যাবে? খরচ কম হয়।

"আবার রাত দশটা পর্যন্ত আলোচনা। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম, না পরেশনাথ পাহাড়? কোন্‌টা সস্তা? হিসেব করে টাইমটেবিল পড়ে দেখা গেল তাতেও পঁচিশ থেকে ত্রিশ টাকা খরচ পড়বে জন পিছু। তার কমে হবে না।—ও একরকম করে যোগাড় হয়ে যাবে এখন, বললেন শম্ভুবাবু।

আশ্চর্যের বিষয়, রোগী এবং রোগ দু-ই হঠাৎ কলকাতা শহরে বড্ড কমে গেল। সারাদিনে আগে তবুও দুটো টাকাও হতো এখন পাঁচ আনার নক্সভমিকাও বিক্রি হয় না। রোগী দেখা দূরের কথা, ওষুধ বিক্রি পর্যন্ত বন্ধ। তার ওপর শম্ভু ডাক্তারের মামাতো ভাই বিধু এসে হাজির, সঙ্গে তার স্ত্রী। দেশে চলছে না আদৌ, এতবড় ডাক্তার পিসতুতো ভাই থাকতে তারা কি না খেয়ে মরবে?

গোপীকৃষ্ণবাবুর অবস্থাও যে ভাল তা নয়। ইতিমধ্যে একদিন তাঁর ভাইঝি-জামাই দুটো ইলিশ মাছ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে হাজির। গোপীবাবুর স্ত্রী এসে বললেন—ওগো শুনছো, জামাইয়ের ও-মাছের টাকা দিয়ে দিও যাবার সময়।

গোপীবাবু রেগে উঠে বললেন—কেন? আমি কি বলেছিলাম আমার বাসার মাছ কিনে না আনলে আমরা সবাই না খেয়ে মরতে বসেছি? পাঁচ টাকা খরচ করে একজোড়া মাছ না আনলে চলছিল না?

—ছিঃ ও-কথা বলতে নেই। জামাই মানুষ, এনে ফেলেছেন যখন তখন সে দাম দিতেই হবে। সবাই মিলে মাছটা তো খাওয়া হয়েছে? জামাই একা খান নি।

—খান নি তাই কি? আমার সংসারে এক পো খয়রা মাছ কিনলে চলে যায় ছ' আনা দিয়ে। পাঁচ টাকার মাছ কিনে একদিন খেয়ে আমার লাভটা কি হলো বলতে পার?

যতই উল্টো তর্ক করুন, তাঁকে শেষ পর্যন্ত সুবোধের মত মাছের দামটা জামাতা বাবাজির হাতে গুঁজে দিতে হলো যখন তিনি যাচ্ছেন। মিটে গেল ব্যাপার। আটটা টাকা বুক করে রাখা ছিল, তার মধ্যে ইলিশ মাছের ঠ্যালায় গেল পাঁচটা টাকা অকারণে বেরিয়ে।

শম্ভু ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে বসে দুই বন্ধু কথা বলছেন। এবার কিন্তু ভ্রমণের আলোচনা নয়, কোথাও যাওয়া তাঁদের হবে না দুজনেই বুঝেছেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের বস্তাপচা আটা ময়দার কথা উঠেছে। ভ্রমণের সম্বন্ধে একটা কথাও কেউ বলেননি আজ। কাল ষষ্ঠী।

হঠাৎ গোপীকৃষ্ণবাবু উস্‌খুস্ করতে করতে পকেট থেকে একখানা রঙীন কার্ড বের করে বললেন—হ্যাঁ—এই বলছিলাম কি, আমাদের আপিসের বঙ্কু সরকার কাল আপিসে বন্ধের দিন এখানা দিয়ে গেল। ওদের গ্রাম লাঙলপোতায় সর্বজনীন দুর্গোৎসব হবে তারই নেমন্তন্ন। রামায়ণ-গান হবে, চণ্ডী হবে দু'রাত। যাবে? বেশি দূর নয়, বারাসত

স্টেশনে নেমে দু মাইল। চলো, পুজোর ছুটিটা তবুও কলকাতার বাইরে—আর সে বেশ জায়গা, ছেলেছোকরাদের দল মিলে রাস্তা করেচে, ঘাট করেচে,' জঙ্গল কেটেচে। একটা পুরনো শিবমন্দির আছে নাকি অনেককালের। তাহলে কাল সকাল সাতটায় শেয়ালদ' থেকে দত্তপুকুর লোক্যাল ছাড়বে—ওতেই চলো যাওয়া যাক্। দেখবার মত জায়গা।

শম্ভু ডাক্তার উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন—বেশ, বেশ, সে বেশ বেড়ানো হবে এখন। চলো ভাই, আমি ঠিক সময়ে রেডি হয়ে স্টেশনে হাজির হবো কাল।

পরবর্তী তিনদিন দুই বন্ধুর পরম আনন্দে লাঙলপোতায় কাটে।

সত্যি বেশ জায়গা। অনেক কিছু দেখবার আছে। একটা পুরনো শিবমন্দির। চৌধুরীদের বড় মজা দীঘি। গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাদের নিজেদের তৈরী মেটে রাস্তা। শনিবারে-সোমবারে হাট বসে—বেগুন-কুমড়ো-ঝিঙে রাঙা আলু বিক্রি হয়। রামায়ণ-গান হলো নবমীর রাত্রে। • পরদিন হলো গ্রামের দলের কেষ্ট যাত্রা। খাওয়া-দাওয়া কদিন বেশ হোল। বন্ধু সরকার অতিথিবৎসল লোক।

খুব খুশি গোপীকৃষ্ণবাবু ও শম্ভু ডাক্তার।

নন্দমামা ও আমি

ছেলেমানুষ তখন আমি। আট বছর বয়স।

দিদিমা বলতেন, তোর বিয়ে দেব ওই অতুলের সঙ্গে।

মামার বাড়ীতে মানুষ, বাবা ছিলেন ঘর-জামাই—এসব কথা অবিশ্যি আরও বড় হলে বুঝেছিলাম।

অতুল আমার দিদিমার সইয়ের ছেলে, কোথায় পড়ে, বেশ লম্বামত আধফর্সা গোছের ছেলেটা। আমাদের রান্নাঘরে বসে দিদিমার সঙ্গে আড্ডা দিত। অতুলকে আমার পছন্দ হতো না, কেমনধারা যেন কথাবার্তা। আমায় বলতো—এই পাঁচী, যা—এখানে কি ? ঐ দিকে গিয়ে খেলা করগে যা—

কখনো বলতো—অমন দুষ্টুমি করবি তো বাঁশবনে লম্বা শেয়ালটা আছে তার মুখে ফেলে দিয়ে আসবো বলে দিচ্চি—

অতুলকে সবাই বলতো ভাল ছেলে। লেখা-পড়ায় বছর বছর ভালো হয়ে ক্লাসে উঠতো, আমার ছোট মামার সঙ্গে কি সব ইংরিজি-মিংরিজি বলতো—যদি তার কিছু বুঝি।

এইসব জন্যেই হয়তো অতুলকে আমার মোটেই ভালো লাগত না। তা সে যতই ভালো হোক, লোকে তাকে যতই ভালো বলুক।

ভালো আমার লাগতো মুখুয্যে-বাড়ীর নন্দকে। কি সুন্দর ফর্সা চেহারা, ননী-ননী গড়ন, ডাগর চোখ-দুটি, বেশ হাসি-হাসি মুখখানি। বয়সও অতুল মামার মত অত বেশি নয়,

আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় হবে। অতুল মামার বয়েস হয়তো ছিল ষোলো-সতেরো।

নমু হাসলে তার মুখ দিয়ে যেন মুক্তো ঝরতো—দিদিমার সেই গল্পের মত। এমন সুন্দর মুখ আমার আট বছরের জীবনে এ অজ পাড়াগাঁয়ে ক'টাই বা দেখেছি! দিদিমার কাছে এসে বসে মাঝে মাঝে সেও গল্প করতো, সে যা বলতো তা যেন মধুর, অতি মধুর। আমি হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে একমনে ওর কথাগুলো যেন গিলতাম। অতুলও তো কথা বলে, কিন্তু তার কথা এত ভালো লাগতো না তো?

দিদিমা বলতেন—অতুলের সঙ্গে পাঁচীর বিয়ে দেবো, বেশ মানাবে।

আমি মুখ ভারি করে বলতাম—ছাই মানাবে।

দিদিমা হেসে বলতেন—ওমা মেয়ের কাণ্ড ছাখো। কেন মানাবে না?

—তুমি তো সব জানো!

—তবে তোর মনটা কি শুনি? কাকে বিয়ে করবি তুই?

—ওই নমুকে।

দিদিমা হেসে গড়িয়ে পড়ে বলতেন—এর মধ্যেই মেয়ে নিজের বর বেছে নিয়েচে। ধন্যি যা হোক, একালের মেয়ে কি না! শুনলে সই, নমু নাকি ওর বর হবে।

অতুলের মা হেসে বলতেন—কেন রে, অতুলকে তোর পছন্দ হয় না কেন?

—অতুল মামার বয়েস বেশি।

—বেশি আর কত? ষোল বছর।

—তা যাই হোক, ষোল বছরের বুড়োকে আমি বুঝি বিয়ে করবো? নমু ছেলেমানুষ।

দিদিমা বলতেন—ছাখো সই একালের মেয়ের কাণ্ড। নমুর বয়স বারো, ওকেই বেশি পছন্দ। তোমার আমার কাল চলে গিয়েচে। তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো, উনি তখন বিয়াল্লিশ, দোজপক্ষে আমায় ঘরে আনলেন। তোমারও তো—

অতুলের মা বল্লেন—আমার অত না! উনি তখন উনত্রিশ, আমার এগারো।

—দোজপক্ষ তো বটে।

—শুধু তাই? সতীন বেঁচে।

—আমায় ভগবান সেদিক থেকে নিষ্কণ্টক করেছিলেন তাই খানিক রক্ষে।

মাঝে মাঝে নমুকে অনেকদিন দেখতাম না। আমাদের পাড়ায় সে আসতো না খেলতে। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো, ছুটে যেতাম মুখুয্যেবাড়ীতে।

নমুমামা উঠোনে বসে কঞ্চি কেটে খেলাঘরের বেড়া বাঁধছে। সঙ্গে আরও তিন-চারটি ছেলে, ওরই বয়সী।

আমি বলতাম—ও নমুমামা, আমাদের বাড়ী যাওনি যে?

—কি রোজ রোজ যাবো! তুই এতদূর এলি যে? আসতে ভয় করে না?

—না।

—খেলা করবি?

—হুঁ।

অন্য ছেলেগুলো তখুনি বলে উঠতো—মেয়েমানুষ আবার আমাদের সঙ্গে খেলবি কেন? যা তুই, পুঁটি মাস্তিদের সঙ্গে খেলগে যা।

নন্থ বলতো—খেলুক আমাদের সঙ্গে—তাতে কি।

হাবু বলতো—ও কি দা দিয়ে কঞ্চি কেটে আনতে পারবে? কি খেলা হবে ওকে নিয়ে? যা তুই—

আমাকে কাঁদো-কাঁদো দেখে নন্থ এসে হাত ধরতো। বলতো—কেন ওকে অমন কচ্ছিস তোরা? ও কেন কঞ্চি কাটতে যাবে? মেয়েমানুষ, চুপ করে বসে থাকবে। বোস তুই পাঁচী—

আমি অমনি কৃতার্থ হয়ে উঠোনের একপাশে বসে পড়তাম। নন্থমামা খেলতে খেলতে হয়তো একটা পেয়ারা ছুঁড়ে দিতো আমার দিকে। বসে বসে পেয়ারা চিবুতাম। অনেকক্ষণ পরে বলতাম—নন্থমামা, খিদে পেয়েচে—

হাবু অমনি বলে উঠতো—ঐ শোনো কথা। ও সব হাঙ্গাম—

নন্থমামা বলতো—তুই চুপ কর হাবু। খিদে পেয়েচে? চল্ পিসিমার কাছে, দুটো চাল্‌ভাজা খাবি তেলনুন দিয়ে, না হয় একটা কচি শসা পেড়ে দেবো—

আমি বলতাম—না, তুমি বাড়ী দিয়ে এসো। আমি বাড়ী গিয়ে ভাত খাবো। একলা যেতে ভয় করে।

হাবু অমনি চোখ পাকিয়ে বলে—তবে একলা এলি কি করে? কে এখন তোর সঙ্গে যাবে পৌঁছে দিতে? উঃ, ভারি পাজি মেয়ে—

নন্থ আমার আগে আগে বাড়ী পৌঁছে দিতে আসতো, ধুলোমাটির পথের ধারে কত কেঁচোর মাটি, কত বেনে-বৌ গাছে গাছে, পাকা বকুল পড়ে থাকতো বকুল তলায়। নন্থকে পাকা বকুল খাওয়াতে ইচ্ছে করতো, আমি বড্ড ভালোবাসি পাকা বকুল। নন্থমামাকে কুড়িয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে করে। কিন্তু সে বলতো—দূর, ও কষা কষা লাগে। তুই খা, আমি খাবো না। নন্থকে খেতে দিয়ে যেন আমার তৃপ্তি, সে সুযোগ ও আমায় দিত কই।

এইভাবে সারা শৈশব ও বাল্যকাল কেটে গেল সেই আমার ছেলেবেলাকার অতিপরিচিত মামার বাড়ীর গ্রামের গাছপালার ছায়ায় ছায়ায়, চৈত্র মাসের পাখী-ডাকা শীতল সকাল-বেলাকার মত। তারপরেই জীবনের রোদ খরতর হয়ে উঠলো ক্রমশ। ফুল-ফোটা পাখী-ডাকা বসন্তপ্রভাত গেল ধীরে ধীরে মিলিয়ে। বাতাস গরম হয়ে উঠলো।

সেই গাঁ, সেই তাঘরা-শেখহাটি এখনও আছে। মাঝে মাঝে এখনও সেখানে যাই, কত বদলে গিয়েছে সে জায়গা। সে মামার বাড়ী নেই, সে দিদিমাও নেই।

বাবা কোথায় কাঠের আড়তে কাজ করতেন। সামান্য ক'টি টাকা মাইনে পেতেন, দিদিমার সঙ্গে সংসারের খরচপত্র নিয়ে তাঁর প্রায়ই ঝগড়া-তর্ক হোত। বাবা রাগ করে চলে

যেতেন বাড়ী থেকে, দু-একমাস কোন খবর আসতো না, মা কান্নাকাটি করতেন, হঠাৎ বাবা একদিন এসে হাজির হোতেন। দিন এভাবেই চলতো।

তেরো বছর বয়সে আমার বিয়ে হলো আড়ংঘাটার কাছে এক গ্রামে। বিয়ের দিনকতক আগে নসুদের বাড়ী গিয়েছিলাম। নসুর মার শরীর খারাপ, নসু রান্নাঘরে ভাত রাঁধছে। উনুনের আঁচে ওর ফর্সা মুখ রাঙা হয়ে গিয়েচে। ওদের বাড়ীর কোন বিলিব্যবস্থা নেই। অনেকগুলো ভাই নসুর, তারা কেউ বাইরে পড়ে, কেউ কাজ করে। নসুর মার শরীর চিররুগ্ণ, সংসারের রান্নাবান্নার ভার নসুমামার উপর। আজ অনেকদিন থেকেই নসুর এই অবস্থা দেখছি।

নসুর অবস্থা দেখে সত্যিই কষ্ট হলো। নসুর মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই, ভাইয়েরা সব স্বার্থপর, সংসার চালানোর ভার ওর ওপর ফেলে দিয়ে সবাই তারা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে।

নসুমামা আমায় দেখে হেসে বল্লে—আয় পাঁচী, বোস। কাল দই পেতেছিলাম, দইটা বসেনি। উনুনের পাড়ে রেখে দেবো, কি বলিস?

যত সব মেয়েলি গল্প নসুর। সাধে কি ওকে সকলে বলে জনার্দন মুখুয্যের বিধবা মেয়ে?

আমায় বল্লে—কাল বুঝলি, এক কাঠা মুগের ডাল ভাজলাম, ভাঙলাম। বেলা গেল ডালডুল করতে। গা-হাত-পা ব্যথা।

বল্লাম—তুমি ডাল ভাজলে? সত্যি?

—হ্যাঁ রে। নইলে কে করবে? আবার কাল একগাদা ময়লা কাপড় সোডা-সাবান দিয়ে সেদ্ধ করতে হবে।

দুঃখিত সুরে বল্লাম—ওসব মেয়েলি কাজ। তুমি ওসব কর কেন? আমায় ডাকলে না কেন? আমি ডাল ভেজে দিতাম।

নসু বল্লে—আহা! আমি না-পারি কি? তোকে আবার ডাকতে যাব কেন?

—লেখাপড়া করবে না নসুমামা? এসব কাজ কি তোমায় সাজে? পুরুষমানুষ, লেখাপড়া কর।

—আমায় কে পড়াবে? দাদারা এক পয়সা দেবে না। তা ছাড়া মার শরীর খারাপ, আমি বাড়ী থেকে গেলে রান্নাবান্না কে করে বল্। পড়বার খরচ জুটলেও আমার পড়া হোত না।

আমি বসে বসে ওর কুটনো কুটে দিলাম। আমার বিয়ের কথা বল্লাম। নসুমামা বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলে না। ও যদি একটুও আগ্রহ প্রকাশ করতো, শুনতো কোথায় আমার বিয়ে হচ্চে ইত্যাদি, তাহলে আমার ভালো লাগতো। কিন্তু নাঃ, সে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই। নসুমামা একটা কথাও জিজ্ঞেস করলে না সে সম্বন্ধে।

আমার বিয়ের রাত্রে নসু নেমন্তন্ন খেয়ে এল পেট পুরে, কিন্তু না এল একবার বিয়ে দেখতে, না একবার বাসরঘরে উঁকি মেরে দেখলে। আমার মনটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা,

ও যদি আসতো তবে খুব ভালো লাগতো। মনের মধ্যে ডুব দেবার সময় আমার নয় তখন, তবুও কি যেন একটা হয়ে গেল, এত বাজনা, এত খাবার-দাবার, এত লোকজনের যাতায়াত, আমার নতুন কাপড় গয়না—কিছুই ভালো লাগলো না। মনে উৎসাহ নেই।

আগেই বলেচি আমার বিয়ে হয়েছিল আড়ংঘাটার কাছে শিকারপুরে। স্বামীর বয়সও সতেরো-আঠারোর বেশি নয়, রোগা চেহারা, মাথার চুল-ওঠা। বিয়ের পরে জানা গেল স্বামী ম্যালেরিয়ার পুরনো রোগী। মাসে দুবার ম্যালেরিয়া জ্বর বাঁধা আছেই। আড়ংঘাটার যুগলকিশোর ঠাকুরের মেলার সময় ময়রার দোকান খোলেন আমার খুড়শ্বশুর, স্বামী তাড়ু দিয়ে সন্দেশ-মুড়কী ভিয়েন করেন।

শ্বশুরবাড়ীতে যাবার সময় মনে খানিকটা কৌতূহল নিয়ে যে না গিয়েছিলাম এমন নয়। না জানি কেমন বাড়ী-ঘর, কেমন খাওয়া-দাওয়া। গিয়ে দেখি, পুরনো আমলের ইট-বের-করা কোঠাবাড়ী, দুটি মাত্র ঘর, ছোট একটা বারান্দা, তবে সব ঘরগুলির সামনে সান-বাঁধানো টানা রোয়াক এবং রান্নাঘরটিও কোঠা। খুব বড় একটা আম গাছ সমস্ত বাড়ীর উঠোন জুড়ে ঘুপসি করে রেখেচে।

আমার শাশুড়ী গর্বের সুরে বল্লেন—আমের সময় তো আসচে, দেখো বৌমা। এমন আম এ অঞ্চলে নেই আমার বাগানে যা আছে, ডাকসাইটে বাগান, কর্তা করে রেখে গিয়েছিলেন, এন্তেক গোয়াড়ি, এন্তেক শান্তিপুর, কোথা থেকে কলমের চারা এনে না পুঁতেচেন!

আমের সময় এল, কোথা থেকে ব্যাপারীরা এসে বাগান কিনে নিলে। দু-এক ঝুড়ি আম যা আমাদের বাড়ী এল, তা থেকে দুটো-একটা জুটল আমার ভাগ্যে। শাশুড়ী নিতান্ত বাজে কথা বলেন নি, আম ভালো।

স্বামীর সঙ্গে আলাপ জমলো মন্দ নয়। ক্রমে তাঁকে ভালোও লাগলো।

আমায় বল্লেন—তুমি কি খেতে ভালোবাসো?

আমি লজ্জা-টজ্জার ধার ধারিনে, বলে ফেল্লাম—তেলেভাজা খাবার।

স্বামী বল্লেন—দূর! অমন বোকা মেয়ে কেন? ভালো খাবারের নাম করো।

—গজা। জিলিপি।

- কেন খাজা?

—সে আবার কি গা? আমাদের গাঁয়ে শুনিনি তো।

উনি হো হো করে হেসে বল্লেন—পাড়াগেঁয়ে ভূত! আমাদের এ শহর বাজার জায়গা। কাল খাজা আনবো লুকিয়ে। কিন্তু সাবধান, মা যেন টের না পায়। বকবে। আমি নিজে খাজা ভিয়েন করি।

সেই থেকে মাঝে মাঝে স্বামী লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার আনেন। কোনোদিন খাজা, কোনোদিন মিহিদানা। আমরা দু'জনে লুকিয়ে খাই। স্বামী বলেন—সবাইকে দিতে গেলে চলে না। খুড়তুতো ভাইয়েরা হাঁসের পাল, সবার মুখে দিতে গেলে তোমার আমার মুখে এক টুকরো উঠবে কি না-উঠবে।

শ্বশুরবাড়ী ভালো লাগলো না বটে, তবে স্বামীকে কিছুটা ভালো লাগলো এই খাবার খাওয়া থেকে। উলোর জাতের মত বড় মেলা এ অঞ্চলে নেই, সে সময় ময়রার দোকানে কাজ বেশি। উনি ফেরেন অনেক রাতে। হাতে বড় বড় ঠোঙায় খাবার ভর্তি। উনি হেসে বলতেন—খাও, খাও, খুব খাও—এসো দুজনে পেট ভরে খাই।

একদিন কি করে খুড়শ্বশুর টের পেলেন লুকিয়ে খাবার আনার ব্যাপারটা। এ নিয়ে খুব ঝগড়া হলো বাড়ীতে। আমাকে আর ওঁকে যথেষ্ট অপমান গালি-গালাজ সহ্য করতে হলো।

খুড়শাশুড়ী বল্লেন—অমন নোলায় সাত ঝাঁটা মারি। লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খেয়ে দোকানটা শেষ করে দিলে গা! এমন অলক্ষ্মী বৌ তো কখনও দেখিওনি, শুনিওনি। লজ্জাও করে না গুরুজনকে লুকিয়ে লুকিয়ে খেতে।

স্বামীকে রাত্রে বল্লাম—আর ওসব এনো না। ভাখো তো কি কাণ্ড রাধালে!

স্বামী বল্লেন—না, আনবে না! আমায় কি মাইনে দেয় কাকা? বিনি মাইনের চাকর করে তো রেখেচে। পেটে দুটো খাবো না? ঠিক আনবো লুকিয়ে, তুমি দেখো। কেমন করে ধরবে কাকা তা দেখবো।

স্বামীর শরীর ভালো নয় অথচ ঘোর পেটুক। আমার কথা শুনতেন না। খাবার চুরি বন্ধ হলো না। রোজ রাত্রে একগাদা বাসি লুচি আর রসগোল্লার রস আনেন। নিজে খান, আমাকেও যথেষ্ট দেন। ওঁর পেটের অসুখ চাড়ে না। আমার বারণ শোনেন না মোটে।

বলেন—খেয়ে যা উঠিয়ে নিতে পারি। কাকা একপয়সা উপুড়-হাত করবে না।

আমি বল্লাম—আমি বাপের বাড়ী যাবো আষাঢ় মাসে, আমায় নতুন কাপড় কিনে দেবে না?

উনি ঠোঁট উল্টে বল্লেন—কে দেবে? কাকা? তা দেখে আর বাঁচলাম না!

—তুত্তি আমার নতুন কাপড় হবে না? বাপের বাড়ীতে কিন্তু সবাই নিন্দে করবে।

—যদি আমি দিতে পারতাম, সব হোত। আমার কি ইচ্ছে করে না তোমায় কাপড় দিতে? কোথায় পাবো?

—তাই তো। অনেকের নিন্দে শুনতে হবে তাই ভাবচি।

আষাঢ় মাসে বাপের বাড়ী এলাম। স্বামীও আমার সঙ্গে এলেন। তাঁকে দেখে গ্রামের সমবয়সী মেয়েরা নানা রকম নিন্দাবাদ করতে লাগলো।

আমায় একদিন রায়বাড়ীর মেজগিন্নী বল্লেন—হ্যাঁ পাঁচী, জামাই নাকি তাড়ু ঘোঁটে ময়রার দোকানে?

আমি অতশত বুঝি নে, বল্লাম—হ্যাঁ। খুব ভালো খাজা তৈরি করে। সবাই হাতের সুখ্যাতি করে মাসীমা।

মেজগিন্নী হেসেই খুন! তাঁর বড় পুত্রবধূ যে বাপের বাড়ী থেকে আসতে চায় না, বাপের বাড়ীর গ্রামে কোন প্রতিবেশী ছেলের সঙ্গে প্রণয়াসক্ত, এসব কথা তিনি তখন ভুলে গেলেন।

আমার স্বামীর খাবারের দোকানে কাজটাই প্রবল দোষের ও নিন্দের কারণ হয়ে উঠল তাঁর কাছে। আমার স্বামীকে গ্রামের লোকে নতুন জামাই বলে খাতির আদর করলে না। আমার তাতে মনে বড় দুঃখ হলো। নতুন জামাইকে সকলে নেমন্তন্ন করে খাওয়ায়, আমার স্বামীকে সবাই যেন কেমন হেনস্থা করলে।

নন্থমামা ঠিক তেমনি ভাত রাঁধচে। আমি তার ওখানে গিয়ে গল্প করে একটু যা আনন্দ পেতাম। একটা জিনিস দেখলাম, নন্থ ধর্মে কর্মে মন দিয়েচে এই বয়সেই। চন্দন ঘষচে দেখে বল্লাম—দিদিমা পুজো করেন বুঝি আজকাল? নন্থ হেসে বল্লে—মা নয়। পুজো করবো আমি। রোজ শিব গড়িয়ে পুজো করি। মানুষ হয়ে জন্মে শুধু খেয়ে যাব শুওরের মত!

আমার হাসি পেলো ওর মুখে তত্ত্বকথা শুনে। নন্থমামা আমাকে শসা কেটে খেতে দিল, নিজেই নারিকেলের নাড়ু করেচে ঘরে, তা দিলে, চা খেতে দিলে।

বছর দুই-তিন কাটলো। আমার স্বামীর শরীর সারলো না। ক্রমেই যেন আরও খারাপ হয়ে উঠচে। শাশুড়ী ও খুড়শাশুড়ী বলেন—ওই অলুক্ষণে বৌ এসে বাছার শরীর একদিনও ভালো গেল না।

শাশুড়ী বল্লেন—সংসারের কোনো জিনিসে আঁট নেই তা দেখেছ লক্ষ্য করে?

কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়, এ আমিও স্বীকার করচি। সত্যিই যেন আমার কোনো জিনিসে কোনো আসক্তি নেই। ভালো কাপড় নয়, গহনা নয়—কোনো কিছুতে না। আমার স্বামী বলেন—পয়সা জমাও না কেন? যা মাঝে মাঝে হাতে এনে দিই, জমিও। তোমার আখেরে ভালো হবে।

ওসব কথা আমি শুনেও শুনিনি কোনো দিন। কার আখেরে কি হবে সে ভেবে ফল কি।

আমার একটি ছেলে হলো, কয়েক মাস পরে মারাও গেল। স্বামীর অসুখ সারে না। সংসারে খেটেই মরি, মুখের মিষ্টি কথা কেউ বলে না। স্বামী আমার নানারকম সাংসারিক উপদেশ দেন। তাঁর যে রকম শরীর, কবে মরে যাবেন, তখন কি উপায় হবে? আমি যেন কিছু কিছু হাতে রাখি। এ কথা আমি যখন শুনি তখনই মনে থাকে, তারপর আর মনে থাকে না।

সেই মাঘ মাসে আমি বাপের বাড়ী এলাম। গ্রামে এসে শুনি নন্থমামার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে, সে দিন-রাত পূজো-আচ্চা নিয়ে থাকে, কারো সঙ্গে কথা বলে না, কি রকম যেন। আমি গিয়ে দেখা করলাম বিকেলের দিকে। নন্থমামা বল্লে—কি খবর পাঁচী, কখন এলি?

—কাল এসেছি। ভালো আছ?

—ভাল আছি। খুব আনন্দে আছি।

—সবাই তোমাকে পাগল বলচে যে?

নন্দমামা মৃদু হেসে চুপ করে রইল। তারপর আমার দিকে শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আমি আসল বস্তু পাওয়ার চেষ্টায় আছি। এতে যে যা বলে বলুক। আমি পাগলই হই আর ছাগলই হই—হি-হি—হি-হি—হ্যাঁরে পাঁচী?

শেষের কথাগুলো আমার কানে একটু অসংলগ্ন-মত ঠেকলেও নন্দমামার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। কি যেন একটা ওর মধ্যে আমি পেলাম, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখিনি। ওর মুখের চেহারা যেন অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। লোকে টাকাকড়ি ঘর-জমি আঁকড়ে পড়ে আছে দেখচি আমার চারিপাশে, খুড়শাশুড়ীকে দেখেছি গাছের সামান্য একটা আম যদি গাছের তলা থেকে কোনো-বাড়ীর ছেলে কুড়িয়ে নিয়ে যায় তবে ঝগড়া করে পাড়া মাত করেন। গাঁয়ের মধ্যে দেখেচি এক হাত জমি হয়তো এগিয়ে বেড়া দিয়েছে কেউ, তাই নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা দু-তিন বছর ধরে চলেচে। এমন আবহাওয়ার মধ্যে নন্দমামা মানুষ হয়েও স্বতন্ত্র, ওর কাপড়ে-চোপড়ে, খাওয়ায়, বিষয়-আশয়ে কোনো আসক্তি নেই; পৈতৃক বিষয় আছে, কিন্তু ভায়েদের দিয়ে বসে আছে সর্বস্ব, একটা পয়সাও চায় না।

আমার স্বামী এসে দু-চারদিন রইলেন। স্বামীর ওপর আমার কেমন একটা মায়া হয়। এর মুখের দিকে কেউ যেন চায় না আমার শাশুড়ী ছাড়া—তাও তিনি বুড়ো হয়েছেন, দেওরের কাছে কোনো কথা তাঁর খাটে না।

আমাদের গ্রামেও তাঁর তেমন খাতিরযত্ন নেই।

বল্লেন—এই গাঁয়ে একটা ঘর করলে ভালো হয়।

আমি বল্লাম—কেন, শ্বশুরবাড়ী বাস করবে? কেউ কিছু বলবে না?

—বলুক গে। কাকার ওখানে আর ভালো লাগে না।

—দেখ ভেবে।

—তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো যেন কেমন কেমন। ভালো করে কথাই বলে না।

আমার রাগ হলো, বল্লাম—তাড়ুঘোঁটা জামাইকে কে খাতির করবে শুনি?

স্বামী হেসে চোখ টিপে বল্লেন—ইঃ! রোজ রোজ রাত্তিরে খাজা খাওয়ার সময় তো খুব ভালো লাগে?

দু-একদিন পরে উনি চলে গেলেন। যাবার সময় আমার হাতে তেরো আনা পয়সা দিয়ে বলে গেলেন—এই পয়সা দিয়ে খাবার কিনে খেও। মাসখানেক থাকো, তারপর এসে নিয়ে যাবো।

আর আসেন নি তিনি। সেই মাসের শেষের দিকে পুরনো আমাশা রোগে তিনি আমার সিঁথির সিঁদুর আর হাতের শাঁখা ঘুচিয়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন। বাবা চিঠি পেয়ে আমাদের প্রথমে কিছু বলেননি, তারপর দু'দিন পরে মাকে একদিন বল্লেন—হ্যাঁ একটা কথা, জামাইয়ের বড় অসুখ, চিঠি পেয়েচি।

মা আড়ষ্ট সুরে বলে উঠলেন—সে কি গো! এতক্ষণ বল নি কেন? হাটে চিঠি পেলে? কই দেখি চিঠি।

বাবা আমতা আমতা করে বল্লেন—তা—ইয়ে—মনে ছিল না। তা নয়—ইয়ে—

আমি কান-খাড়া করে পাশের ঘরে বসে সব শুনচি। আমার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করচে। মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে যেন। জিব শুকিয়ে আসচে। আমি বুঝতে পেরেচি সব। বাবা অত্যন্ত ব্যস্তবাগীশ লোক, জামাইয়ের অসুখ-সংবাদে চুপ করে বসে থাকবার মানুষ নন। মা ছুটে হাঁপিয়ে বাবার কাছে এসে বল্লেন—তার কাছে এখুনি চলে যাও। মেয়ের যাবার কথা লেখেনি? ওকেও নিয়ে যাও—

বাবা শুকমুখে বল্লেন—আর সেখানে গিয়ে কি হবে গিন্নী। সব শেষ হয়ে গিয়েচে!

মা মেঝের ওপর আছড়ে পড়লেন আর্ত চীৎকার করে। আমি কিন্তু বেশ সহজ ভাবেই কথাটা শুনলাম কারণ আমি আগেই বুঝতে পেরেচি বাবা কি বলবেন।

এইভাবে আমার বিবাহিত জীবনের ইতি হয়ে গেল। কি করবো, আমার অদৃষ্ট। বাবা তো বুড়োহাবড়া স্বামীর হাতে আমায় দেননি, ছোকরা দেখে দিয়েছিলেন, আমার কপালের লেখা, কারো দোষ নেই। আমার কিন্তু বিশেষ কোন দুঃখ নেই মনে। বিশেষ কিছু যে হারিয়েচি, বিশেষ কোন অভাববোধ নেই। লোকে বলচে আমার নাকি সর্বনাশ হয়ে গেল। কি সর্বনাশ হলো কিছু বুঝতে পারচি নে। মাছ খেতে পাবো না, না-ই বা পেলাম; একাদশী করতে হবে, করবো। ভালো খাওয়া বা পরার দিকে আমার কখনো কোন ঝোঁক নেই। তবে মানুষটার ওপর মায়া জন্মেছিল বটে। তাকে আর দেখতে পাবো না, এইটুকু যা কষ্ট।

বিধবা হওয়ার পরে আমি অনেকবার শ্বশুরবাড়ী গেলাম।

শাশুড়ীর সেবা করি, মুখরা জায়ের সংসারে পুত্রহীনা বৃদ্ধার বড় কষ্ট, যত দূর পারি সেটুকু ঘোচাবার চেষ্টা করি। একাদশীর দিন শাশুড়ী-বৌয়ে নিরম্বু উপোস করি, সন্ধ্যের সময় তাঁর পায়ে তেল মালিশ করি।

খুড়শাশুড়ী সর্বদা শোনান, আমি অলুক্ষুণে বৌ, আমায় ঘরে এনেই তাঁর সোনার চাঁদ ছেলে, দুধের বাছা মারা গেল।

ভাসুরপোর ওপর এমন স্নেহ ভাসুরপোর জীবদ্দশায় কোনোদিন দেখেচি বলে মনে করতে পারলাম না। আশ্চর্য!

একবার বাপের বাড়ী এসে শুনলাম নসুমামা বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েচে। ছ' মাস পরে খবর এল হালিসহরের এক কালীমন্দিরে সে আছে, গঙ্গার তীরে দুখানা ভাঙা মন্দির, সেখানে সে পূজো-আচ্চা নিয়েই নাকি আছে।

খবরটা দিলে ও-পাড়ার বুধো গয়লার মা, ঘোষপাড়ার দোল দেখে দেশে ফেরবার পথে সে হালিসহরে গিয়েছিল, সেইখানেই দেখা হয়েচে। আমি মনে মনে ভাবলাম ওর পক্ষে ভালোই হয়েচে। কি জানি কেন আমার মনে হয় নসুমামা যা করে তাই ভালো।

এই ভাবে দিনের পর দিন কাটে। বৃদ্ধা শাশুড়ীকে কত যত্নে আগলে নিয়ে বেড়াই,

বাপের বাড়ী গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারিনে, পাছে বুড়ীর কষ্ট হয়। একদিন শাশুড়ী বল্লেন—চল মা, সান্যাল মশায়ের বাড়ী ভাগবত শুনে আসি—

—সে কে মা ?

—পাড়ার বুড়ো সান্যাল দাদা, ছাখোনি বুড়োকে ?

সান্যাল মশায়ের বাড়ী গেলাম। ওঁর অবস্থা বেশ ভালো বলে মনে হলো বাড়ীঘর দেখে, শুনলাম দুই ছেলে কলকাতায় চাকরি করে, তাদের স্ত্রী-পুত্র তাদেরই সঙ্গে কলকাতার বাসায় থাকে। সান্যাল মশায় বিপত্নীক। বয়স ছিয়াত্তর বছর, নিজেই বল্লেন। একটি বিধবা বোন বাড়ীতে থাকে ও রান্নাবান্না করে। আমাদের দেখে খুব যত্ন করলেন, আমাদের সামনে ভাগবত ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

সেই থেকে সান্যাল মশায়ের বাড়ীতে রোজ যাই। আমায় তিনি বড় ভালোবাসেন, যোগবাশিষ্ঠ ও ভাগবত তাঁর প্রিয় বই। যদি দু'দিন না যাই, সান্যাল মশায় আমার শ্বশুরবাড়ী আসবেন। আমার শাশুড়ী তাঁর বৌমা। ডেকে বলেন - ও বৌমা ?

বৃদ্ধা শাশুড়ী মাথায় কাপড় তুলে দিয়ে বলেন—কি দাদা ?

—নির্মলা (আমার ভালো নাম) কোথায় ? ডেকে দাও।

আমি বের হয়ে এসে বলি—কি দাদু ?

—দাদু কি রে, তোমার জ্যাঠামশাই হই। তোমার শ্বশুরের চেয়ে এগার বছরের বড় আমি। আমার ওখানে ক'দিন যাওনি কেন ? আজ অবিশ্যি যাবে।

আবার নিয়মিত ভাবে যাই। সান্যাল মশায় আজকাল আর কোন শ্রোতা চান না, আমার মধ্যে কি যে দেখেচেন—আমাকে পেয়ে খুব খুশি। যোগবাশিষ্ঠ পাঠ জমে না আমি না গেলে।

একদিন তাঁকে বল্লাম—জ্যাঠাবাবু আমি তো মুখ্যু মেয়েমানুষ, আমার মধ্যে কি পেলেন আপনি ?

—কি পেলাম কি জানি। কিন্তু তুমি গেলে মা আমার গীতা আর যোগবাশিষ্ঠ জ্যান্ত হয়ে ওঠে। ওদের শ্লোকের মধ্যে থেকে নতুন ভাষ্য বেরিয়ে আসে। আনন্দ যদি শাস্ত্র-আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটার বোল আনাই পাই তুমি আসলে মা।

আমি হেসে বল্লাম—তাহলে বলুন জ্যাঠামশাই, আমার মত শ্রোতা আপনি অনেকদিন পাননি ?

—সত্য মা, এতদিন জানতাম না যে লোককে শুনিয়ে এত আনন্দ হয়। নিজেই চর্চা করতাম, এই পর্যন্ত। আজ কিন্তু অন্যরকম বুঝচি। উপযুক্ত শ্রোতা পেলে —

আমারও ভালো লাগে বলেই যাই। কেমন যেন মন বদলে যাচ্চে, যে মন আমার কোন কালেই সংসারে ছিল না—তা আরও নিরাসক্ত হয়ে পড়েচে। বন্ধনের মধ্যে কেবল বৃদ্ধা শাশুড়ী। বৃদ্ধা কাঁদেন, আমি বসে যোগবাশিষ্ঠের উপদেশ শোনাই। কিন্তু তাতে তাঁর

মন ভেজে না। ঘোর বিষয়ী মন। এ বয়সেও কাঁটালের ভাগ নিয়ে, সজনে ডাঁটার ভাগ নিয়ে খুড়শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া। আমি বলি—মা, কি হবে আপনার এঁচড় আর সজনেডাঁটার চুলচেরা ভাগে। ওর কি সার্থকতা ? ভগবানের নাম করুন।

বাতাবী লেবু-ফুল ফুটলো ফাগুন মাসে—পথে পথে অপূর্ব সুগন্ধ ছড়িয়ে। ঘেঁটুফুলে বাঁশ-বনের তলা ভর্তি হয়ে গেল। কোকিলের ডাকে মন উদাস হয়ে ওঠে, কত কথা ভাবি। বাল্যকালের কথা, মা-বাবার কথা, স্বামীর কথা—জীবনে কিছু না পেয়েই যেন সব-কিছু পেয়েচি। যদি কোনো হিসাবী বিষয়ী লোক বলে, কি পেয়েচ, হিসেব দেখাও—হয়তো কিছু দেখাতে পারবো না—কারণ বাইরে আমার অর্ধমলিন সরুপাড় ধুতি আর দুগাছি অতি সরু বিবর্ণ সোনার চুড়ির মধ্যে কেউ কোনো লাভের সন্ধানই খুঁজে পাবে না, আমার মন বলে কি-এক জিনিসের ঠিকানা মিলেচে, যার দরুন অফুরন্ত আনন্দের ভাণ্ডার আজ আমার কাছে খোলা। অন্য সব কিছু যেন তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে।

একদিন আমার শাশুড়ী বল্লেন—ও বৌমা, তোমাদের গাঁয়ের একটি ছেলে আমাদের গ্রামে হরি কলুর বাড়ীতে এসে চাকরি করচে। বামুনের ছেলে, দিব্যি চেহারা। কিন্তু বাপু, কলুবাড়ী জল তোলে, গরুর জাব কাটে, এ আবার কেমন কথা! বড্ড গরীব বোধ হয়। আমি দেখিনি, কে কাল বলছিল ঘাটে। বল্লে, বৌমার দেশের লোক।

যেদিন শুনলাম, সেইদিনই পথে নসুমামার সঙ্গে দেখা। কিন্তু প্রথমটা চিনতে পারিনি। নসুমামার মাথায় বড় বড় চুল, পরনে শাড়ী, আধ-ঘোমটা দেওয়া, হাতে কাঁচের চুড়ি, মেয়েলি বেশ, অথচ মুখে ঈষৎ গোঁফ-দাড়ি। আমার হাসি পেল ওর এই অপরূপ বেশ দেখে। আমায় দেখে মেয়েলি সুরে বল্লে—ও পাঁচী, ভাল আছিস তো ভাই?

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—তোমার এ কি বেশ নসুমামা?

নসুমামা অদ্ভুত হাসি হেসে বল্লে—এই, থাকলেই হলো একরকম।

—তুমি নাকি কলুবাড়ী বাসন মাজো, জল তোলো?

—দোষ কি?

—তুমি যা ভালো বোঝো।

বৃদ্ধা শাশুড়ী সেই শ্রাবণ মাসে দেহ রাখলেন। দিন-দশেক জ্বরে ভুগে গভীর রাত্রে মৃত্যুর কিছু পূর্বে অশ্রুভরা চোখে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে কার কাছে রেখে যাচ্চি মা?

বৃদ্ধার আকুল সুরে মনে ব্যথা বাজল আমার। তাঁর জরজীর্ণ হাত-দুটি ধরে বল্লাম—কেন, আমার সোনার চুড়ি আছে, এক বিঘে আমন ধানের জমি আছে—ভাবনা কি মা আমার? কিছু ভেবো না আমার জন্যে।

বিষয়ী লোককে বিষয়ের ভাষায় সান্ত্বনা দিই। আমি জানি যাঁর কাছে আমি আছি, তিনি আমায় কোনোদিন ফেলবেন না, চরণে স্থান দেবেনই।

নসুমামার সঙ্গে দেখা আবার একদিন। সে একগাদা কাপড় সেদ্ধ নিয়ে ঘাটে যাচ্চে

কাচতে। আমি বল্লাম—ও-সব কাজ আমায় দাও নসুমামা। আমি তোমায় করতে দেবো না।

জোর করে সেগুলো তার কাছ থেকে নিয়ে নিজে কেচে দিলাম। আমার চোখের সামনে ও-সব খাটুনি খাটতে দেবো না ওকে। বল্লাম—হরি কলুর বাড়ী গোয়াল-পরিকার আমি করে দেবো।

—না পাচী, লক্ষীটি, লোকে কি বলবে?

—আমি গ্রাহ্য করিনে।

—আমি করি।

—মিথ্যে কথা, তুমি কিছু গ্রাহ্য কর না, কলুবাড়ী বাসন মাজচো অথচ—

—পাচী, এ সব তুই বুঝবিনে। ওসব করিসনে কক্ষনো।

ওর কথা সান্ন্যাল জ্যাঠাকে বলতে তিনি বড় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওকে দেখবার জন্যে। হরি কলুর বাড়ীর পেছনে একটা পুকুর, পুকুরের চারিধারে আম কাঁঠালের বাগান। তারই একটা গাছতলায় দেখা গেল ও চোখ বুজে বসে। সেই থেকে সান্ন্যাল মশায়ের সঙ্গে ওর ভাব হয়ে গেল। যোগবাশিষ্ঠের দলে ভিড়ে পড়লো।

সান্ন্যাল জ্যাঠা বলেন—ছেলেটি শুদ্ধসত্ত্ব।

শীতের প্রথমে কলুপাড়ায় কলেরা দেখা দিলে। একদিনে আঠারটার কলেরা হলো, পাঁচটা মরে গেল। নসুমামা কি ভীষণ পরিশ্রম করে সেবা শুরু করলে। হরি কলুর ছোট ভাই ওর সেবাতেই নাকি বেঁচে উঠলো। রাত্রে ঘুমোয় না। নিজে হাতে রোগীদের গা ও বিছানা পরিষ্কার করে।

কলেরায় কলুপাড়া উজোড় হয়ে গেল—ধরলে কিছু দূরে মুচিপাড়াকে। ভয়ে তখন মুচিপাড়ার অনেক লোক পালিয়েছে। বুড়ো হিরু মুচি একদিনের অসুখে মারা গেল। কিন্তু তখন এমন ভয় হয়ে গিয়েচে সকলের, মড়া ঘরের মধ্যে পড়ে রইল সারাদিন, কেউ ফেলতে চায় না। সন্ধ্যের পর নসুমামা একা গিয়ে ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে ফেলে দিয়ে এল খালের ধারে শ্মশানে।

যোগবাশিষ্ঠের আসরে একথা শুনে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমিও যাবো নসুমামাকে সাহায্য করবো। লোকে যে যা বলে বলুক গে।

জ্যাঠামশায় হেসে বল্লেন—মা, এ কাজ তোমার নসুমামার। তোমার জন্যে নয়। সব কাজে অধিকারী-ভেদ আছে।

—কেন? আমার অধিকার জন্মায়নি?

—তোমার বুড়ো শাশুড়ী মরে গিয়েচে, জগতে আরও কি বুড়ো হাবড়া নেই?

—আপনি বলুন নসুমামাকে। ও আমাকে নিতে চায় না কোন কাজে। আমি যাবো জ্যাঠামশায়।

এই অবস্থায় হঠাৎ একদিন নসুমামা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। কলুপাড়ার সবাই হায় হায়

করতে লাগলো। খুড়শাশুড়ী বল্লেন—ভালোই হলো চলে গেল, সুবুদ্ধি হয়েচে। বামুনের মুখ অমন করে হাসাতে হয়? ছিঃ ছিঃ—

তারপর মুখ টিপে হেসে বল্লেন—বৌমার বাপের বাড়ীর লোক। খুব কষ্ট হয়েচে বৌমা তোমার—না? যখন-তখন দেখা হোত তো। অন্ধ গাঁ থাকতে এ গাঁয়ে এসেছিল সেজন্যেই হয়তো, তবুও তো দেশের ঘরের লোক আছে একটা।

ছিলে-খোলা ধনুকের মত সটাং সোজা হয়ে বলে উঠি—নিশ্চয়ই। আমার কষ্ট তো হবারই কথা।

হরি কলু একদিন সাণ্ডাল জ্যাঠার কাছে বল্লে—অমন মানুষ হয় না। ছোট ভাইটা বেঁচে উঠলো, পায়ে ধরতে গেলাম, বলি তুমি ব্রাহ্মণ, আমার ঘরে হেনস্থা কাজ আর করতে দেবো না। দু'মাসের মাইনে বাকি, একটা পয়সাও নিয়ে গেলেন না যাবার সময়। হঠাৎ পালিয়ে গেলেন। আমায় যেন ঘ্যামা করেন তিনি।

হাত জুড়ে সে উদ্দেশে প্রণাম করলে।

আবার ফাল্গুনে বনে বনে ফুল ফুটেচে, আবার কোকিলের ডাক পথে পথে। মুচুকুন্দ চাঁপার সুগন্ধে ঘাটের রানা ভুরভুর করে। আমি একদিকে যেন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। জ্যাঠামশায়ের বৈঠকখানায় যোগবাশিষ্ঠ শুনতে যাই রোজ বিকেলে। সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে রিক্ত হয়েই বোধ হয় সেখানে পৌঁছুতে হয়।

দৈবাৎ

গিরীন ঘোষের আড়ত বন্ধ হয় রাত নটায়। সারাদিন খাতা লেখা। ভাল লাগে এ কাজ? কখন খাইয়া-দাইয়া বাড়ী হইতে সে বাহির হইয়াছে। ছোট ছেলেটির অসুখ, বিনয় ডাক্তারকে ডাকার কথা, গিয়াছিল কি না কে জানে। দু টাকা ভিজিট খরচ। তাছাড়া হয়তো ঔষধ আনিতে বলিবে ডাক্তারখানা হইতে। ঔষধের দামও পড়িবে টাকা-দুই।

কালী চৌধুরী বিরক্তির সঙ্গে আড়ত বন্ধ করিল, দরজায় চাবি লাগাইয়া দিল। একজন খরিদ্দার বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছিল দাওয়ায়। তাহাকে ডাকিয়া বলিল—ওগো কর্তা, আজ তোমার দর ঠিক হবে না। আজ যাও, রাত হয়েছে। কাল সকালে এসে ঘোষ মশায়ের সঙ্গে কথা ব'লো।

ভাঙা সাইকেলটির চাবি খুলিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া চড়িয়া বসিল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না-রাত, একটু একটু হাওয়া বহিতেছে মাঝে মাঝে। তাহার গ্রাম সাতবেড়ে, তিন মাইল পথ। বড় রাস্তা হইতে নামিয়া ঘেঁসোহাটির মাঠের মধ্যে এক মাইল কাঁচা রাস্তা। বর্ষাকালে সাইকেল অচল, এখন কার্তিক মাসের শেষ, তাই ধুলা ঠেলিয়াও কোনরকমে চালানো চলে। আট টাকা মাহিনায় পোষায় এত? মাইল-টাক গিয়া মুচিপাড়া পার হইয়া বড় অশথগাছটা

ছাড়াইয়া কালী চৌধুরী সাইকেল হইতে নামিয়া পড়িল।

রাস্তার ওপর ওটা কি পড়িয়া আছে? নেকড়া-জড়ানো একটা বাণ্ডিলমত? কাছে গিয়া দেখিল নেকড়া-জড়ানো একটা বাণ্ডিলই বটে। ছোঁয়া ঠিক হইবে এই রাত্রিবেলা? শেষকালে বাড়ী ফিরিয়া স্নান করিয়া মরিতে হইবে নাকি?

সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত দ্রব্যটি সে হাতে তুলিয়া লইল। নেকড়ার গেরো খুলিয়া কৌতূহলের সঙ্গে দেখিতে গেল—কাগজপত্র বলিয়া মনে হয়। দলিলপত্রের বাণ্ডিল কেহ ফেলিয়া গিয়াছে?

খুলিয়া দেখিয়া কিন্তু তাহার সর্বশরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল। হাত কাঁপিতে লাগিল। এই ঠাণ্ডা রাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সর্বনাশ! এক শ টাকার নোট—এক, দুই, তিন, চার...

কালী চৌধুরী সভয়ে রাস্তার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল। পল্লীগ্রামের পথ, এত রাত্রে সম্পূর্ণ নির্জন। হাটবার হইলেও বা দু-একজন মানুষ দেখা যাইত। কেহ কোনও দিকে নাই আজ।

দশ...বিশ...ত্রিশ...চল্লিশ...পঞ্চাশ...পঞ্চাশখানা এক শ টাকার নোট। পঞ্চাশকে গুণ কর এক শ দিয়া। শক্তি করতে শক্তি...না দূর কর—

উত্তেজনায় মাথায় কালী চৌধুরী সহজ গুণ ভুলিয়া গেল—একবার হইল পাঁচ শ, একবার পঞ্চাশ হাজার। না, পাঁচ হাজারই বটে। বাণ্ডিলটা পুরানো নেকড়ায় জড়ানো। নোট ছাড়া এক টুকরাও অন্য কোন কাগজ নাই সঙ্গে। কাহারও নাম, কি কোনও চিঠি কি ঠিকানা—কিছু নাই। পাঁচ হাজার টাকা!

সে কুড়াইয়া পাইল এই অজ পল্লীগ্রামের পথে! কি সর্বনাশ! যে কালী চৌধুরী সামান্য আট টাকা মাহিনায় গিরীন ঘোষের আড়তে চাকুরি করে, এই যুদ্ধের বাজারে যাহার দুবেলা পেট পুরিয়া ভাত জোটে না, একখানা তুলো-জমানো কম্বল সাড়ে তিন টাকায় মেলে হারাধন বক্সির কাপড়ের দোকানে কিন্তু পয়সার অভাবে কিনিয়া গায়ে দিতে পারে না—চারটি ছেলেমেয়ে, বৌ, এক বৃদ্ধা পিসি, দুইটি গরু, তিনটি ছাগল, এক জোড়া পাতিহাঁস যাহার বাড়ীতে—সেই আধময়লা কুষ্টিয়ার চাদর গায়ে দেওয়া কালী চৌধুরীর হাতে পড়িল পঞ্চাশখানা এক শ টাকার নোট—একটা আধুলি যাহার সঞ্চয় নাই, লক্ষ্মীর কাঠার মাথায় সিঁদুর মাখানো রুপোর টাকাটি ছাড়া।

বাণ্ডিলটা সে সন্তর্পণে কোঁচার কাপড়ে বাঁধিল। কেহ দেখে নাই তো? আর একবার সভয়ে চারিদিকে দেখিল।

না, রাস্তা সম্পূর্ণ জনহীন।

বাড়ী পর্যন্ত কোনরকমে সাইকেল চালাইয়া চলিয়া আসিল কালী। পা-হাত ঠিকমত নিজের বশে নাই। মাথার মধ্যে কেমন করিতেছে। মাথা গোলমাল হইয়া গিয়াছে। কালী চৌধুরী কিছু ভাবে নাই। পাঁচ হাজার টাকা তাহার কাপড়ের কোঁচায়, এই পর্যন্ত। এর

বেশি আর সে কিছু ভাবিতে পারিতেছে না। মাথার তার কিছুই নাই এর বেশি বর্তমানে।

কালীর স্ত্রীর নাম ননীবালা। বাপের বাড়ী পাশের গ্রামে, মনেকুপুর। খাঁটি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়েমানুষ, আগে যা হক চেহারা গড়ন-পিটন ভাল ছিল, এখন অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া তাও গিয়াছে।

কালীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—হুঁশ-পবো হবে কবে? যাবার সময় পই-পই করে না বললাম সরষের তেলের বোতলটা নিয়ে যাও—তা বোতলটা ফেলে গিয়েছ কি বলে? রান্না হয় নি তেলের অভাবে। এত রাত গেল—

কালী চৌধুরী অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—তেল নেই?

ননী রাগিয়া বলিল—থাকবে কোত্থেকে? পাঁচ ছটাক তেলে আজ দুবেলা চালাচ্ছি তিনটি দিন। তেল আনবার কথা তোমাকে বলে দিইনি? আজকাল কি গাঁজা ধরেছ নাকি? এ রকম করে সংসার করা আমার দ্বারা পোষাবে না বাপু। হ্যাঁগা, তোমার বগলে ওটা কি?

কালী চৌধুরী চমকিয়া উঠিয়া বলিল—ও কাগজ।

—আড়তের?

—হ্যাঁ। এগুলো আমার ওই কাঠের হাতবাক্সটাতে রেখে এস তো।

পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিলটা সেই চাবিভাঙা বাজে হাতবাক্সটার মধ্যে দিন-পনের পড়িয়া রহিল, ননীবালা কোন সন্দেহ করিল না, করিবার কথাও নয়। কালী চৌধুরীও যেন টাকার বাণ্ডিলের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল। তাহার সংসারে যেমন অভাব-অনটন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল। ও টাকায় হাত পড়িল না।

এই পনের দিনের মধ্যে কালী চৌধুরী অনেক কিছু ভাবিয়াছে। পরের টাকা ফেলিয়া গিয়াছে, যার টাকা সে যদি আসিয়া চায়, তবে এখনই বাহির করিয়া দিতে হইবে। নতুবা থানা পুলিশের হাঙ্গামা হইবে। খরচ করিয়া ফেলিলে, সে গরিব লোক, টাকা দিবে কোথা হইতে। দারোগা আসিয়া টানাটানি করিবে, হয়তো ঘরবাড়ী ক্রোক দেবে। না, ও টাকায় হাত দেওয়া হইবে না। ননীবালাকেও কোন কথা বলে নাই কালী চৌধুরী। মেয়েমানুষের মন, অতশত বুঝিবে না, টাকা খরচ করিবার তাগাদা দিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে।

এই সময় আসিয়া পড়িল বিপদ। বড় খোকা অসুখে পড়িয়া বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গেল। বাজারের বিনয় ডাক্তারের ডাক্তারখানায় পাঁচ ছ টাকা ওষুধের দাম বাকি পড়াতে সেখান হইতে ওষুধ আনা বন্ধ হইল। ননীবালার কানের একটা অল্প সোনার অলংকার বিক্রি করিয়া যাহা কিছু পাওয়া গেল, ডাক্তারের ভিজিটের দাম শোধ দিয়া সামান্যই অবশিষ্ট রহিল তার। অথচ ছেলের জ্বর বন্ধ হয় না।

এ অবস্থায় ননীবালা একদিন কাঁদিয়া পড়িল স্বামীর কাছে। ছেলেকে যে করিয়া হক বাঁচাইতে হইবে, জমিজমা সামান্য যাহা কিছু আছে বিক্রি করিয়া ডাক্তার দেখানো হউক।

কালী বলিল—আছে তো মোটে দু বিঘে ধানের জমি।

—ওগো ধানের জমি যায় যাক গো, ভিক্ষে করে খাব। তুমি খোকাকে বাঁচাও।

তাহাই হইল শেষ পর্যন্ত। খোকাও বাঁচিল না, ধানের জমিও গেল।

ননীবালা পুত্রশোকে ভাঙিয়া পড়িল। অনাহারশীর্ণ শরীরে ঢুকিল জোর ম্যালেরিয়া, চিকিৎসাপত্র চলে না, পথ্য জুটানোও দুষ্কর। কালী চৌধুরী একদিন সাতপাঁচ ভাবিতে ভাবিতে নোটের বাণ্ডিল খুলিয়া ফেলিল। এক দুই তিন করিয়া গুনিল, পাঁচ হাজার টাকা ঠিক আছে। এ তহবিল হইতে আপাতত কিছু ধার লইলে কেমন হয়? কিন্তু শোধ হইবে কেমন করিয়া? দশ বিশ টাকা লইলে মাহিনার টাকা হইতে শোধ দিবার কোন উপায় নাই।

পুলিশ যখন আসিয়া বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিয়া টাকা চাহিবে, তখন?

সেদিন ননীবালা অনেক রাত্রে স্বামীকে ডাকিয়া বলিল—হ্যাগা, খোকা কদ্দিন গিয়েছে?

কালী চৌধুরী স্ত্রীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—কেন, সে কথা কেন এখন? ও কথা বলে না।

—বল না গো?

—তা দু মাস।

—তাকে কোথায় দিয়েছিলে?

—ঐ নদীর ধারে জামতলার শ্মশানে। তুমি ঘুমোও।

—না, শোন। তার ছিটের জামাটা গায়ে ছিল?

—সে কথা কেন এখন?

—বল না?

—ছিল।

—আমি জানি। শোন বলি।

—কি?

—খোকা এই জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ছিটের জামাটা গায়ে দিয়ে। সন্ধ্যেবেলা—

—ও সব কিছু না। তুমি ঘুমোও।

—আমি দেখলাম যে—

—ও কিছু না।

—খোকা আমায় ডাকছে। সে কি একটা বলছে আমি বুঝতে পারছি নে।

—আঃ, ঘুমোও না চুপটি করে। ও সব চোখের ভুল।

ননীবালা আর কোন কথা বলিল না। কালী চৌধুরী ঠিক করিল, কাল সকালে নোটের বাণ্ডিল হইতে দশটা টাকা বাহির করিয়া খরচ করিবে। নোট পাইয়াছে আজ চার মাস। কেহ খোঁজ করে নাই এ পর্যন্ত। বোধ হয় কেহ খোঁজ করিবেও না।

পরদিন সকালে উঠিয়া কালী চৌধুরী বিমল ডাক্তারের ডাক্তারখানায় যাইবে, স্নান করিয়া

আসিয়া নোটের বাণ্ডিল খুলিবে এমন সময় সাইকেলে চড়িয়া একজন অপরিচিত লোক উঠানে আসিয়া সাইকেল হইতে নামিল।

কালী দাওয়া হইতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে চান ?

লোকটা বলিল—এই কি কালীনাথ চৌধুরীর বাড়ী ?

—হ্যাঁ, কেন ?

আগন্তুক আসিয়া দাওয়ার উপর উঠিল। নীচু স্বরে বলিল—আপনি টাকা পেয়েছিলেন কুড়িয়ে ? সে আমার টাকা।

কালী চৌধুরীর বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ করিয়া উঠিল। সে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার টাকা ?

—হ্যাঁ, সে আমার টাকা। আপনি বনগাঁয়ের মতি পালের আড়তে বলেছিলেন, টাকা কুড়িয়ে পেয়েছেন, যার টাকা সে এসে যেন নিয়ে যায়।

—হ্যাঁ, তা বলে এসেছিলাম। কিন্তু আপনার টাকা কি করে জানব ? কি ভাবে টাকা হারালেন আপনি ?

—পাট বেচে যাবার সময় গেঁজে থেকে পড়ে গিয়েছিল।

—বেশ। কত টাকা ?

লোকটি ভাবিয়া বলিল—তিন হাজার।

কালী চৌধুরী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আজ্ঞে না।

—আচ্ছা, বলছি। দু' হাজার—

—আজ্ঞে না—ও আপনার টাকা নয়। কিসে বাঁধা ছিল ?

—ইয়ে—গেঁজেতে, না—রুমালে—

—আজ্ঞে না।

লোকটি উগ্রমূর্তি ধারণ করিল। কড়াস্বরে বলিল—তাহলে দেবেন না টাকা আপনি ?

—না।

—বেশ, আমি থানায় গিয়ে বলি।

—যান। যার ন্যায্য টাকা আমি তাকে দেব বলে বসে আছি। নয় তো গল্প করে বেড়াতাম না টাকার কথা। আপনার টাকা ও নয়।

লোকটি চলিয়া গেল বটে, কিন্তু কালী চৌধুরীকে বড় ধাপ্পা দিয়াই গেল। থানা পুলিশের ভয় দেখাইল। লোক আনিয়া মারধোর করিবার ইঙ্গিতও করিল। সুতরাং লোকটা চলিয়া গেলে কালী চৌধুরী নোটের বাণ্ডিল হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া খরচ করিতে পারিল না। কালই পুলিশ আসিয়া যদি টাকা চায়, সে কোথা হইতে দিবে ? পরের টাকা, তাহার তো নিজের নয়। কথায় বলে, 'পরের সোনা দিও না কানে'।

ননীবালা আরও দিন দশেক পরে ভুগিয়া ভুগিয়া ইহজগতের মায়া কাটাইল।

স্ত্রীর মৃত্যুর দু দিন পূর্বে টাকার কথাটা স্ত্রীকে বলি বলি করিয়া অবশেষে বলিয়া

ফেলিল। ননীবালা আশ্চর্য হইয়া বলিল—কত টাকা? পাঁচ হাজার?

—হ্যাঁ গো। পাঁচ হাজার।

—একটা কথা বলি। যখন ও টাকা খরচ করো নি এতকাল, তখন ওতে আর হাত দিও না। পরের টাকা। আমি তো বাঁচবই না—

—কেন, তুমি খুব বাঁচবে, বাঁচবে—

—ওগো, আমি বাঁচব না। খোকা আমায় ডেকেছে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে তিনটি বৃদ্ধা পিসির হাতে মানুষ হইতেছিল, কিন্তু বৃদ্ধাও শোকের ঘায়ে কাবু হইয়া পড়িয়াছিল। বুড়ী একদিন বলিল—কালী, তুই আবার বিয়ে কর!

—কেন পিসি?

—তোর এমন বয়সটা কি? তা ছাড়া, এই বুড়ো বয়সে এত বড় সংসার আমি দেখতে পারি? বিয়ে কর তুই।

—খেতে দেব কি বিয়ে করে। তুই পাগল, পিসি? ও আর হচ্ছে না। ছেলেমেয়েগুলো পর হয়ে যাবে।

বৈশাখের প্রথমে বৃদ্ধা পিসি কোথা হইতে এক সম্বন্ধ জুটাইয়া আনিলেন। তাহারা বর ও ঘরবাড়ী দেখিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল—মশাই, আপনি অনেক টাকা কুড়িয়ে পেয়েছেন, একথা সত্যি?

—হ্যাঁ, সত্যি।

—কত টাকা?

—তা বলব না। তবে অনেক টাকা।

—কতদিন পেয়েছেন?

—তা প্রায় এক বছর হতে চলল।

—কেউ আসেনি টাকা নিতে? আপনি তো অনেক জায়গায় বলেও রেখেছেন।

—মাঝে মাঝে লোক আসে। কিন্তু ঠিকমত বলতে পারে না কত টাকা। কি অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তাও বলতে পারে না। তা ছাড়া, তাদের টাকা নয়, মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ও সব জুয়োচোর।

—টাকা খরচ করেননি মোটেই?

—স্ত্রীর অসুখের সময় সামান্য কিছু। সে আমি যে করেই হক পুরিয়ে দেব। ও টাকা আমার নয়, আমার স্ত্রী মৃত্যুর সময় বারণ করে গিয়েছে ও থেকে খরচ করতে। পরের টাকা গচ্ছিত আছে ভাবি। যার টাকা সে এসে নিয়ে যাক।

—আপনি বড় সাধুলোক দেখছি।

—সাধু-টাধু নই বাঁড়ুজ্যে মশাই। আগে খরচ করি নি পুলিশের ভয়ে। এখন খরচ করি

না—আমার স্ত্রীর মরবার সময়কার কথা, তাই। সে আমায় বলে গিয়েছে যার টাকা তাকে ফিরিয়ে দিতে।

কন্যাপক্ষ এই সব শুনিয়াই বিবাহের জন্য কোন আগ্রহ দেখাইল না। ওই টাকা বাদ দিলে কালী চৌধুরী নিঃস্ব লোক। একে দোজবরে পাত্র, তাহাতে গরীব লোক; এমন পাত্রে মেয়ে দিবার আগ্রহ যদি তাদের না থাকে, নিতান্ত দোষ দেওয়া চলে না।

একদিন পিসিমা বলিলেন—হ্যাঁরে কালী, এসব কি কথা শুনছি? তুই নাকি অনেক টাকা পেয়েছিস?

কালী বলিল—কে বললে?

—সকলেই বলছে। বলছে অত টাকা হাতে থাকতে ছেলেটা বউটাকে মেরে ফেললে। হ্যাঁরে, কথাটা সত্যি?

—হ্যাঁ পিসিমা।

বলিয়া কুড়ানো টাকার কথা সে সব ব্যক্ত করিল। পিসিমাও শুনিয়া বলিলেন, বউ যখন বারণ করেছে তখন আর ওতে হাত দিতে হবে না এখন।

এদিকে বছর ঘুরিয়া গেল, কিন্তু টাকা চাহিতে কোন লোক আসিল না বা থানা-পুলিশের হাঙ্গামাও হইল না। দু-একজন গায়ে পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, টাকাটা কোথায় আছে। কালী চৌধুরী বলিল—টাকা কি ঘরে রাখি? গিরীন ঘোষের আড়তে জমা আছে।

একবার তার বাড়ী সিঁদ হইয়া গেল।

আরও এক বছর ঘুরিয়া গেল। এই বছরে কালী চৌধুরীকে বিবাহ করিতে হইল পুনরায়। গরীবের ঘরের মেয়ে। কন্যাপক্ষ কালীকে দরিদ্র জানিয়াই বিবাহ দিল, ও পাঁচ হাজার টাকার কোন কথাই উঠিল না। টাকার বাণ্ডিল সেই ভাঙা হাতবাক্সের মধ্যেই রহিল, নববধূ ক্রমশ দুইটি ছেলেমেয়ের মা হইল, সেও জানিতে পারিল না টাকার কথা। বৃদ্ধা পিসিমাও ইতিমধ্যে স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

সুখে-দুঃখে এগারটি বছর কাটিয়া গিয়াছে।

কালী চৌধুরীর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার প্রথম পক্ষের ছেলে দুটি রেলের চাকরিতে ঢুকিয়া দু-পয়সা আনিতেছে।

একদিন দুপুরবেলা কালী চৌধুরী স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—শোন একটা কথা—

স্ত্রী বড়ি শুকাইতে দিয়া, কাক তাড়াইতেছিল বাহিরের রোয়াকে। কাছে আসিয়া বলিল—কি?

—ওই হাতবাক্সটা নিয়ে এস তো।

তারপর পুরানো কাগজপত্রের ভিতর হইতে নোটের বাণ্ডিলটা বাহির করিয়া বলিল—এদিকে এস। শোন।

স্ত্রী অবাক হইয়া নোট গুনিতে গুনিতে চুপি চুপি বলিল—হ্যাগা, এত টাকা কোথায় পেলে?

কিসের টাকা এ ?—সেই টাকা ?

—তুমি এ টাকার কথা জান ?

—কানাঘুষো শুনেছিলাম যখন প্রথম বিয়ে হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয়নি।

—আমায় জিজ্ঞেস করোনি তো কোনদিন ?

—না। পিসিমা বারণ করেছিলেন। দিদির নাকি বারণ ছিল এ টাকায় হাত দিতে।

—এখন তোমায় কি মত ?

—ভাগ্যিমানী স্বর্গে চলে গিয়েছেন বহুকাল। তাঁদের কাজে যখন আসেনি, তখন এ টাকায় আর হাত দিও না। কার টাকা জানাও যায়নি !

—পরের ধন যক্ষির মত আগলে বসে আছি আজ এগার-বারো বছর। এখন ভেবেছি কি শোন। যদি তুমি মত দাও, তবে গ্রামে বড় জলকষ্ট, একটা পুকুর করে দিই এই টাকায়।

গ্রামের লোকের এতদিনের জলকষ্ট ঘুচিল।

বিড়ম্বনা

বিষ্ণু অনেকদিন পরে দেশে ফিরল শীতকালে।

পৌষ মাসের প্রথম। স্টেশন থেকে নেমে গ্রামে যাওয়ার পথে কলাই-মুগের ক্ষেতে সুঁটি পেকে উঠেছে। কোন ক্ষেত্রে ফসল কাটা হয়ে খালি জমি পড়ে আছে। লোকের বাড়ীর উঠান পর্যন্ত ছোট এড়াঞ্চির ঝোপ। শীতের সময় সাদা সাদা থোকা থোকা ফুলে মাঠ বন ভর্তি। নতুন কাটা খেজুর রসের সুগন্ধ পথের বাতাসে।

গ্রামের নাম ধুতরোবেড়ে—ছ ক্রোশ দুর স্টেশন থেকে। আজ গ্রামে পৌঁছুনো যাবে না, বেলা পড়ে এসেছে। বেশি দূরও যাওয়া যাবে না, আরামডাংতা কিংবা সোনাখালি-বাকসা পর্যন্ত সন্ধ্যের আগে পৌছে আশ্রয় নিতে হবে কোথাও। বিষ্ণু দু বছর আগে দিন-দশেকের জন্যে গ্রামে এসে দিনকতক জ্ঞাতি ভাইপোর বাড়ীতে ছিল, তার আগে আসেনি বোধ হয় তের কি চৌদ্দ বছর। সে থাকে বহুদূর সম্বলপুর জেলা, টিটলাগড় বলে এক গ্রামে। ওখানকার এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ জমিদারের ছেলের প্রাইভেট টিউটর। বয়স হয়েছে বটে, প্রাইভেট টুইশানি করার সময় এখন নয়—কিন্তু ভাগ্য এর চেয়ে কোন ভাল জিনিস ওকে দেয়নি। অনতিক্রম্য অদৃষ্ট কেবল দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে আজ কত বৎসর। উন্নতি হয়নি জীবনে, হবে যে কোনদিন তার আশাও কম। পরের বাড়ী থেকে থেকে পরের ছেলেকে মানুষ করে বয়স প্রায় চল্লিশের কোঠায় ঠেকল।

পথে মথুরাপুরের সতীশ কলু গরুরগাড়িতে ধানের বস্তার ওপর বসে আসছে। সেই সতীশ কলু, ধুতরোবেড়ের হরি গুরুমশায়ের পাঠশালায় দুজনে একসঙ্গে পড়ত—অনেককাল পরে

দেখা, তবুও বিষ্ণু চিনতে পারল।

—ও সতীশ, ভাল আছ? চিনতে পার?

সতীশের মাথার চুলে পাক ধরেছে, চেহারাখানি বেশ স্থূল ও হৃষ্টপুষ্ট। সে ঠাওর করে দেখে বলে উঠল—আরে, আমাদের সেই বিষ্ণু না? কোথায় আছ আজকাল?

—থাকি অনেক দূর, উড়িষ্যায় সম্বলপুর জেলা।

—সে আবার কোথায়?

—অনেক দূর। সে তুমি বুঝতে পারবে না।

—কোন্ রেলে যেতে হয়?

—হাওড়া থেকে উঠতে হয়।

—কি কর সেখানে? কত মাইনে পাও?

—ছেলে পড়াই। গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাই।

সতীশ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বললে—মোটে! এলতলা বেলতলা, শেষ বুড়ির বটতলা! তার চেয়ে যে আমরা দেশে থেকে ভালই করছি। এবার ধানের কাজ করে—তোমায় বলতে কি—চারটি হাজার টাকা তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে—

সতীশের রোজগার-পুষ্ট ভুঁড়ির ভারে বিব্রত বলদ দুটি গাড়ী বহন করে ক্রমে দূরে চলে গেল। সে আর সতীশ কলু। একদিন ক্লাসে ভাল ছেলের অধিকারে গুরুমশায়ের নির্দেশমত সে সতীশ কলুর কান মলে দিয়েছিল, হাতে নাড়ুগোপালের ইট তুলে দিয়েছিল। আজ সতীশ তার শোধ তুলে নিলে। তবুও তো সে সতীশকে আসল মাইনের চেয়ে কিছু বাড়িয়ে—বেশ কিছু বাড়িয়ে—বলেছে। পরের বাড়ীতে থাকা খাওয়া আর ত্রিশ টাকা মাইনে শুনলে সতীশ না জানি কি বলত!

অনেক দিন না এলেও সে চিনতে পেরেছে, দূরের ওই বটগাছটা সোনাখালি-বাকসার কুঠিবাড়ার বটগাছ। বেলা পড়ে এসেছে—সন্ধ্যে হবার দেরি নেই। সোনাখালিতে রাত্রে কারও বাড়ী থাকতে হবে। কিন্তু ও গ্রামে ভদ্রলোকের বাড়ী বেশি নেই বলেই তার জানা আছে। যা হক, একজনের কারও বাড়ীতে থাকার যোগাড় করতেই হবে।

গ্রামে ঢুকে প্রথমেই তার নজরে পড়ল, রাস্তার বাঁদিকে যেখানে আগে বাঁশবন ছিল, এখন সেখানে একটা ছোট ঘর। বাইরে লেখা আছে—ইউনিয়ন বোর্ড দাতব্য চিকিৎসালয়। নতুন ব্যাপারটা; এ গ্রামের ত্রিসীমানায় কোনদিন ডাক্তারখানা ছিল না। একজন লোককে জিজ্ঞেস করে জানলে, একটু দূরে গিয়ে পুকুরপাড়ে যে খড়ের ঘর, সেটাই ডাক্তারবাবুর কোয়ার্টার্স। ডাক্তারবাবু ব্রাহ্মণ শুনে বিষ্ণু ভাবলে অন্য কোথাও আশ্রয় প্রার্থনা করার চেয়ে ওখানে যাওয়া ভাল। ডাক্তারবাবুর বাসা খুঁজে বের করতে দেরি হল না। বাইরেই ডাক্তারবাবু বসে ছিলেন, হাত-কাটা ফতুয়া, ন-হাতি ধুতি পরনে। পাড়াগাঁয়ের ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার, ওর চেয়ে কি ভাল বেশভূষা বা হবে। বিষ্ণুকে বললেন—কোথা থেকে আসছেন?

—কলকাতা থেকে। একটু জায়গা দিতে হবে রাত্রে।

—আপনারা ?

—ব্রাহ্মণ।

—স্বচ্ছন্দে থাকুন। আমার এই বাইরের ঘর খালিই পড়ে থাকে। যাবেন কোথায় ?

—যাব আর ক্রোশ পাঁচ-ছয় এদিকে। আপনি বোধ হয় বিদেশী, সব গ্রামের নাম জানেন না।

—আজ্ঞে না। আমি বিয়ে করেছি এই দেশেই, ধুতরোবেড়ে—

বিষ্ণুর মুখে কৌতূহলের রেখা ফুটে উঠল। বললে—ধুতরোবেড়ে? আপনার শ্বশুরের নাম কি ?

ডাক্তারবাবু বললেন—কেন, চেনেন নাকি কাউকে ? ধুতরোবেড়ের কালিদাস বাঁড়ুজ্যে আমার শ্বশুর—

বিষ্ণু চমকে উঠল। হঠাৎ যেন চোখের সামনে কতকগুলো কি মাকড়সার জালের মত ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। কান ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে —না, চিনি নে। আমি এমনি বলছি। আমিও নতুন এদেশে।

ডাক্তার তারপর কি সব বকে যেতে লাগল, বিষ্ণু কিছু বা শোনে, কিছু শোনে না— উত্তরগুলো বোধ হয় কিছু কিছু অসংলগ্ন হতে লাগল। ভাগ্যিস ডাক্তার কিছুক্ষণ বকুনির পর বাড়ীর ভেতর চলে গেল অতিথির ব্যবস্থা করতে তাই রক্ষে। নতুবা বিষ্ণু মুশকিলে পড়ে যেত।

এ তাহলে নন্দিকে বিয়ে করেছে!

কিন্তু অদ্ভুত ভাগ্যের বিপর্যয়। এতকাল পরে ঘুরতে ঘুরতে কিনা সে এখানে এসে হাজির হল একেবারে নন্দির স্বামীর বাড়ীতে!

কিন্তু তার চেয়েও বিপদ যে, সে এখানে এসেছে, সে কথা নন্দিকে জানতে দেবে, না দেবে না ? না জানতে দেওয়াই ভাল। তাকে এক রাত্রের জন্যে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে চলতে হবে। যদি বাড়ীর মধ্যে খেতে নিয়ে যায় ডাক্তার ? ধুতরোবেড়ে গ্রামের সেসব স্বপ্নময় দিন কতকাল কেটে গিয়েছে : অদ্ভুত সব দিন, এখন মনে হয় তারা স্বপ্নের মত অবাস্তব। এই পৌষ মাসে ছোট এড়াঞ্চির সাদা ফুলে ভর্তি বনঝোপের মাথায় দিনশেষের রাঙা রোদের সঙ্গে সেসব দিনের স্মৃতি জড়ানো আছে। এদের সঙ্গে যে সুন্দর মুখের সম্বন্ধ ছিল তার জীবনে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ, অত্যন্ত বাস্তব—যা এতদিন ধরে মধুর স্মৃতির কুয়াশা সৃষ্টি করে রেখেছে—আজ তাকে সে চলে যেতে দেবে না। দিলে হয়তো সে ভুল করবে—কে জানে। প্রত্যক্ষ বাস্তবতার রূঢ় আঘাতে স্বপ্ন যদি ভেঙে যায় ? সে নন্দি যদি না থাকে ? ষোল বছর আগের সে নন্দি ?

ষোল বছর দেখেনি সে তাকে। কত বিনিদ্র রজনী প্রথম সে যাপন করেছে, কত চোখের জল ফেলেছে যার কথা ভেবে, তারপর হয়তো বিস্মৃতির উপলেপনে শান্ত স্নিগ্ধ মধুর

হয়ে এসেছিল যার স্মৃতি—আজ এতদিন পরে সে এভাবে এত কাছে এসে পড়বে, এ কে ভেবেছিল ?

ডাক্তারবাবু এই সময় চা ও একটা বাটিতে ছুটি চিঁড়েভাজা নিয়ে ঘরে ঢুকে বললেন—একটু চা খান। আর এই সামান্য কিছু মুখে দিন। পাড়াগাঁ জায়গা, কি বা আছে ? নতুন পাটালি এনে দেব একটু ? ভাল পাটালি আছে। আমার স্ত্রী বললে, যদি খান, জিজ্ঞেস করে এস।

বিষ্ণু হেসে বললে—আমাকে কি শহুরে বাবু পেয়েছেন ? এ সময় খেজুরগুড়ের পাটালি তো দেবভোগ্য জিনিস—নিশ্চয় খাব।

নন্দি বলেছে তাকে পাটালি দিতে। সে কি জানে, এতদিন পরে কে এসে তার বাড়ীতে অতিথি হয়েছে ? বিষ্ণুর মনে পড়ে অনেকদিন আগের বিকচোন্মুখ একটি রজনীগন্ধার ছড়ি, প্রভাতের সোনালি সূর্যালোক এসে পড়েছে শিশিরসিক্ত আধফোটা কুঁড়ির ওপর। এমনিতর জ্যোৎস্নারাতে ধুতরোবেড়ে গ্রামে আজ যোল-সতের বছর আগে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ীর বেলতলায় একটি কিশোরীর ছবি আবার মনে আসে। তার স্বপ্নের মায়াকাজল পরা ডাগর চোখের স্মৃতি হয়তো কিছু অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ এই সন্ধ্যায় সেগুলো এত স্পষ্ট হয়ে উঠল একেবারে এখানে এসে পড়েছে বলেই।

একবার তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগল, ডাক্তারকে সে বলে—আপনি কালিদাস বাঁড়ুজ্যের মেয়ে নন্দিনীকে বিয়ে করেছেন বুঝি ?

তখুনি ডাক্তার অবাক হয়ে বলবে—আপনি, আপনি চেনেন নাকি ?

—হ্যাঁ, আমি ওই গাঁয়েরই ছেলে—মানে, ছিলাম—

—ও বটে, বটে! মশায়ের নামটা কি ?

—বলুন গিয়ে ধুতরোবেড়ের বিষ্ণু ঘোষাল এসেছে বাইরে।

নন্দি তখনি ছুটতে ছুটতে আসবে, কিশোরী নন্দিনী যেমন তার আসবার খবর পেলে বাড়ীর ভেতর থেকে ছুটে বাইরে আসত।

—বিষ্ণুদা ?

—কি রে নন্দি, কেমন আছিস ?

—এতকাল পরে কোথা থেকে ? তুমি কি করছ, কেমন আছ ? গাঁয়ে আর যাও না কেন ?

—সেসব কথার উত্তর দিচ্ছি—তুই বোস আগে, কথা বলি। যোল বছর পরে দেখা, একগাদা কথা জমে রয়েছে।

—বল বিষ্ণু-দা, সব শুনব। কতকাল তোমার সঙ্গে দেখা নেই। আগে তোমায় খাওয়াই, তার পর সারারাত বসে গল্প করব—কেমন তো ?

কিন্তু এসব কি সত্যি হবে ? নন্দি কি এখনও সেই চঞ্চলা তরুণী আছে, লঘুগতি হরিণীর মত ত্রস্তব্যস্ত হবে তার পদক্ষেপ আজও ? কিংবা নন্দির মোক্তারমহুর মনে সে ব্যাকুলতা

ক্ষিপ্রতা সজীবতা আজ যদি না থাকে? পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ের মা মোটাসোটা গিন্নিবান্নি নন্দির মধ্যে সেই বিকচোন্মুখ রজনীগন্ধাকে যদি খুঁজে না পায়?—বিষ্ণু ক্লান্তিতে চোখ বুজল।

ডাক্তার বললে—মশায়, ঘুম পাচ্ছে নাকি? বালিস এনে দেব?

—না না, এই তো সন্দেবেলা।

—রাস্তা হেঁটেছেন কিনা, তাই বলছি—

—না, ঘুমুব না।

—তামাক খান?

—থাক, সেজন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আচ্ছা, এ ছোট্ট গাঁ আপনার ভাল লাগে?

ডাক্তারবাবু হেসে বলে উঠল—দেখুন দিকি কাণ্ড, ভাল লাগা না লাগার তো কোন মানে হয় না। আমি করি চাকরি, পেটের দায়ে বন্দী—ভাল আমাকে লাগাতে হবে। যেখানে ভাত, সেখানে শান্তি।

—তা তো বটেই।

—আগে ভাল লাগত না, এখন সয়ে গিয়েছে। যা হক দু-পয়সা পাই এখানে। আশে-পাশের আট-দশখানা গ্রামের লোক আমাকেই ডাকে। দু টাকা ফি করেছি আর বর্ষাকালে গরুরগাড়ীর ভাড়া। শীতকালে এখন সাইকেলে যাই। এইসব গ্রামের চাষীরা বছরে যা দেয়, তাতে একটা গোলা ভর্তি হয়ে যায় খাবার সময় বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখবেন এখন। ভাল কি সাধে লাগে?

স্থূল তৃপ্তিবোধে ডাক্তারের ছোট ছোট চোখ আরও যেন বুজে ছোট হয়ে আসে। বিষ্ণুর ভাল লাগে না সেটা। এ ধরণের স্থূল অনুভূতির প্রকাশ তার কাছে চিরকালই বিরক্তিকর। অন্য কথা পাড়বার চেষ্টায় সে বললে—এ জায়গায় ম্যালেরিয়া কেমন?

—ম্যালেরিয়া খুবই। ম্যালেরিয়াই লক্ষ্মী, আছে বলেই দু পয়সা যা হক রোজগার করি। একটি মেয়ে প্রায় বিয়ের বয়সে পা দেব-দেব করছে—সামনের বছর বিয়ে দিতেই হবে।

বিষ্ণু নিজের অলক্ষিতে চমকে উঠল। একথা সে জিজ্ঞেস করেনি, জানতেও চায়নি।

নন্দির মেয়ে বিবাহযোগ্য হয়ে উঠেছে!

কত বয়স হল, ষোল সতের? না, এইসব পল্লীগ্রামের সমাজে বিবাহের ঊর্ধ্বতম বয়স তো অত নয়, সে ভুলে যাচ্ছে। তের চোদ্দ বছরের বালিকা হবে বোধ হয়। যাক—সে কথায় তার দরকার কি। অন্য কোন দরকার নয়—নন্দির বর্তমান চেহারা সে বুঝতে চাইছে তার ছেলেমেয়ের সংখ্যার মধ্যে দিয়ে।

এমন সময়ে বাইরে থেকে কে ডাকল—ডাক্তারবাবু আছেন?

ডাক্তার উঠে বাইরে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বললে—আমাকে যে একবার চাঁপা-বেড়ে যেতে হচ্ছে জরুরী কলএ। তাই তো, শক্ত কেস। গরুরগাড়ীতে যাব আসব—তিন চার ক্রোশ দূর হবে। আমার তো থাকবার জো নেই। ফিরতে শেষরাত। আপনি রইলেন, আমি বাড়ীতে বলে যাচ্ছি, কোন অসুবিধা হবে না।

—না না, অসুবিধা কি।

—শক্ত কেস না হলে রাত্রে যেতাম না। আপনি থাকবেন, বেশ দুজনে গল্প করছিলাম—

—তাতে কি। তা বলে কলএ যাবেন না? কোন ভাবনা নেই—যান আপনি।

—আমি যা হয়েছে দুটো খেয়ে নিই—আপনাকে এরপরে ওরা খাবার দেবে এখন, বাড়ীতে বলে যাচ্ছি।

ডাক্তার খানিক পরে সেজেগুজে স্টেথসকোপ নিয়ে গরুরগাড়ীতে বার হয়ে চলে গেল।

বিষ্ণুর মনের অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেল ডাক্তার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। নিজেকে সংযত করে রাখা যে এত কঠিন, তা কোনদিন সে ভেবেছিল?

এই বাড়ীতেই নন্দি থাকে, একবার খবর পেলেই সে ছুটে আসবে, ষোল বছর পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে—এ চিন্তাকে সে প্রাণপণে দমন করে রাখতে চেষ্টা করে।

নন্দি তাদের গ্রামের মেয়ে, তার বাল্যসঙ্গিনী, এক বোঁটায় দুটি ফুলের মত জীবনে অনেক বছর কাটিয়ে এসেছিল। নন্দির সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে না এ সে জানত। তারা ঘোষাল বামুন, নন্দির বাবা নিকষ কুলীন। ঘোষাল না হয়ে চাটুজ্যে মুখুজ্যে হলেও বিশেষ কোন আশা ছিল না তার। তবুও সে চেষ্টা করেছিল।

কুমোরপাড়া থেকে হাঁড়ি কিনে সে ফিরছে—নন্দিদের বাড়ীর সামনের পথ দিয়ে। ওদের বেড়ার গায়ে বড় নিমগাছটার তলায় নন্দি দাঁড়িয়ে। বিষ্ণুর মনে হল ও যেন তার জন্যেই অপেক্ষা করছে। বিষ্ণু কাছে আসতেই নন্দি এদিক ওদিক তাকিয়ে নীচু সুরে বললে—বিষ্ণু-দা, একটা কথা আছে।

—কি?

—পিসিমার কাছে ও কথা বলেছ কেন? বাবাকে জান না?

বিষ্ণু চুপ করে রইল।

—মাঝে পড়ে কি হবে জান, আমি বকুনি খেয়ে মরব।

বিষ্ণু এ কথায় মনে আঘাত পেলে। এইটুকু আত্মত্যাগ সে নন্দির কাছে প্রত্যাশা করতে পারে না? নন্দির একথা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতও বটে।

সে শুধু বললে—ও।

নন্দি ঝাঁঝের সঙ্গে বলে—'ও'! না? শুধু 'ও' বললে কি হবে? এ নিয়ে বাড়ীতে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে তুমি জান না। আমাকে তো বকুনি খেতেই হচ্ছে তোমার সঙ্গে মিশি বলে—তা ছাড়া তোমার নিন্দেও আর যে আমি সহ্য করতে পারছি নে বিষ্ণু-দা? বিষ্ণু বিস্ময়ের সঙ্গে ওর মুখের দিকে চাইলে। নন্দির চোখে জল চক চক করছে, চোখের জলে গলার সুর আটকেছে। সে উত্তর দেবার আগেই নন্দি বললে—যাও, তুমি পালাও—এখুনি এ পথে কে এসে পড়বে। বাবা বাড়ী নেই, মা-রা সব নদীর ঘাটে—তাই তোমাকে কথাটা বলতে এলাম।

—কি করে জানলি আমি এ পথে— ?

—ছাদ থেকে দেখি তুমি হাঁড়ি হাতে আসছ। আচ্ছা চলি—খবরদার, কোন কথা আর যেন—

নন্দি মুখের কথা শেষ না করে পিঠের ওপর ঝোলানো লম্বা বেণী দুলিয়ে ছুটে পালাল। কিন্তু বিস্মিত বিষ্ণু কয়েক পা যেতে না যেতে নন্দি আবার ওকে ডেকে বললে—ও বিষ্ণু-দা, শোন একটা কথা, ও বিষ্ণু-দা—

—কি রে ?

—শোন, সরে এস আর একটু—

—কি ?

—তোমার সাহস আছে ?

—কেন ?

—আমায় নিয়ে পালিয়ে যেতে পার ?

বিষ্ণু কথাটা ভাল করে যেন বুঝতে পারলে না, ইতস্তত করে বললে পালিয়ে ?…কি রকম ? তোকে নিয়ে ?…তা—

নন্দি ঘাড় দুলিয়ে বাঁকিয়ে এক অপূর্ব ভঙ্গি করে বললে—বুঝেছি। খুব পুরুষমানুষ তুমি! সময় নেই, হাঁ কি না জবাব চাই। আমি যা বলব তুমি তাতে রাজি আছ ? সাহস হয় ?

—তা কেমন করে সম্ভব নন্দি ?

—ও! কেন অসম্ভব শুনি ?

—দূর পাগলী! তা হয় না।

—হয় না কেন ?

—এ কি ছেলেখেলা নন্দি—কত কথা ভাবতে হবে। টাকা কোথায় ? রাখব কোথা ? মা-বাবা কি ভাববেন ?

—যেন আমার কিছু ভাববার নেই! আমার মা-বাপ নেই ? বুঝতে পেরেছি তোমাদের বিদ্যে। এই তুমি পুরুষমানুষ! আচ্ছা তুমি যাও—

স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি বিষ্ণুকে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই নন্দি একছুটে ওদের বাড়ীর খিড়কির দোরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ল।…

নন্দির সঙ্গে তার আর দেখা হয়নি, কেবল হয়েছিল অতি অল্পক্ষণের জন্যে বিয়ের রাত্রে। কন্যা-সম্প্রদান সমাধা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু ওদের বাড়ী থেকে চলে এসেছিল, নিমন্ত্রণ খেতেও বসেনি গ্রামের নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে।

বিয়ের পরদিন সকালে নন্দির ছোট বোন মালতী ওকে পথে দেখে বললে—কাল কোথায় পালালে বিষ্ণু-দা ? দিদি দু'বার তোমাকে ডাকতে পাঠালে। বাসরঘরে আমায় চুপি চুপি বললে—বিষ্ণুদাকে ডেকে নিয়ে আয়। আমি তোমায় কোথাও দেখতে পেলাম না। বাসুন

খেতে বসবার সময়ে দিদি আবার বললে—এইবার নিশ্চয় বিষ্ণু-দা খেতে বসেছে, বলে আয়। আবার আমি বাইরে ছুটে এলাম তোমায় ডাকতে—কোথাও দেখলাম না। তুমি কাল খাও নি কেন আমাদের বাড়ী ?

—খাই নি কেন, তোর কাছে এখন কৈফিয়ৎ দিতে পারি নে, যাঃ—

মালতী ঘাড় তুলিয়ে বললে—আহা, কথার ছিরি ত্যাখো না! আমি ভালর জন্যে বলতে গেলুম—

—যা, ভালর জন্যে বলতে হবে না, খুব হয়েছে।

—বর দেখেছ ?

—একবার একচমক দেখেছিলাম। ময়দা মাখছিলাম গোয়ালের চালায় আমি আর নটবর —বর দেখি কখন ? তোর দিদি চলে গিয়েছে ?···

—এই এখন গেল। যাবার সময় দিদি বললে—দেখে আয় বিষ্ণু-দা বাইরে আছে কি না। আমি মরি ছুটোছুটি করে· একবার ঘর একবার বার। দিদি চোখের জল ফেলছিল তুমি খাও নি বলে—জান ?

—হয়েছে, যা—

কতকালের কথা সব! তারপর সুদীর্ঘ ষোলটি বছর কেটে গিয়েছে। ধুতরোবেড়ে গ্রামের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় নন্দির বিয়ের কয়েক মাস পরেই। বাবা মারা গেলেন, মামা এসে ওদের নিয়ে গেলেন তাঁদের দেশে। গ্রামের খড়ের ঘর অযত্নে ভেঙে-চুরে ধূলিসাৎ হল।

হঠাৎ বিষ্ণু চমকে উঠল।

চোদ্দ-পনের বছরের কিশোরী নন্দি দোরের কাছে দাঁড়িয়ে—সেকালের মত মৃদু মধুর স্বরে জিজ্ঞেস করছে, আপনাকে কি এখন খাবার দেওয়া হবে, মা জিজ্ঞেস করলেন—

—ও!···তা—

ওর চমকে ওঠার ভাবে মেয়েটির বোধ হয় হাসি পেল। ঠোঁটের প্রান্তে হাসি চেপে বললে —খাবেন এখন ?

—তুমি বুঝি ডাক্তারবাবুর মেয়ে ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি তোমার খুকি ?

—তুলসী।

—এখানে একটু বস না। খাব এখন একটু পরে। আচ্ছা, তোমার বাবা মা এ কি রকম নাম রাখলেন তোমার ? তুলসী হবে তোমার ঠাকুমা দিদিমার নাম। তোমার নাম তুলসী হলে কি মানায় ? তোমার নাম হবে রেবা, রেখা, সিপ্রা, অনীতা, নিদেনপক্ষে

স্বকুমারী, স্থলোচনা, নলিনী এই সব। তা না—তুলসী!—ছোঃ—

বিষ্ণুর কথার ভঙ্গীতে মেয়েটি হেসে ফেললে। চোখ নীচু করে শান্ত স্বরে বললে—ঠাকুরমা রেখেছিলেন। আমি যখন হই, ঠাকুরমা বেঁচে ছিলেন কিনা।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—নদে জেলা, মদনপুরের কাছে। দেশে বড তো যাওয়া হয় না। বাবার যেখানে চাকরি সেখানেই থাকতে হয়।

—তুমি বড়? আর কটি ভাইবোন?

—আমার ছোট আর দুই বোন, ছোট আর একটি ভাই এই দু বছরের।

—বেশ।

খানিকক্ষণ কথাবার্তার পর মেয়েটি বললে—এইবার খাবেন?

বিষ্ণু বললে—মন্দ নয়। জায়গা এই বাইরের ঘরেই কর।

—কেন, ভেতরের রোয়াকে করি। রোয়াকের ওপর চালা আছে।

—না না—তুমি বাইরের ঘরে এখানেই জায়গা কর খুকি। বাড়ীর মধ্যে দরকার নেই।

মেয়েটি বাড়ীর মধ্যে চলে গেল, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে এসে বললে— মা বললেন—এখানে খাওয়ার অসুবিধা হবে। রান্নাঘরের রোয়াকে জায়গা করে দিতে বললেন।

বিষ্ণু ব্যস্ত হয়ে বললে—না না—তুমি খুকি বাইরেই জায়গা করে দাও। কোন অসুবিধে হবে না। বাড়ীর মধ্যে আমার বাধ-বাধ ঠেকবে। এখানেই দাও।

খুকি বাড়ীর মধ্যে চলে গেল আবার।

বিষ্ণুর সমস্ত দেহমন চঞ্চল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এই মেয়েটির মধ্যে পনের বছরের কিশোরী নন্দিকে কতকাল পরে আবার প্রত্যক্ষ করলে সে। সেই চোখ-মুখের ভঙ্গি, সেই হাসি! স্বপ্নের মত মনে হয় সব।

বাইরের ঘরেই খাবার জায়গা করে দেওয়া হল। তুলসী পরিবেশন করলে। দোরের বাইরে ফিস ফিস শব্দ শুনে বিষ্ণুর মনে হল, এর মা রান্নাঘর থেকে খাবার বয়ে নিয়ে এসে ওকে সাহায্য করছে। বিষ্ণু আগে থেকেই সতর্ক হয়ে দোরের দিকে পিছন ফিরে বসেছে। নন্দি যেন কিছুতেই জানতে না পারে আজ সে তারই বাড়ীর অতিথি।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। রাত বেশি হয়নি। পাড়াগাঁয়ে শীতের রাত্রে সকাল সকাল লোকে আহারাদি চুকিয়ে ফেলে। বিষ্ণু একটা ব্যাপার বেশ বুঝতে পারলে আজ সে এখানে থাকলে নন্দিকে না ডেকে, তার সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারবে না। বার বার তাকে এ ইচ্ছা দমন করতে হয় প্রাণপণে। বার বার আবার অন্য পথ দিয়ে সেটা এসে মনকে চঞ্চল করে তোলে। ধমনীতে উন্মাদ রক্তস্রোত বইতে শুরু করেছে। মন বলছে—নন্দিকে ডাক, জীবনে এমন অবসর আর পাবে না। কতদিন পরে! দেখা করবে না?

খুব অসম্ভব। না, সে একটিবার নন্দিকে খবর পাঠাবে। দেখা করতে দোষ কিছুই নেই, তুলসীকে ডেকে খবর পাঠাবে? কি ভাবে বলবে? তুলসী, তোমার মামার বাড়ী কোন্ গ্রামে? ধুতরোবেড়ে? তোমার মা তাহলে আমাদের গ্রামেরই মেয়ে। বল গে, ধুতরো-বেড়ের শিবনাথ ঘোষালের ছেলে বিষ্ণু ডাকছে, দেখা করবে। না, ওভাবে নয়। তুলসীকে ডেকে, কথায় কথায় তাকে শুনিয়ে দেবে যে তার বাড়ী ধুতরোবেড়ে। এতে তুলসী নিশ্চয় বলবে যে তার মামারবাড়ীও সেই গ্রামে। ডাক্তারের সঙ্গে এ সম্বন্ধে যে কথা একবার হয়েছিল, তুলসী তার খবর রাখে না। তুলসী তখন তার মায়ের কাছে ঠিক গিয়ে বলবে, বাইরের ঘরে যিনি এসেছেন, তিনি ধুতরোবেড়ের লোক। নন্দি নিশ্চয়ই বলবে, নাম কি জিজ্ঞেস করে আয়। বাপের বাড়ীর গ্রামের লোক সম্বন্ধে নন্দি উদাসীন থাকতে পারবে না। সে বলবে—বল গিয়ে ধুতরোবেড়ের শিবনাথ ঘোষালের—ইত্যাদি। নন্দি ছুটতে ছুটতে আসবে বাইরের ঘরে।

বিষ্ণু বিছানা থেকে উঠে বসল। উত্তেজিত ভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করলে বাইরের দিকের রোয়াকে। তারপর ডাক দিলে—তুলসী, তুলসী!

তুলসী ছুটে এল বাইরের ঘরে।

বিষ্ণু বললে—ডাক্তারবাবু কখন ফিরবেন খুকি?

গলার স্বর অনেকটা নীচু করেই সে কথা বলছে অনেকক্ষণ থেকে। তুলসী বললে—তা তো জানি নে। মাকে জিজ্ঞেস করে আসব?

—না, থাক। হ্যাঁ শোন, আমি এখুনি চলে যাব। বিশেষ জরুরী কাজ মনে পড়ল। ট্রেন ধরতে হবে গিয়ে। তোমরা বাইরের দোর বন্ধ করে দাও।

তুলসী অবাক হয়ে বললে, এত রাত্রিতে এই শীতে এখন যাবেন কেন? কাল সকালে উঠে—

বিষ্ণু ব্যস্তভাবে বললে—না—না, আমার খুব জরুরী দরকার। এই রাত বারোটার ডাউন খুলনা মেলেই যেতে হবে। তুমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বলগে—

তুলসী তখুনি বাড়ীর মধ্যে গিয়েই আবার ফিরে এসে বললে—মা বারণ করেছেন। এসব দেশ ভাল না। এত রাত্রিতে যাবেন না। বাবা রাত তিনটের মধ্যে আসবেন। আপনি না হয় সেই গরুরগাড়ীতে যাবেন—হেঁটে একা যাবেন না ইস্টিশানে।

নন্দি বারণ করে পাঠিয়েছে। কাকে বারণ করেছে না জেনেই বারণ করে পাঠিয়েছে। বিষ্ণু হঠাৎ যেন রূঢ় হয়ে উঠল। ঈষৎ রুক্ষ কর্কশ স্বরে বললে—না—না, আমার কাজের ক্ষতি হবে। থাকবার জো নেই। বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও।

বিষ্ণু সরলা গ্রাম্য বালিকাকে অবাক করে দিয়ে এক রকম ছুটেই বাড়ীর বার হয়ে গেল। তার পর—নিঃসঙ্গ তারা-ভরা রাত্রি। মাঠের পর মাঠ। পৌষের কনকনে শীত। প্রস্ফুট সর্ষেফুলের সুগন্ধ। বহুদিনের স্বপ্নভরা প্রথম যৌবনের নেশা ওর শিরায় শিরায়।

ভুবন বোষ্টুমী

ওই পথে ভুবন বোষ্টুমী যেত।

অনেকদিন গ্রামের এ পথে হাঁটিনি। এই ঝোপে ঝোপে ঘেঁটুফুলে ভর্তি ফাল্গুন-অপরাহ্নে গ্রামের পিছনকার মাঠ ও বনের মধ্যেকার সুঁড়িপথের ধারে দাঁড়িয়েছি এসে হঠাৎ আজ বেড়াতে বেড়াতে। পঁচিশ বছর এ পথে পা দিইনি—সেই বাল্যকালে আসতাম খেলাধুলো করতে আপনমনে বনের ধারে। ওই পথটা নদীর ঘাটে যাবার। আমার ছেলেবেলায় বোষ্টমপাড়া ও জেলেপাড়ার লোকে ওই পথ ধরে নদীর ঘাটে যেত—এখনও বোধ হয় যায়। আমি গ্রামে বহুকাল পরে ফিরেছি এ বছর ফাল্গুন মাসে। মাঠের মধ্যে বেড়াতে বেড়াতে এই অপরাহ্নে এসে পড়েছি এই জায়গাটাতে।

প্রথমটাতে চিনতে পারিনি, তার পরেই মনে হল, ও, ঐ সেই ছিরেপুকুরের ধারের পথ! ওদিকে বেলেডাঙার বাঁওড়ের ধারের বট-অশথের ছায়াস্নিগ্ধ তীর। আম্রমুকুলের ঘন সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে। পৃথিবীর বসন্ত আজ কি অপূর্ব রূপেই প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে আমার চোখের সামনে। একটা বেলগাছ (যুগলকাকাদের বেলগাছ, এটা তাঁদেরই জমিতে অবস্থিত, ছেলেবেলা থেকেই জানি), পাকা পাকা বেল ঝুলছে। কত বেল কুড়িয়ে নিয়ে যেতাম এখান থেকে ছেলেবেলায়। বেশ ভাল বেল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভুবন বোষ্টুমীর কথা মনে পড়ল কেন?

সে এ পথে যেত, এই বিকেলবেলা ওই বন-ঝোপ-ঘেরা সরু ছায়াস্নিগ্ধ পথটি বেয়ে বাংচিতে বন ও গাবভেরেণ্ডা গাছের পাশ কাটিয়ে। ঝরা শুকনো বাঁশপাতার রাশ পা দিয়ে মচমচ করে মাড়াতে মাড়াতে, ওই মাদার গাছের তলায় পড়া হলদে হলদে মাদার ফুলের কুঁড়ির সুবাস আঘ্রাণ করতে করতে, এ পথ দিয়ে নদীর ঘাটে গা ধুতে যেত ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে।…

ভুবন বোষ্টুমীকে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেই দেখতাম। ফর্সা খাটোমত মানুষটি। বেশ শান্ত মুখশ্রী, কানে ছিল সেকেলে মাকড়ি—হাতে কাঁচের চুড়ি। বয়স আমার মায়ের সমান হবে, দু-এক বছরের কমবেশি না হতে পারে এমন নয়। আমি তখন আট বছরের ছেলে, ন বছরের ছেলে, দশ বছরের ছেলে।

জীবনের ঐ তিনটি বছর পরে আর কখনও তাকে দেখিনি।

ভুবন বোষ্টুমী আমাকে বলত, হ্যাঁগা বামুনদের খোকা, তুমি একা বনে বনে কি কর?

আমি সলজ্জ সুরে বলতাম—এই—

—বাবাঠাকুর যেন আমার কি! যাও যাও, বাড়ী যাও। এখানে বড় শেয়াল বেরোয়। ছেলেমানুষ, এখানে থাকে না। যাও—

—যাচ্ছি।

—আমি এগিয়ে দিয়ে আসব তোমায় খোকা?

—না, আমি পারি যেতে।

—থেকো না। চলে যাও। বামুন দিদি বকবে। লক্ষ্মি ছেলে—যাও মানিক—

—আর একটু খেলা করব ?

—না। একা বনের ধারে তোমার কি খেলা বাবা ? বড় শেয়াল বেরোয় এখানে।

—বড় শেয়াল তো দেখিনি—সব ছোট শেয়াল।

—তা নাগো খোকা। বড় শেয়াল হল সেই যার নাম করতে নেই সন্ধ্যেবেলা।

—বাঘ ?

—নাম করে না, নাম করে না, দুষ্টু ছেলে।

এই রকম টুকরো কথা হয়তো হয়েছিল কোন এক বিকেলে।

দু-চারদিন হয়তো—তার বেশি নয়।

প্রায়ই তাকে দেখতাম, ঘড়া-কাঁখে নদীর ঘাটে যেত এমনই বিকেলে। সে কেন, বোষ্টম-পাড়ার জেলেপাড়ার কত বৌ-ঝি যেত।

এই পর্যন্ত তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। ওর সঙ্গে আমার যোগাযোগ নিতান্তই সামান্য।

ভুবন বোষ্টুমীর ইতিহাস যতদূর আমার জানা আছে বা পরে বড় হয়ে শুনেছিলাম, তার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না। সে ছিল গোপীনাথ বৈরাগীর বিবাহিতা স্ত্রী। গোপাল পরামানিকের বাড়ীর পেছনে ওদের দুখানা মেটে ঘর ছিল। চাষবাস জমিজমার সামান্য আয়ে সচ্ছল ভাবেই সংসার চলত—নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রীর ঝামেলাবিহীন সংসার। ভুবনের মুখখানা ছিল সুন্দর, কারণ ওর মুখ আমি মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই। তবে ভয়ানক রকমের সুন্দর কিছু নয়, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পাঁচপ্যাঁচ ধরনের চেয়ে একটু ভাল।

ভুবন বোষ্টুমীর সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে আছে, কেউ তার চরিত্র সম্বন্ধে কোন অপবাদ দেয়নি। অথচ ও-পাড়ার অধিকাংশ ঝি-বৌ সম্বন্ধে সেই ছেলেবেলাতেই কত কানাঘুষো আমার কানে গিয়েছিল। পাড়াগাঁ জায়গা, পরের এতটুকু ছিদ্রও চোখ এড়ায় না সেখানে। এর কারণ অবিশ্যি এ নয় যে পাড়াগাঁয়ের সব লোকই হিংসুক বা নিন্দুক। এর বড় কারণ এই যে, এই সব পল্লীগ্রামে লোকের আমোদ-কৌতুকের কোনও বড় পথ নেই—যেমন আছে শহরে, ফুটবল খেলা বা সিনেমা বা রাজনীতি আলোচনার মধ্যে। কি নিয়ে এরা সময় কাটায় ? এর-ওর ঘরের মুখরোচক কুৎসা-নিন্দা না নিয়ে থাকলে অবসর-বিনোদনের অন্য পন্থা কই ? সুতরাং দোষ এদের দেওয়া যায় না সেজন্যে।

এ হেন গ্রাম্য আলোচনার মজলিসেও ভুবন বোষ্টুমীর নামে কোন অপবাদ শুনিনি। বরং সকলে বলত ভুবন খুব ভাল মেয়ে। শান্ত সুশ্রী স্নেহময়ী। এই পর্যন্ত, এর বেশি আর কিছু ওর সম্বন্ধে বলবার আছে বলে আমার মনে হয় না। অতি সাধারণ গ্রাম্য-বধূদের একজন।

ভুবন বোষ্টুমী সম্বন্ধে আর কিছু বলবার নেই আমার। অথচ কেন এতকাল পরে এখানে দাঁড়িয়ে তাকেই আমার প্রথম মনে হল ? এই পথের সঙ্গে, বনফুলের গন্ধের সঙ্গে, ফাল্গুন-

অপরাহ্ণের সঙ্গে ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগেকার ভুবনি কেন মিশে আছে? আরও কত ঝি-বৌ তো যেত। তারাও মরে হেজে গিয়েছে আজ কত বছর, তাদের কারও কথা মনে কেন ওঠে না? কারও মুখও কেন মনে নেই? অথচ এতকাল পরে চোখ বুজে ভাবলেই ভুবনি বোষ্টমীর মুখ সামনে ভেসে ওঠে, যেমন ভেসে ওঠে আমার মায়ের।

এ কথার জবাব নেই।

আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি বনঝোপ-ঘেরা জনশূন্য পথে, ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের ঝাড়ের ধারে। তার পর—কতবার কখনও বসন্তকালে কখনও গরমকালে, এক-আধবার শরৎকালের অপরাহ্ণে ওই পথে বেলগাছটার তলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। প্রথম বারের পর আরও অন্ততপক্ষে দশ-বারো বার, কি তার বেশি গত কয়েক বছরের মধ্যে। হয়তো অন্য কথা মনে ভাবতে ভাবতে গিয়েছি—কোনও একটা বইএর কথা, কি সাংসারিক কোন সমস্যার কথা, কি অর্থচিন্তা, যাই হক। কিন্তু যেমন ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, চুপ করে দাঁড়িয়ে মনকে শান্ত সংযত করবার চেষ্টা করছি, অমনি কত বছরের পার থেকে ভুবন বোষ্টমীর শান্ত সুশ্রী মুখখানা ধীরে ধীরে মনের মধ্যে ফুটে ওঠে। অথচ ভুবনি আমার কেউ ছিল না, আমাদের পাড়ার মানুষও ছিল না সে। খুব বেশি যে তার সংস্পর্শে এসেছি বাল্যে তাও নয়। তার চেয়ে অনেক বেশি মিশেছি যাদের সঙ্গে, তাদের অনেকেই আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন। কতবার ভেবেছি অবাক হয়ে—কেন এমন হয়?

কিছু বুঝতে পারি নি।

শাবলতলার মাঠ

অনেক দিন পরে শাবলতলার মাঠ দেখলাম সেদিন। আমার পিসিমার বাড়ীর দেশে। ছেলেবেলায় যখন পিসিমার বাড়ী থেকে দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি পাঠশালায় পড়তাম সে আজ পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগের কথা। পিসিমা মারা যাওয়াতে সে গ্রামে আর যাই নি কখনও।

সেদিন আবার কার্যোপলক্ষে গরুর গাড়ী চড়ে যেতে যেতে শাবলতলার মাঠ চোখে পড়ল, কিন্তু মস্ত বড় কি এক কারখানা হচ্ছে সেখানে। রেল লাইন বসেছে মাঠের ওপর দিয়ে—বড় রেল লাইন। কত যে লোহালক্কড় যন্ত্রপাতি এসে পড়েছে! লোকজন কুলিমজুরের ভিড়, দুমদাম শব্দ, সে এক বিরাট ব্যাপার।

চালাঘর ও তাঁবু চারিধারে। ইন্‌জিনিয়ার-ওভারসিয়ারের দল খেটে খেটে সারা হল। পাঞ্জাবী কণ্ট্রাক্টরের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারের খুঁটি বসানো হচ্ছে, ইলেকট্রিকের ও টেলিফোনের তার খাটানো হবে। ইটবোঝাই কাঠ-বোঝাই লরির ভিড় নতুন তৈরি চওড়া রাস্তাগুলোর ওপরে। চুনের ধূলো, সিমেন্টের ধুলো উড়ছে বাতাসে।

এ কি হল ?

আমার সেই ছেলেবেলাকার শাবলতলার মাঠ কোথায় গেল ? সত্যিই তা নেই। তার বদলে আছে কতকগুলো তাঁবুর সারি, ইটখোলা, পাথুরে কয়লার স্তূপ, চুনের ঢিবি, কাঠের ঢিবি, লোকজনের হৈ চৈ, লরির ভিড়।

আজ সকালে মার্টিন লাইনের ছোট স্টেশনে নেমেছি, গরুরগাড়ী করে চলেছি পিসিমার বাড়ীর গ্রামের পাশের একটা গ্রামে মেয়ের বিয়ের পাত্র খুঁজতে। রাস্তার ধারে পড়ে শাবলতলার মাঠ। হঠাৎ দেখি এই অবস্থা তার।

গরুরগাড়ীর গাড়োয়ানকে বলি—হ্যাঁরে, এটা শাবলতলার মাঠ, না ?

—হ্যাঁ বাবু।

—কি হচ্ছে এখানে ?

—কি জানি বাবু, কলকারখানা বসছে বোধ হয়।

—কতদূর নিয়ে ?

—তা বাবু অনেক দূর নিয়ে—উই বাজিতপুর, মনসাতলা, ছাওয়াল-মারি, বেদে-পোতা, হাঁসখালির চড়া পর্যন্ত।

—গ্রামগুলো সব কোথায় ?

—সব উঠিয়ে দিয়েছে।

মনে পড়ল আমার এগার বছর বয়সের একটি মধ্যাহ্নদিন। আর মনে পড়ল দুর্গাপুর উচ্চ প্রাইমারি স্কুলের উমাচরণ মাস্টারকে।

উমাচরণ মাস্টার কতদিন থেকে দুর্গাপুর ইউ পি পাঠশালার হেডমাস্টারি করছিলেন তা আমি বলতে পারব না। গ্রামের রায় জমিদারদের ভাঙা কার্নিসে পায়রার বাসাওলা বৈঠকখানার একপাশে সেকেলে তক্তপোশে ছিল তাঁর বাসা। দেওয়ালে তাঁর হুঁকো ঝুলন্ত পেরেকের গায়ে, বাঁশের আলনায় তাঁর দুখানা আধময়লা ধুতি ও এক এবং অদ্বিতীয় পিরানটি আলগোছে করে ঝোলানো থাকত—আর থাকত তক্তপোশের নীচে একজোড়া কাঠের খড়ম। একটা টিনের বিবর্ণ তোরঙ্গ। একটা চটের-থলে-ভর্তি টুকিটাকি জিনিস। একখানা পাকা বাঁশের লাঠি এবং—সেইটেই বেশি করে মনে আছে—একগাছা তেলে-জলে পাকানো বেত।

উমাচরণ মাস্টার আবার বই লিখতেন। আমি তখন অল্পবয়স্ক, লেখক বা সাহিত্যিকের যশোগৌরব সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন খুবই অস্পষ্ট—তবুও মাস্টারমশায় যখন ক্লাসের টেবিলের ওপর পা তুলে গম্ভীরভাবে তাঁর লেখা 'আক্কেল গুড়ুম' বই পড়তেন—তখন আমরা ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বিস্ময় ও প্রশংসাভরা দৃষ্টিতে তাঁর দীর্ঘগুম্ফযুক্ত বসন্তের দাগ-আঁকা প্রৌঢ় মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে থাকতাম।

হ্যাঁ—তাঁর বইএর নাম ছিল 'আক্কেল গুড়ুম'—তিনি বলতেন 'প্রহসন'। আমার যা বয়স তখন তাতে 'আক্কেল গুড়ুম' বা 'প্রহসন' দুটো কথার একটারও মানে বুঝতাম না। মনে

আছে বইএর মধ্যে একটি ইংরেজি-পড়া ছোকরার কথা আছে এবং পড়ার ভঙ্গিতে মনে হত উক্ত ইংরেজি-পড়া ছোকরা খুব ভাল লোক নয়।

উমাচরণ মাস্টার আমাদের দিকে চেয়ে সগর্বে বলতেন—এই বই পড়ে গোবরডাঙার সেজবাবুর শালা কি বলেছিলেন জান? বলেছিলেন, উমাচরণবাবু, আপনি কালে গিরিশ ঘোষের সমান লেখক হবেন।—বুঝলে?

আমি বলেছিলাম—গিরিশ ঘোষ কে পণ্ডিত মশাই?

উমাচরণবাবু অনুকম্পার হাসি হেসে আমার দিকে চেয়ে বলেছিলেন—গিরিশ ঘোষ? জান না? হুঁ! কি-ই বা জান?

আমি লজ্জায় চুপ করে থাকি। কি উত্তর দেব? যখন সত্যিই জানি নে গিরিশ ঘোষ কে। নামও কোনদিন শুনি নি! উমাচরণ তাঁর এই মূল্যবান প্রহসন আমাদের কাছে বিক্রি করবার চেষ্টা করতেন এবং বিক্রি অনেক করেছিলেনও। প্রত্যেক ছাত্রের বাড়ী একখানা বা দুখানা করে 'আক্কেল গুড়ুম' ছিলই। মাইনের টাকা দিলে খুচরো ফেরত দেওয়ার রীতি ছিল না তাঁর। বলতেন—কত বাকি? সাত আনা? নাও একখানা ভাল বই নিয়ে যাও। বাড়ী গিয়ে পড়তে দিও সবাইকে।

একদিন পিসিমা বললেন—হ্যাঁরে, মাইনের টাকা দিলাম, ন আনা পয়সা ফেরত দিলি নে?

—না পিসিমা। মাস্টার মশাই বই একখানা দিয়েছেন তার বদলে।

—কি বই?

—আক্কেল গুড়ুম।

—ওমা, সে আবার কি বই? তুই কি বলে সেই বই আনতে গেলি? যেমন পোড়ারমুখো মাস্টার তেমনই পোড়ারমুখো ছেলে! বইএর নাম শোন না—'আক্কেল গুড়ুম'। কেষ্টর শতনাম পাওয়া যায় তো একখানা আন্ গে বরং—ও বই ফিরিয়ে দিয়ে আয়।

—সে হবে না পিসিমা, তিনি ওসব বাজে বই লেখেন না। এ হল প্রহসন।

—সে আবার কি রে?

—সে তুমি বুঝবে না। গিরিশ ঘোষের নাম শুনেছ?

—সে কে আবার? আমাদের গাঁয়ে তো ও নামের কেউ নেই। দুগগোপুরের লোক নাকি?

—সে তুমি বুঝবে না। তিনি আমাদের মাস্টার মশায়ের মত প্রহসন বই লেখেন।

পিসিমা ধমক দিয়ে বলতেন—তুই চুপ কর বাপু—বড্ড পণ্ডিত হয়েছিস তুই। আমি জানি নে—ওঁর গাল টিপলে দুধ বেরোয় উনি জানেন—ফাজিল কোথাকার! ওসব গিরিশ ঘোষ সতীশ ঘোষ বুঝি নে—কাল ও বই ফেরত দিয়ে কেষ্টর শতনাম আনতে পারিস ভাল, নয়তো ন আনা ফেরত আনবি—যা—

একদিন উমাচরণ মাস্টার মশায় আমাদের বুঝিয়ে বলেছিলেন, বড় বড় লেখকরা সবাই প্রথম জীবনে তাঁর মত ইস্কুল-মাস্টারি করেছিলেন। কথাবার্তার মাঝখানে আমাদের ক্লাসের সারদা হঠাৎ বলে বসল—আপনার বয়স কত মাস্টার মশাই ?

—কেন রে ?

—তাই বলছি।

উমাচরণ মাস্টার তাকে ধমক দিয়ে বসিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম ছেলেটার খটকা বাধছে কোথায়। এই বয়সেও যদি এখন উমাচরণ মাস্টার আমাদের এই স্কুলে মাস্টারি করতে রয়ে গেলেন, তবে কোন্ বয়সে গিয়ে তিনি কোথায় কি বড় কাজ করবেন ? আমাদের ক্লাসের সতু কিন্তু বলত—মাস্টার মশাই খুব বড় পণ্ডিত। ওরকম হয় না।

আমি বললাম—কেন রে ?

—উনি চালতেবাগানের মাঠের ধারে বসে বসে রোজ কি করেন ! বোধ হয় লেখেন। কবিমানুষ কিনা।

আমি একদিন সতুর সঙ্গে দেখতে গেলাম ব্যাপারটা। চালতেবাগান বহুকালের প্রাচীন আম তেঁতুল গাছের ছায়ায় দিনমানেই সন্ধ্যার মত অন্ধকার। অনেক রকম মোটা লতা গাছে গাছে জড়াজড়ি করে আছে। বাগান পার হয়েই একটা ছোট মাঠ, উমাচরণ মাস্টার সেই মাঠের ধারে বসে আছেন, বাগানের ছায়ার আশ্রয়ে একটা ছেঁড়া মাদুর পেতে। মাদুরের ওপর কাগজ বই ছড়ানো। পাছে উড়ে যায় বলে মাটির ছোট ছোট ঢেলা চাপানো সেগুলোর ওপর। আমরা সেওড়া ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম, তিনি কখনও উপুড় হয়ে কি লিখছেন, কখনও সামনের মাঠের দিকে চেয়ে কি ভাবছেন, কখনও আপনমনে হাসছেন, বিড় বিড় করে কি বকছেন।

সতু সসম্ভ্রমে চুপি চুপি বললে—দেখলি ? কবিমানুষ !

আমি বললাম—কি করছেন ?

—লিখছেন।

—বিড় বিড় করে কি করছেন ?

—ও রকম কবিরা করে থাকে।

দুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে কবির কাণ্ড অনেকক্ষণ দেখলাম। এই আমার জীবনে প্রথম একজন জীবন্ত কবির ক্রিয়াকলাপ দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য ঘটল। মনে আছে, সেওড়া ঝোপের পাশেই ছিল বড় একটা কতবেল গাছ, তলা বিছিয়ে পড়ে ছিল পাকা পাকা কতবেল। সেই বয়সের লোভ, বিশেষ করে কতবেলের ওপর লোভ দমন করেছিলাম কবি দেখবার আনন্দে ও বিস্ময়ে। উমাচরণ মাস্টারের বয়স তখন কত ? আমার মনে হয় চল্লিশের ওপর। কারণ আমার মায়ের বড় ভাই, আমার বড় মামা—যাঁর বয়স তখন শুনতাম পঁয়ত্রিশ—তিনি মাস্টার মশায়কে 'দাদা' বলে ডাকতেন।

আমরা যেমন নিঃশব্দে সেখানে গিয়েছিলাম তেমনই নিঃশব্দে চলে এলাম মনে বিস্ময় ও আনন্দ নিয়ে।

এর পরে উমাচরণ মাস্টার যখন পড়াতেন, তখন হাঁ করে তাঁর দিকে চেয়ে দেখতাম। একজন কবি বটে! উনি ঠিকই বলেছেন—বড় বড় লোকেরা প্রথম জীবনে মাস্টারি করে। ওঁর বয়স বেশি হয়েছে বটে কিন্তু উনি একজন কবিও তো হয়েছেন। সারদাটা কিছুই বোঝে না।

বছরখানেক কাটল। আমরা কটি ছেলে উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হয়েছি। সেই বছর উমাচরণ মাস্টার আমাদের নিয়ে রানাঘাটে যাবেন পরীক্ষা দেওয়াতে। চারটি ছেলে—মনে আছে চক্কত্তিদের কানাই, আমি, সতু ও সারদা। দুর্গাপুর থেকে হেঁটে বেরিয়ে শাবলতলার মাঠে যখন পড়েছি, তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

বড্ড মনে আছে সেই অপরাহ্ণের কথাটি। তখন শাবলতলার মাঠে ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মস্ত বড় মাঠের এখানে ওখানে কুলগাছ সেওড়া-ডাঁটা আর বনতুলসীর জঙ্গল। ধু ধু করছে মাঠ যেন সমুদ্রের মত, কূলকিনারা নেই কোনও দিকে। এত বড় মাঠ কখনও দেখি নি। দুর্গাপুর থেকে শাবলতলার মাঠ প্রায় দু ক্রোশ আড়াই ক্রোশ পথ। কাছাকাছি কোন গ্রাম নেই এ মাঠের কোনও দিকে। একটা সরু মেঠো পথ মাঠের মধ্যে দিয়ে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। কি একটা ফুলের গন্ধ বেরুচ্ছে দুপুরের রোদে। আমরা সবাই ছেলেমানুষ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। উমাচরণ মাস্টার বললেন—যাও সব গাছতলায় একটু বসে নাও।

আমাদের প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে বোঁচকা। তার মধ্যে আমাদের বই-দপ্তর আছে, কাপড় গামছা ও কাঁথা আছে। থাকতে হবে নাকি হোটেলে। আমরা বোঁচকা নামিয়ে একটা কুলগাছের তলায় সবাই বসলাম। মাস্টার মশায় বললেন—দেখ তো কুল হয়েছে কিনা।

সতু দেখে বললে—কুল হয়েছে, ছোট ছোট—খাওয়া যায় না।

কানাইএর মা ওকে সেখানে গিয়ে খাবার জন্যে নারকোলের নাড়ু আর রুটি করে দিয়েছিলেন পুঁটুলিতে। সতু ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে খেলে। আমি চাইতে গেলাম, কানাই বললে, নেই।

আমরা একটু পরে সবাই বোঁচকা রেখে হুটোপাটি করে মাঠের মধ্যে বনতুলসীর জঙ্গলে খেলা করতে লাগলাম। কি সুন্দর যে লাগছিল! ক্ষুদ্র গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় খেলা করে বেড়াই, এত বড় মাঠের এত ফাঁকা জায়গায় খেলা করবার সুযোগ কখনও পাইনি। ওদের কেমন লাগছিল জানি না, আমার মনে হচ্ছিল যেন কোন নতুন রাজ্যে রূপকথার জগতে এসে পড়েছি—তুলসীমঞ্জরীর সুগন্ধভরা অপরাহ্ণের বাতাসে যেন কোন্ সুদূরের ইঙ্গিত। যে দেশ কখনও দেখিনি, যার কথা কিন্তু আমার মনে সর্বদাই উঁকি দেয়, আজ এই শাবলতলার মাঠে

এসে সেই দূর-দূরান্তরকে দেখতে পেলাম। ঝোপে ঝোপে শালিক আর ছাতারে পাখীর কলরব, এখানে ওখানে বেলে জমিতে খেঁকশেয়ালের গর্ত, রাঙা কেলেকোঁড়া ফুলের লতা জড়িয়ে উঠেছে বুনো কলুচটকা আর তিত্তিরাজ গাছে, জনমানুষের বাস নেই, একটা কলা গাছ কি আম গাছ চোখে পড়ে না, যেন এ জগতে মানুষের বাস নেই, শুধুই বনঝোপের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করে পাতার ধুলো উড়িয়ে এ দেশে চলে যাও, লেখাপড়ার বিরক্তিকর বাধ্যতা এখানে নেই। খেলা ছেড়ে লেখাপড়া করতে কেউ বলবে না এ দেশে। উমাচরণ মাস্টার সেই পুরনো, একঘেয়ে, বালকের পক্ষে মহা বিরক্তিকর জগতের মানুষ, এ নতুন জীবনের উদাস মুক্তির মধ্যে, দিনরাতব্যাপী খেলা আর অবকাশের মধ্যে ওঁর স্থান নেই আদৌ।

বেলা পড়ে এসেছে। হঠাৎ সতু বললে—হ্যাঁরে, মাস্টার মশাই কোথায় রে?

আমি বললাম—কেন, কুলতলায় নেই?

—কতক্ষণ তো তাঁকে দেখছি নে। গেলেন কোথায়? আমাদের যেতে হবে না ইস্টিশনে? দু ঘণ্টার ওপর তো এখানে আছি। গাড়ী ধরতে হবে না?

আমার মনে হচ্ছিল গাড়ী ধরে আর কি রাজা হব আমরা! এই তো বেশ আছি, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষার বিভীষিকার মধ্যে না-ই বা গেলাম। ইনস্‌পেক্টর এসে সেবার স্কুলে বলে গিয়েছিল রানাঘাট গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার নাকি নানা গোলমাল। খাতায় লিখে পরীক্ষা হয়, গার্ড আছে সেখানে ঘাড়ের ওপর ঝুঁকে, একটু যে দেখাদেখি করবে কি বলাবলি করবে তার কোন উপায় নেই। বলাবলি করলেই মহকুমার হাকিমের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে, তিনি জেলও দিতে পারেন, জরিমানাও করতে পারেন। একটু ফিসফাস করবার জো নেই সেখানে। নবমীর পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ঢুকতে হবে হলঘরে। কি ভীষণ পরিণাম ছাত্রজীবনের।

সত্যি বলছি, শাবলতলার মাঠ দেখবার পরে, এখানে এসে এই দু ঘণ্টা ছুটোছুটি করে বেড়ানোর পরে আমি যেন জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছি। তা হচ্ছে এই রকম বিশাল মুক্ত বনময় ধূলিভরা মাঠের অবাধ শান্তি আর স্বাধীনতার মধ্যে খেলা করে বেড়ানো। পরীক্ষা দিয়ে কি হবে! কানাই এসেও বললে—আমরা যাব কখন? মাস্টার মশাই কোথায়?

সত্যিই তো, তাঁকে কোনও দিকে দেখা যাচ্ছে না। সবাই মিলে খুঁজতে বার হওয়া গেল। সতু ডাকতে লাগল—ও মাস্টার মশাই, মাস্টার ম-শা-ই- -

কোনও সাড়া নেই।

সতু ভীতমুখে বললে—বাঘে নিয়ে গেল নাকি রে?

কানাই বললে—দূর, এখামে মানুষ-খেকো বাঘ থাকবে?

—না, নেই! তোকে বলেছে!

—তবে গেলেন কোথায়?

আমি বললাম—তোমরা খুঁজে দেখ। আমি এখানে খেলা করি।

এমন সময় সারদা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে—শীগগির—শীগগির আয়—দেখে যা—

আমরা সবাই একসঙ্গে বলে উঠলাম— কি হয়েছে রে ? বেঁচে আছেন তো ?

• কথা বলতে বলতেই আমরা সারদার পেছনে ছুটলাম। বেশ খানিকটা দূর দৌড়ে সারদা থেমে পড়ল এবং আঙুল দিয়ে সামনের দিকে দেখিয়ে আমাদের চুপ করতে বলে পা টিপে টিপে এগিয়ে চলল।

একটা শুকনো খাল-মত নীচু জায়গায় কুঁচঝোপের আড়ালে উমাচরণ মাস্টার বসে বসে ঝুঁকে পড়ে কি লিখছেন সেই আর-একদিনের মত। জায়গাটাতে খুব ছায়া পড়েছে। কুঁচ-ঝোপটায় পাখীরা কিচির কিচির করছে—সামনে অনেকদূর ফাঁকা। সুন্দর জায়গাটি। এই মাঠের মধ্যে এই জায়গাটাই সব চেয়ে ভাল। কবি উমাচরণ মাস্টার ঝুঁকে পড়ে লিখতে লিখতে বিড় বিড় করে আপনমনে কি বকছেন, এমন কি আপনমনে ফিক ফিক করে হাসছেনও। যে কেউ দেখলে বলবে উন্মাদ পাগল। অমন তন্ময় হয়ে লিখতে আমরা তাঁকে কখনও দেখিনি, অমন ভাবে আপনমনে হাসতেও তাঁকে কখনও দেখিনি!

সতু মুগ্ধদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে বললে—মাস্টার মশাই একজন আসল কবি।

সারদা ওর মতে মত দিয়ে বললে—ঠিক তাই।

কানাই ও আমি কোন কথা না বলে একদৃষ্টে এই সত্যিকার জীবন্ত কবিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমাদের কত ভাগ্যি যে আমরা এমন মাস্টার পেয়েছি।

কানাই একটু পরে বললে—কিন্তু ভাই, সন্ধ্যে হল। ওঁকে না ডাকলে আমাদের উপায় কি হবে? ডাকি ওঁকে। কি বলিস?

কেউ সাহস করে না।

সারদার মনে কবির প্রতি শ্রদ্ধা একটু ফিকে, সে দু-একবার আমাদের উপস্থিতি জ্ঞাপক কাসির আওয়াজ করলে।

সতু চুপি চুপি বললে—এই! আস্তে!

সারদা বললে—হ্যাঁ, আস্তে বই কি! আমরা মরি এখন এই মাঠের মধ্যে সন্ধ্যেবেলা। বাঘে ধরুক সবশুদ্ধ—বলে সজোরে একবার কাসির আওয়াজ করতেই উমাচরণ মাস্টার চমকে পেছন ফিরে চাইলেন।

সারদা বললে—আসুন মাস্টার মশাই, সন্ধ্যের দেরি নেই যে—ইস্টিশান এখনও অনেকখানি রাস্তা—

উমাচরণ মাস্টার ব্যস্ত হয়ে খাতাপত্র গুটিয়ে বগলে করে নিয়ে আমাদের কাছে উঠে এলেন শুকনো খাল থেকে। অপ্রতিভের হাসি হেসে বললেন—তাই তো, বেলা গিয়েছে দেখছি। চল চল!

তারপর পেছনদিকে চেয়ে বললেন—জায়গাটা বড় চমৎকার—না?

সতু সশ্রদ্ধ সুরে বললে—ওখানে কি করছিলেন মাস্টার মশাই? কি আছে ওখানে?

উমাচরণ মাস্টার ধমক দিয়ে বললেন—সে কি তুই বুঝবি? সিনারি কাকে বলে

জানিস? চমৎকার সিনারি ওখানটাতে। কবিতা লিখছিলাম। কি চমৎকার মাঠটা বুঝিস কিছু?

আমারও চোখে যে এই অপরাহ্ণে এই মাঠ অদ্ভুত ভাল লেগেছে, মাস্টার মশায়ের কথার মধ্যে তার সায় পেয়ে আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। আমি নতুন দৃষ্টি পেলাম সেই দিনটিতে, উচ্চ প্রাইমারি পরীক্ষা দিতে যাবার পথে। উমাচরণ মাস্টার কত বড় শিক্ষকের কাজ করলেন সেদিন—তিনি নিজেও কি তা বুঝলেন?

আমার কথা এখানেই শেষ। উমাচরণ মাস্টারের ইতিহাসও এখানেই শেষ। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের কথা সেসব। উমাচরণ মাস্টার আজ আর বোধ হয় বেঁচে নেই। বড় হয়ে উমাচরণ চক্রবর্তী বলে কোনও কবির লেখা কোথাও পড়িনি বা কারও মুখে নামও শুনি নি। তাতে কিছু আসে যায় না। যশোভাগ্য সকলের কি থাকে।

আজ এতকাল পরে শাবলতলার মাঠে এসে আবার মনে পড়ে গেল বাল্যের সেই অপূর্ব অপরাহ্ণের কথা, মনে পড়ে গেল উমাচরণ মাস্টারকে। দুঃখ হল দেখে—সে শাবলতলার মাঠ একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মুছে গিয়েছে সে সৌন্দর্য, সে নির্জনতা। উমাচরণ মাস্টারের জন্যে মনটা এতদিন পরে যেন কেমন করে উঠল।

পৈতৃক ভিটা

মধুমতী নদীর ওপরেই সেকালের প্রকাণ্ড কোঠাবাড়ীটা।

রাধামোহন নদীর দিকের বারান্দাতে বসে একটা বই হাতে নিয়ে পড়বার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু বইএ মন বসাতে পারলে না।

কেমন সুন্দর ছোট্ট গ্রাম্য নদীটি, ওপারে বাঁশবন, আমবন—বহুকালের। ফলের বাগান যেন প্রাচীন অরণ্যে পরিণত হয়েছে। একা এতবড় বাড়ীতে থাকতে বেশ লাগে। খুব নির্জন, পড়াশুনো করবার পক্ষে কিংবা লেখাটেখার পক্ষে বেশ জায়গাটি। তাদের পৈতৃক বসতবাটী বটে, তবে কতকাল ধরে তাদের কেউ এখানে আসেনি, কেউ বাস করেনি।

রাধামোহনের বাবা ৺শ্যামাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বাল্যবয়সে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যান। মেদিনীপুরে তাঁর মামার বাড়ী। সেখান থেকে লেখাপড়া শিখে মেদিনীপুরে ওকালতি করে বিস্তর অর্থ উপার্জন করেন এবং সেখানে বড় বাড়ীঘর তৈরি করেন। স্বগ্রামে যে একেবারেই আসেননি তা নয়, তবে সে দু-একবারের জন্যে। এসে বেশি দিন থাকেনওনি। অতবড় পসারওয়ালা উকিল, থাকলে তাঁর চলত না।

গ্রামের বাড়ীতে জ্ঞাতি-ভাইরা এতদিন ছিল, তারা সম্প্রতি এখান থেকে উঠে গিয়ে অন্যত্র বাস করছে, কারণ গ্রামে বসে থাকলে আর সংসার চলবার কোন উপায় হয় না।

যা কিছু জমিজমা আছে, না দেখলে থাকে না। বাড়ীটারও একটা ব্যবস্থা করতে হয়। নইলে বাড়ীঘর সব নষ্ট হয়ে যাবে।

রাধামোহন নিজে গত বৎসর ওকালতি পাশ করে পরলোকগত পিতৃদেবের পসারে বসেছে। এবার দেশের চিঠি পেয়ে পূজোর ছুটিতে একাই গ্রামে এসেছে বাড়ীঘর এবং জায়গা-জমির একটা বিলি-ব্যবস্থা করতে।

পাশের বাড়ীর বৃদ্ধ ভৈরব বাঁড়ুজ্যে ক'দিন খুব দেখাশুনো করছেন। তিনি জোর করে তাঁর বাড়ীতে রাধামোহনকে নিয়ে গিয়ে ক'দিন খাইয়েছেন। নইলে রাধামোহন নিজেই রেঁধে খাবে পৈতৃক ভিটেতে, এই ঠিক করেই এসেছিল।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বড়ছেলে কেষ্ট এসে বললে—দাদা, চা খাবেন, আসুন।

—তুই নিয়ে আয় এখানে কেষ্ট। বেশ লাগছে সন্ধ্যেবেলাটা নদীর ধারে।

—আনব ?

—সেই ভাল, যা।

গ্রামের সবাই অবিশ্যি আত্মীয়তা করেছে, ভালবেসেছে। বৃদ্ধ লোকেরা বলেছে—আহা তুমি শ্যামাকান্তদা'র ছেলে, কেন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেতে যাবে। আমরা তো মরিনি এখনও। এস আমাদের বাড়ী।

রাধামোহন সকলের কাছেই কৃতজ্ঞ।

কেষ্ট চা দিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে চলে গেল। তারপর রাধামোহন আবার একলা। অন্ধকার রাত্রি, মধুমতীর জলে তারাভরা আকাশের ছায়া পড়েছে। রাধামোহন বসে বসে ভাবছে, এই এতবড় বাড়ীটা তার ঠাকুরদাদা তৈরি করেছিলেন কেন এখানে ? সেকালের পুলিশের দারোগা ছিলেন তিনি। অনেক পয়সা রোজগার করেছেন বটে কিন্তু বৈষয়িক বুদ্ধি ছিল না সেকালের লোকের। এই বনজঙ্গলে-ভরা গ্রামে কেউ পয়সা খরচ করে বাড়ী করে ? কি কাজে আসছে এখন ?

আচ্ছা সুরকির কলওয়ালারা বাড়ীটা নেয় ? তাহলে পুরনো ইঁটের দরে বাড়ীটা বিক্রি করা যায়।

খুট করে কিসের শব্দ শোনা গেল।

রাধামোহন দেখলে, একটি দশ এগার বছরের টুকটুকে ফর্সা মেয়ে ঘরের দাওয়ার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ঘরের মধ্যে হ্যারিকেন জ্বলছে, বারান্দাতে সামান্য আলো এসে পড়েছে, সুতরাং একেবারে অন্ধকারে সে বসে নেই।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে একবার ছেলে পাঠায়, একবার মেয়ে পাঠায়, লোকটা খুব যত্ন করছে বটে।

ও বললে—কি খুকি, ভাত হয়েছে বুঝি ?

একটু পরে মেয়েটি সংকোচের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

রাধামোহন বললে—তোমার নাম কি ?

—লক্ষ্মী।

—বেশ নাম। পড় ?

—উঁহু।

—গান জান ?

—উঁহু।

রাধামোহন হেসে বললে—তবে তো মুশকিল দেখছি, বিয়ের বাজারে তুমি যে বিপদে পড়বে। রান্না ?

বালিকা ঘাড় নেড়ে জানায়—সে জানে।

—ওই একটা ভাল গুণ রয়েছে তোমার। কি কি রান্না জান ?

—স-ব।

—সব ? বাঃ, বেশ খুকি তুমি। বস।

বালিকা সলজ্জভাবে ঘাড় নেড়ে বললে—না, বসব না।

—কেন ? কাজ আছে ?

—না।

—তবে বস।

—না, আমি যাই। তুমি খেয়ে এস।

—যাচ্ছি। ভাত হয়েছে ?

—তোমার খুব খিদে পেয়েছে—না ? যাও খেয়ে এস।

রাধামোহন কি একটা বলতে গিয়ে পেছন ফিরে দেখলে খুকি কখন চলে গিয়েছে। সে একটু পরে বাঁড়ুজ্যে-বাড়ী খেতে গেল।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে বললেন—এস বাবাজি, এস। রান্নাও হয়ে এল প্রায়।

রাধামোহন বললে—হ্যাঁ, আপনার মেয়ে ডাকতে গিয়েছিল যে—

খাওয়া-দাওয়া করে রাধামোহন চলে এল। একা নির্জন বাড়ীতে তার বেশ লাগে। তার পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষেরা যেন অদৃশ্যচরণে এখানে বিচরণ করেন। এই বাড়ীতে তার পিতামহ বাল্যকালে খেলে বেড়িয়েছেন। তার পিতামহী নববধূরূপে প্রথম এসে দুধে-আলতায় পা রেখে দাঁড়িয়েছেন এ-বাড়ীর প্রাঙ্গণে। আজ তারা বিদেশে গিয়ে বড় বাড়ী ফেঁদে বাস করছে, দেশকে ভুলেছে।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে সব পূর্বপুরুষেরা যেন এসে অনুযোগ করেন—কেন আমাদের ছেড়ে চলে গেলে ? কি করেছিলাম আমরা ?

পরদিন সকালে উঠে সে নিজের জমিজমা নিয়ে ব্যস্ত রইল, সারাদিন কাটল সে-ভাবে। রাত্রে বারান্দাতে বসেছে, আবার সেই খুকিটি এসে দরজার আড়ালে দাঁড়াল। প্রথমটা রাধামোহন টের পায়নি—বড় লাজুক মেয়ে, নিঃশব্দ চরণে কখন এসে যে দাঁড়ায় !

রাধামোহন বললে—ও খুকি ?

—উঁ ?

—ভাত হয়েছে নাকি ?

—আজ দেরি হবে। মাংস রান্না হচ্ছে তোমার জন্যে।

—সত্যি ? তবে তো আজ 'ফীস্ট'-এর ব্যবস্থা। ও, তুমি বুঝি 'ফীস্ট' বুঝতে পারলে না ? ভোজ যাকে বলে। কি বল ?

খুকি হেসে চুপ করে রইল। বেশ মেয়েটি। বেশি কথা বলে না, শান্ত সলজ্জ ব্যবহার। রাধামোহন বললে—তোমার মামার বাড়ী কোথায় খুকি ?

—ভুলে গিয়েছি।

—ভুলে গিয়েছি কি রকম ? সেখানে যাও না ?

খুকি ঘাড় নেড়ে বললে—না।

রাধামোহনের হাসি পেলে খুকির কথায়। বেশ নিঃসংকোচ ভাব ওর।

খুকি আবার বললে—তুমি একা এসেছ কেন ?

রাধামোহন হাসতে হাসতে বললে—কেন বল তো ?

—বৌঝিদের নিয়ে এস। এত বড় বাড়ী পড়ে আছে। আমোদ করুক।

—তোমার তাই ইচ্ছে খুকি ?

খু-উ-ব। আমি তো তাই চাই।

—কেন ?

—কতকাল এ বাড়ী এমনই পড়ে আছে না ! কেউ পিদিম দেয় না।

এ কথাটা ওর মুখ থেকে শুনে রাধামোহনের আশ্চর্য লাগল। এতটুকু মেয়ের মুখে এমন কথা ! পাকা গিন্নীর মত !

ও কৌতুকের সঙ্গে বললে—তোমার তাতে খারাপ লাগে নাকি খুকি ?

—বাঃ, লাগে না ! তোমরা সবাই এস, বাড়ীতে শাঁক বাজুক, সন্ধ্যের পিদিম দেওয়া হক।

কথা শেষ করেই সে ব্যস্তভাবে বললে—তোমার খুব খিদে পেয়েছে, না ? বড্ড রাত হয়ে গেল।

—না না, এমন আর বেশি রাত কি।

—তোমার আবার সকালে খাওয়া অব্যেস।

—তুমি কি করে জানলে খুকি ?

অস্ফুট হাসির সুর মাত্র শোনা গেল, কোন উত্তর এল না।

একটু পরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খুকি বললে—ভাল লাগে, বড্ড ভাল লাগে।

রাধামোহন ওর দিকে চেয়ে বললে—কি ভাল লাগে খুকি ?

—এই তুমি আজ এসেছ। কেউ তো কখনও আসে না এ বাড়ীতে। তুমি যাও, মাংস রান্না হয়ে গিয়েছে।

—হয়ে গিয়েছে! তুমি কি করে জানলে?

খুকি হেসে বললে—আমি জানি যে! যাও তুমি।

—দাঁড়াও, আমি মুখটা ধুয়ে আসি। একসঙ্গে যাব।

মুখ ধুয়ে এসে কিন্তু রাধামোহন খুকিকে আর দেখতে পেলে না। চঞ্চল মন ছেলেমানুষের, আগেই চলে গিয়েছে। বেশ খুকিটি, কেমন পাকা পাকা কথা বললে। হাসতে হাসতে প্রাণ যায়।

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে ওকে দেখে বললে—এস এস বাবাজি। এই তোমায় ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। আজ একটু রাত বেশি হয়ে-গেল, একটু মাংস নেওয়া হল আজ। বলি রোজ রোজ ডাল ভাত ওরা খেতে পারে না। আমার বাড়ী আজ দুদিন খাচ্ছে, সে আমার ভাগ্যি। নইলে ওদের অভাব কি! তাই আজ—

রাধামোহন সলজ্জভাবে বললে—না না, সে কি কথা! যা জুটবে তাই খাব। পর ভাবেন নাকি কাকা? আমি তো বাড়ীর ছেলে!

পরদিনও আবার খুকি সন্ধ্যার সময় এসে হাজির।

রাধামোহন বললে—এস খুকি। তোমার কথাই ভাবছিলাম।

খুকি হেসে বললে—আমার কথা?

—সত্যি তোমার কথা!

খুকি ছেলেমানুষী ভাবে ঘাড় দুলিয়ে হেসে বললে—কেন আমি জানি।

—তুমি জান?

—জানি। কিন্তু বলব না।

রাধামোহন আজ খানিকটা সন্দেশ আনিয়ে রেখেছে, খুকিকে দেবে বলে। অবিশ্যি আনিয়েছিল হরি নন্দীর চাকর অমূল্যকে দিয়ে, ইসলামকাটির বাজার থেকে। ইসলামকাটির সন্দেশ এ অঞ্চলে বিখ্যাত। অমূল্য দেখা যাচ্ছে গল্প করে বেড়িয়েছে। রাধামোহন মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল অমূল্যর উপর। খুকিকে হঠাৎ খুশি করে দেবে সন্দেশ হাতে দিয়ে ভেবেছিল। সেটা আর হল কই।

তবুও রাধামোহন বললে—না, তুমি জান না খুকি। কি বল তো?

খুকি মৃদু মৃদু হেসে বললে—জানি আমি।

ওর হাসির মধ্যে এমন একটা বিজ্ঞতা আছে যে রাধামোহন আর কোন প্রশ্ন করলে না এ নিয়ে। ও জানে। ওর মৃদু হাসির মধ্যে দিয়েই সে কথা বোঝা গেল।

অমূল্যটা আচ্ছা তো! পাড়াগাঁয়ের লোকের পেটে কোন কথা থাকে!

খুকি আবদারের সুরে বললে—কই, দাও আমাকে সন্দেশ?

রাধামোহন ব্যস্ত হয়ে ওকে সন্দেশ দিতে গেল, কিন্তু ওকে আর সেখানে দেখা গেল না। চঞ্চলা বালিকা, কখন হঠাৎ চলে গিয়েছে। ওর ধরন বড় আশ্চর্য রকমের!

আহারের সময় ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বাড়ীতে ও সন্দেশটা নিয়েই গেল। বললে—খুকি বড় লাজুক, তখন চলে এল, ওকে একটু এই—

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে হেসে বললে—খুকি বুঝি তোমার কাছে গিয়েছিল?

—রোজই যায়। গল্প-সল্প করে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, ও একটু লাজুক বটে। খুব ছেলেমানুষ তো।

পরদিন সন্ধ্যায় খুকি আবার নির্দিষ্ট স্থানটিতে এসে দাঁড়াল বারান্দাতে।

রাধামোহন বললে—কাল অমন করে চলে গেলে কেন তুমি? আমি ভারি রাগ করেছিলাম কিন্তু।

খুকি হেসে চুপ করে রইল।

—খেয়েছিলে সন্দেশ?

—বা রে, যখন তুমি বললে, ওই তো আমার খাওয়া হয়ে গেল।

পরক্ষণেই সে যেন স্নেহের সুরে বললে—তুমি এই এসেছ, আমার কত ভাল লাগছে! বাড়ীতে পিদিম জ্বলছে। একা একা ভাল লাগে?

—শহরে যাবে? চল আমার সঙ্গে। চল—

—আমার এখানেই ভাল। ওসব আমার ভাল লাগে বুঝি?

—বাঃ, কত টকি-ছবি, কত খাবার-দাবার—

—হক গে। আমার তাতে কি। তুমি আবার আসবে বল।

—আসব নিশ্চয়ই। কেন আসব না।

—এতদিন তো আসনি। ভিটেতে সন্ধ্যের সময় পিদিম জ্বলেনি তো? আচ্ছা আসি আজ। তুমি তো মঙ্গলবারে যাবে?

রাধামোহন একটু আশ্চর্য হল। মঙ্গলবারে সে যাবে, বলেছিল ভৈরব বাঁড়ুজ্যেকে। ভৈরব কাল আবার বাড়ীতে গল্প করেছেন!

তারপর দু দিন রাধামোহন বৈষয়িক কাজে অন্য গ্রামে গিয়ে রইল। সোমবার অনেক রাত্রে নৌকাযোগে স্বগ্রামে ফিরল বটে, কিন্তু ভৈরব বাঁড়ুজ্যের বাড়ীর কারও সঙ্গে অত রাত্রে আর দেখা করলে না। ঘরে চিঁড়ে ছিল, তাই খেয়ে রাত কাটালে।

পরদিন সে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে, ভৈরব এসে বললেন—বাবাজি, কাল কত রাত্রে এলে? খেলে কোথায়? আমাদের ডাকা তোমার উচিত ছিল। তুমি তো ঘরের ছেলে। এত লজ্জা কর কেন? ছিঃ—

রাধামোহন বললে—আপনার খুকিটিকে একবার ডেকে দিন না?

—বেশ বেশ। এখুনি ডাকছি—দাঁড়াও—

একটু পরে একটি আট বছরের কালো-মত মেয়ের হাত ধরে ভৈরব বাঁড়ুজ্যে সেখানে নিয়ে এলেন। রাধামোহন বললে—এ খুকি তো নয়, এর দিদি!

ভৈরব বাঁড়ুজ্যে বললেন—এর দিদির তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। সে তো শ্বশুরবাড়ী আছে। তুমি তাকে দেখনি।

—তবে আপনার বাড়ীর অন্য কোন মেয়ে—

—আমার বাড়ীতে বাবাজি আর কোন মেয়ে নেই। তবে অন্য কোন মেয়ে—কিন্তু না, আর কোন মেয়ে এ-পাড়ায় নেই ও-বয়সের। দু ঘর তো মোটে ব্রাহ্মণের বাস। বয়স কত?

রাধামোহনের হঠাৎ মনে পড়ে গেল, বললে—ওর নাম বলেছিল লক্ষ্মী।

—লক্ষ্মী? সে আবার কে? কই ও-নামের মেয়ে এ-গ্রামেই নেই। তোমার শুনতে-টুনতে ভুল হয়ে থাকবে বাবাজি।

—শুনতে ভুল হতে পারে নামটা, কিন্তু সে খুকিটি কে? সে তো আর ভুল হবে না।

—কই বাবাজি, বুঝতে তো পারলাম না। ও-বয়সের ও-নামের মেয়ে আমাদের পাড়ায় কেউ নেই ঠিকই।

রাধামোহন চিন্তিত মনে বিদায় নিলে। আশ্চর্য ব্যাপার, খুকিই বা আর দেখা করতে এল না কেন?

স্বগ্রাম থেকে ফেরবার দু বছর পরে রাধামোহন তার পিসির বাড়ী গিয়েছে জব্বলপুরে। সেখানে পুরনো এক ফোটো-অ্যালবাম খুলে দেখতে দেখতে একটি মেয়ের ফটো চোখে পড়ল। এই মেয়েটিকে সে যেন কোথায় দেখেছে। ঠিক মনে পড়ল না।

পিসিমাকে ডেকে ফোটোটা দেখাতে তিনি বললেন—একে তুই দেখবি কোথায়! ও তো আমার ছোট বোন। তোর ছোট পিসি। বারো বছর বয়সে মারা যায়, তখন তুই কোথায়? তোর মার বিয়েই হয়নি। আমরা তখন সব আমাদের গাঁয়ের বাড়ীতেই থাকি।

তারপর পিসিমা কতকটা যেন আপনমনেই বললেন—আহা, একটু একটু মনে হয় ওকে। বেশ দেখতে ছিল। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। তারপর তোর বাবাও দেশ ছেড়ে মেদিনীপুর চলে এল। দেশের বাড়ীতে যাওয়াই হয়নি। বিয়ের পর আমি একবার মোটে গিয়েছিলাম, সেও আজ বিশ বছর আগের কথা।

রাধামোহন অবাক হয়ে চেয়ে রইল অ্যালবামখানা হাতে করে। হঠাৎ মনে পড়াতে বললে—কি নাম ছিল ছোট পিসিমার?

পিসিমা উত্তর দিলেন—লক্ষ্মী।

দুর্মতি

নিশ্চিন্তপুর গ্রামের প্রান্তে হরিচরণ রায়ের ছোট একখানা কোঠাবাড়ি ছিল। সংসারে থাকিবার মধ্যে তাহার স্ত্রী আর এক ছেলে। হরিচরণ রায়ের বয়স বছর ত্রিশেক, স্ত্রীর বয়স একুশ-বাইশ। হরিচরণ রায়ের লেখাপড়া এমন বিশেষ কিছুই জানা ছিল না, তাহার উপর নিতান্তই পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কাজেই কোথাও না যাইয়া তিনি বাড়ী বসিয়া পৈতৃক আমলের সামান্য একটু জমিজমার খাজনা সাধিতেন। কচু কুমড়া বেগুন—আবাদ করিতেন ঠিক বলা চলে না—পুঁতিতেন, ইহাতেই তিন প্রাণীর একপ্রকার কষ্টে-সৃষ্টে সংসার চলিয়া যাইত।

পৌষ মাস। খুব শীত। সন্ধ্যার সময় এক দূর প্রজাবাড়ী হইতে খাজনা আদায় করিয়া হরিচরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। স্ত্রী বীণাপাণি উঠানের তুলসীতলায় সন্ধ্যা দিতেছিল, স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তুলসীতলায় প্রণাম সারিয়া, হাসিমুখে কাছে আসিয়া বলিল—তবে যে বলা হল ফিরতে অনেক রাত হবে? আমি এখনও ডাল বাটিনি।

হরিচরণ হাতের পুঁটুলি নামাইতে নামাইতে বলিল—এলাম চলে। খাজনা তো এক পয়সাও দেবে না, মিথ্যে হায়রান হওয়া।

বীণাপাণি হাতের প্রদীপ নামাইয়া রাখিয়া বলিল—একটু দাড়াও, আমি কুয়ো থেকে টাটকা জল তুলে দি, তবুও একটু গরম হবে এখন। এবার যে শীত পড়ল তাতে পুকুরের জলে আর কাজ চলবে না।

হরিচরণের ছেলে নীপু বাবার গলার স্বর পাইয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। মাকে নিশ্চিন্তমনে তুলসীতলায় প্রদীপ দিতে দেখিয়া সে ঘরের মধ্যে তাকের হাঁড়ি হইতে আমসত্ত্ব চুরির কাজে ব্যাপৃত ছিল। বাবার গলার স্বরে বুঝিল বিপক্ষ সজাগ হইয়াছে। সে ক্ষুণ্ণমনে বাহির হইয়া আসিয়া বাবার বড় পুঁটুলিটা দেখিয়া হঠাৎ নিজের অসাফল্যের দুঃখটা ভুলিয়া গেল। বাবাকে সে একটু ভয় করিত। হঠাৎ কাছে না আসিয়া আঙুল দিয়া পুঁটুলিটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি বাবা এতে?

হরিচরণ বলিল—হ্যাঁরে, এই বাঁদর, এই শীতে একটা কিছু গায়ে দিতে নেই তোর? ওগো, নীপুর সে দোলাইখানা কোথায় গেল?

বীণাপাণি জলের বালতি নামাইয়া বলিল—সেই বিকেলবেলা থেকে বলছি ছেলেকে, ও কি কারুর কথা শোনে। গায়ে দিয়ে দিলেও গায়ে রাখবে না। ওই তো, কাঠের আলনায় দোলাই রয়েছে।

হরিচরণ বলিল—হুঁ! সে বেতখানা কোথায় গেল?

নীপু প্রমাদ গনিয়া মার মুখের দিকে চাহিল। বীণাপাণি বলিল—থাক গো, আজ আর কিছু ব'লো না। তারপর ছেলেকে কাছে টানিয়া বলিল—এবার ফের কিন্তু যেদিন—

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল বীণাপাণি রান্নাঘরে বসিয়া ডাল বাটিয়া কি একটা পিঠা তৈয়ারির যোগাড় করিতেছে, বাহিরের কনকনে শীত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হরিচরণ উনানের পাশে বসিয়া তামাক টানিতেছে ও স্ত্রীর সহিত খোশগল্প করিয়া সমস্ত দিনের শ্রম নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। নীপু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বীণাপাণি ভুলই শুনুক কি যাই হক, স্বামী বাহির হইয়া যাইবার সময় সে শুনিয়াছিল তাঁহার ফিরিতে রাত হইবে, কাজেই যে ডাল পূর্বে বাটা উচিত ছিল তাহা সে এখন বাটিতে বসিয়াছে। ইহার পর কখন কি হইবে? বীণাপাণি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি বাটিতে লাগিল।

হরিচরণ ভাল করিয়া এক কলিকা তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল—অত করে তাড়াতাড়ি করছিস কেন রে? না হয় একটু রাতই হবে এখন। এই তো সবে সন্ধ্যে, শেষে আঙুল-টাঙুল ছেঁচে ফেলবি?

নিতান্ত ঘরোয়া লোক হরিচরণের স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণের রীতি এই রকমই। অবশ্য ছেলেপিলের সম্মুখে এবং বাহিরের লোকের কাছে সম্ভাষণের অন্য রীতি আছে। এটা নির্জনের একটু গাঢ় রকমের আদরের ডাক।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—কেন? আঙুল কি রোজই ছেঁচি নাকি?

বীণাপাণি দেখিতে মন্দ নহে—রংটি খুব ফরসা না হইলেও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখের গড়নটি বেশ সুন্দর, চোখদুটিও ডাগর ডাগর। পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-বধূ, কাজকর্মে থাকে বলিয়া শরীরেও বেশ নিটোল স্বাস্থ্য।

হরিচরণ তামাক টানিতে টানিতে বলিল—না, সত্যি বৌ, দেখ কতদিন ভাবছি, একজোড়া ভালরকম অনন্ত তোকে গড়িয়ে দেব, তা 'এই হবে, এই হবে' করে—বুঝলি না?

বীণাপাণি একটুখানি হাসিয়া মুখ নীচু করিল। সে বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী আসিয়া আজ দশ বৎসর ধরিয়া এ কথা শুনিয়া আসিতেছে। একজোড়া সোনার অনন্ত গড়াইয়া দেওয়া যে তাহার দরিদ্র স্বামীর পক্ষে কতটা অসম্ভব, তাহা সে বুঝিত। স্বামীকে একটু ভুলাইবার জন্য সমদুঃখে বলিল—তা এবার তো হয়েও যেত; ঐ সেটেলমেন্টের খরচা দিতেই তো অনেকটা বেরিয়ে গেল।

হরিচরণের সামান্য যাহা কিছু জমিজমা ছিল, এবার সেটেলমেন্টের খরচ বাবদ তাহার দরুন গভর্নমেন্টের লোককে ত্রিশ টাকা দিতে হইয়াছিল। সে কিন্তু স্ত্রীর কাছে, ও যে-সব লোকে জমিজমার ধার ধারে না তাহাদের নিকট প্রচার করিয়া বেড়াইত যে, তাহার পৈতৃক অনেক জমি লোকে ফাঁকি দিয়া খাইত, এখন সেটেলমেন্টে সেগুলি সে ফিরিয়া পাইয়াছে, প্রায় 'শদাবধি' টাকা এজন্য তাহাকে খরচা দিতে হইয়াছে, সেটেলমেন্টের ক্যাম্পে তাহার খুব খাতির হইয়াছে, ইত্যাদি। স্ত্রীর চোখে বড় হইতে সকলেই চাহে।

স্ত্রীর মুখে সেটেলমেন্টের কথা শুনিয়া হরিচরণ আরম্ভ করিল—দেখ্, সেদিন তো ক্যাম্পে গেলাম। আমাদের গাঁয়ের অনেক সব বড় বড় (হরিচরণ আঙুল দিয়া দেখাইল)—হুঁ হুঁ

—ডেকে জিজ্ঞাসাও করলে না কানুনগো। আমি যেতে মাত্রই কানুনগো একেবারে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, বললে, 'আসুন জমিদার মশায়, আসুন!' সাতবেড়ের দরুন সেই জমার যে কাগজপত্র গোলমাল হয়েছিল বুঝলি তো—তা বলতেই কানুনগো মুহুরীদের সব বকে উঠল, বললে—'রায় মশায়, আমি না থাকলেই এরা সব গোলমাল করে ফেলে; আপনি বসুন, আমি বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।'—সে খাতির কী!

স্ত্রীর ডাগর চোখের প্রশংসমান দৃষ্টিতে উৎসাহিত হইয়া হরিচরণ অধিকতর ভিত্তিহীন কি একটা ফাঁদিতে যাইতেছিল, এমন সময় তাহাদের বাহিরের বাড়ীর সদর দরজায় কে যেন ঘা দিতেছে শোনা গেল।

বীণাপাণি বলিল—ওগো, দরজায় কে যেন ঘা দেয়?

হরিচরণ বলিল—কই না, এত রাত্রে কে ঘা দেবে?

সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় আঘাতের শব্দ ও কার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

বীণাপাণি বলিল—ঐ যে কে ডাকছে, দেখ না একবার?

হরিচরণ শঙ্কিত হইল। পূর্বেও যে আঘাতের শব্দ সে না শুনিয়াছিল এমন নহে। কিন্তু এই শুনিতে না পাওয়ার ভান করিবার মূলে একটু প্রত্নতত্ত্ব নিহিত আছে। আজ তিন বৎসর পূর্বে ঠিক এই পৌষ মাসেই সে রামনারায়ণপুরের হাটে এক কাবুলী আলোয়ান বিক্রেতার নিকট ধারে দশ টাকা মূল্যের একটা আলোয়ান খরিদ করিয়াছিল। হতভাগ্য কাবুলীওয়ালা দুই বৎসর যাবৎ হাঁটাহাঁটি করিয়াও এ পর্যন্ত টাকা পাওয়া তো দূরের কথা, হরিচরণের সাক্ষাৎ পর্যন্ত পায় নাই। হরিচরণ শঙ্কিত চিত্তে সামনের উঠানে গেল। সেই কাবুলীওয়ালাটা এত রাত্রে আসে নাই তো! বিচিত্র কি! সঙ্গে কি সে তাহার দুই একজন দেশভ্রাতাদের আনিয়াছে? তাহা হইলে উপায়?

সন্তর্পণে বাহির-বাটীর দরজার নিকট যাইতে যাইতে হরিচরণ শুনিতে পাইল দরজার বাহির হইতে বাংলায় কে উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—'রায় মশায় কি বাড়ী আছেন?' যাক বাঁচা গেল। তাহা হইলে কাবুলীওয়ালাটা নয়।

হরিচরণ খিল খুলিয়া দিল। দেখিল বাহিরে একজন অপরিচিত ভদ্রবেশী প্রৌঢ় দাঁড়াইয়া।

প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা করিলেন—এইটেই কি হরিচরণ রায় মশায়ের বাড়ী?

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে আমারই নাম।

প্রৌঢ় বলিলেন—তা বেশ। বড় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আসছি কলকাতা থেকে—এই ট্রেনেই আসছি। তোমার শ্বশুর রামজীবনবাবু আমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। তাঁর ওখানে একসময় আমার খুব যাতায়াত ছিল। তবে এখন আমিও বাইরে বাইরে থাকি, এই-জন্যে ততটা আর—। তা বেশ বেশ, বড় সন্তুষ্ট হলাম বাবাজীবনকে দেখে। বীণা এখানেই আছে তো?

হরিচরণ বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আসুন বাড়ীর মধ্যে।

মুখে অভ্যর্থনা করিলেও মনে মনে সে অত্যন্ত চটিয়া গেল। দিব্য শীতের রাত্রে স্ত্রীর সহিত গল্প জমাইয়া আনিয়াছিল, তা নয়, এখন আবার রাঁধ ভাত, নিয়ে এস জলখাবার—কোথায়ই বা পিঠা, আর কোথায় বা কি। শ্বশুরগিরি ফলাবার আর সময় পেলেন না। এর চেয়ে সে কাবুলীওয়ালাও যে ছিল ভাল! নাঃ—এই সব দুর্বৃত্তের জন্য দুনিয়ায় আর সুখশান্তি নাই।

প্রৌঢ় বলিলেন—বাবাজি, তোমার শ্বশুরের সঙ্গে আমার হরিহরাত্মা ছিল। আমার নাম শুনেছ কিনা জানি না—আমার নাম কৃষ্ণলাল গাঙ্গুলি। ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব—তার ছেলেপিলে সব আমার কোলেপিঠে মানুষ। তোমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি লাহোরে চাকরি করি, কাজেই আসতে পারিনি। আহা, ছোকরা অল্প বয়সেই মারা গেল। সবই ভবিতব্য!

হরিচরণের বাড়ীর দালান ছিল নিতান্ত ছোট; পৈতৃক আমলের বাড়ী, অনেকদিন মেরামত হয় নাই। জানালার কবাট খুলিয়া পড়িয়াছে, কোন-কোনটি নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি দিয়া গরাদের সহিত বাঁধা। হরিচরণ কৃষ্ণলালবাবুকে দালানে একটা ছোট টুলের উপর বসাইয়া বলিল—বসুন, আমি বাড়ীর মধ্যে বলি।

কৃষ্ণলালবাবু বসিয়া দেখিলেন, দালানের দরজা জানালা একটাও ভাল অবস্থায় নাই। সবগুলির ফাঁক দিয়াই হু হু করিয়া হিম আসিতেছে। বন্ধুর এ কন্যাটি সকলের ছোট, তিনটি মেয়ের বিবাহ দিবার পর সর্বস্বান্ত হইয়া তাহার বিবাহ দেন। সে যে ভাল পাত্রে পড়ে নাই তাহা তিনি জানিতেন। কৃষ্ণলালবাবু মনে মনে কষ্ট অনুভব করিলেন।

মিনিট চার-পাঁচ পরে উত্তরদিকের দরজা ঠেলিয়া বীণাপাণি দালানে প্রবেশ করিল।

কৃষ্ণলালবাবু তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—এস এস, বীণু মা আমার এস। ওঃ, সেই তোর বিয়ের আগে মা—তখন আমি—

বীণাপাণি গলায় আঁচল দিয়া কৃষ্ণলালবাবুকে প্রণাম করিল। কৃষ্ণলালবাবু তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন—এস এস, সাবিত্রী-সমান হও মা। দেখি মা বীণু মুখখানা তোর, কতদিন দেখিনি।

বীণাপাণির মাতাপিতা কেহ ছিল না। বাপের বাড়ী ভাইএরা থাকিলেও পিতার মৃত্যুর পর তাহার বড় খোঁজখবর করিত না। আজ পাঁচ-ছয় বৎসর সে বাপের বাড়ী যায় নাই বা বাপের বাড়ীর কাহাকেও দেখে নাই। নির্জনে তাহার মায়ের মুখ মনে পড়িত, বাপের মুখ মনে পড়িত, শৈশবের সাথীদের মুখ মনে পড়িত, উঠানের বকুলতলায় সেঁজুতি ব্রতের কথা মনে পড়িত। তার বিরহী প্রাণটি পুকুরের ঘাটের চালতাতলায়, শত শৈশবের স্মৃতিভরা তাহাদের পাড়ার ধুলামাটির পথে পথে, সেই বকুলফুলদের বুকে মুখ লুকাইয়া মনের সমস্ত দুঃখকষ্ট উজাড় করিয়া দিত—অসহ্য তৃষ্ণায়। ভাইএরা তাহার খোঁজও করে না। সে ভাবিত, আজ মা-বাপ বাঁচিয়া থাকিলে কি তাহাকে এরূপ করিয়া ফেলিয়া থাকিতে পারিতেন? হাজার হউক, মেয়েমানুষ—অনেক দিন পরে পিতৃসম পিতৃবন্ধুকে পাইয়া তাহার সেই অভিমানই সকলের

চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিল। ডাগর চক্ষু-দুটি ছাপাইয়া চোখের জল ঝরঝর করিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কৃষ্ণলালবাবু তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিতে দিতে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—ছিঃ বীণু, মা আমার—কেঁদো না। কাঁদে কি মা, ছিঃ!

বীণাপাণি আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে কাঁদ-কাঁদ সুরে বলিল—এতদিন কোথায় ছিলেন জেঠামশায়?

—আমি তো লাহোরে ছিলাম অনেকদিন। তার পরে দেশে এসে সব শুনলাম। তোর বিয়ের সময়ও আমি চিঠি পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আসতে পারলাম না। বড় জরুরী কাজ পড়ে গেল। এই তো সেদিনকার কথা—

—নরুদা ভাল আছে জেঠামশায়?

—নরু ভাল আছে, পড়ছে। এবার বি-এ পরীক্ষা দেবে।

—আমার কথা বলে নরুদা?

—বলে না মা! খুব বলে। তার নিজের বোন নেই, তোকেই বোনের মত ছেলেবেলা থেকে জানে। ছেলেবেলা খেলা হতে হতে তুই একবার ঝগড়া করে নরুর মুখ আঁচড়ে দিয়েছিলি, তোর মনে আছে বীণু?

বীণাপাণি একটুখানি হাসিল; সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শৈশবের সাথী নরুদার কথা মনে পড়ায় তার চোখের পাতা পুনর্বার অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বলিল—নরুদা আমায় একবারটি দেখতে আসে না কেন জেঠামশায়? আপনি গিয়ে একবার পাঠিয়ে দেবেন?

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—দেব বই কি মা, দেব। তবে এখন তো আসতে পারবে না, এবার যে তার পরীক্ষা কিনা। বি-এ পরীক্ষা হয়ে গেলে তখন তোকে একবার দেখে যাবে, বলে দেব।

বীণাপাণির মনে পড়িল, রাত হইয়াছে, জেঠামশায়ের আহারাদির বন্দোবস্ত তো করিতে হইবে। সে বলিল—আপনি বসুন জেঠামশায়—

কৃষ্ণলালবাবু শশব্যস্তে প্রায় চৌকি হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—শোন মা, শোন। আমার জন্যে এত রাত্রে কিছু রাঁধতে-টাঁধতে হবে না। আমি রাত্রে বরং—

বীণাপাণি ঘাড় বাঁকাইয়া জননীর মত শাসনের সুরে বলিল—আচ্ছা সে হবে, বসুন জেঠামশায়। আমি সে বুঝব।

কৃষ্ণলালবাবু হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বীণাপাণির বড় ইচ্ছা হইল জেঠামশায়কে শীতের রাত্রে গরম গরম লুচি ভাজিয়া খাওয়ায়। কিন্তু পয়সা কই? তাহাতে এখনই তো প্রায় এক টাকা খরচ। সংসারে অসচ্ছলতা যে কতদূর তাহা তো সে জানে। সে রান্নাঘরে গিয়া দেখিল স্বামী উনুনের পাড়ে বসিয়া আপনমনে তামাক টানিতেছে। স্ত্রীকে দেখিয়াই হরিচরণ বলিল—তা, কি, ভাত-টাত তো আবার রাঁধতে হবে?

বীণাপাণি বলিল—একটা কথা বলি, রাখবে? জেঠামশায়ের বয়স হয়েছে। আমার

কাছে এসেছেন, এ সময় যদি একটু সেবা-যত্ন করতে না পারব তবে মেয়েজন্ম মিথ্যে নিয়েছিলাম। আমি ভাবছি জেঠামশায়কে খানকতক লুচি ভেজে দিই। তুমি তোমার সেটেলমেণ্টের টাকা থেকে একটা টাকা নিয়ে গিয়ে বিপিনের দোকান থেকে জিনিস কিনে নিয়ে এস না?—আনবে?

হরিচরণ কিছু পূর্বে স্ত্রীর নিকট যে জমিদারগিরির আস্ফালন করিয়াছিল, আসন্ন বিপদের মুখে সে কথা ভুলিয়া গেল। মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল—তা তো আনলে ভালই হত—মানে আনা তো কিছু উচিত ছিল, কিন্তু হয়েছে কি, এই চব্বিশের মধ্যে টাকা দাখিল না করলে আবার সার্টিফিকেট জারী হবে। ঐ যা যোগাড় করা আছে—তা থেকে—

বীণাপাণি উপায় ঠাওরাইয়া রাখিয়াছিল, বলিল—তুমি তার জন্যে ভেবো না, আমার কানের ছেঁদা ভাল হয়নি, মাকড়ি পরতে বড় ব্যথা হয়—আজই খুলে রাখতাম, তা নীপুর জন্মবার বলে খুলিনি। তুমি ঐ থেকে টাকা নিয়ে যাও, কাল সকালে বরং মাকড়ি বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা আর কোথাও পাবে না? মাকড়ি তো সেই খুলতেই হবে?

ইহার পর আর কোন প্রতিবাদ করা ভাল দেখায় না বলিয়া হরিচরণ বলিল—তবে একটা বাটি দাও, ঘিটা আনতে হবে। যাই দেখি—

হরিচরণ চলিয়া গেলে বীণাপাণি দালানে গিয়া দেখিল কৃষ্ণলালবাবু চামড়ার ব্যাগ খুলিয়া কি সব জিনিসপত্র বাহির করিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—মা বীণু, শোন, এদিকে আয়। আমার একটা সাধ তোকে পুরোতে হবে মা।

বীণাপাণি হাসিয়া বলিল—কি জেঠামশায়?

—তুই ছেলেবেলা আমার কাছে বসে আমার জলখাবার থেকে খাবার তুলে খেতিস তোর মনে আছে? আমি কলকাতা থেকে খাবার এনেছি ব্যাগে করে, তোকে ছেলেবেলার মত খাওয়াব বলে। আয় এখানে বোস বীণু—তোকে কতদিন খাওয়াইনি! তখন এই সব খাবার খেতে তুই খুব ভালবাসতিস তোর মনে আছে? আয় মা, এখানে বোস দিকি।

জেঠামশায়ের কথা শুনিয়া বীণাপাণির খুব আমোদ অনুভব হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, বাপ-জেঠা ভিন্ন কি কেউ মেয়ের কষ্ট বোঝে? সে খাইতে ভালবাসে সত্য, কিন্তু সেজন্য এখানে তো কেউ কোনদিন তাহাকে আদর করিয়া ভাল কিছু খাইতে দেয় নাই, পূর্বে তো তাহার শ্বশুরশাশুড়ী বর্তমান ছিলেন! আর জেঠামশায় আজ কলিকাতা হইতে ব্যাগে বহিয়া খাবার আনিয়াছেন তাহাকে খাওয়াইবার জন্য! শুধু যত্ন ও স্নেহ দান করিতে করিতে তার মনটি যে গৃহিণী ও জননীর প্রবীণত্বে উপনীত হইতেছিল, আজ এই প্রৌঢ়ের সংস্পর্শে তাহার সে মনটি আবার দশ বৎসরের ছোট মেয়ের মত হইয়া গেল। তাহার পর তাহার ঘুমন্ত খোকা নীপুর কথা মনে পড়িল—সেও খাবার খাইতে ভালবাসে। এ পর্যন্ত জেঠামশায় নীপুর কথা কিছু বলেন নাই, বোধ হয় তাহার কথা তিনি জানেন না—জানিলে নিশ্চয় তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নিজে বলিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল।

বীণাপাণি আসিয়া জেঠামশায়ের কাছে গিয়া বসিল। কৃষ্ণলালবাবু আহ্লাদে আত্মবিস্মৃত-প্রায় হইলেন। বাম হাতে বীণাপাণির মাথার চুলগুলির মধ্যে আঙুল চালাইতে চালাইতে তিনি তাহাকে খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন। স্নেহ-মায়ায় তাঁহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন—মা বীণু, সেই তুই ছেলেবেলায় আমার জলখাবার থেকে জোর করে টপ টপ খাবার তুলে খেতিস, তোর মনে আছে কি? তখন তুই খুব ছোট। মা আমার কত রোগা হয়ে গিয়েছে (এ কথা সত্য নহে, কারণ বীণাপাণি পূর্বাপেক্ষা বরং সুস্থই ছিল)—আজ যদি রাম থাকত—! এইটে খেয়ে দেখ মা, একে রাজভোগ বলে—এ তুই কখনও খাসনি, এ কলকাতা ছাড়া সব জায়গায় বড় একটা মেলে না। কেমন, ভাল নয়?

বীণাপাণির মনে হইল নীপু কখনও রাজভোগ খায় নাই। সে খাইতে খাইতে নতমুখে ঘাড় নাড়িল।

আরও কিছু খাইবার পর বীণাপাণি বলিল—জেঠামশায়, আর কত খাব?

—আচ্ছা, এই অমৃতিখানা শুধু খা। আর খাবারগুলো তুলে রেখে দে, জামাইকে—। তার পর বলিলেন—একটু দাঁড়া, এই দেখ্ দিকি, এই ব্রেসলেট-জোড়াটা তোর জন্যে গড়িয়েছি মা, দেখ্ দিকি, হাতে হবে তো?

কৃষ্ণলালবাবুর নিজের মেয়ে ছিল না। বন্ধুকন্যাকে শৈশব হইতেই তিনি নিজের কন্যার ন্যায় দেখিতেন। বহুদিন দেশে আসেন নাই—বিদেশ হইতে দেশে আসিবার সময় প্রথমেই তাঁহার বীণাপাণির কথা মনে পড়িল। প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ করিয়া দিল্লীতে তিনি বীণার জন্য এই ব্রেসলেট-জোড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণলালবাবু ব্রেসলেট-জোড়াটি বীণাপাণিকে দেখাইবার জন্য প্রদীপের সম্মুখে ধরিলেন। ক্ষীণ আলোয় তাহার চারিদিকের পাথরগুলি ঝক ঝক করিয়া উঠিল।

বীণাপাণি ব্রেসলেট দেখিয়া শুধু আশ্চর্য নয়, মুগ্ধ হইয়া গেল; সে এরূপ জিনিস কখনও দেখে নাই। ওগুলি কি জ্বলিতেছে, পাথর? পাথর ঐরকম জ্বলে নাকি?—ওমা! বিস্ময়ে তাহার মুখ দিয়া কথা সরিল না।

কৃষ্ণলালবাবু বলিলেন—দেখি মা, তোর হাত?

বীণাপাণির হাতের সবুজ ও লাল রঙের জার্মানি কাঁচের চুড়িগুলোকে বিদ্রূপ করিয়া ব্রেসলেটের দামী চুনি, পান্না, হীরা-জহরতগুলি যেন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রদীপের আলোক শতভাগে ভাগ করিয়া ব্রেসলেট-জোড়া বীণাপাণির হাতে যেন লাল সবুজ নীল আগুনের ফুল্কি উড়াইয়া জ্বলিতে লাগিল।

বীণাপাণি নিজের হাতের দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চোখ ফিরাইতে পারিল না। গহনা আবার এ রকম হয় নাকি?

কৃষ্ণলালবাবু বীণাপাণির ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে গহনাটি তাহার পক্ষে অপ্রত্যাশিতরূপে সুন্দর হইয়াছে। ইহাতে তিনি মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইলেন। আহা,

গরিবের ঘরে পড়িয়া মেয়েটা কত কষ্টই পাইতেছে, তবু এ বুড়া তো তাহাকে একটু আনন্দ দিতে পারিল।

এই সময় হরিচরণ দোকান হইতে ফিরিল। দালানের বাহিরে তাহার আসিবার শব্দ শুনিয়া বীণাপাণি দালান হইতে সরিয়া গেল। একটু পরে সে যখন রান্নাঘরে লুচি ভাজিতে বসিয়াছে, হরিচরণ সেখানে আসিলে বীণাপাণি হাসিতে হাসিতে বলিল—আজ কি দেখাব বল দিকি ?

কৃষ্ণলালবাবু হরিচরণকে গহনার সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, কারণ বলা তাঁহার পক্ষে একটু অশোভন হইত।

হরিচরণ বলিল—কি ?

ব্রেসলেট পাইয়া বীণাপাণির আনন্দ আর ধরিতেছিল না। সে ব্রেসলেটটা স্বামীকে দেখাইবার জন্য কেসে পুরিয়া কেসটা রান্নাঘরে আনিয়াছিল। স্বামীর সঙ্গে একটু কৌতুক করিতে ইচ্ছা হইল, বলিল—আচ্ছা, একটুখানি চোখ বুজিয়ে থাক দিকি নি, আমি একটা ভেলকি দেখাব।

হরিচরণ বলল—কি, শুনি ?

বীণাপাণি বলিল—আচ্ছা, বোজাও না একটু চোখ, দেখাচ্ছি।

—আমি পিছন ফিরছি, কি দেখাবে দেখাও।

বীণাপাণি কেস খুলিয়া নিজের হাতে পরিল, তার পর হাসিমুখে বলিল—চেয়ে দেখ এদিকে।

হরিচরণ হঠাৎ চাহিয়া দেখিতেই যেন চমকাইয়া উঠিল। বলিল—কি ও ?

বীণাপাণি বলিল—কি বল দেখি ?

হরিচরণ নাচু হইয়া স্ত্রীর হাতের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল। সেও দরিদ্রসন্তান, এরকম জিনিস কখনও দেখে নাই—হাঁ করিয়া অনেকক্ষণ ব্রেসলেট-জোড়ার দিকে চাহিয়া রহিল।

বীণাপাণি সকৌতুকে বলিল—কোথায় পেলাম বল দেখি ?

হরিচরণ বলিল—উনি দিলেন বুঝি ? দেখি—। তাহার পর ব্রেসলেটের পাথরগুলির উপর সন্দিগ্ধভাবে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—এগুলো বোধ হয় কাঁচ। এরকম কাঁচ-বসানো আংটি তো দেখেছি—কলকাতা থেকে হরিগাঁয়ের মেলায় বিক্রি করতে আনে—এর দাম বেশি নয়।

বীণাপাণি বিজ্ঞ জহুরীর মত মুখখানা গম্ভীর করিয়া বলিল—হ্যাঁ, কাঁচ ! এসব পাথর, খুব দামী পাথর।

হরিচরণ বলিল—তুই কি করে জানলি পাথর ? তুই পাথর চিনিস ?

বীণাপাণি মুখ হইতে বিজ্ঞতার বোঝা ভাল করিয়া না নামাইয়াই বলিল—জেঠামশায় বললেন যে।

হরিচরণ ব্রেসলেট-জোড়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভাল করিয়া দেখিল, তারপর বলিল—তা যদি হয় তাহলেও কিন্তু এর দাম তিনশ' টাকার এক পয়সা বেশি নয়।

বীণাপাণি সন্দিগ্ধসুরে বলিল—তুমি কি করে বুঝলে? জেঠামশায় যে বললেন পাথরগুলোর দাম খুব বেশি?

হরিচরণ বলিল—ঐ রকমই হবে। তিনশ' না হক, সাড়ে তিনশ-ই হল—তার বেশি আর কত হবে। আজকাল পাথরের দাম কি। আর পাথরেই তো সব জায়গা ছেয়ে ফেলেছে, সোনা আর ওতে কতটুকু আছে!

বীণাপাণির একথা বিশ্বাস হইল না। এক জোড়া অনন্ত গড়াইতে সে শুনিয়াছে পাঁচশ টাকার বেশি পড়ে, আর এক জোড়া দামী পাথর বসানো ব্রেসলেট যে তিনশ' টাকায় হইবে, ইহা তাহার আদৌ সম্ভব বলিয়া মনে হইল না।

রাত্রি বেশি হইবার ভয়ে বীণাপাণি খুব শীঘ্র শীঘ্র খাবার প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। তারপর জেঠামশায়কে ও স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া শুইতে গেল।

পরদিন ভোরে জেঠামশায় নীপুকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইলেন। সেদিনকার বীণু—তাহার ছেলে অত বড় হইয়াছে! সমস্ত সকাল নীপুর সঙ্গছাড়া হইলেন না; দুঃখ করিতে লাগিলেন, বীণুমার খোকা হইয়াছে জানিলে তিনি তাহার জন্য একটা চেন গড়াইয়া আনিতেন।

কলিকাতায় কৃষ্ণলালবাবুর জরুরী কাজ। দুপুরের ট্রেনে রওনা হইবার ইচ্ছা থাকিলেও, বীণাপাণির চোখের জল এড়াইতে না পারিয়া তিনি বৈকাল পর্যন্ত রহিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পূর্বে হরিচরণ তাঁহাকে স্টেশনে পৌছাইয়া দিতে গেল।

•

সাত-আট দিন হইয়া গেল।

বীণাপাণি ব্রেসলেট-জোড়া মাত্র বৈকালে কিছুক্ষণের জন্য পরিত, অন্য সময়ে বাসন মাজা, উঠান ঝাঁট, রান্নাবান্না করা—ইহার মধ্যে কখন সে ব্রেসলেট পরে। ব্রেসলেট-জোড়া তাহার কাছে যেন নিত্য নূতন ঠেকিত। প্রদীপের মৃদু আলোয়, নীল-লাল-সবুজ আলো যখন ব্রেসলেটের গা হইতে ঠিক্‌রাইয়া পড়িত, বীণাপাণি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিত। তাহার উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ সুগঠিত হাত দুটিতে ব্রেসলেট-জোড়াটি বড় সুন্দর মানাইয়াছিল।

হরিচরণ একদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া বলিল—বৌ, তোর হাতে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু। বীণাপাণির মুখ লজ্জায় ও আনন্দে রাঙা হইয়া উঠিল।

সাত-আট দিন পরে মাঘ মাসের মাঝামাঝি রায়-বাড়ীতে একটা বড় নিমন্ত্রণ উপস্থিত হইল। বীণাপাণির অনেক দিনের একখানা জরিপাড় কাপড় তোরঙ্গের ভিতর তোলা ছিল। নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে এই কাপড়খানা সে বাহির করিয়া পরিত। হরিচরণ মুখে যতই আস্ফালন করুক, স্ত্রীকে ভাল কাপড় কিনিয়া দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। অত্যন্ত পুরাতন হইলেও বীণাপাণি কাপড়খানাকে অতি যত্নের সহিত ব্যবহার করিত। এই নিমন্ত্রণে যাইবার সময়

কাপড়খানা সে বাহির করিয়া পরিল ও মেয়েমহলে দিগ্‌বিজয়ের লোভ সামলাইতে না পারিয়া ব্রেসলেট-জোড়াও হাতে পরিয়া খাইতে গেল। তাহার ইচ্ছা নিজেকে লোকের চক্ষে বড় করা। আমাদের দেশের শিক্ষিত পুরুষদের জ্ঞান ও বিদ্যা আছে, তাহারা লোকসমাজে তাহাই দেখাইয়া বেড়ান; কিন্তু বেচারী মেয়েদের সে সম্বল নাই, কাজেই তাহারা শুধু গহনা দেখাইয়া বড় হইতে চাহে।

সন্ধ্যার একটু পরে বীণাপাণি নিমন্ত্রণ হইতে ফিরিয়া আসিল। একাদশীর জ্যোৎস্না অল্প অল্প উঠিয়াছে, বাড়ীতে কেহ নাই—নীপুকে রায়গৃহিণী ভালবাসিতেন, রাত্রের জন্য তাহাকে রাখিয়া দিয়াছেন—সকালে লোক দিয়া পাঠাইয়া দিবেন। বীণাপাণি ভাবিল স্বামী এখনও বাড়ী আসেন নাই, ততক্ষণ গা ধুইয়া ও কাপড়খানা কাচিয়া আসিয়া রান্না চড়াইয়া দিবে। পুকুরের ঘাটে যাইবার সময় দেখিল, বাগানের বেড়ার ওপারে বসিয়া স্বামী কি কাজ করিতেছেন। গা হাত ধুইয়া পুকুর হইতে উঠিবার সময় সে দেখিল স্বামী বেড়ার ধারে নাই, বোধ হয় উঠিয়া বাড়ী গিয়া হাত-পা ধুইতেছেন। বাড়ী আসিয়া দেখিল, দুয়ার যেমন তেমনই তালা লাগানো আছে—স্বামী বাড়ি নাই। ভাবিল বোধ হয় পাড়ায় কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন। জলের ঘড়া দালানের মুখে নামাইয়া সে ঘড়ার জলে হাত-পা ধুইয়া রকে উঠিল—কুলুঙ্গি হইতে চাবি লইয়া ঘর খুলিল, তারপর শুকনা কাপড় পরিয়া প্রদীপ জ্বালিল। জলের ঘড়া বাহির হইতে আনিয়া ভিতর হইতে দালানের দোর বন্ধ করিয়া রান্নাঘরে যাইবে, এমন সময় তাহার ব্রেসলেটের বাক্সের কথা মনে পড়িল। নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া ব্রেসলেট খুলিয়া কেস-সুদ্ধ গহনা দালানের উপর রাখিয়াছিল, তুলিয়া রাখিবার জন্য সেখানে গিয়া বীণাপাণি দেখিল—ব্রেসলেটের কেস দালানে নাই! ভাবিল, তবে কি নীচে পড়িয়া গেল? আলো ধরিয়া দেখিল, সেখানেও নাই!

বীণাপাণির মুখ ভয়ে নীলবর্ণ হইয়া গেল। পরক্ষণেই মনে হইল বোধ হয় স্বামী ঘরে আসিয়া জিনিসটা অসাবধানে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দিয়া থাকিবেন। তাহার নিজের তোরঙ্গের চাবি নিজের কাছে—স্বামীর নিজস্ব একটা তোরঙ্গ ছিল, তাহার চাবি ছিল না, সেটা খুলিয়া দেখিল তাহাতেও নাই। এ-কুলুঙ্গি সে-কুলুঙ্গি খুঁজিল, বাক্সের উপর-নীচে দেখিল, ঘরের কোণে খুঁজিল—কোথাও নাই। গরিবের গৃহস্থালি, বাক্স-প্যাটরার সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। যাহা ছিল তাহার কোথাও ব্রেসলেটের কেস খুঁজিয়া পাইল না। বীণাপাণি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিল—তাহা হইলে অন্য কেহ কি ঘরে ঢুকিয়া চুরি করিল? সে কথা ভাবিতেও পারিতেছিল না—ভাবিতেই তাহার বুক কেমন আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

চুরি গিয়াছে এ কথায় আমল না দিয়া সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল—তবে কি তাহার স্বামী কৌতুক দেখিবার জন্য গহনার বাক্স লুকাইয়া রাখিয়াছেন? নিশ্চয় তাই—নতুবা আর কে লইতে পারে?

হরিচরণের সেদিন বাড়ী ফিরিতে বেশ বিলম্ব হইল। সে কোনদিন এত রাত করিয়া ফিরে

না। যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাত অনেক। তাহার একহাঁটু ধূলিকাদা, যেন অনেক রাস্তা হাঁটিয়া আসিয়াছে। হরিচরণ ঢুকিয়াই বলিল—ওঃ, আজ যা ঘোরাঘুরি হল। সেই বেলা. দুটোর সময় তুমি নেমন্তন্ন গেলেই বেরিয়েছি আর অনবরত ঘুরছি। তা তুমি এসেছ কখন ?

বীণাপাণি স্বামীর কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল—আহা, আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারিনি, কচি খুকি কিনা! সে তুমি বের হয়ে গেলেই আমি ধরেছি।

হরিচরণের মুখ হঠাৎ একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। একটু পরেই সে কথা বলিল বটে, কিন্তু সে যেন অনেক চেষ্টা করিয়া—কি বল দেখি ? সত্যি বলছি আমি তো বাড়ী ছিলাম না। আমি সেই দুটোর সময়েই চলে গেছি খাজনা আদায় করতে। তুই কিসের কথা বলছিস ?

তাহার স্বরে লেশমাত্র কৌতুকের আভাস ছিল না।

বীণাপাণি স্বামীর কথায় ও চোখমুখের ভাবে চিন্তিত হইল, বলিল—সেই ব্রেসলেটের বাক্স কোথায় গেল খুঁজে পাচ্ছি না। সন্ধ্যের আগে নেমন্তন্ন খেয়ে এসে দালানের ওপর রেখে গেলাম, তারপর ঘাট থেকে এসে দেখি আর নেই! তুমি সত্যি জান না ? না, জান। সত্যি সত্যি বল লক্ষ্মীটি!

হরিচরণ লাফাইয়া উঠিল—অ্যাঁ, বল কি! ব্রেসলেটের বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না ? কি সর্বনাশ! অ্যাঁ! সে যে অনেক টাকার জিনিস। আমি কি করে জানব বল, আমি তো এখানে ছিলাম না। আমি কি মিথ্যে বলছি! সেই দুটোর সময় বেরিয়ে গিয়েছি—আমি তো কিছুই জানি না।

বীণাপাণি স্বামীর কথা শুনিয়া বুদ্ধি হারাইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইল—বেলা দুইটার সময় বাহির হইয়া যাওয়ার কথাটা। স্বামী এত জোর করিয়া বলিতেছেন কেন ? সে যে তাঁহাকে সন্ধ্যার পর বেড়ার পাশে গাবতলায় বসিয়া কঞ্চি কাটিতে দেখিয়াছে। স্বামীর আস্ফালন ও বিস্ময়ের মধ্যে একটা মিথ্যার ধ্বনি তাহার কানে আসিয়া যেন বাজিতে লাগিল।

হরিচরণ অত্যন্ত চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বল কি! সে তো এক-আধ টাকার জিনিস নয়; তুমিই বা সেটাকে ফেলে অমন করে যাও কেন ? যাঃ—সর্বনাশ হয়ে গেল। ভাল করে ঘরদোর খুঁজেছ ? চল দেখি, আমি একবার খুঁজে দেখি। ওসব মেয়েলি খোঁজার কাজ নয়—যাবে কোথায়, ঘরেই কোথাও পড়ে আছে।

বীণাপাণি দালানের মেঝেতে বসিয়া পড়িল। একটা নূতন রকমের ভয় তাহার মনের মধ্যে দেখা দিল। স্বামী মিথ্যা কথা বলিতেছে কেন ? বীণাপাণি কখনও স্বামীকে অবিশ্বাস করে নাই—স্বামীর কথা এবারও সে অবিশ্বাস করিত না, যদি সে সন্ধ্যার সময় তাহাকে না দেখিত। বুদ্ধির দিক হইতে না হইলেও তাহার নারী-হৃদয়ের অনুভূতিশক্তি কেমন করিয়া বুঝিয়া ফেলিল, স্বামী প্রতারণা করিতেছে।

তাহার ভয়টা অস্পষ্ট রকমের। কিসের জন্য এ ভয় তাহা সে বুঝিল না। ব্রেসলেট তো

তুচ্ছ—তাহার জন্য এ ভয় নয়। স্বামী মিথ্যা কথা বলিতেছে কেন? তবে কি—? কথাটা সে ভাবিতেও পারিল না, কিন্তু মনের মধ্যে সেকথা স্পষ্ট ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও একটা মহাযন্ত্রণাকর অনুভূতি মনের কোন্ গোপন তল হইতে যেন ঘনাইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কোন নির্দিষ্ট রূপ নাই—তাহা আবছায়ার মতই অস্পষ্ট, অথচ তীক্ষ্ণ ও কঠিন—রাত্রিশেষের হিমকণার মত ঠাণ্ডা তাহার গোপন সঞ্চার।

সেই তীক্ষ্ণ শৈত্য ক্রমে ক্রমে তাহার হৃৎপিণ্ডে পৌছাইয়া সেখানকার উষ্ণ রক্তস্রোতকে যেন জমাট বাধাইয়া দিল। তাহার চোখের সামনে হরিচরণ হাঁকডাক করিয়া ঘর তোলপাড় করিতে লাগিল।• বাক্সের নীচে, সিন্দুকের নীচে, চৌকির নীচে, এবং তাহা ছাড়া যত অসম্ভব স্থানে খুঁজিতে লাগিল—বীণাপাণি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। স্বামীকে কি বলিবে? একবার ভাবিল, বলে যে, সে তাহাকে সন্ধ্যার সময় ঘাটে যাইবার পথে দেখিয়াছে—কিন্তু—নাঃ, ছিঃ···

সেদিন তো বটেই, পরের দিনও কাটিয়া গেল। ব্রেসলেটের কোন সন্ধান হইল না। হরিচরণ বলিতেছে যে, সে থানায় গিয়া ডায়েরি করিয়া আসিয়াছে, এখানে বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিল—আর চলে না, ইত্যাদি।

শীতের সেই ঠাণ্ডা রাত্রি ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিল—ভাঙা জানালার ফাঁক দিয়া চাঁদের আলো বিছানায় আসিয়া পড়িল। বিবাহের পর হইতে আজ পর্যন্ত যে মধুর অনুভূতি তাহার মনের মধ্যে চিরজাগরিত ছিল, দুঃখে কষ্টে যাহা তাহার নীরব অবলম্বন, জানালার বাহিরের ঐ ভোরের জ্যোৎস্নার মত তাহা ধীরে ধীরে মন হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। সংসারের শত অনটনেও মুখে যে হাসি তাহার চিরদিন ফুটিয়া থাকিত, এ কোন্ নিষ্ঠুর অপহারক তাহার সরল নারী-হৃদয়ের সে গোপন ঐশ্বর্য এক মুহূর্তে লুটিয়া লইল! আজ দশ বৎসর ধরিয়া তিল-তিল সঞ্চয়ের সে যে অমূল্য রত্নভাণ্ডার!

গাছে গাছে পাখীরা যখন জাগিয়া উঠিয়া কলরব করিতে লাগিল, বীণাপাণি বিছানা হইতে উঠিয়া তখন বাহিরে গেল। সমস্ত রাত না ঘুমাইয়া তাহার চোখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বাঁশগাছের মাথা অন্যদিনের মত আজও ভোরের হিঙ্গুলরাগে রাঙা, পুকুরের পথে কচি কচি দূর্বাদলে শিশিরের জলের আলো আজও রামধনুর রঙ ফলাইয়াছে—আস-শেওড়ার ঝোপের মাথায় রাঙালতায় সাদা ফুলগুলি অন্যদিনের মতই নব-প্রস্ফুট; কিন্তু পৃথিবীর চেহারা এক রাত্রেই তাহার কাছে বদলাইয়া গেল কিসে?

সমস্ত দিন কোনও রূপে কাটিল। বীণাপাণির মুখে ব্রেসলেটের সম্বন্ধে এ পর্যন্ত কোন কথাই আর শোনা যায় নাই। চুপ করিয়া কলের পুতুলের মত সে সংসারের কাজ একে একে করিয়া গেল। রাত্রে শুইয়া তাহার আর ঘুম হইল না। তাহার সকল নির্ভরতা-ভরা নারীহৃদয় যেন নিষ্ঠুর আঘাতে একেবারে ভাঙিয়া গিয়াছে। সেদিন ভোরে যখন হরিচরণ উঠিল তখনও বীণাপাণি শুইয়া। হরিচরণ কাজে বাহির হইয়া গেল; ফিরিল যখন, দেখিল

নীপু রকে বসিয়া কাঁদিতেছে। ঘরের মধ্যে গিয়া দেখিল বীণাপাণি তখনও বিছানায় শুইয়া। স্ত্রীকে গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া দেখিল তাহার গা জ্বরে পুড়িয়া যাইতেছে। সংজ্ঞা নাই—জ্বরের ঘোরে অঘোর-অচৈতন্য।

হঠাৎ অনুতাপের দংশনে হরিচরণের মন তীব্র বেদনায় ভরিয়া উঠিল। সেদিন সে-ই সন্ধ্যার সময় গহনা চুরি করিয়াছিল নানাদিকে দেনা ও পাওনাদারদের জ্বালায় বিব্রত হইয়া। তাহার পূর্বে কয়েকদিন হইতেই তাহার স্ত্রীর ব্রেসলেট-জোড়াটার উপর লোভ হয়। সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরে ঢুকিয়াই সে দেখিল, দালানের উপর ব্রেসলেটের বাক্স। লোভ সামলাইতে না পারিয়া সেই ব্রেসলেট চুরি করিয়া রামনারায়ণপুরে এক মাড়োয়ারীর দোকানে গিয়া বিক্রয় করিল মোট সাত শত টাকায়! ভাবিয়াছিল, পরে না-হয় একদিন সব প্রকাশ করিবে।

স্ত্রীর মাথার কাছে গিয়া ডাকিল—বৌ, ও বৌ!

বীণাপাণি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ জবাফুলের মত লাল। হরিচরণ পাগলের মত রামহরি ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন—জ্বরটা খুব বেশিই হয়েছে, তবে ভয়ের কোনও কারণ নেই। শিশিটা পাঠিয়ে দেবেন, ওষুধ দেব।

সেইদিন বৈকাল হইতে কিন্তু বীণাপাণির অবস্থা খুব খারাপ হইয়া উঠিল। শেষবেলা হইতেই ছটফট করিতে লাগিল। সন্ধ্যার পর হইতে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল—ওগো, আমায় বললে না কেন? মুক্তোর মালাছড়াটা তোমায় এমনিই পরিয়ে দিতুম—আমি তো রাখতে চাইনি—

ডাক্তার বলিলেন—আজকের রাত আর টিঁকিবে কিনা সন্দেহ।

দশ-বারো বৎসর পরের কথা।

নীপু এখন বড় হইয়াছে। সে বেশ ভাল ছেলে হইয়া উঠিয়াছে। এইবার আই-এ পরীক্ষা দিবে। হরিচরণের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ মেঘলতা তাহাকে নিজের ছেলের মতই বেশ আদর-যত্ন করে। এ পক্ষে হরিচরণের আরও দুই ছেলেমেয়ে হইয়াছে। গ্রামে একখানা ছোট মুদিখানায় দোকান করিয়া এখন তাহার একপ্রকার ভালই চলে। শীতের সন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে অনেক সময় তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। অনেকদিন আগে রান্নাবাড়ীর উঠানে বীণাপাণি একটা ডালিমের চারা পুঁতিয়াছিল। শীতকালে যখন রাঙা-রাঙা ফলের ভারে গাছটার ডালগুলি নুইয়া পড়ে, তখন ভাত খাইতে খাইতে সেদিকে চাহিয়া হরিচরণের গলায় ভাত বাঁধিয়া হঠাৎ বিষম লাগিয়া যায়। তাহার ছোট মেয়ে পুঁটি বলে—মা, তুমি তরকারিতে এত ঝাল দাও কেন? ঝালের চোটে বাবার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে!

ফকির

ইচু মণ্ডলের আজ বেলায় সর্দি হয়েছে। ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর শীতল প্রভাত। তালি দেওরা কাঁথা, ওর বৌ, তার নাম নিমি, শেষরাত্রে গায়ে দিয়ে দিয়েছিল। এমন সর্দি হয়েছে যেন মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর ভারী। ইচু শুয়েই পা দিয়ে চালের হাঁড়িটা নেড়ে দেখলে, সেটা ওর পায়ের তলার দিকেই থাকে, হাঁড়িটাতে সামান্য কিছু চাল আছে মনে হল তার।

ইচু বললে—আজ আর জনে যাব না। একটু পানি দে দিকি।

ওর বৌ বললে—জনে যাবে না তবে চলবে কিসি ?

—কেন, চাল তো রয়েছে তোর হাঁড়িতি, সজনে শাক-মাক সেদ্দ কর আর ভাত। নুন আছে ?

—এট্টু অমনি পড়ে আছে মালাটার তলায়।

—তবে আর কি ? পানি দে—নামাজ করি।

ইচু জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ওজু শেষ করে ফজরের নামাজে বসে গেল। এটি তার জীবনের অতি প্রিয় কাজ বাল্যকাল থেকেই। মজুরি করতে না যেতে পারে সে, কিন্তু নামাজ না করে সে দিনের কাজ কখনও আরম্ভ করেনি।

নিমি বললে—উঠেছ যখন, তখন জনে যাও। আজকাল যুদ্ধের বাজারি দশ আনা করে জন, অন্য সময় তিন আনা হত যে। হাঁড়িতে যদি চাল থাকতি দেখলে, তবে আর তুমি জনে যাবা না! ও ভাল না।

ইচু বললে—নামাজের সময় ঘ্যান ঘ্যান করিস নে বাপু, একটু চুপ কর।

নামাজ শেষ করে ইচু দা হাতে বেরিয়ে যেতে গিয়ে একটু থেমে বললে—খিদে পেয়েছে! কি আছে রে ?

—কিছু নেই।

—দেখ না হাঁড়িটা—বড্ড খিদে পেয়েছিল।

—দুটো-কটা পানি দেওয়া ভাত পড়ে আছে, আর কিছু নেই।

—তাই দে। বেনবেলা না খেয়ে গেলি দুপুর বেলা এমন খিদে পায়, দা ধরতি হাত কাঁপে। কাজ করতি পারি নে।

শাইলিপাড়া গ্রামের পাশ দিয়েই রেল লাইন চলে গিয়েছে।

রেল লাইন পার হয়ে ফাঁকা মাঠ একদিকে, মাঠের মধ্যে বিল, ভরা ভাদ্রের বর্ষায় থৈ থৈ করছে তার জল, ধারে ধারে কাশবনে সবে ফুল ফুটতে শুরু হয়েছে, জলে কলমি লতা জালের মত বিস্তৃত হয়ে আছে। বনখেজুর গাছের মাথায় তেলাকুচো লতার দুলুনি। টুকটুকে লাল তেলাকুচো ফল সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। ফিঙে পাখী ঝুলছে রেলের তারে।

রামা গোয়ালা জন-মজুর নিয়ে ধান কাটছে তার নিজের জমিতে। ইচুকে দেখে বললে —যাবা কোথায় ?

—সনেকপুরের বিলি ধান কাটতি।

—কত করে জন দেচ্ছ?

—সাত সিকি করে বিঘে। তামাকের আগুন দেবা?

—নিয়ে যাও, ওই বেনাঝোপের ধারে মালসা আছে।

—ভাত খেয়েই চলে আলাম, হাঁফ জিরুতে পারিনি। তামাক না খেলি কাজে মন বসে?

মালসা থেকে আগুন নিয়ে তামাক খেতে খেতে চলল ইচু।

ইচুর গ্রাম থেকে দু মাইল দূরে সনেকপুরের বিলে দেড়-শ দু-শ বিঘে জমিতে আউশ ধান পেকে গাছ শুয়ে পড়েছে। যেমন বর্ষা নেমেছে, দু-পাঁচ দিনে বিলের জল বেড়ে পাকা ধান ডুবিয়ে দেবে, তাই এবার মজুরির রেট এদিকে খুব বেশি। তার ওপর আছে মজুরদের একবেলা খোরাকি।

ইচুর বড় ভাল লাগে আল্লার কথা শুনতে। পায়রাগাছির ফকির এ অঞ্চলের মধ্যে নামজাদা সাধু। একবার ইচু তাঁকে দেখেছিল। বাল্যকাল থেকে ইচুর ঈশ্বরের দিকে কেমন এক টান। পায়রাগাছির ফকির সে টান আরও বাড়িয়ে দেন ওর। ইচু যেন কেমন হয়ে গিয়েছে তার পর থেকে। সংসারে মন দেয় না, মজুরি করে পয়সা রোজগারের দিকে বা খাওয়া-দাওয়ার দিকেও মন নেই। কাস্তে হাতে জমির ধান কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অনেকে ওকে তা নিয়ে খেপায়। বলে—ও ইচু, শেষকালে ফকির হবা নাকি গো? ইচু মুখে কিছু বলে না, চুপ করে থাকে। সে নিতান্ত ভালমানুষ, কারও কোন কথার প্রতিবাদ সে করতে পারে না।

মজুরির রেট নিয়ে দরাদরি করতে পারে না বলে অনেকে ওকে ঠকিয়ে কাজ আদায় করে। বিনি মজুরিতে অনেক সময় খাটিয়ে নেয়।

—ও ইচু, আমার বাড়ীর চালকুমড়োর মাচাটা তুমি থাকতে নষ্ট হয়ে যাবে?

—কেন, কি হয়েছে চাচা?

—খুঁটিগুলো সব পড়ে গিয়েছে।

—ওবেলা এসে করে দেবানি চাচা।

ইচু কথা ঠিক রাখত নিজের। যাকে যা বলবে, তা সে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করবে এটা সকলেই জানে। মহাজনে দু তিন বিশ ধান মুখের কথায় ওকে দিয়ে দিত, এ পর্যন্ত সে কারও টাকা বা ধান মেরে দেয়নি।

একবার পাশের গ্রামের মুখুজ্যেদের জমির ধান সে ভুল করে কেটে ফেলেছিল—বেশি নয়, কাঠাখানেক জমির পাকা ধান। মুখুজ্যেদের জমির পাশে তখন ওর নিজের ওটবন্দি জমি ছিল দু বিঘে। মুখুজ্যে মশায় যখন জানতে পারলেন তাঁর জমির ধান কে কেটে নিয়েছে, তখন খুব হৈ-চৈ জুড়ে দিলেন। কে ধান কেটেছে সন্ধান করতে পারলেন না, কারণ সবারই তখন ধান কাটবার সময়, সকলেরই বাড়ীতে ধান—কার ধান তিনি গিয়ে ধরবেন? দিন-দুই

পরে ইচু গিয়ে সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়ী হাজির হল।

মুখুজ্যে মশায় বললেন— কি রে ইচু, কি মনে করে ?

ইচু বললে— সালাম বাবু! একটা বড্ড ভুল করে ফেলিছি!

—কি রে ?

—আপনার জমির ধানডা কাঠাখানেক কেটে ফেলে ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেগাম। তা বাবু, দেড়া সুদ দিয়ে সেই ধানডা আপনারে ফেরত দিতে চাই।

—ওঃ, তোর কাজ ইচু! আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। সেদিন বড্ড বর্ষা, জমির আল ঠিক করতি পারলাম না। তার পর পরস্পর শুনলাম আপনার জমির ধান কে চুরি করেছে বলে আপনি খোঁজ করছেন। তখন ভাবলাম বাবুরে বলে আসি। ক্ষেতি লোকসান যখন অজান্তে করে ফেলেছি, তখন দেড়া বাড়ি সুদ দেব আপনারে।

মুখুজ্যে মশায় বিশ্বাস করলেন ওর কথা। ইচুকে অন্তত চোর বলে কেউ সন্দেহ করবে না। ইচু জন খেটে খায় বটে, কিন্তু আশেপাশে চার-পাঁচ গ্রামের লোক ওকে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। মুখুজ্যে মশায় বললেন, তোকে সুদ দিতে হবে না ইচু, আমার ধান যা কেটেছিস ও আর ফিরিয়েও দিতে হবে না। ও তোকে দিলাম। ভুলে করে ফেলেছিস তা আর এখন কি হবে।

ইচু হাতজোড় করে বললে—তা হবে না মুখুজ্যে মশায়, ও ধান নিতি পারব না, মাপ করবেন। ও ধান আমার গলা দিয়ে নামবে না। আল্লা যা আমায় হাতে তুলে দেবেন, তাই খেয়ে পরান বেঁচিয়ে রাখব—যা না দেবেন সে আমার হারাম।

মুখুজ্যে মশায় জানতেন ইচুকে। খুশী হয়ে বললেন— যাক, দুটো চিঁড়ে নিয়ে যা, বাড়ীর মধ্যে তোর কাকীমার কাছ থেকে চেয়ে নে।

সনেকপুরের বিলটা পৌঁছে ইচু দেখলে, জন-মজুর এখনও কেউ এসে পৌঁছয়নি। এট পছন্দ করে না সে। বেশি খেটে মজুরি নেব অথচ কাজে আসব দেরি করে, মালিকের কাজে ফাঁকি দেব, এ তার ভাল লাগে না। ধান কাটে ঘড়ির কাঁটার মত। এ কাজে তার ফাঁকি নেই।

পথ-চলতি লোকে জিজ্ঞেস করে—কি ধান এটা গো ?

—বেনাঝুপি।

—এবার ফসল কেমন ?

—আড়াই বিশ থেকে তিন বিশ পড়তা হত্তি পারে।

—বিঘেয় ?

—বিঘেয় না কি কাঠায় ?

ইচু হা হা করে হাসে পথিকের অজ্ঞতায়। পথিকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলে—কাঠায় আড়াই বিশ ধান ফলন হলি কি আমরা জন খেটে খাতাম গো কর্তা ? হ্যা—হ্যা—হ্যা—

—বাড়ী কোথায় তোমার ?

—শাইলেপাড়া।

—নাম ?

—ইচু মণ্ডল।

বেলা আড়াইটের গাড়ী দূরের রেল লাইন দিয়ে গড় গড় করে চলে গেল। জনমজুরদের জন্যে জমির মালিক খাবার পাঠিয়েছে, একজন লোকে বাঁকে ঝুলিয়ে আধক্রোশ দূরবর্তী সনেকপুর গ্রাম থেকে কাঁসার জামবাটিতে সাজিয়ে এনেছে গরম ভাত, কুমড়োর ঘন্ট ও কুচো চিংড়ি ভাজা। এ সময় ভাল খেতে দিয়ে মন খুশি করা মানে বেশি কাজ আদায় করা ওদের কাছ থেকে। জমির মালিকেরা তা জানে। আখের মণ্ডল খেতে খেতে বলে—আজ এট্টু সকাল সকাল যাব। মোর ঘরে নুন নেই—বাজার থেকে নুন না নিয়ে গেলি বাচ-কাচ খেতি পাবে না।

—নুন কনে পাবা ? বাজারে কালও খোঁজ করিছি, নুন মেলে না।

—ওমা, আলুনি খেয়ে খেয়ে মুখি তো পোকা পড়ে গেল।

—আর অন্ধকারে খেয়ে খেয়ে চকি চ্যালা বেরুল। কেরাচিন্নি তেলের মুখ দেখিনি কতকাল।

—কুমড়োর ঝালডা করেছে বেশ। সনেকপুরের এরা খেতি দেয় ভাল, পেটটা ভরি খেতি দেয়। কেরাচিন্নি পাবা কোথায় ?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আখের মণ্ডল দা-কাটা তামাক সাজলে কলকেতে। বেশ করে আগুন ধরিয়ে প্রবীণ রমজান মণ্ডলের হাতে দিয়ে বললে—ধ্যাড়ে ধর চাচা।

ইচু বললে—চাচা, তোমার বয়েস হল ক কুড়ি ?

—তা যেবার জোড়া বন্যে হয়েল সেবার আমি গরু চরাতে পারি, তিরিশ কি চল্লিশ হল পেরায়—

কেউ বিশেষ বুঝতে পারলে না। জোড়া বন্যা কত বৎসর পূর্বে কোন্ সালে হয়েছিল কেউ জানে না। রমজানের বয়স কম হলেও সত্তর ছাড়িয়েছে। যখন সে গরু চরায় তখন এরা কেউ জন্মায় নি। সংখ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এদের নিতান্তই সীমাবদ্ধ।

বেলা যায়-যায়। পাঁচটার গাড়ী গড় গড় করে মাদলার বিলের ওপর দিয়ে চলে গেল। ঝিঙের ক্ষেতে ফুল ফুটেছে সনেকপুরের মাঠে। নোয়ালি সর্দার জাতে বুনো, সনেকপুরের মধ্যে অবস্থাপন্ন, গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাম্যপথ ধরে। ইচু সন্ধ্যার নামাজ শেষ করে উঠতেই বেড়ার ধার থেকে নোয়ালি সর্দার বললে—ও ইচু, কাল আমায় জন দিতি পারবা ?

—না গো।

– কেন ?

—সনেকপুরওয়ালাদের বিলির ধান কাটা হচ্ছে।

—চল আমার বাড়ী, তামুক খেয়ে যাবা।

রমজান মণ্ডলকে ইচু ডাক দিলে।—ও চাচা, সর্দারের বাড়ী তামুক খাবা চল।

নোয়ালি সর্দারের তামুক খাওয়ানোর আসল উদ্দেশ্য মজুরির রেট সম্বন্ধে দরদস্তুর করা। ইচু রমজানের পুত্রের বয়সী—সুতরাং দরদস্তুর সম্বন্ধে রমজান নেতা হয়ে কথাবার্তা চালালে।

—সাত সিকের কম পারব নি গো, এতে তুমি রাগ করো না সর্দার।

—রমজান চাচা, তার চেয়ে আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল না কেন?

—অনেয্য তো কিছু বলছি নে।

—অনেয্য নয় চাচা? যা ছেল চোদ্দ আনা তাই সাত সিকে? এট্টা ভেবে চিন্তে কথা বল। পাঁচ সিকে কর, আর চাল ডাল মাছ পেটিয়ে দেবানি তোমরা রান্না করে খেয়ো। মোদের রান্না তো তোমরা খাবা না। আমার পুকুরি এবার এই এত বড় বড় চ্যাং মাছ—

নোয়ালি সর্দার হাত দিয়ে কাল্পনিক মৎস্যের দৈর্ঘ্য নির্দেশ করলে, যদি লোভ দেখিয়ে এদের কাজে টানা যায়।

রমজান ঘাড় নেড়ে বললে—ও হবে না সর্দার। সাত সিকের কম করনি—

—আর এক কথকে ধরাও চাচা! হ্যাদে, গাছের জালি শসা গোটাকতক নিয়ে যাও। দু'জনে খেয়ো।

—শসা পুঁতেছিলে? মাচার শসা, না মেঠো?

—মেঠো কোথায় পাব চাচা, এই উঠোনটাতে মাচা করে দিয়েলাম—সিম বরবটি শসা—কিনে খাবার তো ক্ষ্যামতা নেই মোদের, তরিতরকারির আগুন দাম।

—সে কথা আর বলো না। হাটে বাগুন কেনতাম পয়সায় দু সের তিন সের—তাই এখন বলে আট আনা সের। খাদ্য-খাদক উঠে গেল। ঝিঙে আছে?

—তা তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে—এট্টো কটা দেবানি তুলে, খেয়ো।

—যাক গে, পাঁচ সিকেই দিও সর্দার, কারও কাছে পেরকাশ করো না যেন এ কথা।

ইচু ও রমজান তামাক খেয়ে ঝিঙে ও শসা নিয়ে উঠে চলে এল। নোয়ালি সর্দারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। সে জানে রমজান জন-মজুরের নেতা, ওর কথায় দরদস্তুর ঠিক হয়। ওকে খুশি রাখলেই হোল।

ইচুর বাড়ী ফিরতে রাত হয়ে গেল। নিমিকে বললে—ভাত রেঁধিছিস?

—এ বেলা শরীরডে খারাপ। পানি দেওয়া ভাত আছে, খাও।

—তরকারি?

—কিছু নেই।

—এই ঝিঙে কটা রেঁধে দে।

—রাঁধব কি দিয়ে, তেল কনে? পাঁচ পয়সা ধার করে এনেলাম আছিরন বিবির কাছ থে। এখনও শোধ দিতি পারিনি—আবার কি ধার করতি ছোটব?

—পোড়া?

নিমি খিল খিল করে হেসে উঠে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বললে—ও মা, মুই কনে যাব গো!

ঝিঙে পোড়া কেউ কখনও শুনিনি। খেতি পারবা না।

—পারব পারব। দে তুই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হোল পাকাটির আলো জেলে। তেল নেই। অন্ধকার ঘরদোর। কে আসে, কে যায়, কিছু বোঝা যায় না। কচুঝাড়ে কেয়োঝাঁকার ঝোপে জোনাকি জ্বলছে, উঁচু-নীচু—উঁচু-নীচু। দেবতা ঝিলিক মারছে, রাত্রে বৃষ্টি হবে বোধ হয়। ভাদ্রের গুমট গরম। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে ইচু যেমন মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছে তখনই রাজ্যের ঘুম এসেছে ওর চোখে। আর জ্ঞান নেই।

কতক্ষণ পরে সে জানে না, লোকজনের গোলমালে ইচু শেখের ঘুম ভাঙল। অনেক লোকের গলা বাইরে। ওরই বাড়ীর উঠোনে।

—ব্যাপারখানা কি ?

পাড়ার মোড়ল হাফেজ বুড়োর গলা—ও ইচু, ইচু বাড়ী আছ ?

বছিরদ্দি শেখ ডাকছে—ও ইচু, বলি ওঠ—শোন ইদিকি।

ভোর সবে হয়েছে। কাক-পক্ষী ডাকতে শুরু করেছে। ইচু ধড়মড় করে উঠে বসে চোখ মুছলে। ফজরের নামাজের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু এত লোক ওর উঠোনে কেন ? তাকে ডাকাডাকিই বা কিসের এত সকালে ? বাইরে এসে ঘুমচোখে উঠোনের দিকে চেয়ে ও অবাক হয়ে গেল। পাড়াসুদ্ধ মানুষ সব ওর উঠোনে। সে বিস্মিত সুরে বললে—কি হয়েছে গো মোড়লের পো ?

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল বললে—ইদিকি এস।

—আগে নামাজটা করে নিই—দেরি হয়ে গিয়েছে।

ইচু ঘরের পেছনের দাওয়ায় নামাজ সেরে নিয়ে আবার সামনে এল। সবাই ওর দিকে এক-সঙ্গে এগিয়ে এল। সবাই মিলে যেন একসঙ্গে ওকে কি বলতে চায়। ইচু ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে, ওর বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে। ভয়ও হয়েছে ওর, নিমি এ সময়ে কোথায় গেল ? হয়েছে কি ?

অন্য সবাইকে থামিয়ে দিয়ে হাফেজ বললে—এস মোর সঙ্গে।

ইচু শেখ ওদের পেছনে পেছনে কলের পুতুলের মত চলল। রেল লাইনের দিকে সকলেই যাচ্ছে। নাবাল ক্ষেতের একহাঁটু জল পার হয়ে সবাই রেল লাইনে উঠল। একটা খেজুর ঝোপের আড়ালে রেল লাইনের ওপর উঠে সবাই দাঁড়াল থমকে। হাফেজ ডেকে বললে—এখানে এস।

কি ব্যাপার ? ইচু এগিয়ে গিয়ে যা দেখলে তাতে তার মাথা ঘুরে গেল, সে নিজেকে পড়তে পড়তে সামলে নিলে। রেল লাইনের ওপরে একটা রক্তাক্ত মৃতদেহ—গলা সামনের দিকে গভীর-ভাবে কাটা, দেহের সঙ্গে একটি অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহ নিমির।

তার পর তার ভাল কিছু মনে পড়ে না। গ্রামের লোকে মিলে তাকে কত কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। সে কোথায় ছিল, নিমি কতক্ষণ ঘরে ছিল, নানা প্রশ্ন। নিমি রেলে গলা দিয়ে মরেনি, তাকে নাকি খুন করে টেনে এনে রেলে শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। ইচু বুঝতে পারলে তার ওপর অনেক সন্দেহ এসে পড়েছে। পাশের গাঁয়ে দফাদারদের সংবাদ দিতে লোক যাবে এখুনি, তার আগে ইচুকে একবার জিজ্ঞেস করা দরকার, সে কোথায় ছিল তা জানা দরকার, সেইজন্যই গ্রামের লোক তার বাড়ীতে গিয়ে ডাকাডাকি করছিল।

ইচু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—মুই কিছু বলতি পারি নে চাচা, আল্লা জানে। মুই মড়ার মত ঘুমুতি নেগেলাম।

—বউরি কিছু বলেলে? ঝগড়া হয়েল?

—কিছু না চাচা।

—বউ ঘরে শুয়েল?

ইচুর মনে একটা ভয়ানক সন্দেহ উঁকি মারলে। এ প্রশ্ন করে কেন লোকে? বছিরদ্দি শেখ এগিয়ে এসে ওকে উঠিয়ে বললে—মোর কথা সবাই শোন। ইচু সে রকম লোক নয়। চল এখুনি বনগাঁয়ে ওকে নিয়ে মোক্তার বাবুদের কাছে। বিহিত কথা তাঁরা বলবে, তাঁদের পরামর্শটা লেওয়া দরকার। এখানে থাকলি এখুনি দফাদার এসে ওকে বাঁধবে। তার আগে চল মোরা ছ সাত জন ওরে নিয়ে বনগাঁয়ে যাই। পরামর্শ নিয়ে ফেলি। পুলিশ গ্রেপ্তার করবার আগেই। কে কে যাবা?

দেখা গেল প্রায় সকলেই যেতে চায়।

ইচু ভগ্নস্বরে বলে—কিন্তু উকিল মোক্তার বাবুদের ট্যাকা মুই কন থে দেব? মোর হাতে একটা ট্যাকা আছে কালকার জনের দরুন। তাতে হবে?

হাফেজ বললে—ট্যাকার জন্যি তোমার ভাবনা হচ্ছে কেন। তোমার জান যদি বাঁচে কত ট্যাকা হবে। সে ভাবনা মোদের। তুমি চল দিনি। কি বল বছিরদ্দি?

বছিরদ্দি বললে—তা নিচ্চয়। টাকার জন্যি তুমি ভেবো না। সে মোরা দ্যাখব।

হাফেজ বললে—রেল লাইন ধরে চল যাওয়া যাক। সোজা রাস্তা দিয়ে গেলি পুলিশি ধরবে।

বেলা সাড়ে সাতটার মধ্যেই ওরা বনগ্রামের বড় মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে মশায়ের বাসায় পৌঁছে গেল। রামলালবাবু বেশিক্ষণ ওঠেননি, সেরেস্তায় বসেই চা খাচ্ছেন এবং মুহুরী দুলাল চক্রবর্তীকে বিলম্ব করে আসার জন্যে তিরস্কার করছেন—কাল চলে গেলে কাছারি থেকে বাড়ী, জামিননামা দুটো সই করাতে হবে, তোমার সে খেয়াল থাকে না। এখন এলে আটটার সময়—এমন করলে কি করে আমি কাজ চালাই? ওদের দরখাস্তের নকল নেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে, নকলের জন্যে দরখাস্ত করা হয়েছে। কাল বিনয়বাবু সকাল সকাল চলে গিয়েছিল, দেখা পাইনি।

—সকালে কাছারিতে গিয়ে আজ নকল দুখানা বার করে ফেল আগে—নইলে জেরাই হবে না। কে? কোত্থেকে আসা হচ্ছে?

হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে নীচু হয়ে ডান হাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে বললে—সালাম, বাবু।

—কি ব্যাপার? বাড়ী কোথায়?

হাফেজ মণ্ডল বললে—বিপদে পড়ে অ্যালাম বাবুর কাছে। বড্ড বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুনের ব্যাপার।

রামলালবাবু প্রবীণ মোক্তার। মোক্তারী ব্যবসায় চুল পাকিয়েছেন—শক্ত কেসে লোক যখন পড়ে, তখন দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পয়সা খরচ করে, ধীরভাবে সে পয়সা আদায় করতে হয়। সুতরাং একটা সিগারেট ধরিয়ে (প্রবীণ হলেও রামলালবাবু তামাক খান না, সিগারেটখোর) আরাম করে টান দিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন—খুন? কি রকম খুন?

হাফেজ ইচুর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে—এই লোকের বৌকে গলা কাটা অবস্থায় কাল রাতে রেল লাইনে পাওয়া গিয়েছে।

—ওর নাম কি?

—ইচু।

—ও রাত্রে কোথায় ছিল?

—বাড়ীতেই শুয়ে ছিল বাবু।

—বৌ-এর স্বভাবচরিত্র কেমন?

হাফেজ চুপ করে রইল। সে প্রবীণ লোক, গ্রামের মোড়ল—তার মুখ দিয়ে আর ও কথা বার হয় কেন? বছিরদ্দি শেখ পাশ থেকে ঈষৎ গলা খাঁকার দিয়ে নিয়ে বললে—বাবু, ভাল না।

ইচু অবাক হয়ে বছিরদ্দির মুখের দিকে চেয়ে রইল। নিমির স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল না? কই, একদিনও তো সে কিছু জানে না! সে নিমির স্বামী, সে-ই কেবল জানে না, আর সবাই জানে!

হাফেজ চুপ করেই রইল। বছিরদ্দি বলে যেতে লাগল—বাবু, এ লোক বড্ড ভালমানুষ—নিরীহ ভালমানুষ। ও কিচ্ছু জানে না এসব কথা। খুনও ও করেনি।

রামলাল মোক্তার বাধা দিয়ে ধমকের সুরে বললেন—তুমি কি করে জানলে? তোমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে লোকে খুন করবে নাকি? যা তুমি জান তাই বল; যা জান না তা নিয়ে জ্যাঠামি করো না। যাও বস ওখানে।

পরে হাফেজের দিকে চেয়ে বললেন—তুমি কি জান বল মোড়ল।

বছিরদ্দির অবস্থা-বিপর্যয়ে হাফেজ একটু ভয় খেয়ে গেল। সমীহ করে সংযত হয়ে বললে—আজ্ঞে বাবু যা বলছেন, অতি সেহ্য কথা। তবু ইচু আমাদের লোক ভাল। সবাই এ কথা জানে। আপনি সব লোককে জিজ্ঞেস কর, সবাই একথা বলবে।

রামলালবাবু সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—ঘটনা বল।

হাফেজ ঘটনা বর্ণনা করলে। ইচু মণ্ডলের মুখে যা সে শুনেছে। জন খেটে এসে অঘোরে ঘুমুচ্ছিল, সবাই গিয়ে ডেকে ওর ঘুম ভাঙায়। ও বলেছিল, রাত্রে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিল, কি হয়েছে না হয়েছে কিছু জানে না। শোবার আগে ওর স্ত্রী ওকে ভাত খেতে দিয়েছিল। ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

—আত্মহত্যা নয় ?

—না বাবু। গলায় অস্তরের দাগ দেখলিই বোঝা যায়। গলা কেটে রেল লাইনি ফেলে রেখেছিল।

রামলালবাবু বললেন—অন্তত তাই প্রিজামশন হবে। পুলিশেও তাই বলবে। লাশ দেখে কে আগে ?

—বাবু, মোর ভাই আর নবি শেখ সকালে রেল লাইনির ধারে নালায় মাছ ধরতি যাচ্ছিল, তারাই দেখতি পায়। পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে আমারে খবর দেয়। মুই তখনি দৌড়লাম লাইনির ধারে।

—আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি, থাক। সুরতহাল আগে হয়ে যাক, তার পরে দেখা যাবে। গ্রামের দফাদারকে খবর দিয়ে এসেছ তো ? বেশ করেছ। বড্ড শক্ত কেস। সন্দেহ গিয়ে ইচু মণ্ডলের উপরই পড়বে। বৌ-এর স্বভাবচরিত্র খারাপ ছিল। ভালমানুষ লোক হঠাৎ রেগে উঠলে এসব ক্ষেত্রে ভয়ানক হয়ে ওঠে কিনা। তোমরা লুকিয়ে চলে এসেছ ?

—হ্যাঁ বাবু।

—একটা কথা শিখিয়ে দিই। ইচু ?

ইচু এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে দাঁড়াল। তার পা-দুটো ঈষৎ কাঁপছে।

—বলি শোন। তুমি খুন করেছ কি না করেছ তা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করব না। আমাদের তা কাজ নয়। আমরা ধরে নেব তুমি খুন করনি। কিন্তু পুলিশে তা শুনবে না। তোমাকে আজ সম্ভব রাস্তায় যেতে যেতেই গ্রেপ্তার করবে। তোমায় স্বীকার করাবার জন্যে নানারকম চেষ্টা হবে। কিন্তু কিছুতেই তুমি বলো না যে তুমি খুন করেছ। স্বীকার কিছুতেই করবে না। করেই থাক বা না-ই করে থাক। বুঝলে ? যাও, সাবধানে যাও।

হাফেজ বললে—বাবু, পুলিশি ধরলি রাখবে কনে ওরে ?

—রাখবে হাজতে। যতদিন না বিচার শেষ হয়। তবে এখানে শেষ বিচার হবে না—দোষী প্রমাণ হলে দায়রায় চালান হবে যশোরে। সেখানে জজসাহেব বিচার করবেন। বাড়ী গিয়ে পয়সা-কড়ি যোগাড় কর গিয়ে—বড্ড ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছ—অনেক টাকার খেলা।

হাফেজ ও বছিরদ্দি সব শুনে যেন মাটির মধ্যে বসে গেল। বনগাঁয়ে মোক্তারবাবুর টাকাই যোগাড় হয় না, আবার যশোর জেলায় কোর্টের উকিলবাবুদের টাকা গরিব গ্রামের-লোকের চাঁদায় কি যোগাড় হয়ে উঠবে ? ইচুকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে উঠল।

এতক্ষণ পরে ইচু কথা বললে। এতক্ষণ সে একটি কথাও বলেনি। এইবার সে হাত জোড় করে বললে—বাবু, মোর একটি কথা বলবার আছে।

ওর মুখের দিকে সবাই চাইলে। মোক্তারবাবুও চাইলেন। এইবার বোধহয় সব প্রকাশ করতে চাইছে লোকটা। এই রকম ভাবেই বলে, তিনি জানেন। হাফেজ ও বছিরদ্দি মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। কি জানি ওর পেটে কি আছে। মানুষকে সব সময়ে বাইরে থেকে চেনা যায় না।

রামলাল মোক্তার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। ভাবটা এই রকম—বলে ফেল বাপু যা আছে পেটে। অমন অনেক ঘুঘুই আমরা দেখলাম, তুমি এখন বাকি আছ।

ইচু রামলালবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে ধরে বললে—বাবু, মোর একটা দরবার আছে। যাতে হয় আপনি তা দেখবেন—মুই গরিব লোক, জন খেটে খাই, আপনার পয়সা হয়তো মুই দিতি পারব না, গরিব বলে দয়া করে একটা আবদার রাখবেন মোর—আল্লা, দিনদুনিয়ার মালিক, আপনার ভাল করবে।

—আহা-হা, পা ছুঁয়ো না—কি—কি বল—

—বাবু, যেখানে মোরে রাখে, যা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু, আপ্‌নি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে যেন পাঁচ-ওক্ত নামাজ আমি সেখানে পড়তি পারি—আর কিছু আমার বলবার নেই বাবু।

রামলালবাবুর সেরেস্তায় বজ্রপাত হলেও লোকে অতটা চকিত হোত না (সেকালের নভেলের বর্ণনা অনুযায়ী)। হাফেজ ও বছিরদ্দি আবার পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এ রকম কথা এ সময় তিনি সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেন নি, যে খুনের দায়ে আজ পথেই হয়তো পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হবে, আজ বাদে কাল যাকে দায়রায় চালান দেওয়া হবে—শত অসুবিধা, অর্থনাশ, নির্যাতন যার সামনে, আর আইনের খাঁড়া যার মাথার ওপর ঝুলছে—নিষ্ঠুর নিয়তির হৃদয়হীন রক্তাক্ত ইঙ্গিতের মত।

রামলালবাবুই সেদিন বার লাইব্রেরিতে গিয়ে গল্প করেছিলেন—সত্যি অবাক হয়ে গেলাম ভায়া, যখন লোকটা ও কথা বললে। আজ যাকে পথেই অ্যারেস্ট করবে পুলিশে, কাল পুরবে হাজতে, যার সব যেতে বসেছে—সে যে ওই ধরনের রিকোয়েস্ট করতে পারে তা আমার মাথায় আসেনি। আমি আগে ভেবেছিলাম বুঝি কনফেস করবে। সামান্য একজন লোক—আমার চোখে জল এসে পড়ল ভায়া।

ওরা সব চলে গেল। ইচু শেখকে ওরা বাজার থেকে পেটভরে তেলেভাজা সিঙাড়া কচুরি আর মুড়ি খাওয়ালে। হাফেজ বললে—ওরে চাড্ডি হোটেলের ভাত খাইয়ে নিলি হোত। পুলিশি ধরলি কোথায় নিয়ে যাবে, আজ খাওয়া হবে কি না ঠিক তো নেই।

কিন্তু অত-সকালে হোটেলে ভাত পাওয়া গেল না।

রাস্তা চলতে লাগল সবাই। দুপুরের কিছু দেরি আছে, ইচু পথের পাশে এক বটতলায় ছায়ায় নামাজ পড়তে বসল। আর কোন কথা ওর মনে থাকে না। ঝিরঝিরে হাওয়ায় আজ পথের ধারের গাছতলায় অপূর্ব আনন্দ ও শান্তি নেমে আসে প্রাণে নামাজের সময়। সে সব ভুলে যায়। চোখে যেন জল আসে। নিমি কত ভাত বেঁধে দিয়েছে—কত আদর-যত্ন করেছে। তার চরিত্র খারাপ ছিল? সে কিছু জানে না। নিমির জন্যে বুকের মধ্যে একটা বেদনা। নিমিকে সে খুন করবে? কাউকে কখনও খুন করার কথা তার মনে আসেনি। আল্লা সাক্ষী আছেন সব কাজের। ভয় কি? মালিক যা করবেন তাই হবে।

রাস্তায় ওকে পুলিশে ধরলে না। বেলা ছুটোর সময় বাড়ী ফিরে ওরা দেখলে পুলিশ হকাদার অপেক্ষা করছে ওদের পাড়ার বড় মোড়লের বাড়ী। লোক গিজগিজ করছে। ডাকহাঁক, সাক্ষীর জবানবন্দি হতে বিকেল হয়ে গেল। শাইলিপাড়া গ্রামের সবাই একবাক্যে দারোগার সামনে বললে ইচুর দ্বারা এ খুন হয়েছে তারা কেউ বিশ্বাস করে না। জবানবন্দিতে আরও প্রকাশ পেল, ইচুর স্ত্রী নিমি প্রায়ই রাত্রে স্বামীকে ঘুম পাড়িয়ে বাড়ী থেকে বেরুত। গ্রামের মধ্যে তার প্রেমিকের অভাব ছিল না। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও চলত। দারোগা ইচুকে সামনে ডাকিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করলেন। শেষে বললেন—তুমি কিছু জানতে না যে, তোমার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ?

—না, দারোগাবাবু। কিছু জানি নে মুই।

—জান এতে চালান দিলে তোমার ফাঁসি হতে পারে?

—আল্লার যদি তাই মর্জি হয়, মোর মনে এতটুকু খেদ থাকবে না দারোগাবাবু—তেনার যা মর্জি তাই তিনি করুক। মুই খুশি ছাড়া অখুশি হব না।

বুড়ো হাফেজ মণ্ডল এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললে—কাকে কি বলছেন বাবু? আল্লার কথা উঠলি ওর চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অমন লোক এ দিগরে নেই।

দারোগাবাবু বললেন—তুমি কাল রাত্রে কোথায় ছিলে?

—ঘরেই শুয়ে ছেলাম। মড়ার মত ঘুম এসেছে চকি, সনেকপুরের বিলি জন খাটেলাম সারাদিন। ওনারা ডাকলে সকালবেলা, তখন মুই ঘুম ভেঙে উঠি।

দারোগাবাবু অভিজ্ঞ লোক, পুলিশের চাকরি অনেকদিন করছেন। কে সাধু কে বদমাইস চেনেন, ইচুর দ্বারা এ কাজ হয়নি ওর মুখের দিকে চেয়ে তখনই বিদ্যুতের লেখা বাণীর মত তাঁর মনের মধ্যে এ সত্য উদয় হোল।

সেই সন্ধ্যায় ইচু নামাজ সেরে ভাঙা খালি ঘরে ঢুকতেই ওর প্রাণটা হা হা করে উঠল।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দে!

সে আপন মনেই ডাকল। নিমিকে সে কত ভালবাসত, যে যা বলে ওসব সে বিশ্বাস করে না। বিচার করবার সে কেউ নয়। নিমিকে সে ক্ষমা করেছে।

—নিমি, ও নিমি, মোরে ভাত এনে দিলি নে?

পরদিন গ্রামের লোক সকালে উঠে ইচুকে আর তার ঘরে দেখতে পেলে না। সে একবস্ত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছে কখন। গৃহস্থালির কলসী, হাঁড়িকুড়ি, নারকোলের মালা, দু-একখানা পিতলের ঘটিবাটি সব ফেলে রেখে গিয়েছে।

খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণকুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যার আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুরচটা বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নামাজ পড়ে, তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো, প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা। সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির।

আইনস্টাইন কেন যে দার্জিলিং যাইতে যাইতে রানাঘাটে নামিয়াছিলেন বা সেখানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে "On…ইত্যাদি ইত্যাদি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন—একথা বলিতে পারিব না। আমি ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমি আপনাদের নিকট সরবরাহ করিতে অপরাগ, তবে আমি যেরূপ অপরের নিকট হইতে শুনিয়াছি সেরূপ বলিতে পারি।

আসল কথা, নাৎসী জার্মানি হইতে নির্বাসিত হওয়ার পর হইতে বোধ হয় আইনস্টাইনের কিছু অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, বক্তৃতা দিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে আগমন। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেনও একথা সকলেই জানেন, আমি নূতন করিয়া তাহা বলিব না।

কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন গণিতের অধ্যাপক রায় বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। সেনেট হলে আইনস্টাইনের অদ্ভুত বক্তৃতা "On the Unity & Universality of Forces" শুনিয়া অন্য পাঁচজন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মত তিনিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কলেজে আইনস্টাইনকে আনাইয়া একদিন বক্তৃতা দেওয়াইবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রিন্সিপাল আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

তিনি বলিলেন—"না রায় বাহাদুর, আমার অন্য কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এমন দিনে এক-জন জার্মান—"

রায় বাহাদুর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন (যেমন ধরনের উত্তেজিত হইয়া তিনি উঠিতেন সন্ধ্যায় রাসমোহন উকিলের বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠের সময়, অন্য কেহ যদি কোন বিরুদ্ধ তর্ক উত্থাপন করিত)—"সে কি মহাশয়! জার্মান কি? জার্মান? আইনস্টাইন জার্মান? ওঁদের মত মহা-মানবের, ওঁদের মত ঋষি বৈজ্ঞানিকের দেশ আছে? জাতের গণ্ডি আছে? আমি বলি—"

প্রিন্সিপাল বলিলেন—"আমিও বলছি নে যে তা আছে। কিন্তু বর্তমানে যেমন অবস্থা—" দুই প্রবীণ অধ্যাপকে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল।

প্রিন্সিপাল দর্শন শাস্ত্রের পণ্ডিত, তিনি মধ্যযুগের স্কলাস্টিক দর্শনের প্রধান আচার্য জন স্কোটাসের উদাহরণ দেখাইলেন। আয়র্লণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও নবম শতাব্দীর গোঁড়াদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ফ্রান্সে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আয়র্লণ্ডে আর ফিরিতে পারিয়াছিলেন কি? আসল মানুষটাকে কে দেখে! তাঁর মতামতেরই মূল্য দেয় লোকে।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত যখন প্রিন্সিপাল রাজি হইলেন না তখন রায় বাহাদুরকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার কানে গেল আইনস্টাইন শীঘ্রই দার্জিলিং যাইবেন। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি হিমালয় দেখিতে পারেন নাই, এইবার এত কাছে আসিয়া আর দার্জিলিং না দেখিয়া ছাড়িতেছেন না।

রায় বাহাদুর ভাবিলেন দার্জিলিঙের পথে রানাঘাটে নামাইয়া লইয়া সেখানে এক সভায়

আইনস্টাইনকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইলে কেমন হয় ?

রায় বাহাদুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করিলেন।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ভারতবর্ষের দর্শনের কথা আমায় কিছু বলুন।"

রায় বাহাদুর প্রমাদ গনিলেন। তিনি গণিতের অধ্যাপক; দর্শন, বিশেষত ভারতীয় দর্শনের কোন খবর রাখেন না, তবুও ভাগ্যে গীতা মাঝে মাঝে পড়া অভ্যাস ছিল; সুতরাং অকূল সমুদ্রে গীতারূপ ভেলা (কোন আধ্যাত্মিক অর্থে নয়) অবলম্বন করিয়া দু-এক কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। 'বাসাংসি জীর্ণানি' ইত্যাদি।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ম্যাক্সমুলারের বেদান্তদর্শনের উপর প্রবন্ধ পড়ে এক সময়ে সংস্কৃত শেখবার বড় ইচ্ছে হয়। দর্শনে আমি স্পিনোজার মানসশিষ্য। স্পিনোজার দর্শন গণিতের ফর্মে ক্রমানুসারে সাজানো। স্পিনোজার মন গণিতজ্ঞ দ্রষ্টার মন, সেজন্য আমি ওঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু বেদান্ত সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের প্রবন্ধ পড়ে আমি নতুন এক রাজ্যের সন্ধান পেলাম। ইউক্লিডের মত খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক মন স্পিনোজার, সেখানে কূটতর্কও বাঁধা পথে চলে। আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে কল্পনাবিলাসী—।"

রায় বাহাদুর অবাক হইয়া আইনস্টাইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি!"

আইনস্টাইন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমার কালের সঙ্গে ক্ষেত্রের একত্র মিলনকে আপনি কল্পনায় ছাঁচে ঢালাই-করা বিবেচনা করেন না কি ?"

রায় বাহাদুর আরও অবাক। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "নতুন ডাইমেনশানের সন্ধান-দাতা আপনি, নিউটনের পর নববিশ্বের আবিষ্কারক আপনি—আপনাকে কল্পনাবিলাসী বলতে—"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর কবিসুলভ দীর্ঘ কেশ ও স্বপ্নভরা অপূর্ব চোখের দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। কল্পনা প্রখর না হইলে হয়তো বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, রায় বাহাদুর ভাবিলেন। কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, আইনস্টাইন পাশের ছোট টেবিল হইতে চুরুটের বাক্স আনিয়া রায় বাহাদুরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। নিজের হাতে একটি মোটা চুরুট বাহির করিয়া ছুরি দিয়া ডগা কাটিয়া রায় বাহাদুরের হাতে দিলেন। রায় বাহাদুরের বাঙালী মন সংকুচিত হইয়া উঠিল। অত বড় বৈজ্ঞানিকের সামনে সিগার ধরাইবেন তিনি, জনৈক হেঁজিপেঁজি অঙ্কের মাস্টার ? তাছাড়া সাহেবও তো বটে, সেটাও দেখিতে হইবে তো। সাহেব জাত কাঁচাখেগো দেবতার জাত। রায় বাহাদুর একটা সিগার তুলিয়া বলিলেন—"আপনি ?"

—"ধন্যবাদ। আমি ধূমপান করি নে।"

—"ও !"

—"আমি একটা কথা ভাবছি।"

—"কি, বলুন।—"

—"রানাঘাটে সভা করলে কেমন লোক হবে আপনার মনে হয় ? কেমন জায়গা রানাঘাট ?"

—"জায়গা ভালই। লোকও হবে।"

—"কিছু টাকা এখন দরকার। যা ছিল জার্মানিতে রেখে এসেছি। ব্যাঙ্কের টাকা এক মার্কও তুলতে দিলে না, একরকম সর্বস্বান্ত।"

—"আমি রানাঘাটে বিশেষ চেষ্টা করছি, স্যার।"

—"ওখানে বড় হল পাওয়া যাবে কি?"

—"তেমন নেই। তবে মিউনিসিপ্যাল হল আছে, মন্দ নয়, কাজ চলে যাবে।" রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইতে চাহিলেন, ভাবিলেন এত বড় লোকের সময়ের ওপর অত্যাচার করিবার দরকার নাই।

আইনস্টাইন বলিলেন—"আমার কিছু ছাপা কাগজ ও বিজ্ঞাপন নিয়ে যান। যে বিষয়ে বক্তৃতা হবে, সে আপনাকে পরে জানাব, টিকিটের দাম কত করব?"

—"খুব বেশি নয়—এই ধরুন—"

—"তিন মার্ক—দশ শিলিং?"

—"আজ্ঞে না স্যার। সর্বনাশ! এ সব গরিব দেশ। দশ শিলিং আজকাল দশ টাকার কাছাকাছি পড়বে। ওদামে টিকিট কেনবার লোক নেই এদেশে, স্যার।"

—"পাঁচ শিলিং?"

—"আচ্ছা, তাই করুন। ছাত্রদের জন্যে এক শিলিং।"

আইনস্টাইন হাসিয়া বলিলেন, "ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। আমি নিজেও স্কুল-মাস্টার। আমার ওপর তাদের দাবি আছে। বম্বে ও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতেও তাই হয়েছিল। ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। এই নিয়ে যান ছাপা হ্যাণ্ডবিল ও কাগজপত্র—"

রায় বাহাদুর বিল হাতে পাইয়া পড়িয়া দেখিতে গিয়া বিষণ্ণমুখে বলিলেন—"এ কি স্যার? এ যে ফরাসী ভাষায় লেখা!"

—"ফরাসী ভাষায় তো বটেই। প্যারিসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছাপিয়েছিলাম। কেন, ফরাসী ভাষা বুঝবে না কেউ? আমি তো সেদিন শুনলাম এখানে ইউনিভার্সিটিতে ফরাসী পড়ানো হয়?"

—"আজ্ঞে না। সে হয়তো এক-আধজন বুঝতে পারে। সেভাবে ফরাসী ভাষা পড়ানো হয় না। এখানে ইংরিজিটাই চলে। কেউ বুঝবে না স্যার।"

—"তাই তো! আপনি ইংরিজিতে অনুবাদ করে নিয়ে ওখানে কোনও প্রেসে ছাপিয়ে নেবেন দয়া করে?"

—"তা—ইয়ে—তা—আচ্ছা স্যার।"

রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন—এখান থেকে বালিগঞ্জে গিয়ে বিনোদের শরণাপন্ন হইগে। ছোকরা ভাল ফ্রেঞ্চ জানে। কাঁহাতক আর একজন এত বড় লোকের সামনে 'জানি নে মশাই' বলা যায়!

বিনোদ চৌধুরী তাঁর বড় শালা। পণ্ডিত লোক। অনেক রকম ভাষা তার জানা আছে। সে উৎসাহের সঙ্গে বিলগুলির বাংলা ও ইংরিজি অনুবাদ করিয়া দিয়া বলিল—"আমি চাটুয্যে

মশায়, রানাঘাট যাব সেদিন। আমার থিওরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে পরিচয় অবিশ্যি লিওনেল বুলটনের পপুলার বই থেকে। তবুও আইনস্টাইনকে আমি এ যুগের ঋষি বলে মানি। সত্যকার দ্রষ্টা ঋষি। সত্যকে যাঁরা আবিষ্কার করেন, তাঁরাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।' লম্বা লম্বা লাঙল মার্কা ইকোয়েশন বুঝতে না পারি, কষতে না পারি, কিন্তু কে কি দরের সেটুকু—।"

রায় বাহাদুর দেখিলেন চতুর শ্যালকটি তাঁহাকে ঠেস দিয়া কথা বলিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"অর্থাৎ সেই সঙ্গে আমার দরটাও বুঝি ঠিক করে ফেললে বিনোদবাবু? বেশ, বেশ।"

—"রামোঃ! চাটুয্যে মশায়, ছি ছি, তেমন কথা কি আমি বলি?"

—"বল না?".

—"স্পেস—টাইম—কনটিনিউয়ামের মোহজালে পড়ে কোন্‌টা কখন কি অবস্থায় বলেছি, তা কি সব সময় হলফ নিয়ে বলা যায় চাটুয্যে মশায়? এবেলা এখানে থেকে যাবেন না?"

—"না না, আমার থাকবার জো নেই। অনেক কাজ বাকি। যাতে দুপয়সা হয় ভদ্রলোকের, সে ভার আমার ওপর। দেখি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানদের একটু ধরাধরি করিগে। ঘুঘু সব। হলটা যদি পাওয়া যায়—"

—"কি বলেন আপনি চাটুয্যে মশায়! আইনস্টাইনের নাম শুনলে হল না দিয়ে কেউ পারবে? আহা, শুনলেও কষ্ট হয়, অত বড় বৈজ্ঞানিককে আজ এ বৃদ্ধ বয়সে পয়সার জন্যে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে—দি ওয়ার্লড ভাজ নট নো ইট্‌স গ্রেটেস্ট—"

—"তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিনোদ। ঐ যা শেষকালে বললে ঐ কথাটাই ঠিক। অনেক ধরাধরি করতে হবে। পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনেই যাই।"

ইহার পরের কয়েকদিন রায় বাহাদুর অত্যন্ত ব্যস্ত রহিলেন। রানাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, স্কুলের হেডমাস্টার, উকিল, মোক্তার, সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসাদারগণের সঙ্গে দেখা করিয়া সব বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয় লক্ষ্য রাখিলেন, সকলেরই যথেষ্ট উৎসাহ, সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ। যেন সবাই আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে চলিয়াছে।

বৃদ্ধ মোক্তার অভয়বাবু বলিলেন,—"কি নামটি বললেন মশাই সাহেবের? আ—কি? আ——ইন্ স্টাই-ন? বেশ বেশ। হাঁ, বিখ্যাত নাম। সবাই জানে সবাই চেনে। ওঁরা হলেন গিয়ে স্বনামধন্য পুরুষ—নাম শোনা আছে বইকি।"

রায় বাহাদুর রাগে ফুলিয়া মনে মনে বলিলেন—তোমার মুণ্ডু শোনা আছে, ড্যাম ওল্ড ইডিয়ট! এ তুমি কাপুড়ে মহাজন শ্যামচাঁদ পালকে পেয়েছ? স্বনামধন্য! তিন জন্ম কেটে গেলে যদি এ নাম তোর কানে পৌঁছয়। মিথ্যে সাক্ষী শিখিয়ে তো জন্ম খতম করলি, এখন আইনস্টাইনকে বলতে এসেছে স্বনামধন্য পুরুষ! ইডিয়সির একটা সীমা থাকা চাই।

নির্দিষ্ট দিনে রায় বাহাদুর কৃষ্ণনগর কলেজের কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে লইয়া সকালের ট্রেনে রানাঘাটে নামিলেন। তাঁর শালা বিনোদ চৌধুরী দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, বিশেষ কার্যবশত তাহার আসা সম্ভব হইল না, আইনস্টাইনের বক্তৃতা শোনা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে, ইত্যাদি।

সেজন্য রায় বাহাদুরের মনে দুঃখ ছিল, ছোকরা সত্যিকার পণ্ডিত লোক, আজকার এমন সভার বেচারীর আসিবার সুযোগ মিলিল না। ভাগ্যই বটে।

রানাঘাট স্টেশনের বাহিরে আসিয়া সম্মুখের প্রাচীরে নজর পড়িতে রায় বাহাদুর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। এ কি ব্যাপার! প্রাচীরের গায়ে লটকানো টাউস এক দু-তিন-রঙা বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা আছে—

বাণী সিনেমা গৃহে (নীল)
আসিতেছেন! আসিতেছেন!! (কালো)
আসিতেছেন!!! (কালো)
কে?? (কালো)
কবে?? (কালো)
সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী (লাল)
অদ্য রবিবার ২৭শে কার্তিক সন্ধ্যা ৫॥০টায় (নীল)
জনসাধারণকে অভিবাদন করিবেন!! (কালো)
প্রবেশমূল্য ৫৲, ৩৲, ২৲ ও ১৲ টাকা (কালো)
মহিলাদের ৫৲ ও ২৲ টাকা (কালো)
এমন সুযোগ কেহ হেলায় হারাইবেন না। (লাল)

কি সর্বনাশ!

রায় বাহাদুর রুমাল বাহির করিয়া কার্তিক মাসের শেষের দিকের সকালেও কপালের ঘাম মুছিলেন। তাহার পর একবার ভাল করিয়া পড়িলেন তারিখটা। না, আজই। আজ রবিবার ২৭শে কার্তিক।

অন্যমনস্ক ভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন আর একখানা সেই বিজ্ঞাপন। ক্রমে যতই যান, সর্বত্রই সেই তিনরঙা বিজ্ঞাপন। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মহাশয়ের বাড়ী পর্যন্ত যাইতে অন্তত ছত্রিশখানা সেই বিজ্ঞাপন আঁটা দেখিলেন বিভিন্ন স্থানে।

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু ফুলবাগানের সামনে ছোট বারান্দায় বসিয়া তেল-ধুতি পরনে তেল মাখিতেছিলেন। রায় বাহাদুরকে দেখিয়া ভাল হইয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"খুব সৌভাগ্য দেখছি। এত সকালে যে?—নমস্কার!"

—"নমস্কার, নমস্কার! চানের জন্যে তৈরি হচ্ছেন? ছুটির দিনে এত সকাল যে?"

—"আজ্ঞে হাঁ, চানটা সকালেই করি।"

—"বাড়ীতে?"

—"আজ্ঞে না, চূর্ণীতে যাই। ডুব দিয়ে চান না করলে—অভ্যেস সেই ছেলেবেলা থেকেই। বসুন, বসুন। আজ যখন এসেছেন তখন দুপুরে গরিবের বাড়ীতেই দুটো ডাল-ভাত—"

—"সেজন্যে কিছু না। নো ফর্ম্যালিটি। আমার মামতুতো ভাই নীরেনের ওখানে না গেলে রাগ করবে। সেবার তো যাওয়াই হোল না।"

—"তাহলে চা চলবে তো ?"

—"তাতে আপত্তি নেই। সে হবে এখন। আসলে যে জন্যে আসা—তা এ এক কি হাঙ্গামা দেখছি ? কে ইন্দুবালা দেবী আসছে বাণী সিনেমাতে আজই—"

—"হ্যাঁ তাই তো, দেখছিলাম বটে।"

—"দিন বুঝে আজই ?"

—"তাই তো—আমিও তাই ভাবছিলাম। ক্ল্যাস করবে কিনা ?"

—"এখন তো আমরা দিন বদলাতে পারি না। সব ঠিকঠাক। আমাদেরও হ্যাণ্ডবিল বিলি, বিজ্ঞাপন বিলি, সব হয়ে গিয়েছে। আইনস্টাইন আসবেন এই দার্জিলিং মেলে।"

—"আমিও তো ভেবেছি। তাই তো—"

—"তবে আমার কি মনে হয় জানেন ? যারা সিনেমাতে ইন্দুবালাকে দেখতে যাবে, তারা সাহেবদের লেকচার শুনতে আসবে না। সাহেবদের সভায় যারা আসবে, তারা ঠিকই আসবে।"

আইনস্টাইনকে 'সাহেব' বলিয়া উল্লেখ করাতে রায় বাহাদুর মনে মনে চটিয়া গেলেন। এমন জায়গাতেও তিনি আনিতে চলিয়াছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে ! এ কি পাট-কলের ম্যানেজার, না রেলের টি. আই, যে 'সাহেব' 'সাহেব' করবি ? বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয় তো !

মুখে বলিলেন,—"হাঁ, তা বটে।"

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু তাঁর অমায়িক আতিথেয়তার জন্যে হানাঘাটে প্রসিদ্ধ। চা আসিল, সঙ্গে এক রেকাবি খাবার আসিল। রায় বাহাদুর চা-পানান্তে আরও নানা স্থানে ঘুরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, অনেক কিছু ঠিক করিতে হইবে।

যাইবার সময় বলিলেন—"মিউনিসিপ্যাল হলের চাবিটা—"

শ্রীগোপালবাবু বলিলেন—"আমাদের হলের চাকর রাজনিধিকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার বাসার চাকরও যাবে। ওরা হল খুলে সব ঠিক করবে। সেখানে ফ্রী রীডিং রুম আছে, সকালে আজ ছুটির দিন খবরের কাগজ পড়তে লোকজন আসবে। তাদের মধ্যে যারা ছেলে-ছোকরা তাদের ধরে চেয়ার বেঞ্চি সাজিয়ে নিচ্ছি। কিছু ভাববেন না।"

শ্রীগোপালবাবু স্নান করিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতেই তাঁহার বড় মেয়ে (শ্রীগোপালবাবু আজ তিন বৎসর বিপত্নীক, বড় মেয়েটি শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, সে-ই সংসার দেখাশুনা করে) বলিল, —"বাবা, আমাদের পাঁচখানা টিকিট করে এনে দাও।"

—"কিসের টিকিট ?"

—"বা রে, বাণী সিনেমায় ওবেলা ইন্দুবালা আসছে—নাচগান হবে। সবাই যাচ্ছে আমাদের পাড়ার।"

—"কে যাচ্ছে ?"

—"সবাই ! এই মাস্তর রাণু, অলকা, টেঁপি, যতীন কাকার মেয়ে চেঁড়স—এরা এসেছিল। ওরা সব বক্স নিচ্ছে একসঙ্গে—বক্স নিলে মেয়েদের আড়াই টাকা করে রিজার্ভ টিকিট দিচ্ছে।

আমাদের জন্যে একটা বক্স নাও।"

শ্রীগোপালবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন,—"হ্যাঁ ভাবি—আবার একটা বক্স! বড্ড টাকা দেখেছিস আমার। সেই ১৯০৩ সাল থেকে জোয়াল কাঁধে নিয়েছি, সে জোয়াল আর নামল না। কেবল টাকা দাও আর টাকা দাও—"

অপ্রসন্ন মুখে দেরাজ খুলিয়া মেয়ের হাতে একখানা দশ টাকার নোট ও কয়েকটি খুচরা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

একটু পরে প্রতিবেশী রাধাচরণ নাগ আসিয়া বৈঠকখানায় উঁকি মারিয়া বলিলেন—"কি হচ্ছে শ্রীগোপালবাবু?"

—"আসুন ডাক্তারবাবু, খবর কি? যাচ্ছেন তো ও বেলা?"

—"হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনারা যাচ্ছেন তো?"

—"যাব বই কি। রানাঘাটের ভাগ্য অমন কখনও হয়নি। যাওয়া উচিত নিশ্চয়।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়ীতে। টাকা-খরচ—ও তো আছেই। কিন্তু এমন সুযোগ—বাড়ীর সবাই ধরেছে, দিলাম দশটা টাকা বের করে। বলি বয়েস তো হোল ছাপ্পান্নর কাছাকাছি, কোন্‌দিন চোখ বুজব, তার আগে—"

—"নিশ্চয়। জীবনে ওসব শোনবার সৌভাগ্য কবার ঘটে? আমাদের রানাঘাটবাসীর বড় সৌভাগ্য যে উনি আজ এখানে আসবেন।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়ীতে। বয়েস হয়ে এল, দেখে নিই, শুনে নিই—গেলই না হয় গোটাকতক টাকা।"

—"তা ছাড়া, অত বড় বিখ্যাত একজন—"

—"সে আর বলতে! আজকাল সব জায়গায় দেখুন ইন্দুবালা দেবী, সাবানের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, গন্ধতেলের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, শাড়ির বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালার ছবি। তাকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য—বিশেষ করে রানাঘাটের মত এঁদোপড়া জায়গায়—সৌভাগ্য নয়? নিশ্চয় সৌভাগ্য।"

শ্রীগোপালবাবু হাঁ করিয়া নাগ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না। ঝাড়া মিনিট-দুই পরে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন,—"আমি কিন্তু সে কথা বলছি নে। আমি বলছি সায়েবের লেকচারের কথা, মিউনিসিপ্যাল হলে।"

রাধাচরণবাবু ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন,—"কোন্ সায়েব?"

—"কেন, আপনি জানেন না? আইনস্টাইন—মিঃ আইনস্টাইন!"

রাধাচরণবাবু উদাসীন সুরে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে বলিলেন,—"ও, সেই জার্মান না ইটালিয়ান সাহেব? হ্যাঁ—শুনেছি, আমার জামাই বলছিল। কি বিষয়ে যেন লেকচার দেবে? তা ওসব আর আমাদের এ বয়সে—লেখাপড়ার বালাই অনেকদিন ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওসব করুকগে কলেজের ইস্কুলের ছেলে-ছোকরারা—হ্যাঃ!"

শ্রীগোপালবাবু ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাধাচরণবাবু পুনরায়

বলিলেন,—"তা আপনি কি করবেন শুনি ?"

—"আমার বাড়ীর মেয়েরা তো যাচ্ছে সিনেমায়। তবে আমাকে যেতেই হবে সায়েবের বক্তৃতায়। রায় বাহাদুর নীলাম্বরবাবু এসে খুব ধরাধরি করছেন—"

—"কে রায় বাহাদুর ? নীলাম্বরবাবুটি কে ?"

—"কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসর। তাঁরই উদ্যোগে সব হচ্ছে। তিনি এসে বিশেষ—"

রাধাচরণবাবু চোখ মিটকি মারিয়া বলিলেন,—"আরে ভায়া, একটা কথা বলি শোন। একটা দিন চল দেখে আসা যাক। ছবির ইন্দুবালা আর জ্যান্ত ইন্দুবালাতে অনেক ফারাক। ইহজীবনে একটা কাজ হয়ে যাবে। ওসব সায়েব-টায়েব ঢের দেখা হয়েছে। দুবেলা রানাঘাট ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে থাক দার্জিলিং মেল শিলং মেলের সময়ে—দেখ না কত সায়েব দেখবে। কিন্তু ভায়া এ সুযোগ—বুঝলে না ?"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—"তা—তা—কিন্তু, তবে রায় বাহাদুরকে কথা দেওয়া হয়েছে কিনা, তিনি কি মনে করবেন—"

রাধাচরণবাবু মুখ বিকৃত করিয়া খিঁচাইবার ভঙ্গিতে বলিলেন,—"হ্যাঃ! কথা দেওয়া হয়েছে রায় বাহাদুরকে! ভারি রায় বাহাদুর! এত কি ওবলিগেশন আছে রে বাবা! বলো এখন, বাড়ীর মেয়েরা সব গেল তাই আমায় যেতে হোল। তারা ধরে বসল তা এখন কি করা। বলি কথাটা তো নিতান্ত মিথ্যে কথাও নয়।"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—"তা—তা—তা তো বটেই। সে কথা তো—"

রাধাচরণবাবু বলিলেন,—"রায় বাহাদুর এলে বলো এখন তাই। তাঁকেও অনুরোধ কর না বাণী সিনেমায় যেতে।"

—"চললেন ?"

—"চলি। ওবেলা আসব ঠিক সময়ে।"

রায় বাহাদুর স্থানীয় জমিদার নীরেন চাটুয্যের বাড়ীতে বসিয়া সভা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আয়োজন করিতেছিলেন।

নীরেনবাবু রায় বাহাদুরের মাসতুতো ভাই, স্থানীয় জমিদার ও উকিল। উকিল হিসাবে হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু জমিদারির আয় ও পূর্বপুরুষ সঞ্চিত অর্থে রানাঘাটের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। শিক্ষিত লোকও বটে।

রায় বাহাদুর গুরুভোজন করিয়া উঠিয়াছেন মধ্যাহ্নে। ধনী মাসতুতো ভাই-এর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজন রীতিমত গুরুতর। দু-একবার নিদ্রাকর্ষণ হইতেও ছিল, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে শুইতে পারেন নাই।

নীরেনবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা দাদা, বক্তৃতায় মোট কথাটা কি হবে আজকের ?"

—"তা ঠিক জানি নে। On the unity of forces—এই বিষয়বস্তু। এ থেকে ধরে নাও।"

—"উনি space-এর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছেন, কি বলুন ?"

—"অর্থাৎ ?"

—"Space বলেছেন সীমাবদ্ধ। আগেকার মত অসীম অনন্ত space আর নেই।"

—"তোমার ম্যাথমেটিক্স ছিল এম. এসসি-তে ? Geometry of Hyperspaces পড়েছ ?"

—"মিশ্রত ম্যাথমেটিক্স ছিল। আপনি যা বলছেন, তা আমি জানি।"

—"খুব খুশি হলুম দেখে নীরেন যে শুধু জমিদারী কর না, জগতের বড় বড় বিষয়ে একটু-আধটু সন্ধান রাখ। খুব বেশি সন্ধান হয়তো নয়, তবুও the very little that you know is unknown to many."

—"আচ্ছা দাদা, উনি কি আজই চলে যাবেন ?"

—"সম্ভব। দার্জিলিং যাবেন বলছিলেন। দার্জিলিঙের পথে এখানে নামবেন। যাতে ওঁর দু পয়সা আজ হয়, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।"

—"আজ সভার পরে আমার বাড়ীতে আসুন না একবার দাদা ? এখানে রাতের জন্যে রাখতেও আমি পারি। আজ দার্জিলিঙের গাড়ী নেই। রাত্রে এখানে থাকুন। কোন অসুবিধা হবে না।"

—"বেশ, বলব এখন।"

—"যাতে থাকেন তাই করুন। কালই খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট করিয়ে দেব এখন। শ্রী প্রেসের আর আনন্দবাজারের রিপোর্টার এখানে আছে।"

রায় বাহাদুর বুঝিলেন তাঁর মাসতুতো ভাইটির দরদ কোথায়। সেসব কথা বলিয়া কোন লাভ নাই, এখন কোন রকমে কার্যসিদ্ধি হইলেই হয়। কোন রকমে আজ মিটিং চুকিলে বাঁচেন।

বাড়ীর ভিতর হইতে নীরেনবাবুর মেয়ে মীনা আসিয়া বলিল,—"ও জ্যাঠামশায়, বাবাকে বলে আমাদের টিকিটের টাকা দিন।"

নীরেনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন,—"যা যা বাড়ীর মধ্যে যা, এখন বিরক্ত করিসনি। ব্যস্ত আছি।"

মীনা আবদারের সুরে বলিল,—"তোমাকে তো বলিনি বাবা, জ্যাঠামশাইকে বলছি।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের টিকিট রে মীনু ?"

মীনা বলিল,—"আপনি কোথায় থাকেন যে সর্বদা! আমাদের পাশের বাড়ীর সবিতা আপনাদের কলেজে পড়ে, সে বলে আপনি নাকি পথ চলতে চলতে অঙ্ক কষেন। সত্যি, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই ?"

নীরেনবাবু পুনরায় ধমকের সুরে বলিলেন,—"আঃ, জ্যাঠা মেয়ে! যা এখান থেকে। জ্বালালে দেখছি। কিসের টিকিট জানেন দাদা, ঐ যে ইন্দুবালা নাকি আজ আসছে আমাদের এখানকার নারী শিল্পশালাতে, নাচগান হবে, কি নাকি বক্তৃতাও দেবে, তাই পাড়াশুদ্ধ ক্ষেপেছে যাবার জন্যে। মেয়েরা তো সকাল থেকে জ্বালালে।"

—"তা দাও না ওদের যেতে। আইনস্টাইনের লেকচারে আর ওরা কি যাবে। তবে দেখে রাখলে একটা বলতে পারত সারাজীবন। কি রে মীনু, কোথায় যাবি ?"

—"আমরা জ্যাঠাইমশাই সিনেমাতেই যাই। 'মিলন' ফিলমে ইন্দুবালাকে দেখে পর্যন্ত বড্ড একটা ইচ্ছে আছে ওকে দেখব। রানাঘাটে অমন লোক আসবে—"

রায় বাহাদুর বাকিটুকু যোগাইয়া বলিলেন,—"—স্বপ্নের অগোচর! তাই না মীনু ? টিকিটের দাম দিয়ে দাও মেয়েকে, ওহে নীরেন।"

মীনা এবার সাহস পাইয়া বলিল,—"আপনাকে আর বাবাকে যেতে হবে আমাদের নিয়ে। সে শুনছি নে। বাবার মনে মনে ইচ্ছে আছে জ্যাঠামশায়। শুধু আপনার ভয়ে—"

নীরেনবাবু তাড়া দিয়া বলিলেন,—"তবে রে দুষ্টু মেয়ে—"

মীনা হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"বাবা, তোমাকে যেতেই হবে আমাদের নিয়ে। ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।"

দার্জিলিং মেলের সময় হইয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা।

রায় বাহাদুর ও কয়েকজন ছাত্র, নীরেনবাবু ও শ্রীগোপালবাবু স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—একি ?

এত ভিড় কিসের ? প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে এত ছোকরা ছাত্র, লোকজনের ভিড়! সত্যই কি আজ আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে এখানকার সকলের টনক নড়িয়াছে ? ইহারা সকলেই দার্জিলিং মেলের সময় আসিয়াছে তাঁহাকে নামাইয়া লইতে ? অত বড় বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা বটে! লোকে লোকারণ্য প্ল্যাটফর্ম। হৈ হৈ কাণ্ড। রায় বাহাদুর পুলকিত হইলেন। সশব্দে মেল ট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল।

একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা হইতে ছোট একটি ব্যাগ হাতে দীর্ঘকেশ আয়তচক্ষু আইনস্টাইন অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা হইতে জনৈক সুন্দরী তরুণী, পরনে দামী ভয়েল শাড়ী, পায়ে জরিদার কাশ্মীরী স্যাণ্ডাল—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলাইয়া নামিয়া পড়িলেন। তরুণীর সঙ্গে আরও দুটি তরুণী, দুটিই শ্যামাঙ্গী—দুজন চাকর, তারা লগেজ নামাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কে একজন বলিয়া উঠিল,—"ঐ যে নেমেছেন! ঐ তো ইন্দুবালা দেবী—"

মুহূর্তমধ্যে প্ল্যাটফর্মসুদ্ধ লোক সেদিকে ভাঙিয়া পড়িল। সেই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে রায় বাহাদুর অতিকষ্টে আইনস্টাইনকে লইয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আইনস্টাইন অত বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিলেন তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এত লোকের ভিড়। রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরা সবই কি স্থানীয় ইউনিভার্সিটির ছাত্র ? এদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না মিঃ মুখার্জি ?"

রায় বাহাদুর এই উদার সরলপ্রাণ বিজ্ঞানতপস্বীর ভ্রম ভাঙাইবার চেষ্টা করিলেন না। রানাঘাটে আবার ইউনিভার্সিটি! হায় রে, এ দেশ কোন্ দেশ তা ইনি এখনও বুঝিতে

পারেন নাই। সবই ইউরোপ নয়।

নীরেনবাবু চাহিয়া-চিন্তিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনী গোপাল পালেদের পুরানো ১৯১৭ সনের মডেলের গাড়ীখানি যোগাড় করিয়াছিলেন। তাহাতেই সকলে মিলিয়া চড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হলের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়ীতে উঠিবার সময় দেখা গেল তখনও বহুলোক স্টেশনের গেটের দিকে ছুটিতেছে। একজন কে বলিতেছিল,—"গাড়ী অনেকক্ষণ এসেছে, ঐ দেখ লেগে আছে প্ল্যাটফর্মে। শীগগির ছোট।" ভিড়ের মধ্যে কে উত্তর দিলে,—"এখান দিয়েই তো বেরুবেন, আর ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই। বড্ড ভিড়। ও তো চেনা মুখ। দেখলেই চেনা যাবে। কত ছবিতে দেখা আছে। সেদিনও 'মিলন' ফিলমে—"

আইনস্টাইন কৌতুকের সঙ্গে বলিলেন,—"এরাও ছুটেছে স্টেশনে বুঝি? ওরা জানে না যাকে দেখতে চলেছে সে তাদের সামনেই গাড়ীতে উঠেছে। বেশ মজা, না? মিঃ মুখার্জি, এখানে ইউনিভার্সিটি কোন্ দিকে?"

সৌভাগ্যক্রমে ভিড়ের মধ্যের একটা লোক আইনস্টাইনের গাড়ীর সামনে আসিয়া চাপা পড়-পড় হওয়াতে হঠাৎ ফুটব্রেক কষার কর্কশ শব্দের ও 'এই এই' 'গেল গেল' রবের মধ্যে তাঁহার প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গেল। স্টেশন ও ভিড় ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মোড়ের মাথায় শ্রীগোপালবাবু ও নীরেনবাবু নামিয়া গেলেন। রায় বাহাদুর বলিলেন,—"এখুনি আসবেন তো?"

শ্রীগোপালবাবু কি বলিলেন ভাল বোঝা গেল না। নীরেনবাবু বলিলেন, "ওখানে ওদের পৌঁছে দিয়েই আসছি। আর কেউ বাড়ীতে লোক নেই মেয়েদের নিয়ে যেতে। টিকিটে এত-গুলো টাকা যখন গিয়েছে—"

ঐ সামনেই মিউনিসিপ্যাল হল। স্টেশনের কাছেই। কিন্তু এ কি? সাড়ে পাঁচটা সময় দেওয়া ছিল। পৌনে ছটা হইয়াছে, কেউ তো আসে নাই। জনপ্রাণী নয়। কেবল মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানী জীবন ভাদুড়ি একটা ছোট টেবিলে অনেকগুলি টিকিট সাজাইয়া শ্রোতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মোটর হলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া নামাইলেন রায় বাহাদুর। মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—"হে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ, সুস্বাগতম। আমাদের রানাঘাটের মাটিতে আপনার পদার্পণের ইতিহাস স্বর্ণ অক্ষরে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করুক—আমরা রানাঘাটবাসীরা আজ ধন্য!"

চকিত ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে শূন্যগর্ভ হলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সঙ্গে সঙ্গে। লোক কই? রানাঘাটবাসীদের অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ কোথায়?

আইনস্টাইন বিস্মিত দৃষ্টিতে জনশূন্য হলের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"এখনও আসেনি কেউ? সব স্টেশনে ভিড় করছে। মিঃ মুখার্জি, একটা ব্ল্যাক-বোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে যে। বক্তৃতার সময় ব্ল্যাক-বোর্ডে আঁকবার দরকার হবে।"

আর ব্ল্যাকবোর্ড! রায় বাহাদুর স্থানীয় ব্যক্তি। নাড়ীজ্ঞান আছে এ জায়গার। তিনি

শূন্য ও হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

জীবন ভাদুড়ি কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলিল,—"মোটে তিন টাকায় বিক্রি হয়েছে। তাও টাকা দেয়নি এখন। কি করব বলুন সার? আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে বলুন। আমারি আবার বাসার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাণী সিনেমায় যেতে হবে। কলকাতা থেকে ইন্দুবালা এসেছেন—বাড়ীতে বড্ড ধরেছে সব। পঁয়ত্রিশ টাকা মোটে মাইনে—তা বলি, থাক গে, কষ্ট তো আছেই। ওঁদের মত লোকে তো রোজ কলকাতা থেকে আসবেন না। যাক, পাঁচ টাকা খরচ হলে আর কি করছি বলুন। আমায় একটু ছুটি দিতে হবে সার। এ সায়েব কে? এ সায়েবের লেকচারে আজ লোক হবে না—কে আজ এখানে আসবে সার!"

জীবন ভাদুড়ি ক্যাশ বুঝাইয়া দিয়া খসিয়া পড়িল। হলের মধ্যে দেখা গেল চেয়ার বেঞ্চির জনহীন অরণ্যে মাত্র দুটি প্রাণী—আইনস্টাইন ও রায় বাহাদুর।

আইনস্টাইন ব্যাগ খুলিয়া কি জিনিসপত্র টেবিলের উপর সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন, সেগুলি তাঁহার বক্তৃতার সময় প্রয়োজন হইবে—সেই সুযোগে রায় বাহাদুর একবার বাহিরে গিয়া রাস্তার এদিক ওদিক উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিতে লাগিলেন।

লোকজন যাইতেছে, ঘোড়ার গাড়ীতে মেয়েরা সাজগোজ করিয়া চলিয়াছে, দ্রুতপদে পথিকদল ছুটিয়াছে—সব বাণী সিনেমা লক্ষ্য করিয়া।

রায় বাহাদুরের একজন পরিচিত উকিলবাবু ছড়িহাতে দ্রুতপদে জনসাধারণের অনুসরণ করিতেছিলেন, রায় বাহাদুরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন,—"এই যে! সায়েব এসেছেন? লোক-জন কেমন হয়েছে ভেতরে? আজ আবার আনফরচুনেটলি ওটার সঙ্গে ক্ল্যাশ করল কিনা? অন্য-দিন হলে—না, আমার জো নেই—বাড়ীর মেয়েরা সব গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কেউ নেই। বাধ্য হয়ে আমাকে—কাজেই—"

রায় বাহাদুর মনে মনে বলিলেন—হ্যাঁ, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সাড়ে ছটা। পৌনে সাতটা। সাতটা।

জনপ্রাণী নাই।

বাণী সিনেমা গৃহ লোকে লোকারণ্য। টিকিট কিনিতে না পাইয়া বহুলোক বাহিরে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে। একদল জোর-জবরদস্তি করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার দুই দিকের ব্যালকনির অবস্থা এরূপ যে আশঙ্কা হইতেছে ভাঙিয়া না পড়ে। স্টেজে যবনিকা উঠিয়াছে। চিত্রতারকা ইন্দুবালা সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন—তাঁরই গাওয়া 'মিলন' ছবির কয়েকখানি দেশবিখ্যাত, বালক বৃদ্ধ যুবার মুখে মুখে গীত গান—'জংলা হাওয়ায় চমক লাগায়', 'ওরে অচিন দেশের পোষা পাখী', 'রাজার কুমার পক্ষীরাজ' ইত্যাদি।

এমন সময়ে রায় বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে টকি-হলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে শ্রীগোপালবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পাশেই অদূরে নীরেনবাবু বসিয়া। বলিলেন—"বা রে, আপনিও এখানে!"

হঠাৎ ধরাপড়া চোরের মত থতমত খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শ্রীগোপালবাবু বলিলেন —"আমার ইচ্ছে ছিল না, কি করি, কি করি—মেয়েরা—ওদের আনা—ইয়ে—সায়েবের লেকচার কেমন হল ? লোকজন হয়নি ?"

—"কি করে হবে ? আপনারা সবাই এখানে। লোক কে যাবে ?"

—"সায়েব কোথায় ? চলে গেলেন ?"

—"এই যে—"

রায় বাহাদুরের পিছনেই দাঁড়াইয়া স্বয়ং আইনস্টাইন।

শ্রীগোপালবাবু শশব্যস্তে উঠিয়া আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া খাতির করিয়া নিজের চেয়ারে বসাইলেন।

একটি খবরের কাগজের কাটিং রাখিয়াছিলাম। এটি সেখানে জানাইয়া দেওয়া গেল—

এখানে আলুর দর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধানের দর কিছু কমের দিকে। ম্যালেরিয়া কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। স্থানীয় সুযোগ্য সাবডিভিশনাল অফিসার মহোদয়ের চেষ্টায় স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্মচারীদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

গত সপ্তাহে স্থানীয় বাণী সিনেমা গৃহে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। নৃত্যকলা-নৈপুণ্যে ও কিন্নরকণ্ঠের সংগীতে তিনি সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। বিশেষত 'কালো বাদুড় নৃত্যে' তিনি যে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন, রানাঘাট-বাসীগণ তাহা কোনদিন ভুলিবে না। এই উপলক্ষে উক্ত সিনেমা গৃহে অভূতপূর্ব জনসমাগম হইয়াছিল—সেও একটি দেখিবার মত জিনিস হইয়াছিল বটে। লোকজনের ভিড়ে মেয়েদের ব্যালকনির নীচে বরগা দুমড়াইয়া গিয়াছিল। ঠিক সময়ে ধরা পড়াতে একটি দুর্ঘটনার হাত হইতে সকলে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন গতকল্য দার্জিলিং যাইবার পথে এখানে মিউ-নিসিপ্যাল হলে বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল।

বিধু মাষ্টার

বাক্স-বদল

প্রতুলের বাবার যা কাণ্ড, তাঁর ব্যস্ততার জন্যে সব মাটি। আজ তার রওনা না হলে এমন কিছু ক্ষতি হোত না। সবে স্কুল-কলেজ কাল খুলবে, পূজোর ছুটির পরে, সারা ট্রেনে মোটর-বাসে এই বলে লোক। প্রতুলের সে তাড়া নেই, তবে আজই এই ভীষণ ভিড় সহ্য করে জনতার চাপে উদ্ব্যস্ত হয়ে না গেলে কি চলত না?

হিলি স্টেশন তেইশ মাইল রাস্তা। লোকে মোট-ঘাট ওঠাচ্ছে বাসের ছাদে। বাক্স, স্যুটকেস, বিছানা। হৈ চৈ গোলমাল। বেশির ভাগ কলেজের ছাত্র, তারা নর্থ-বেঙ্গল এক্সপ্রেসে কলকাতা যাচ্ছে, প্রতুল যাবে আসাম মেলে বা ডাউন নর্থ-বেঙ্গলে।

বাস ছাড়ল, প্রতুলের দুপাশে দুটি দোকানদার, তারা তামাকের ব্যবসা করে, সেই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে বলতে যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চিতে একটি ভদ্রলোক স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বসে।• একখানা বেঞ্চি ওঁরাই জুড়ে বসে আছেন। ছেলেমেয়ে তিন-চারটি, তারা ভীষণ উৎপাত জুড়ে দিয়েছে বাসের মধ্যেই। তাদের দুষ্টুমি ও চেঁচামেচিতে প্রতুলের মাথা ধরে যাবার উপক্রম হয়েছে।

প্রতুল যেখানটিতে অতিকষ্টে একটু জায়গা করে নিয়েছে, ছোট ছেলেটা অনবরত সেখানে এসে প্রতুলের কোলের ওপর বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে চাইছে। এতে কষ্ট ও অসুবিধা যথেষ্ট হলেও ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি চেপে যেতে হচ্ছে প্রতুলের।

যুদ্ধের সবে আরম্ভ। বাসের ওদিকে তিন-চারটি ভদ্রলোক যুদ্ধ সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনায় ব্যস্ত। তাঁদের কথা শুনে প্রতুলের মনে হোল যুদ্ধ-সম্পর্কিত পরিস্থিতি তাঁদের নখদর্পণে, হিটলার বা চেম্বারলেন অপেক্ষাও তাঁরা জিনিসটা ভাল বোঝেন, কারণ তর্কের মধ্যে উভয় পক্ষের ভুল-ভ্রান্তি তাঁরা বিশদভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করে পরস্পরকে দেখিয়ে দিচ্ছেন।

ড্রাইভারের ঠিক পিছনে বাসের সামনের দিকটাতে গোটাকতক রিজার্ভ সিট। দুটি মেয়ে সেখানে বসে, তাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সম্ভবত মেয়ে দুটির অভিভাবক। মেয়ে দুটির মধ্যে একটির বয়স আঠার-উনিশ বছর, অন্য মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ হবে। বয়সে ছোট যে মেয়েটি, সে দেখতে বেশ সুন্দরী, অন্যটির রঙ শ্যামবর্ণ, মুখশ্রীও খুব ভাল বলা চলে না, তবুও তার সারাদেহে কেমন এক ধরনের লাবণ্য মাখানো। প্রতুল দু একবার অন্যমনস্কের জন্যে চেয়ে চেয়ে দেখছে।

কয়েক মাইল পরে বালুরঘাট টাউনে এসে বাস দাঁড়াল। এখানে একটি মেয়ে উঠল, পুরুষ যাত্রীও অনেকগুলি। একেই বাসে নেই স্থান, তার ওপর এতগুলি যাত্রী কোথায় বসে? অনেক নবাগত যাত্রী অগত্যা দাঁড়িয়ে রইল, রিজার্ভ সিটে মেয়েটির জায়গা হয়ে গেল।

এরই মধ্যে আবার এক কানা ভিখিরি ভিক্ষে করতে আরম্ভ করেছে। সে উঠল বালুরঘাট থেকে সাড়ে এগার মাইল চলে এসে সদরডিহি বলে গ্রামে; রাজ-কাছারি আছে বলে, এখানে বাস দশ মিনিট দাঁড়ায়।

সামনের ভদ্রলোকটি ছোট ছেলেটির হাতে একটি পয়সা দিয়ে বললেন,—দে, যা ভিখিরির হাতে দে।

ছেলেটি এগিয়ে গিয়ে বললে,—এই নাও ভিখিরি।

ভদ্রলোক ধমক দিয়ে বললেন—ও কি, অমন বলতে নেই, ভিখিরি বলতে নেই। ছিঃ!

কানা ভিখিরি পয়সাটা নিয়ে একগাল হেসে ওঁর দিকে চেয়ে বললে,—পোলাপানের কথা, ওদের এখন গেয়ান কি হয়েছে বাবু? খোকাবাবুর নাম কি ও খোকাবাবু?

বেজায় ধুলো উড়ে পেছন দিকটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রতুল ভাবছে, বাসের ছাদে তার বিছানার পুঁটলিটার ওপর সাত-পুরু ধুলো জমে গেল এতক্ষণ।

রাস্তাও যে ফুরোতে চায় না। বড় বড় মাঠের ওপর রাস্তা, মাঝে মাঝে বিল আর ধানক্ষেত আর দু' একটা চাষা-গাঁ।

কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি, তেমন গরম নেই তাই নিস্তার, নইলে বাসে যা ভিড়, গরমে, ভীষণ কষ্ট হোত, চলন্ত বাসেও গরম কাটত না। প্রতুল একবার মুখ বাড়িয়ে দেখলে স্টেশন চোখে পড়ে কি না।

বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠেছে তার হাত থেকে একখানা বই হঠাৎ পড়ে গেল, বাসের ঝাঁকুনিতে। কোন একজনের পায়ের ঠোক্কর লেগে বইখানা বেঞ্চির ফাঁক দিয়ে গলে একেবারে এসে পড়ল প্রতুলের বেঞ্চির পায়ার কাছে। প্রতুল বইখানা নীচু হয়ে তুলে দেখলে, কলেজ-পাঠ্য ইংরেজী বই—'এট্ট ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স'। ও সেখানা উঁচু করে তুলে ধরে মেয়েটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে,—"আপনার বইখানা পড়ে গিয়েছে, এই যে!" হাতে হাতে বইখানা মেয়েটির হাতে গিয়ে পৌঁছল।

প্রতুল এতক্ষণ ভাল করে লক্ষ্য করেনি; বাসে যে কটি মেয়ে আছে, সব চেয়ে এই মেয়েটি সুন্দরী, গায়ের রঙ ধপ্‌ধপে ফরসা, বয়স কুড়ির বেশি নয়, এখনও বিয়ে হয়নি। কলেজের ছাত্রী তা তো বোঝাই গেল।

কোন্ কলেজে পড়ে? নাম কি মেয়েটি? বালুরঘাটে কার মেয়ে?

—হিলি। হিলি!

বড় বড় টিনের চালা ও শিরীষ গাছের সারি দেখা দিয়েছে—হিলির বাজার! স্টেশনের সিগন্যাল দেখা যাচ্ছে।

—ওরে, নে, জুতো পরে নে সব, হিলি এসেছে। হ্যাঁ গা, সে পানের কৌটোটা কোথায়? দেখ দেখ, বেঞ্চির তলায় পড়ে গিয়েছে। ব'স্ না চুপ করে, গাড়ী দেখবি তো ইষ্টিশান আসুক। কটা জিনিস গুনে নাও। এক, দুই, তিন, চার—গাড়ীর ছাদে আছে এক, দুই, তিন। আসাম মেলের ডাউন দিয়েছে।

হুড়মুড় করে যাত্রীরা সব নামতে আরম্ভ করেছে, বাসের ছাদ থেকে কণ্ডাক্টর মাল নামিয়ে কুলিদের মাথায় চাপাচ্ছে, গোলমাল সেখানটাতে যেমন, ভিড়ও তেমনই।

—আরে, ওই লাল সুটকেসটা, ওই যে গামছা-বাঁধা, দাও নামিয়ে।

—সামাল সামাল, এই ভাল করে ধর, কাঁচের জিনিস আছে ভেতরে।

—ওটা না ওটা না, ওই টিনেরটা, লেখা আছে—আর সি ডি,—হ্যাঁ ওইটে—

আসাম মেল এসে দাঁড়াল। যাত্রীর দল মোটঘাট নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে। প্রতুলের মোটে একটা টিনের সুটকেস আর একটা বিছানা, তত ভারীও নয়, নিজেই সেটা হাতে করে ছুটল টিকিটঘরের দিকে—কুলির হাতে দিলেই এখুনি আবার চারটে পয়সা।

আসাম মেলে তত ভিড় ছিল না, কিন্তু পার্ব্বতীপুর থেকে যে শিলং মেল ছাড়ল, সেটা আসছে লখনউ বা কানপুর থেকে; হিন্দুস্থানী যাত্রীরা আসামের দিকে চলেছে শীতকালের প্রথমে বিভিন্ন চা-বাগানে কাজ করতে, তাদের ভিড়ে দাঁড়াবার জায়গা পর্য্যন্ত নেই ট্রেনে।

রঙ্গিয়া জংশনে ভোরবেলা ট্রেন পৌছল। এখান থেকে ষোল মাইল দূরে ভাটিখালি চা-বাগান। প্রতুল ডাক্তারী করে, বছর-খানেক এই চাকরিটাতে ঢুকেছে, ফ্রী কোয়ার্টার দিয়েছে চা-বাগান থেকে, জিনিসপত্র সস্তা, এক রকম চলে যাচ্ছে।

রঙ্গিয়ার নেমে আবার মোটর-বাস। বাগানের দু মাইল তফাৎ দিয়ে রাঙাপাড়া রোড দিয়ে বাস চলে গেল। এইটুকু পথ একজন কুলির মাথায় সুটকেসটা চাপিয়ে বেলা সাড়ে নটা আন্দাজ প্রতুল চা-বাগানে নিজের কোয়ার্টারে এসে উঠল।

বড় নির্জ্জন জায়গা। দূরে অনুচ্চ নীল পাহাড় মেঘের মত দেখা যায়। একদিকে খুব বড় একটা জলা, নলখাগড়া বনে ঘেরা। হেমন্তের সকাল বেলা একটা আর্দ্র অপ্রীতিকর বাষ্প যেন উঠছে জলাটা থেকে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের ডিপো এই চা-বাগানগুলো। প্রতুল নিজেও কয়েকবার ম্যালেরিয়ায় পড়েছে এখানে এসে পর্য্যন্ত।

ডাক্তারখানায় আসামী কম্পাউণ্ডার শিবনাথ ভট্টাচার্য্য একাধারে ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার ও প্রতুলের পাচক। প্রতুল নিজে রাঁধতে জানেও না, ও-কাজ তার পোষায়ও না, সুতরাং শিবনাথকে খোরাকি দিয়েও রাখতে হয়েছে। ডাক্তারখানার চাকর ছুটে এল ডাক্তারবাবুকে আসতে দেখে। প্রতুল তাকে জিজ্ঞেস করে জানলে, শিবনাথ তার বাড়ী গিয়েছে দু দিনের ছুটি নিয়ে, পরশু আসবে। শুধু বাবার তাড়াতাড়িতে আজ আসতে হোল প্রতুলের, নয়তো পরশুই তো সে আসত।

ডাক্তারখানার চাকরকে বললে—ওরে ভীম, তুই জল তুলে দে আমার নাইবার আর রান্না করবার। যখন কষ্ট পেতে হবে দু দিন, তাড়াতাড়ি যা—। কোন কেস ছিল এ কদিন? ছিল না? চাবিটা নিয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা ঝাঁট দিয়ে রাখ গে।

স্নানের পূর্ব্বে সুটকেস খুলতে গিয়ে সে দেখলে সুটকেসের গায়ে অন্য কি একটা তালা লাগানো, তার চাবি নেই ওর কাছে। আঃ কি বিপদ, এ ঠিক তার বোন কমলার কাজ। সে-ই কাল আসবার সময়ে বাক্স গুছিয়ে দিয়েছিল, কিসের তালা কিসে লাগিয়ে বসে আছে!

অনেক কষ্ট করে লোহার সরু সিক দিয়ে চাড় দিতেই তালাটা খুলে গেল।

সুটকেসের ডালাটা তুলে নিজের ধুতি গামছা বার করতে গিয়ে কিন্তু সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুটকেসের ভিতরটাতে চেয়ে। এ কার জিনিসপত্র? শাড়ী কিসের?

বাক্সের ওপরের দিকে থাকে থাকে সাজানো রঙ-বেরঙের শাড়ী, তার নীচে ব্লাউজ গোটা ছ-সাত, সায়া দুটি; এ ছাড়া পাউডারের কৌটো, ক্রিম, আরও লম্বা ও গোল আকারের ছোট বড় সুদৃশ্য কৌটো, শিশি—সাবানের কেস, লেখার প্যাড, ফাউন্টেন পেনের কালি—এক তাড়া চিঠি, আয়না চিরুনি, আরও কত কি। সর্ব্বনাশ!—কার বাক্স এটা?

প্রথমটা তার মনে হোল, তার বোন কমলার সুটকেসটা কি ভুলে গোলমাল হয়ে—? কিন্তু না, তা নয়। এ রকম শৌখিন শাড়ী ও জিনিসপত্র কমলার নেই। তা ছাড়া এ তো কোন জায়গায় যাওয়ার প্রাক্কালে গুছিয়ে নেওয়া বাক্স; কমলা বাড়ী বসে আছে, তার বাক্স এমন গোছালো থাকবার কথা নয়।

হতবুদ্ধি প্রতুল বাক্সের জিনিসগুলো তুলে হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। একটা মখমলের বড় কৌটোর মধ্যে লকেটওয়ালা একটা হার, একটি আংটি, দুটি বড় বড় কানের পাশা, সোনার বড় সেফটিপিন একটা, গাছ-কয়েক সরু সোনার চুড়ি; নতুন-ওঠা কাঁচের চুড়িও ছ গাছা, খুব বড় বড়, ঝকঝকে কাঁচ বসানো, কাজ-করা। একটা মনিব্যাগে চারখানা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরো। সম্পূর্ণ মেয়েলী সুটকেস। পুরুষের নাম-গন্ধ নেই সুটকেসের কোন জিনিসে বা তার আবহাওয়ায়।

প্রতুল দশ হাত মাটির তলায় সেঁদিয়ে গেল সব ব্যাপারটা বুঝে দেখে। সুটকেস বদল হয়েছে বেশ বোঝা গেল, কিন্তু কোথায় বদল হোল? ট্রেনে, না বালুরঘাট থেকে আসবার পথে মোটর-বাসে? মোটর-বাসেই হওয়া সম্ভব, কারণ ট্রেনে তার কামরায় কোনও মেয়ে তো ছিল না; পার্ব্বতীপুর থেকে সে ট্রেনের যে কামরায় উঠেছিল, তাতে হিন্দুস্থানী ও মাড়োয়ারী যাত্রী বোঝাই ছিল; তাদের মধ্যে এ সুটকেস কারও নয়। এ বাঙালী মেয়ের সুটকেস।

আচ্ছা, মোটর-বাসে যদি বদল হয়ে থাকে, তবে কোন্ মেয়েটির বাক্সের সঙ্গে হওয়া সম্ভব?—তা ভেবেই বা কি মীমাংসা হবে, কারণ যে-কোনও মেয়ের সুটকেসের সঙ্গেই সম্ভব হতে পারে, যখন সকলের বাক্স ছিল মোটর-বাসের ছাদে। যাক্, সে কথা পরে ভাবা যাবে, তার যথেষ্ট সময় আছে। এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, যা পরনে আছে তা ছাড়া আর তার দ্বিতীয় ধুতি নেই, গামছা নেই, সাবান নেই, ক্ষুর নেই, লুঙি নেই—কিছু নেই। আর এই বিজন চা-বাগানও যা, ফরাসী ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকাও তাই—কিছু মেলে না এখানে। এখান থেকে সাত মাইল দূরে একটি ছোট বাজারে কেঁয়েদের দোকান আছে কাপড়ের, তবে সেখানে বাঙালী ভদ্রলোকের উপযুক্ত জামা-কাপড় পাওয়া যাবে না।

এখন আপাতত স্নান করে উঠে সে পরে কি, গায়ে দেয় কি? গামছা কোথায়? দাড়ি কামায় কিসে? নাপিত আছে বটে, কিন্তু তার সে কুলি-ক্ষুরে প্রতুল কখনও কামাবে না,

দাড়ি বেড়ে নারদ মুনির মত হয়ে গেলেও না।

এমন বিপদে সে জীবনে কখনও পড়েনি। কি এখন সে কি করে?

নাঃ, উপায় নেই। অনেক ভেবে-চিন্তে সে দেখলে এই স্যুটকেস যারই হোক, এর মধ্যের গামছাখানি আর একখানি শাড়ী আপাতত তাকে ব্যবহার করতেই হবে—নিরুপায়!

শাড়ী বার করতে গিয়ে আরও বিপদ। সাদা শাড়ী যা আছে সব জরিপাড়, আর তাঁতের দামী শাড়ী শান্তিপুরী কি ফরাসডাঙা; মোটা আটপৌরে গোছের শাড়ী যা আছে, তার সব রঙিন। দামী শাড়ী আছে এ ছাড়া। এখুনি একবার আপিসে যেতে হবে, কি পরে যাওয়া যায়? জরিপাড শান্তিপুরী শাড়ী? আর সাদা ব্লাউজ?

নাঃ, ভেবে এর কূল-কিনারা নেই। একটা যা হোক করতেই হবে। রঙিন একখানা শাড়ী পরে স্নান সেরে, রেলে ব্যবহৃত যে আধ-ময়লা জামা-কাপড় বর্তমানে গায়ে আছে তাই পরেই যেতে হবে আপিসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। ম্যানেজার সাহেবকে সব কথা খুলে বলে এর একটা পরামর্শ চাইতে হবে।

দাড়ি কামানো হোল না। রঙিন শাড়ী পরে স্নান সেরে সে রেলের জামাকাপড়ই অঙ্গে চাপিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

ম্যানেজার ইংরেজ, নাম সিমসন। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা-ঝোপের ছাটাই তদারক করছিল, প্রতুলকে দেখে পাইপ মুখ থেকে নামিয়ে বললে,—হ্যালো ডক্টর, গুডমর্নিং, ইউ আর হিয়ার অলরেডি! থট ইউ ওন্ট বি হিয়ার বিফোর টু-মরো।

প্রতুল বললে,—এসেছি বটে, কিন্তু আমার বড় বিপদ সার।

—ওয়েল, হোয়াট'জ অ্যামিস?

সব শুনে সাহেব হো হো করে হেসে উঠল।

—সে ডক্টর, ইউ আর এ ডগ আফটার উইমেন, হোয়াট, সে ইট উইথ দি রোজ! ইফ আই ওয়্যার ইউ—

—না সার, হাসি নয়, মুশকিলে পড়েছি; একখানা কাপড় নেই, জামা নেই, দাড়ি কামাবার ক্ষুর পর্য্যন্ত নেই।

সাহেব হাসতে হাসতে বললে,—সে বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। আমার স্যুট একটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। শেভিং সেট বাড়তি আছে, নিয়ে যাও। ইয়ংম্যান তোমরা, তোমাদের রোমান্সে সাহায্য করব না এমন বেরসিক নই আমি। তোমাদের বয়সে—

—রোমান্স কোথায় সার, বিপদ খুব। সোনার গহনা, মনিব্যাগে টাকা—পুলিসে একটা খবর দেওয়া উচিত নয় কি? শেষকালে—

—এখন থাক। আমায় বললে তো, এতেই হোল। তোমায় চোর বলে কেউ ধরতে পারবে না। আমার সামনে বাক্সের জিনিসের একটা লিস্ট করা যাবে এখন ওবেলা। চল আমার বাংলোয়, জিনিসগুলো দিই তোমায়। দিব্যি রোমান্স বাধিয়ে বসে আছ—

—ধন্যবাদ সার। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি বড়ই—

—কিছু বলবার আবশ্যক নেই। চল।

নিজের কোয়ার্টারে এসে খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হয়ে প্রতুল একটা সিগারেট ধরালে। তার পর শুয়ে পড়ল ঘুমিয়ে নেবার জন্যে বটে, কিন্তু ঘুম আসে না কিছুতেই। এই অদ্ভুত ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল। প্রতুলের বয়স এই পঁচিশ। সবে ডাক্তারি পাশ করে চা-বাগানের চাকুরিটা পেয়েছে। বিবাহ হয়নি। বিশেষ ভাবে কোনও মেয়ের সম্পর্কে আসেনি। যাকে রোমান্স বলে, গল্পে উপন্যাসে কতই যা সে পড়েছে, তার নিজের জীবনে —না, কই, ঘটেনি। ডাক্তারী পড়বার সময় এক-আধজন নার্সের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বটে, কিন্তু সে কিছু নয়। দিশি নার্স, তাদের দিকে তাকানো যায় না, তার রোমান্স!

কিন্তু তার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। আচ্ছা, কোন্ মেয়েটির সঙ্গে সুটকেস বদল হোল? বালুরঘাট থেকে যে মেয়েটি উঠল তার সঙ্গে, না ওই যে দুটি মেয়ে আগে থেকে বসে ছিল তাদের কারও সঙ্গে?

বালুরঘাটের মেয়েটি বেশ সুন্দর। কলেজের ছাত্রী বটে—ওঁর সেই বইখানা 'এট্ ভিক্টোরিয়ান পোয়েট্স্' থেকে তা বোঝা গিয়েছে। কি নাম? কি জাত? ব্রাহ্মণ না কায়স্থ না বৈদ্য?

হঠাৎ তার মনে পড়ল সুটকেসটার মধ্যে নীল ফিতে দিয়ে বাঁধা একতাড়া চিঠি ছিল বটে। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই তাতে পাওয়া যাবে। এতক্ষণ এ কথা মনে হওয়া উচিত ছিল তার।

উঠে সে সুটকেসটা খুলে ফেললে—শাড়ীর নীচে একপাশে চিঠির তাড়াটা ছিল, সে সেটা হাতে করে বিছানার ওপর এসে বসল।

চিঠি খান-পনের। একজনেরই হাতের, বেশ শৌখিন নীল লিনেন পেপারের খামের ওপর ঠিকানা লেখা—অমিয়া মজুমদার, C/o সি. আর. পাল, ২২৩ নীলমণি দত্তের লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

যাক, বাঁচা গেল, এই তো দিব্যি ঠিকানা পাওয়া গেল। আর ভাবনা নেই। কালই একখানা চিঠি লিখে দেওয়া যাবে। মেয়েটিরও নিশ্চয়ই ভীষণ অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। বেচারীর একখানা শাড়ী নেই ব্লাউজ নেই, তার ওপর টাকা আর গহনা হারানোর দুশ্চিন্তা। মেয়েটি এতক্ষণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

তার ওপর যদি তারই সুটকেস মেয়েটি নিয়ে গিয়ে থাকে তবে তো সুটকেস খুলে মেয়েটি মূর্চ্ছা যাবে! দেশ থেকে এখানে খাবার জন্যে সে কিছু পাটালি আর চিঁড়ে আনছিল ওই সুটকেসের মধ্যে। তা ছাড়া একটা ছোট মানকচু আছে, আর আছে—এক জোড়া জুতো, নূতনও তেমন নয়। এ সব বাদে তার ধুতি শার্ট পাঞ্জাবি প্রভৃতি তো আছেই।

ওর মধ্যেকার একটি জিনিসও মেয়েটির কোন উপকারে আসবে না।

মজুমদার? মজুমদার? মজুমদার কি জাত? কায়স্থ না বৈদ্য না ব্রাহ্মণ? না অন্য কিছু?

চিঠিগুলো পড়ে দেখবার ইচ্ছে হল প্রতুলের, কে লিখেছে, মেয়ে না পুরুষ। শেষ পর্য্যন্ত সে ইচ্ছা সে দমন করলে। দরকার নেই পরের চিঠি পড়বার। ওটা অন্যায়।

সারা দিনরাত কেটে গেল বটে, কিন্তু প্রতুলের মন থেকে মেয়েটির চিন্তা কিছুতেই যেতে চায় না। যত সে অন্যদিকে মন দেবার চেষ্টা করে ততই সেই একই চিন্তা—সেই বালুঘাটের মেয়ে, তার সুটকেস।

পরদিন সে মেয়েটিকে একখানা চিঠি দিলে। 'মাননীয়াসু' পাঠ ব্যবহার করে সে সুটকেস বদলের সব অবস্থা খুলে জানালে। সুটকেসের মধ্যে যা যা ছিল, গহনা টাকা বস্ত্রাদির একটা তালিকাও দিলে চিঠিতে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্ত মার্জ্জনাভিক্ষাও বাদ গেল না। সে যে কি ভীষণ লজ্জিত ও দুঃখিত হয়েছে এজন্যে, অন্তত তিনবার সেকথা লিখলে তিন জায়গায়। তার নিজের সুটকেসটি কি ওখানে আছে?

চিঠি ডাকে দিয়ে দু তিন দিন দুরু দুরু বক্ষে উত্তরের প্রতীক্ষায় রইল প্রতুল। না জানি কি উত্তর আসে, খুব রাগ করে কি চিঠি লিখবে? পুলিসে খবর দেবার ভয়-টয় দেখিয়ে?

নয় দিনের দিন উত্তর এল।—

মান্তবরেষু,

মহাশয়ের পত্রে অবগত হইলাম, হিলি স্টেশনে মোটর হইতে নামিবার সময় আমার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী অমিয়ার সুটকেসটি ভ্রমক্রমে আপনার সহিত বদল হইয়া গিয়াছে। আপনার সুটকেসটিও আমার ভাগিনেয়ীর সহিত আসিয়াছে। জিনিসপত্রাদির কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সুটকেসের মধ্যে উহার অতিরিক্ত কিছুই ছিল না। মহাশয় ভদ্রলোক, আপনাকে এই অসুবিধায় ফেলিবার নিমিত্ত আমার ভাগিনেয়ী যথেষ্ট লজ্জিতা, তাহার পক্ষ হইতে আমিও আপনার নিকট বার বার ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। বাক্সটি ইনসিওর্ড আনপেড রেলওয়ে পার্সেলে পাঠাইয়া দিবেন। আপনার সুটকেসটিও সেইভাবে পাঠাইব। রেলের রসিদটা উপরের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত

শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী

পত্র পেয়ে প্রতুলের যে কিছু আশা-ভঙ্গ না হয়েছিল এমন নয়। প্রথম তো এ মেয়েটি যে কোন্‌টি, তা কিছুই বোঝা গেল না। বালুরঘাটের সেই মেয়েটিই যে এই অমিয়া মজুমদার, তার কোন প্রমাণ নেই। চিঠি একখানা মেয়েটির কাছ থেকে আসবে এমন আশা করা নিতান্ত অসংগত ছিল না, কোথা থেকে আবার মেয়ের মামা শ্রীভবতারণ চক্রবর্ত্তী এসে জুটল মাঝখানে! তবে মামা থাকাতে একটা ব্যাপার খানিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল, মেয়েটি ব্রাহ্মণ। সেও ব্রাহ্মণ। তাতে অবিশ্যি এমন কিছু সুবিধে যে কি, প্রতুল ভাল করে যখন ভাবলে, তখন বুঝেই পেল না।

পরদিন লোক পাঠিয়ে সে সুটকেসটি রেলে বুক করে দিলে এবং তার নিজের সুটকেসটিও সে-সপ্তাহের শেষে একদিন অক্ষত অবস্থায় কুলির মাথায় চেপে তার কোয়ার্টারে এসে পৌঁছল। জিনিসপত্র নাড়াচাড়া হয়েছে বটে, কিন্তু ঠিক আছে, এমন কি চিঁড়ে ও তালের পাটালি পর্য্যন্ত।

ব্যাপারটা বেমালুম মিটে গেল।

এর পর আর কি ঘটতে পারে? কিছুই না।

প্রতুল কিন্তু কিছুতেই মেয়েটির কথা একেবারে ভুলতে পারলে না। তার তরুণ জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত ঘটনা। রোমান্স না হলেও রোমান্সের কল্পনা মনে জাগে বই কি! বিশেষত চা-বাগানের এই নির্জ্জন জীবনে। তা ছাড়া, কোন্ মেয়ে ছিল এটি? সেই বালুরঘাটের?

মেয়েটির কাছ থেকে একখানা ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি আসবে এ আশাও প্রতুলের ছিল। তা আসেনি।

পাঁচ মাস পরে প্রতুল আবার ছুটি নিয়ে বাড়ী রওনা হোল। অনেকদিন দেশে যায়নি, মনটা ব্যাকুল ছিল আত্মীয়স্বজনকে দেখবার জন্যে। ওর বোন কমলাকে ও বড় ভালবাসে। কমলার বিবাহের কথাবার্ত্তা চলেছে, সামনের বৈশাখেই বোধ হয় বিয়ে হয়েও যাবে। তার আগে কমলাকে নিজেদের মধ্যে আপন ভাবে দিনকতক পেতে চায়। সেজন্যে আরও বিশেষ করে বাড়ী যাওয়া দরকার।

হিলি স্টেশনে নেমে বসে থাকতে হোল। একখানি আপ ট্রেন এলে তারও যাত্রী নিয়ে তবে মোটর-বাস ছাড়বে।

প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে করতে কলকাতার ট্রেন এসে পৌঁছল। যাত্রীর ভিড় তেমন ছিল না, কয়েকটি মাত্র লোক ট্রেন থেকে নামল।

হঠাৎ প্রতুল থমকে দাঁড়াল—বালুরঘাটের সেই তরুণী কলেজের ছাত্রীটি একা ট্রেন থেকে নামছে। ওর হাতের দিকে চেয়ে কিন্তু সে চক্ষে অন্ধকার দেখলে কিছুক্ষণের জন্যে। ট্রেনের দরজা থেকে কুলি যে সুটকেসটাকে মাথায় চাপিয়ে নিলে মেয়েটির—সেটি তার অত্যন্ত পরিচিত সে সুটকেসটি নয়। সেটি ছিল টিনের, আর এটি চামড়ার বড় একটা সুটকেস।

মোটর-বাস ছাড়বার সময় নেই বেশি। প্ল্যাটফর্মে নেমে মেয়েটি একবার চারিদিকে চেয়ে দেখলে, যেন একটু হতাশ হয়ে পড়ল।

মোটর-বাসে ওঠবার সময় প্রতুল শুনলে মেয়েটি কণ্ডাকটরকে বললে—বালুরঘাটের সাবডেপুটিবাবুর বাড়ী থেকে কোনও লোক আসেনি?

কণ্ডাকটর বললে—ডিপুটি সাব? নেহি মাইজি। আপ উঠিয়ে, হরজ কেয়া, বালুরঘাট মে উতার দেগা!

বাস চলছে। মেয়েটির প্রতি ঔদাসীন্য এসে গিয়েছে প্রতুলের, সে অন্য দিকে চেয়ে আছে,

অন্য কথা ভাবছে। বাক্সের অদল-বদল হয়েছিল বলেই তার মন বালুরঘাটের মেয়েটির প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল, মেয়েটি সুন্দরী বলে নয়, সুন্দরী মেয়ে সে অনেক দেখেছে।

এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যে মেয়ের সম্পর্কে, তার প্রতি মন আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রতুল কেন, সকলেরই হয়—আরও বেশি করে হয় এর ওপরেও যদি মেয়েটি সুন্দরীর পর্য্যায়ে পড়ে।

কিন্তু এ যখন সে-মেয়ে নয়, প্রতুল ওর স্যুটকেস দেখেই তা যখন বুঝলে, সেই মুহূর্ত্তে প্রতুলের মন থেকে মেয়েটি একদম মুছে গিয়েছে। যাকে নিয়ে তার মন নিভৃতে কত স্বপ্নজাল বুনেছিল এক সর্ময় ভাটিখালি চা-বাগানের বনানীবেষ্টিত নির্জ্জন বাংলোতে—এ সে মেয়ে নয়।

যাত্রীদের ভিড় বেশি নেই। ভদ্রলোকও নেই সে আর মেয়েটি ছাড়া। ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, রেলিং দিয়ে অন্য যাত্রীদের বসবার জায়গা থেকে পৃথক করা রিজার্ভ সিটে মেয়েটি বসে আছে। প্রতুল তার ঠিক পিছনের লম্বালম্বি ভাবে পাতা বেঞ্চির প্রথমেই বসেছে, রিজার্ভ সিটের পিতলের গরাদে ঠেস দিয়ে।

একটা ছোট বাজারে বাস দাঁড়াল। দু-একজন যাত্রী ওঠা-নামা করল। প্রতুল লক্ষ্য করলে মেয়েটি তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, কি যেন বলবার আছে ওর, কিন্তু বলতে বাধো-বাধো ঠেকছে, ভাবটা এই রকম। কি বলবার থাকতে পারে মেয়েটির? সে কি এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা কইবে?

মোটর-বাস ছাড়বার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হঠাৎ মেয়েটি ওর দিকে ফিরে বললে,—আপনি কি বালুরঘাট যাবেন?

প্রতুল চমকে উঠে বললে, বালুরঘাট? হ্যাঁ—তা না—বালুরঘাট? কেন বলুন তো?

প্রতুলের উত্তর দেওয়ার ধরন ও অবস্থা দেখে তরুণীর সুন্দর মুখে হাসির অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখা ঈষৎ ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। সে বললে,—দেখুন, আমি বড় মুশকিলে পড়ে গেছি। রাত হয়ে গেল, বালুরঘাটে আমার কাকা গভর্নমেণ্ট অফিসার। বাসা থেকে লোক আসবার কথা আছে নর্থ বেঙ্গলের সময়, আমি একটা ট্রেন আগে এসে পড়েছি, কি করে বাসায় যাব? তা ছাড়া আপনি যদি আগে নেমে যান তবে গাড়ীতে আর দ্বিতীয় ভদ্রলোক নেই, এই অন্ধকার রাত—এ পথে ভয়ও তো আছে জানি।

মেয়েটি যেন অসহায়ভাবে ওর মুখের দিকে চাইলে।

প্রতুল লাফিয়ে উঠল প্রায়। বললে,—কোন ভয় নেই—আমি আপনাকে পৌছে দেব বাড়ী, আমিও ওখানেই যাব—চলুন।

মেয়েটি যেন সাহস ও আশ্বাস পেয়ে মনের বল ফিরিয়ে পেল। কিন্তু মুখে বললে,—আপনাকে সে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। আপনি বালুরঘাট নেমে দয়া করে আমাকে একখানা গাড়ীতে তুলে—

—কিছু না। আপনি সেজন্যে কিছু মনে করবেন না। কার বাসায় যাবেন আপনি?

—আমার কাকা ওখানকার সাবডেপুটি, সুধাংশুকুমার মজুমদার।

প্রতুলের বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন দুলে উঠল—যে কথাটা ভুলে ছিল এতক্ষণ, সেটা আবার ওর মনে সাড়া জাগাল।

—একটা কথা বলব? যদি কিছু মনে না করেন, আপনার নামটি কি জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

—আজ্ঞে আমার নাম অমিয়া মজুমদার।

প্রতুলের মাথা ঘুরে উঠল। বাস, লোকজন, গাছপালা, পৃথিবী, আকাশ, বাতাস দুলে উঠল। যেন বিরাট একটা ভূমিকম্প।...অমিয়া মজুমদার! অমিয়া মজুমদার!

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে বললে—আর একটা কথা বলব, কিছু যদি মনে না করেন। আপনার সঙ্গেই আমার সুটকেস বদল হয়েছিল গত পুজোর ছুটির সময়—আমারই নাম প্রতুল ভট্টাচার্য, আমিই ভাটিখালি চা-বাগানে থাকি—ডাক্তার—

মেয়েটির ডাগর চোখে বিস্ময় ও কৌতূহলের দৃষ্টি ফুটে উঠল। অল্পক্ষণ চুপ করে ওর দিকে চেয়ে থেকে বললে, ও! আপনি প্রতুলবাবু! আপনাকে আমি চিনি।

—আমাকে? আমাকে চেনেন কি ভাবে?

—সেবারে বাসে আমার একখানা বই পড়ে যাওয়াতে আপনি আমায় কুড়িয়ে দিয়েছিলেন —না?

প্রতুল হেসে বললে,—হ্যাঁ, ঠিক বটে। মনে পড়েছে। কিন্তু বাক্স-বদলের চেনাটা বড় বেশি রকম করে চেনা নয় কি? ওঃ কি কষ্ট দিয়েছিলুম আপনাকে, মনে থাকবে চিরকাল।

মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে হাসিমুখে বললে,—না না, তা আর কি, অমন ভুল তো হয়েই থাকে। আমারই দোষ—

—আপনার কি দোষ? আমার দোষ, যতই তাড়াতাড়ি হোক, নিজের জিনিস দেখে নেওয়া উচিত ছিল। আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?

—স্কটিশ চার্চ্চ-এ।

—এবার দেবেন বুঝি বি-এ?

—থার্ড ইয়ার শেষ হবে এবার—সামনের বারে দেব।

—আপনার মামার নাম বুঝি ভবতারণবাবু? মামার বাড়ী থাকেন বুঝি?

—না, মামার বাড়ী ওটা নয়। মামা একা থাকেন, উনি জ্যোতিষী, কেউ নেই বাসায়, আমি রাঁধি, মামা আর আমি থাকি।

রাত্রি সাড়ে আটটার সময় বালুরঘাটে বাস এল। প্রতুল মেয়েটিকে বললে—আপনাদের বাসা কতদূর? একখানা গাড়ী করি?

মেয়েটি বললে—গাড়ী করতে হবে না। কুলির মাথায় দিয়ে চলুন যাই, ওই মোড় ঘুরলে তিন মিনিটের পথ।

এরা বাসায় পৌঁছুতেই একদল বালক-বালিকার উল্লাস-সূচক কলরবের মধ্যে ওদের অভ্যর্থনা হোল। মেয়েটির কাকা সুধাংশুবাবু প্রতুলকে যথেষ্ট আপ্যায়িত করলেন। প্রতুল তখনই চলে যেতে চাইলে—সে কথাতে তিনি কর্ণপাতও করলেন না; রাত্রে তিনি কোথাও তাকে যেতে দেবেন না, কাল সকালে সে পরামর্শ হবে কখন যাওয়া যায় না যায়। আপাতত হাতমুখ ধুয়ে বিশ্রাম করে একটু চা খেলে তিনি কৃতার্থ হবেন।

ইতিমধ্যে বাড়ীর মধ্যে মেয়েটির দ্বারাই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে, এই সেই লোক, যার সঙ্গে তার বাক্স-বদল হয়েছিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতুল ছিল মাত্র জনৈক সহৃদয় পথিক ভদ্রলোক, যিনি তাদের অমিয়াকে একা আসতে দেখে দয়া করে তাকে বাসায় পৌঁছে দেবার কষ্ট স্বীকার করেছেন।

কিন্তু এ কথা প্রকাশ হবার পরে প্রতুল বাসাসুদ্ধ সকলের নতুনতর কৌতূহল ও প্রশংসার কেন্দ্র হয়ে উঠল। মেয়েটির কাকা বাড়ীর মধ্যে থেকে এ কথা শুনে এসে তাকে বললেন—আপনার সম্বন্ধে যে কথা শুনলুম অমির মুখে তাতে আপনাকে আর সাধারণ ভদ্রলোক বলে ভাবতে পারি নে তো। আপনি অতি মহৎ লোক। এভাবে যে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে যাবে এ ধারণার অতীত। বেশি কিছু আমি আপনার সামনে আপনার সম্বন্ধে বলব না, তবে এইটুকু বলছি যে, আমরা বাসার সকলেই আপনাকে পরমাত্মীয় বলে গণ্য করি প্রতুলবাবু। অমিও বাড়ীর মধ্যে ওর কাকীমার কাছে বলছিল, আপনার সম্বন্ধে ওর যথেষ্ট উঁচু ধারণা।

প্রতুলের মুখ লজ্জায় ও সংকোচে লাল হয়ে উঠল, বিশেষ করে সুধাংশুবাবুর এই শেষের দিকের উক্তিতে।

একটু পরে চা ও খাবারের রেকাবি হাতে মেয়েটিই বাইরের ঘরে ঢুকে প্রতুলের সামনে টেবিলের ওপর সেগুলো রেখে বললে,—হাতমুখ ধুয়েছেন? একটু চা খেয়ে নিন।

সুধাংশুবাবুর হঠাৎ কি-একটা কাজের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে তিনি বললেন—অমি, তুই এখানে বস্ একটু, ওঁকে আর এক পেয়ালা চা এনে দিস, আসছি আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে।

সুধাংশুবাবুকে আর বাইরের ঘরে দেখা গেল না।

প্রতুল ইতিমধ্যে মেয়েটির সম্বন্ধে অনেক কথা জেনে ফেললে। ওর বাবা-মা নেই, অনেক দিন মারা গেছেন। কাকা মানুষ করছেন বহুদিন থেকে। আই-এ-তে মেয়েটি কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিল, কলেজে ও ফাইন আর্টস সোসাইটির সেক্রেটারি। কলেজে গানের প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে মেডেল পেয়েছে এ বৎসর। কলেজ ম্যাগাজিনে ওর লেখা ছোট গল্প বেরিয়েছে। বি-এ পাশ করে ও নিশ্চয়ই এম-এ পড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মেয়েটি সরাসরি ভাবে এসব সংবাদ প্রতুলকে বলেনি। প্রতুলের প্রশ্নে, কতকটা নিজে থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন ভাবে বলেছিল যে প্রতুলের তথ্যগুলি অজ্ঞাত রইল না আধ-ঘণ্টা সময় শেষ হবার পূর্ব্বেই।

সুধাংশুবাবু পুনরায় বাইরের ঘরে ঢুকতেই অমিয়া উঠে চলে গেল। পরদিন সকালে উঠে

প্রতুল যাবার উদ্যোগ করতেই সুধাংশুবাবু ওকে জানালেন—বাড়ীর মধ্যে বলেছে এ-বেলা খাওয়া হবে না তার। খেয়ে-দেয়ে ও-বেলা ধীরে-সুস্থে গেলেই চলবে।

প্রতুলের সম্বন্ধেও সুধাংশুবাবু অনেক কথা জানলেন কথায় কথায়। সে এম. বি. পাশ করেছে আর বছর, চা-বাগানে চাকরি করে, এক-শ'টি টাকা মাইনে। ওরা রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ, বাবা-মা বেঁচে আছেন, দেশে জায়গা-জমি আছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বাঙালীর সংসার, বাপ-মা-মরা বয়স্থা মেয়ে কাকার ঘাড়ে, পাত্র হিসাবে প্রতুল ভালই, সম্মুখে শুভ বৈশাখ মাস। অতএব, এর পরে আর খুব বেশি কিছু বলবার নেই, থাকবার কথাও নয়।

ভাটিখালি চা-বাগানের সেই কোয়ার্টারে প্রতুল একদিন তার তরুণী পত্নীকে ঠাট্টার সুরে বলেছিল—কি, আর বাক্স-বদল করবে? অমিয়া ক্রোধে ঘাড় বেঁকিয়ে উত্তর দিয়েছিল, ব'লো না! কি কষ্ট সেদিন আমার! কলেজে যাব—বাক্স খুলে দেখি ধুতি, গেঞ্জি, লুঙি, শার্ট! মাগো, আমার চোখে জল এল! কি পরি তখন বুঝি নে। বাড়ীতে দ্বিতীয় মেয়েমানুষ নেই, নেয়ে উঠে কি পরি তার নেই ঠিক। কি বিপদ গিয়েছে সেদিন আমার! আর বাক্স-বদল হোল নাকি একজন গেঁয়ো লোকের সঙ্গে! বাক্সের মধ্যে আবার চিঁড়ে, গুড়, পুরনো তালি-দেওয়া জুতো—উঃ মাগো!

প্রতুল বললে—হায় হায়, বাক্স-বদল তো পদে আছে, সেই গেঁয়ো লোকটার সঙ্গে একদিন মালা-বদল হয়ে যাবে তা কি আর তখন জানতে!

মুলো—র‍্যাডিশ—হর্স র‍্যাডিশ

নবীনবাবু ঘুম হইতে উঠিয়া কয়লা চাকরকে ডাকাডাকি করিতেছেন শুনিতে পাইয়াও আবার চাদর মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া এবং তার একটু পরে বোধ হয় ঘুমাইয়াও পড়িয়াছি। জানালার ফাঁক দিয়া পাশের আতাগাছের ডাল যখন দেওয়ালের গায়ে অনেকখানি রোদের মধ্যে ছায়া সৃষ্টি করিয়াছে, তখন কয়লার ডাকে তন্দ্রা ভাঙিল।

—বাবুজি, চা তৈয়ার!

—চা? এখানে নিয়ে আয়, বিছানায়।

নবীনবাবু বোধ হয় প্রাতর্ভ্রমণ সারিয়া আমার ঘরের পাশের শক্ত কাঠের মেঝে দিয়া গট্‌গট্ করিয়া চলিয়া গেলেন, আমার আলস্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই বেশ জোরে জোরে পা ফেলিয়া গেলেন। চা-পান বিছানায় বসিয়াই শেষ করিয়া উঠিব-উঠিব ভাবিতেছি, এমন সময় নবীনবাবু তাড়াতাড়ি আসিয়া আমার বিছানার পাশের দিকের জানালায় দাঁড়াইয়া বলিলেন—উঠুন মশাই, যোধপুরী মুলো এসেছে, র‍্যাডিশ।

আমি চটি পায়ে দিতে দিতে বলিলাম—হর্স র‍্যাডিশ? একা, না মিস সোরাবজিকে নিয়ে?

নবীনবাবু রাগ করিয়া বলিলেন—আসুন না, উঠেই আসুন না। মিস সোরাবজির বাবা-

মার দায় পড়েছে ওর সঙ্গে মেয়েকে পাঠাতে সকাল বেলা। একাই এসেছে।

পরে পিছন ফিরিয়া বলিলেন—আচ্ছা, রোজ রোজ কেন সকালে এসে জোটে বলুন তো? কি কাজ এখানে বাপু তোর? বিরক্ত করলে! আর আপনিও আটটার আগে বিছানা ছেড়ে উঠবেন না একদিনও—

বলিলাম—আপনার উক্তি দুটির মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধটা কি ভাল বুঝলাম না নবীনদা—

—বুঝবেন বুঝবেন—শীগগিরই বুঝবেন। যদি সকালে সকালে বেরিয়ে যাই, তাহলে তো আর এ হাঙ্গামা এসে জোটে না সকালবেলা। এখন চা কর রে, খাওয়াও রে, ভ্যাজ ভ্যাজ করে বকো রে—

—নবীনবাবু, শিওরলি ইউ ডোণ্ট গ্রাজ ইওর গেস্ট এ কাপ অব টি!

—থাক থাক হয়েছে—গেস্ট! ভারি আমার গেস্ট রে!

যাহার অভ্যর্থনার আয়োজন এত হৃদ্যতাপূর্ণ, সে বেচারী নির্বিকার ভাবে হাসিমুখে বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। আমায় দেখিয়াই হাত বাড়াইয়া পরম বন্ধুত্বের সুরে বলিল—গুডমর্নিং মিস্টার রায়!

আমি হাত ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে পরিপূর্ণ অমায়িকতার সঙ্গে বলিলাম—গ্ল্যাড ইউ হ্যাভ কাম মিঃ শুকরাম—গুডমর্নিং।

নবীনবাবু উদাসীনভাবে অতিথির করমর্দন করিয়া ইংরেজিতে বলিলেন, বসুন মিঃ শুকরাম। আমি একবার জেনারেল পোস্টাপিস থেকে একটা তার করে আসি, আপনি ততক্ষণ চা খান।

আমার দিকে চাহিয়া বাংলায় বলিলেন—মূলোকে শীগ্‌গির ভাগাবার চেষ্টা করুন। আজ এখুনি আমাদের বেরুতে হবে, কাজ আছে অনেক।

মূলো যাহাকে বলা হইয়াছে সে বাংলার একবর্ণও বোঝে না তাই রক্ষা। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা ইংরেজিতেই হয়।

মূলো জাঁকিয়া বসিয়া আমায় বলিল—বাঙালীদের মত লুচি কবে খাওয়াচ্ছেন মিঃ রায়? ও আমার বড় ভাল লাগে। আমি বাঙালীদের সঙ্গে একবার মিশেছিলাম—লুচি খাইয়েছিল। সে এখনও ভুলিনি।

শুনিয়া মনে মনে বলিলাম—নবীনদার পিত্তি জ্বলে যেত—যদি কথাটা শুনত। ভাগ্যিস নেই এখানে। যে অভ্যর্থনার ঘটা তাঁর! কয়লা চাকরকে ডাকিয়া খানকতক লুচি ভাজিতে বলিতে গিয়া শুনিলাম ঘি ও ময়দা বাজার হইতে না আনিলে চলিবে না, ফুরাইয়া গিয়াছে! বুঝিলাম অতিথির অদৃষ্টে লুচি নাই। নবীনবাবু হয়তো ইতিমধ্যে আসিয়া পড়িতে পারেন। দরকার নাই সেসব হাঙ্গামায়। চা-ও টোস্ট খাওয়াইয়া দিলাম মূলোকে। মূলো তাহার স্বভাব-সিদ্ধভাবে বকিতে শুরু করিয়া দিল। বকুনি আর থামায় না, বেলা নটা বাজিয়া গেল, তবুও তাহার হুঁশ নাই। ইতিমধ্যে নবীনবাবু আসিয়া পড়িলেন, মূলোকে তখনও বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিরক্তির সহিত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া আমায় বলিলেন—মূলোটা এখনও যায়নি? হর্স র‍্যাডিশটা?

—না গেলে তো তাড়িয়ে দিতে পারি নে ! ও বলছে আমাদের সঙ্গে খিন্‌সি লেক দেখতে যাবে।

—মাটি করেছে ! সারলে দেখছি।

মুলো আমাদের কথাবার্ত্তা বুঝিতে না পারিয়া বলিল—মিঃ রায় খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে কি বলছেন ?

নবীনবাবু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, অবশ্য ইংরেজিতে—খিন্‌সি লেক সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করছি ওর সঙ্গে। আপনি আসবেন নাকি আমাদের সঙ্গে ?

—নিশ্চয় মিঃ বোস, খুব খুশীর সঙ্গে।

—বেশ বেশ। বড় আনন্দ হোল। বড় খুশী হোলাম।

আমি বলিলাম—মিঃ শুকরামের মত সঙ্গী পেলে খিন্‌সি তো খিন্‌সি, উত্তর মেরুতে গিয়েও সুখ আছে।

নবীনবাবু ইংরেজিতে সায়সূচক কথা বলিয়া আমায় বাংলাতে বলিলেন—স্বর্গেও যদি যাও মুলোকে নিয়ে স্বর্গের হাওয়া পর্য্যন্ত তেতো হয়ে উঠবে, ওকে ভাগাবার চেষ্টা কর।

মুলো বলিল—তাহলে কখন রওনা হব আমরা, মিঃ বোস ?

—রওনা ? সে তো এখনও ঠিক হয়নি, দেখি—

—যদি বলেন আমার এক জানাশুনো গাড়ী আছে—পেট্রোলের খরচটা দিলেই রাজী হয়ে যাবে। বলব তাকে ?

—বলুন না, বেশ বেশ !

আমরা সবাই বেশ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

পরদিন মুলোর চেষ্টাতে গাড়ীর যোগাড় হইয়া গেল। আহারাদি সারিয়া আমরা তিনজনে শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী খিন্‌সি হ্রদ দেখিতে রওনা হইলাম। নাগপুর জব্বলপুর রোডের যে স্থান হইতে খিন্‌সি হ্রদের রাস্তা বাহির হইল, ঠিক সেই জায়গাটিতে পড়ে মান্‌সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি।

মুলো আমাদের সঙ্গে আসিতে পাইয়া বড়ই খুশী হইয়া উঠিয়াছে এবং ভীষণ বকুনি শুরু করিয়াছে। নবীনবাবু বাংলায় বলিলেন—মুলোটা তো বড্ড জ্বালাচ্ছে হে! ওকে এই ম্যাঙ্গানিজের মাইনে রেখে গেলে কেমন হয় ?

মুলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস ?

তাহার সব বাংলা কথার মানে জানা চাই।

নবীনবাবু উত্তর দিলেন—এই ম্যাঙ্গানিজ খনিটা ইণ্ডিয়ার মধ্যে একটা বড় খনি তাই বলছি।

নাগপুরে আমরা দুজনে আসিয়াছি বেড়াইতেও বটে, কিছু ইনসিওরের আগামী যোগাড় করিতেও বটে। সিভিল লাইনে কোতোয়াল সাহেবের বাংলো ভাড়া লইয়া যেদিনটা

বারান্দার ক্যানভাসের আরাম-কেদারা পাতিয়া বসিয়া একটি সিগারেট ধরাইয়াছি—সেদিন এবং সেই মুহূর্ত্তে এই লোকটি আসিয়া আমাদের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়াছে। একটি তরুণ যুবককে বাড়ীর হাতায় ঢুকিতে দেখিয়া আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আগাইয়া গেলাম এবং ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলাম—কাকে চান ?

যুবকটির চেহারা একহারা, দাঁত উঁচু, শ্যামবর্ণ, মুখে দুই একটা বসন্তের দাগ, ছোট ছোট চোখ, পরনে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। সে একগাল হাসিয়া বলিল—আপনারা এই বাসা ভাড়া নিয়েছেন ? বাঙালী ? সে আমি দেখেই বুঝেছি। সেইজন্তেই এলাম—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছে আমার অনেক দিন থেকে আছে।

বলিলাম—আসুন বসুন। এইখানেই বাড়ী বুঝি ?

যুবক পাশের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল—দেশ আমার যোধপুর। এখানে কলেজে পড়ি—ফোর্থ ইয়ারে।

—বেশ বেশ। একটু চা খান—

সেই হইতে ইহার যাতায়াত শুরু। এমন একটি দিন যায় নাই, যেদিন ছোকরা দুবেলা আসে নাই এবং নানাপ্রকার আলোচনার অবতারণা করে নাই। দিন কয়েক পরেই নবীনবাবু এবং আমি আবিষ্কার করিলাম যে ছোকরা কিছু স্থুলবুদ্ধি, ঠিক সকালে ও বিকেলে চা পানের আগে আসিয়া জুটিবে এবং দুপুর পর্য্যন্ত বসিয়া বসিয়া শুধু বকিবে—উঠিবার নামটি করিবে না। বাধ্য হইয়া প্রায়ই দুপুরে বা রাত্রে—কোন কোন দিন দুবেলাই তাহাকে খাইতে বলিতে হইয়াছে। সে খাইয়াছেও। এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিলেও সে বুঝিতে পারে না।

হয়তো নবীনবাবু বলিলেন—মিঃ শুকরাম (তাহার নাম রত্নাকর শুকরাম জৈন), ওবেলা আমরা একটু হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাব, বিকেলটাতে থাকব না।

—বেশ বেশ, আমি সন্ধ্যের পর আসব।

—ও, তা বেশ। তবে বোধ হয় ফিরতে একটু দেরিই হবে।

—না হয় আমি একটু রাত করেই আসব এখন। আপনারা অনেক উঁচু বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেন—আমার শুনতে বড় ভাল লাগে। এই জন্তেই আমি বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে বড় ভালবাসি। তা এখানে বাঙালী বেশি নেই—যাঁরা আছেন, তাঁরা বড় মেশেন না।

এই ধরনের নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেওয়ার দরুন আমরা তাহাকে 'মূলো' আখ্যা দিলাম এবং তাহার সাক্ষাতে পর্য্যন্ত নিজেদের মধ্যে বাংলায় তাহাকে 'মূলো' বলিয়া উল্লেখ করিতাম। কখনও কখনও 'মূলো'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া তাহার সামনেই তাহাকে 'র‍্যাডিশ', কখনও 'হর্স র‍্যাডিশ' বলিতাম। বেচারা আমাদের বাংলা কথার অর্থ একবর্ণও বুঝিত না। 'মূলো' কথার ইডিয়মগত অর্থই বা বুঝিবে কিরূপে। মাঝে মাঝে আমাদের মুখে 'র‍্যাডিশ', 'হর্স র‍্যাডিশ' শুনিয়াও কিছু না বুঝিয়া হয়তো ভাবিত—ইহারা এ তিনটা কথা এত ব্যবহার করে কেন ?

আমরা আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিলাম। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র বটে, কিন্তু 'মুলো'র বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় বিশেষ নয়, একজন ভাল বাঙালী ম্যাট্রিক ছাত্র তাহার অপেক্ষা অনেক কিছু জানে। বলা বাহুল্য অবাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্বভাবত খুব উচ্চশ্রেণীর নয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় ? রামোঃ, এখানে মানুষ আছে কে ?

আমাদের এই মনোভাবের পটভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলে মুলোর ন্যায় একজন স্থূলবুদ্ধি ছাত্রের যে দুর্দ্দশা এরূপ দাঁড়াইবে আমাদের বিচারের মাপকাঠিতে ইহা আর বেশি কথা কি!

মজার ব্যাপার এই, যাহাকে লইয়া এই ব্যাপার সে কিছুই বুঝিত না। বরং ভাবিত, আমাদের মত অমায়িক বাঙালী ভদ্রলোকেরেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সে লাভবান হইয়াছে। এজন্য সে মাঝে মাঝে গর্ব্বও করিত।

মুলোর মুখে শুনিয়াছিলাম ম্যাঙ্গানিজ খনির ম্যানেজারের সঙ্গে তার আলাপ আছে। গাড়ী জব্বলপুর রোডের উপর খনির সামনে দাঁড়াইতেই সে দোর খুলিয়া ছুটিয়া গেল ম্যানেজারকে খবর দিতে। যেন আমরা লাট সাহেব আসিয়াছি মান্সারের ম্যাঙ্গানিজ খনি দর্শন করিতে—এমনভাবে সে হন্তদন্ত অবস্থায় আমাদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। ইনি মিঃ বোস, ইনি মিঃ রায়—বাঙালী, খুব পণ্ডিত লোক এঁরা দুজনেই। আমার বিশেষ বন্ধু।—কি মুশকিল! পাণ্ডিত্যের মধ্যে তো আমরা করি ইন্সিওরেন্সের দালালি! অবশ্য আমাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ও পুরাতত্ত্বের ওপর কিছু ঝোঁক আছে—কিন্তু সে ফটোগ্রাফির দিক হইতে, বিদ্যা বা পাণ্ডিত্যের দিক হইতে নয়।

মুলোর কাণ্ড দেখিয়া আমরা মনে মনে কৌতুক অনুভব করিলাম।

ম্যানেজার নাগপুরের লোক, ছিন্দওয়ারা জেলার অধিবাসী, বেশ ইংরেজি বলে। জব্বলপুর রোডে গাড়ী দাঁড় করাইয়া আমরা প্রায় দু শ ফুট চড়াই ভাঙিয়া খনির মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। একটা ক্ষুদ্র ডন্‌কি এঞ্জিনে খাদের জল তুলিয়া লম্বা রবার ও তারের নল দিয়া পাহাড়ের পাশ দিয়া ফেলিয়া দেওয়াতে ছোটখাটো একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি হইয়াছে—সেটা দেখিয়া আমরা সকলে খুশী হইলাম।

ম্যানেজার আমাদের চা পান করিতে বলিলে আমরা অস্বীকার করিয়া আবার নীচে নামিয়া আসিয়া মোটরে উঠিলাম। ম্যানেজারকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিলাম, কষ্ট করিয়া আমাদের সব দেখাইবার জন্য। গাড়ী পুনরায় চলিল।

নবীনদা কহিলেন—মুলো বড্ড গণ্ডগোল করে। আমাদের নিয়ে এমন করছিল···!

মুলো জিজ্ঞাসা করিল—কি, মিঃ বোস ?

তাহার আবার সকল কথারই মানে জানা চাই।

নবীনদা বলিলেন,—চমৎকার খনিটা, তাই বলছিলাম।

—ও, তা র‍্যাডিশের কথা কি বলছিলেন ? এখানে তো র‍্যাডিশ পাওয়া যায় না!

আমরা দুজনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। নবীনদা বলিলেন,—ওটা একটা বাংলা ইডিয়ম মিঃ শুকরায। ভাল জিনিসকে বাংলায় আমরা মূলো বলি।

—তাই নাকি ? হাউ ইণ্টারেস্টিং!

আমি বাংলায় বলিলাম,—তোমার মুণ্ডু—বোকারাম কোথাকার!

নবীনদা বলিলেন,—মূলো আর সাধে বলে! একেবারে হর্স র‍্যাডিশ!

রামটেকের পাহাড় বাঁদিকে রাখিয়া কিছু দূর গিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের নিবিড় ছায়াভরা বীথিপথে চড়াই-উৎরাই ভাঙিয়া মোটর অপেক্ষাকৃত ধীরে চলিতেছে। শরৎ-অপরাহ্ণের অপূর্ব্ব শোভা বনতলে। কোথায় যেন পাকা আতার গন্ধ, দু-একটা বনফুলের সুবাসের সঙ্গে যেন শেফালীর পরিচিত সুবাস ভাসিয়া আসিতেছে বাতাসের ঝাপটায়। এমন শোভার মধ্যে বসিয়া আমরা কিছুক্ষণের জন্য ইন্‌সিওরেন্সের দালালি বিস্মৃত হইয়া গেলাম।

খিন্‌সি হ্রদে উঠিবার সময় পাহাড়ের পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ। অনেক দূর উঠিয়া গেলে শৈলবেষ্টিত হ্রদের শান্ত জলরাশি দৃষ্টিগোচর হয়। চতুর্দিকের শৈলসানু ঘন বনে সমাকীর্ণ, স্থানটা নিতান্ত নির্জ্জন। একদিকে অপরাহ্ণের ছায়া, অপর পারের পাহাডের গায়ে হলুদ রঙের রোদ। হ্রদের এপারের ডাকবাংলোয় গিয়া আমরা চৌকিদারকে ডাকিয়া চেয়ার বাহির করাইয়া বসিলাম। চৌকিদার আমাদের নির্দ্দেশমত চায়ের জল চড়াইতে ছুটিল।

নবীনদা ও আমি হ্রদের জলে স্নান করিবার জন্য নামিলাম। বনের মধ্যকার সরু পথ ধরিয়া ধরিয়া কতদূর নামিয়া গেলাম দুজনে। মূলো এসব ভালবাসে না, সে ডাকবাংলোর বারান্দাতে বসিয়াই রহিল। জলের উপরে বুনো শিউলি ফুলের রাশি সকালের রোদে ঝরিয়া পড়িয়াছে—দু তিন দিনের জমানো ফুলের রাশ। আমরা জলের ঢেউ দিয়া একপাশে সরাইয়া স্নান করিলাম।

নবীনদা বলিলেন,—বাঘ নেই তো ? বড্ড জঙ্গল চারিধারে—

—আশ্চর্য্য নয় কিছু।

—মূলোটাকে বাঘে না নিয়ে যায়। একা বসে আছে—

—কেন, ড্রাইভার ?

—ও চৌকিদারের সঙ্গে গিয়েছে। বলে গেল ফিরতে আধঘণ্টা দেরি হবে, দুধ আনতে গেল।—উরে ভয়ে উপরে উঠিয়া দেখি মূলো নির্ব্বিকারচিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছে। নাগপুর হইতে আনা বম্বে ক্রনিকল, আগের তারিখের। আমাদের দেখিয়া বলিল—আমেদাবাদের দুটো মিলে স্ট্রাইক হয়েছে বড় জোর—

নবীনদা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—মূলোর কাণ্ড শোন—এমন একটা জায়গায় এসে ওর এখন আমেদাবাদের মিলের কথা বড্ড দরকারী হোল!

কিছুক্ষণ থাকিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু ড্রাইভার তাড়াতাড়ি করিতে বলিল। পাহাড়ের পথ, তাহার গাড়ীর আলোটা ভাল নাই—আমরা দেরি করিলে শেষে মুশকিলে পড়িতে হইবে।

মুলো বলিল—চলুন মিঃ বোস। আজ যাওয়া যাক, আর কি দেখবেন, দেখা তো হয়ে গেল—

নবীনদা বলিলেন—তোর মুণ্ডু হোল—হতভাগা হর্স র‍্যাডিশ!

মুলো বলিল—কি?

—মানে, আমাদের এখন যাওয়াই দরকার তাই বলছি।

—হোয়াট হ্যাজ হর্স র‍্যাডিশ টু ডু উইথ ইট?

—বাংলা ইডিয়ম—ওর মানে মূলো খেতে যেমন ঝাল, অথচ দেখতে রাঙা তেমনি এ জায়গা যতই ভাল হোক—মানে—এই গিয়ে—

আমি নবীনদার সাহায্যে অগ্রসর হইয়া বলিলাম—ঠাণ্ডা লাগতে পারে তাই তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত—বাংলা ইডিয়ম। মুলো হাসিতে লাগিল। বলিল—ফানি, হ্বাট র‍্যাডিশ ইজ অলওয়েজ মিক্সড্ উইথ ইওর বেঙ্গলি ইডিয়মস্।

খিন্‌সি হ্রদের পাহাড় হইতে নামিয়া রিজার্ভ ফরেস্টের কুসুমাস্তৃত পথে আমরা রামটেক পাহাড়ের তলদেশে পৌছিলাম। নবীনদার আদেশে ড্রাইভার নাগপুরের রাস্তা ছাড়িয়া বন্য আতাবৃক্ষ শোভিত রামটেক পাহাড়ের ঘোরানো পথ ধরিল। মুলোর এ জিনিসটা মনঃপূত হইল না। সে দু একবার মৃদু প্রতিবাদও করিল, বিশেষ কোনও ফল হইল না। আসল কথাটা আমরা জানিতাম। মিস সোরাবজি নামে একটি পার্শী তরুণীর সঙ্গে মুলো ভাব জমাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে আজ মাস ছ সাত ধরিয়া। মেয়েটির বাবা নাগপুরের ডাক্তার, তাহাদের বাড়ী সন্ধ্যাবেলাটা কাটানো মুলোর অনেক দিনের অভ্যাস, যদিও মেয়ের বাপ-মা তাহা যে খুব পছন্দ করে তাহা নয়। মুলোর মুখে শুনিয়াই বুঝিয়াছি তাঁহারা মুলোকে এমন ইঙ্গিতও করিয়াছেন যে, এত ঘন ঘন সে যেন তাঁহাদের বাড়ী না আসে। কিন্তু মুলোর বুদ্ধি ও বিবেচনা-শক্তির স্থূল আবরণ তাঁহারা ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই।

পাহাড়ের নীচে গাড়ী রাখিয়া আমরা সিঁড়ি বাহিয়া উপরিস্থিত রামসীতার মন্দিরে উঠিতেছি।

মুলো বলিল,—মিঃ রায়, একদিন মিস সোরাবজি বলেছিল রামটেকের মন্দির দেখবে, বড় ভাল হোত যদি আজ আনতাম।

নবীনদা আমার গা টিপিলেন। আমার হাসি পাইতেছিল, অতি কষ্টে চাপিলাম।

পাথরে বাঁধানো অনেকগুলি সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিলাম। সিঁড়ির দু ধারে অসংখ্য বন্য আতা, পড়াসি ও তিন্দুক গাছের নিবিড় বন। ডান দিকে অনাবৃত পর্ব্বতগাত্র হেলিয়া থাকিয়া দৈত্যপুরীর মাইলস্টোনের মত দেখাইতেছে। সন্ধ্যার ধূসর ছায়ামাখা নিস্তব্ধতার মধ্যে পেশোয়াদের নির্ম্মিত এই শৈলমন্দির দুর্গটি ভারতের অতীত গৌরবের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়া দিতেছিল আমাদের কানে কানে। শুধু সে গাম্ভীর্য্যময় নিস্তব্ধতার অপোভঙ্গ হইতেছিল মুলোর অসম্ভব বকুনি দ্বারা। উপরে উঠিয়া আমরা বিগ্রহ দর্শন করিলাম। সামান্য কিছু প্রসাদ ও চরণামৃত পাইলাম। উঁচু পাহাড়ের উপর মন্দির, অনেক নীচে একদিকে রামটেকের বাজার।

মূলোর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হইত, যদি সে এখানে আসিয়া মিস সোরাবজি সম্বন্ধে কিছু বলিত—আমরা ভাবিতাম লোকটার প্রাণে তবুও কবিত্ব আছে। কিন্তু মন্দির-দুর্গের চওড়া প্রাচীরের উপর বসিয়া আমরা যখন দূরের জ্যোৎস্নালোকিত থিন্‌সি হ্রদের দিকে চাহিয়া আছি, মন্দিরে প্রাচীন মারাঠী পুরোহিত রামসীতার আরতি করিতেছেন, পেশোয়াদের আমলের প্রথানুযায়ী আরতির সময় গম্ভীর নির্ঘোষে রণবাদ্য দামামা ও ডগর বাজিতেছে, ঐদিকে বহুদূরে কাম্‌টি ক্যান্টনমেন্টের ক্ষীণ সারি, তখন যদি সে তাহার প্রণয়িনীর কথা তুলিত—আমরা ভাবিতাম এই রামগিরি আশ্রমে জনকতনয়ার স্নান হেতু পুণ্যোদকের স্পর্শে হর্স র‍্যাডিশ বুঝি কালিদাসের বিরহী যক্ষের দশা পাইয়া বসিল। কিন্তু তাহা হইবার নয়, সে মহাড়ম্বরে গল্প জুড়িয়া দিল—দেশের এক মিউনিসিপ্যাল কমিশনারকে সে কি করিয়া ভোট যোগাড় করিয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে নামিল তাহাদের দেশে কি করিয়া 'ফুটেরি' তৈরি করে। আমরা কহিলাম—ফুটেরি কি ?

,মূলো হাত দিয়া গোলাকার জিনিস দেখাইবার ইঙ্গিতে বলিল—এই এত বড় বড়, আটার তৈরি, ভেতরে ছাতু। ঘুঁটের আগুনে সেঁকে ঘি দিয়ে খায়, আলুর চোখা আর বেগুনের ভর্ত্তার সঙ্গে।

নবীনদা বলিলেন—মূলোর সঙ্গে নয় ?

—নো, র‍্যাডিশ ইজ নট ইট্‌ন্—

—আশ্চর্য্য !

—হোয়াই আশ্চর্য্য ? র‍্যাডিশ ইজ মাচ রেলিশ্‌ড্‌ ইন বেঙ্গল ইট সিম্‌স্—বাট নট সো ইন আওয়ার কাণ্ট্রি।

—বুঝলাম।

—আচ্ছা, এই দুর্গের পাঁচিলটা এত চওড়া কেন ?

মূলোর স্থূল বুদ্ধিতে আর কতটুকু বোঝা সম্ভব ? তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম, পেশোয়াদের সময়ে এই মন্দিরটি দুর্গের মত করিয়াই তৈরি হয়—আসিবার পথে অতগুলি ফটক দেখিয়া তাহা সে নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করিয়াছে। পেশোয়া বালাজি বিশ্বনাথ এই মন্দির-দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এখানে একটি গুপ্ত ধনাগার স্থাপন করেন। আকস্মিক রাষ্ট্রবিপ্লবের দিনে নাগপুর হইতে বিশ-বাইশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এই অরণ্যাবৃত পাহাড়ের চূড়ায় রামসীতার মন্দিরে তাঁহার ধনভাণ্ডার অনেকটা নিরাপদ থাকিবার ভরসাতেই এটি নির্ম্মিত হয়। বিশেষত তখনকার যুগে না ছিল রেল, না ছিল এখনকার দিনের মত চওড়া মোটর রোড। রামটেকের পাহাড় ছিল দুর্গম অরণ্যভূমির অন্তরালে—শত্রু সন্দেহ করিবে না যে জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কোন্ পাহাড়ে রাম-সীতার মন্দির—সেখানে আবার ধনভাণ্ডার থাকিতে পারে। তবুও সাবধানের মার নাই ভাবিয়া বালাজি বিশ্বনাথ মন্দিরটিকে দুর্গের মত করিয়াই নির্ম্মাণ করেন—মন্দিরকে মন্দির, দুর্গকে দুর্গ। আবশ্যক হইলে কিছুকাল ধরিয়া এখানে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করাও চলিতে পারিত। জলের অভাব দূর করিবার জন্য পাহাড়ের নীচে একটি পুষ্করিণী খনন করা হয়—আসিবার সময় যে

পুকুরটা ডান দিকে পড়িয়াছিল। মূলো আমার মুখে রামটেকের মন্দিরের ইতিহাস শুনিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে বলিল—আপনি এসব নিয়ে খুব নাড়াচাড়া করেছেন দেখছি, বহুৎ পড়াশুনো করেছেন। এইজন্যেই তো বাঙালীদের আমি বড় ভালবাসি—বাঙালীর সঙ্গে আলাপ করলে আমার মন বড় খুশী হয়।

মন্দিরের আরতি থামিয়াছিল। আমি বলিলাম—এখানে একটা অস্ত্রাগার আছে বইয়ে পড়েছি—চলুন সেটা দেখে আসি সবাই, এখনও আছে বলে জানি।

মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ রংড়ে ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বেই পরিচয় পাইয়াছিলাম। তিনি প্রথমে মৃদু আপত্তি তুলিলেন, রাত্রে অস্ত্রাগার দেখানোর নিয়ম নাই—অবশেষে আমাদের নিতান্ত নাছোড়বান্দা দেখিয়া, বিগ্রহ যেখানে থাকেন তাহার পাশের একটা কুঠুরি খুলিয়া দিলেন। আমরা টর্চ্চের আলোয় সেখানে মারাঠী যোদ্ধাদের প্রকাণ্ড চওড়া দুধার তলোয়ার, সাতহাত লম্বা বন্দুক, বিশাল ঢাল, লোহার জালের টুপি ও বর্ম্ম, নানা রকমের তীর, আরও কত কি অস্ত্রশস্ত্র দেখিলাম। যোদ্ধজাতির যুদ্ধের উপকরণ পাঁচরকম থাকিবে—ইহার মধ্যে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। প্রশংসার ভাব মনে জাগিত হয়তো, যদি বর্গির হাঙ্গামার কথা মনে না উঠিত।

মূলো বলিল—এ আর কি, যোধপুর ওল্ড কোর্টে একটা মিউজিয়াম আছে, সে এর চেয়ে অনেক বড়।

কোন কিছু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা—এ ক্ষমতা সকলের থাকে না, মূলোর মধ্যে তাহা থাকিবার আশা করি নাই; সুতরাং বিস্মিত হইলাম না।

নবীনদা বলিলেন—আপনাদের দেশে যোধপুরে একবার নিয়ে যাবেন আমাদের? অস্ত্রাগার দেখে আসব।

—নিশ্চয়ই। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের নিজ বাড়ীতেই একটি অস্ত্রাগার আছে, আমার পূর্ব্ব-পুরুষের আমলের।

—বলেন কি মিঃ শুকরাম!

—হাঁ। আমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ছিলেন আওরঙজেবের আমলের লোক। তাঁর নাম—আচ্ছা নোটবুক দেখে বলব। আমরা হলাম ডোগরা রাজপুত—ওয়ারিয়ার ক্ল্যান ডোগরা রাজপুত জানেন তো? আমাদের সেই পূর্ব্বপুরুষ, তিনি লড়েছিলেন জয়সিংহের সৈন্যদলে। এখনও অস্ত্রাগারের পূজো হয় আমাদের বাড়ী। ধূপধুনো জ্বালাতে হয়, সিঁদুর মাখাতে হয়—

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—সাবাস মূলো! ডোগরা রাজপুত হয়ে মরতে এসেছ কেন ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি নিতে? ও কি তোমার হবে?

আমিও বাংলায় জবাব দিলাম—বিষ হারিয়ে ঢোঁড়া, মূলোর তুকুলই গিয়েছে। অস্ত্র ধরবার ক্ষমতা নেই, লেখাপড়ারও বুদ্ধি নেই—একে বলে হর্স র‍্যাডিশ।

মূলো বলিল—কি?

নবীনদা বলিলেন—কি রকম বড় বংশে জন্ম আপনার তাই বলছি—ডোগরা রাজপুত যোদ্ধা জাত কিনা!

মূলো বলিল—যাক, মিঃ বোস, একটু চা খাওয়ার যোগাড় হয় না? চা না খেলে আর তো চলে না।

মন্দির হইতে নামিয়া রামটেকের বাজারে চায়ের দোকানে চা পান করিয়া নাগপুরে ফিরিলাম। এত ভাল ভাল জিনিস যে সারাদিন ধরিয়া দেখিলাম, মূলো সেসব সম্বন্ধে একটি কথাও বলিল না। তাহাব যতসব বাজে গল্প আর অনবরত বকুনির জন্ত আমরা নিজেদের মধ্যেও কিছু আলোচনা করিবার অবকাশ পাইলাম না।

পরদিন সকালবেলা মূলো আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আপনাদের ওবেলা আমার সঙ্গে যেতে হবে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায়?

—মিস সোরাবজির বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ।

—আমরা কেন?

—আপনাদের নিয়ে যাবার জন্তে আমাকে অনুরোধ করেছেন ওঁর বাবা।

আমরা বিকালে সাজগোজ করিয়া বসিয়া আছি, মূলো আর কিছুতেই আসে না। নবীনবাবু বলিলেন,—ওহে, মূলোটার মতলব শুনে আমাদের হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল দেখছি। ও এল না।

এমন সময় মূলো আসিয়া হাজির হইল—সে নিখুঁত সাজপোশাক করিয়া কোটের বোতামে গোলাপ ফুল গুঁজিয়া রুমালে এসেন্স ঢালিয়া আসিয়াছে এবং বোঝা গেল যে সে কিছু পূর্ব্বে নাপিতের দোকান হইতে চুলও কাটিয়া আসিয়াছে।

মিস সোরাবজির পিতা এখানকার ডাক্তার। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল—বৃদ্ধ অতি অমায়িক লোক। দেখিলাম তিনি শুধু আমাদের তিনজনকে চা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন তাহা নহে, শহরের আরও আট-দশটি ভদ্রলোককে বলিয়াছেন—তাঁহার পুত্রের জন্মতিথি উৎসব চা-পার্টির আসল কারণ।

মিস সোরাবজি আঠার-উনিশ বছরের একহারা মেয়ে, আমরা তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি। খাঁড়ার মত উঁচু সুচাল নাকের জন্ত কোনদিনই মিস সোরাবজিকে বিশেষ সুন্দরী বলিয়া আমার মনে হয় নাই—যদিও রং বেশ ফরসা ও গলার সুর কষ্টকৃত মেমসাহেবিয়ানার দোষমুক্ত না হইলেও মন্দ নয়। মেয়েটি নাকি লেখাপড়াতে ভাল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম আমরা দুজনেই। মিস সোরাবজি মূলোর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট—অন্তত হাবভাবে আমাদের তাহাই মনে হইল। বাহিরের বারান্দায় দুজনে নির্জ্জনে মাঝে মাঝে যাইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। মূলোর এতটুকু ইচ্ছাও যেন মিস সোরাবজি তখনই পূর্ণ করিতে ব্যগ্র। অতিথির প্রতি যতটুকু কর্ত্তব্য করা উচিত শেষ করিয়া মেয়েটি মূলোকে

লইয়া সব সময় ব্যস্ত রহিল।

চা-পার্টি হইতে ফিরিবার পথে মূলো কি আমাদের ছাড়ে—সঙ্গে সঙ্গে আসিল!

কিন্তু তাহার যা স্বভাব,—মিস সোরাবজি সম্বন্ধে একবারও একটি কথাও বলিল না। চা-পার্টির-কথাই যেন তাহার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে এটুকু সময়ের মধ্যে।

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা! কলেজের বেশ ভাল মেয়ে বলে শুনেছি—র‍্যাডিশটার মধ্যে কি পেলে খুঁজে!

দু দিন মূলো কি জানি কেন আমাদের বাংলোতে আসিল না। তৃতীয় দিন সকালবেলা একখানা মোটরগাড়ী বাসার সামনে দাঁড়াইতেই আমি আগাইয়া গেলাম—নবীনদা তখন বাসায় নাই। মোটর হইতে নামিলেন ডাঃ সোরাবজি। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন—শুকরাম কি এখানে এসেছিল? একটা জরুরী কথা আছে। আপনারা ওকে কতদিন জানেন?

—খুব বেশি দিন নয়। কেন বলুন তো?

—ও আমার কাছে কিছু বলে না। কিন্তু আমার মেয়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করেছে। আমি ওকে বাড়ী ঢুকতে দেব না। ওকে আপনারা বারণ করে দেবেন।

মূলোর হইয়া ওকালতি করিবার ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ওকে কি উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করেন না?

ডাক্তার সোরাবজি রাগের সঙ্গে বলিলেন, ও একটা লোফার—ওর সঙ্গে আমাদের মেয়ের বিয়ে হবে কেন? ওরা হল ডোগরা—আমি আর্মিতে ছিলাম, ওরা সেখানে সাধারণ সেপাই-এর কাজ করে। সুবাদার হতে কাউকে দেখিনি। কেন জানেন?

বলিলাম—কি?

—খুব সাহস আছে, যা বলবেন তাই করবে—কিন্তু—

বলিয়া ডাক্তার সোরাবজি আঙুল দিয়া নিজের মাথায় দু-তিনবার টোকা দিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

—তাহলে বলে দেবেন দয়া করে।

—আজ্ঞে ওটা বলা আমাদের পক্ষে একটু শক্ত, বুঝতেই পারেন।

—আমি বললে একটু রূঢ় হয়ে যাবে।

—কিন্তু একটা কথা বলি যদি কিছু মনে না করেন—মিস সোরাবজির মনোভাব কেমন মিঃ শুকরামের ওপর, সেটা একবার—

—সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর মত একটা বাজে অপদার্থ লোকের হাতে মেয়ে দেব? ও কোনওকালে বি-এ পাশ করতে পারবে? কোনদিন নয়। আমার মেয়ে অনার্স ক্লাসের ছাত্রী, সকলের চেয়ে ভাল ছাত্রী—ওর সঙ্গে তার বিয়ে! হাসির কথা।

পরদিন সকালে মূলো আমার কাছে আসিয়া গোপনে বলিল, মিঃ রায়, সব ঠিক হয়ে গেল।

—কি ঠিক হয়ে গেল মিঃ শুকরাম ?

—আলুর সঙ্গে বিয়ের। অবিশ্যি ওর সঙ্গেই কথা হোল—ওর বাবা এখনও জানেন না।

—খুব খুশী হলাম শুনে। তবে ডাক্তার সোরাবজিকে একবার বলুন।

—সে হয়ে যাবে। তা—বললেও হয়।

নবীনদা শুনিয়া বলিলেন—বাঁদরের গলায় মুক্তোর হার—মূলোর সঙ্গে অমন একটি চমৎকার মেয়ের বিয়ে!

ইতিমধ্যে মূলোর পরীক্ষা পড়িল—সে বি-এ পরীক্ষা দিয়া কিছুদিনের জন্য দেশে গেল। আমাদের বার বার অনুরোধ করিয়া গেল, আমরা যেন তাহাকে না ভুলি—চিঠি দিলে যেন উত্তর দিই।

দুই মাস কাটিয়া গেল।

হঠাৎ একদিন আমাদের অত্যন্ত আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া ডাক্তার সোরাবজি তাঁহার কন্যার বিবাহে আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন। শুনিলাম পাত্র পুণার মেডিকেল অফিসার, আই এম এস পদবীর লোক। মোটা বেতন পান।

আমরা বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া বলিলাম,— ও, আমরা জানতাম মিঃ শুকরাম—

বৃদ্ধ ডাক্তার রাগত-ভাবে বলিলেন, সে একটা লোফার, আগেই বলেছি। গেজেটটা দেখেছেন! তার নাম খুঁজে দেখবেন কোথাও নেই। আর আমার মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পেয়েছে।

আমরা সত্যই দুঃখিত হইলাম মূলোর জন্য।

এত কথার পর বিকালে যখন মূলো আসিয়া জানাইল মিস সোরাবজি ও আমাদের লইয়া সে পরদিন পিকনিকে যাইবে, তখন একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। নবীনদা হাঙ্গামায় পড়ার ভয়ে প্রথমটা যাইতে চাহিলেন না—কিন্তু শেষে যখন মূলোর মুখে শুনিলাম, মিস সোরাবজির ভাইও এই সঙ্গে যোগ দিবে তখন আমাদের যাইতে কোন আপত্তি রহিল না।

গোরেওয়াডা হ্রদের ধারে পিকনিক ঠিক হইয়াছিল। পরদিন সকালে দল বাঁধিয়া দুখানা মোটরে হ্রদের ধারে গিয়া পৌছিলাম। নাগপুরের পাহাড়ের মধ্যে যতগুলি হ্রদ আছে, এটি সর্ব্বাপেক্ষা বড, দৃশ্যও চমৎকার। আমরা উত্তর পাড ধরিয়া হ্রদের ওপারে অনুচ্চ পাহাডের তলায় বড বড তিন্দুক গাছের ছায়াতে আমাদের বনভোজনের স্থান নির্দ্দেশ করিলাম। মিস সোরাবজির ভাইটির বয়স চোদ্দ-পনেরর বেশি নয়, বালক মাত্র—তাহার মনে দেখিলাম খুব স্ফূর্ত্তি, হ্রদের জলে সাঁতার কাটিবার জন্য সে স্নানের পোশাক পর্য্যন্ত সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মিস সোরাবজি মেয়েটিকে ঠিক বোঝা কঠিন। এদিনও দেখিলাম মূলোর প্রতি তাহার যথেষ্ট আকর্ষণ, তাহার এতটুকু সুখ-সুবিধার জন্য মেয়েটির কি উদ্বেগ। অবশ্য আমাদের দুজনেরও সঙ্গে সে ভাল ভাবেই মিশিল। এতটুকু অহংকার নাই, বাঙালী মেয়ের মতনই সরলতা, পরের সুখ-সুবিধা দেখার অভ্যাস, নিজের হাতে সেবা করিবার ঝোঁক। সে যে বি-এ

ক্লাসের ভাল ছাত্রী, তাহার কথাবার্তা হইতে এতটুকু তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

আমাকে বলিল—মিঃ রায়, একটা বাংলা গান করুন না?

আমি গান গাহিতে ভালই পারিতাম। এখন চর্চ্চার অভাবে গলায় সুর নাই—সে আপত্তি বলা বাহুল্য টিকিল না, পর পর তিনটি রবীন্দ্রনাথের গান গাহিতে হইল। বাঙালী-সমাজ নয়, বিশেষত কলিকাতা হইতে বহুদূরে, কাজেই ভুল ধরিবার কেহ নাই—বেপরোয়া হইয়া গাহিলাম। প্রশংসাও অর্জ্জন করিলাম মূলো ও মিস সোরাবজির কাছে।

মূলো বলিল—ওয়াণ্ডারফুল। এমন গান যে আপনি গাইতে পারেন, তা জানতাম না বাস্তবিক।

মিস সোরাবজি বলিল—টাগোরের কবিতা মুখস্থ আছে।

—দু-একটা—

—আবৃত্তি করুন না! আমাদের কলেজে মিঃ সেনের মেয়ে একবার করেছিল, বড় ভাল লেগেছিল আমার।

'জীবনদেবতা' কবিতাটি মুখস্থ ছিল ভাল, আমার মুখে শুনিয়া মিস সোরাবজি উচ্ছ্বসিত সুরে বলিল—ভারি সুন্দর।

তাহার পর সে তাহার শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া আবদারের সুরে বলিল—মিঃ রায়, আর একটা আবৃত্তি করবেন দয়া করে?

—আগে আপনি একটা ইংরেজি আবৃত্তি করুন!

—করবেন তাহলে?

মিস সোরাবজির খড়্গের মত সূক্ষ্ম ও উগ্র নাসিকাকে ক্ষমা করিলাম, মেয়েটি অত্যন্ত চাল-বিহীন ও অমায়িক, তখনই সে ব্রাউনিঙের 'বৈয়াকরণের শবযাত্রা' নামে বিখ্যাত কবিতাটি সুন্দরভাবে আবৃত্তি করিয়া আমাদের মুগ্ধ করিল।

পুনরায় আমাকে একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করিতে হইল। এবার হাত-মুখ নাড়িয়া শিশির ভাদুড়ীর অনুকরণে 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করিয়া ইংরেজিতে ভাবার্থ বুঝাইয়া দিলাম। পূর্ব্বের কবিতাটি অপেক্ষা এইটিই মিস সোরাবজির বেশি ভাল লাগিয়াছে, তাহা তাহার কথার সুরে ও চোখ-মুখের ভাবে আমার বুঝিতে দেরি হইল না। আমায় বলিল—দেখুন রায়, টাগোরের কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পড়েছি কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনি আর ঝংকারের মধ্য দিয়ে যে ওসব কবিতা এমন চমৎকার শোনায়, তা আমি আজ এই প্রথম জানলাম। এর আগে একবার বাংলা আবৃত্তি শুনেছিলাম কলেজে, সে তেমন কিছু নয়। আমার বাংলা শেখার বড় ইচ্ছে, কি করে শেখা যায় বলতে পারেন?

মূলো দেখিলাম খুব খুশী হইয়াছে—কবিতা শুনিয়া নয়, কারণ সে সূক্ষ্ম রসবোধ তাহার ছিল না—বাংলা কবিতা ও প্রকারান্তরে বাঙালীর প্রশংসা করা হইতেছে, এইজন্য। লোকটা অন্ধ বাঙালীভক্ত।

বলিল—জার্লু, তুমি মিঃ রায়ের কাছে কেন বাংলা শেখ না? বেশ ভাল হবে—

মিস সোরাবজি পুনরায় আবদারের ভঙ্গিতে তাহার সুঠাম শুভ্র গ্রীবাটি দুলাইয়া বলিল—শেখাবেন আমাকে মিঃ রায়? আমি রোজ আপনার বাসায় আসব এক ঘণ্টা করে?

মুলো পরম উৎসাহের স্বরে বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ, বেশ!

নবীনদা বাংলায় বলিলেন—ওর তাহলে বড় সুবিধে হয়, দু বেলা দেখা হয় কিনা। মুলোর কাণ্ড দেখ—সাধে কি বলে হর্স র‍্যাডিশ!

মুলো মিস সোরাবজির সঙ্গে কথা কহিতে অন্যমনস্ক ছিল, নবীনদার বাংলা কথা শুনিতে পাইল না—নতুবা বলিত, হোয়াট? কি বললে বাংলাতে?

আমি ভদ্রতা বজায় রাখিয়া বলিলাম—শেখালে তো বেশ হোত—কিন্তু আমাদের সময় নেই কিনা! দুজনকে টো টো করে সারাদিন নিজের কাজে বেড়াতে হয়, নইলে এ তো বড় আনন্দের কথা।

আমরা গোরেওয়ারায় জলে নামিয়া সবাই স্নান করিলাম, মিস সোরাবজি পর্য্যন্ত। দুপুর ঘুরিয়া গিয়া একদিকে ছায়া পড়িয়াছে—এখনও সেদিনকার সেই দিনটি চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে—একদিকে অনুচ্চ কালো পাথরের পাহাড়, অন্যদিকে শিউলি ও তিন্দুক গাছের সারি, দু-দশটা বড় বড় শালও আছে। আকাশে খর রৌদ্র, দুপুরের রোদে ঝক-ঝক-করা চোখ-ঠিকরানো ছোট ছোট ঢেউএর সারি হ্রদের বুকে, অথচ এপারে অনেকখানি ছায়াসিক্ত—আঁটসাট স্নানের পোশাকে শুভ্রদেহ কৃশাঙ্গী ভেনাসের মত পার্শী তরুণী জালু শৈলবেষ্টিত হ্রদের নীল জল হইতে উঠিতেছে—দূরে ওপারে গোরেওয়ারার উঁচু পাড়ের উপর একটা বাংলা ধরনের বাড়ী, বোধ হয় এক ডাকবাংলো।

আমরা রান্না করিয়া রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলাম, মিস সোরাবজির নিজের হাতের রান্না ভাত ও ডাল, কিছু মাংস, দু একটা ভাজা। পার্শী ধরনের নুন দিয়া রান্না ভাত ও মশলাবিহীন সাদা রঙের মাংসের স্টু ও বেশনে টোমাটো ভাজা—সবগুলিই আমার মুখে সমান অখাদ্য। ভাগ্যে বুদ্ধি করিয়া নবীনদা কিছু আচার আনিয়াছিলেন—তাই দিয়া গ্রাস-কয়েক ভাত খাওয়া গেল। মুলো পোষা কুকুরটির মত মিস সোরাবজির পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগিল এবং তাহার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিল।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার মত বটে—দেখিলাম তাহার বাঙালী-প্রীতি তাহার প্রণয়িনীর প্রতি ভালবাসা অপেক্ষা কম নয়। বাঙালীর সব-কিছুর সে আজ ভক্ত, আমাদের কত কি ব্যাপারের প্রশংসা সে শতমুখে যদি বলিতে পারিত তাহার প্রণয়িনীর নিকট—তবে যেন তাহার তৃপ্তি হইত। বলিল, জান জালু, ওঁরা বাংলাতে মূলো কথার বড্ড ব্যবহার করেন, প্রায়ই ওঁরা বলেন র‍্যাডিশ—আমি শিখে নিয়েছি, একটা বাংলা ইডিয়ম, মানে 'খুব ভাল'।

নবীনদা অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, মরেছে হতভাগা!

মিস সোরাবজি আমাদের দিকে চাহিয়া কৌতূহলের স্বরে বলিল—ও হাউ ইণ্টারেস্টিং! সত্যি মিঃ রায়—আপনারা বুঝি—ইত্যাদি।

মেয়েটিকে যা তা বুঝাইয়া ও অন্য কথা পাড়িয়া চাপা দিলাম জিনিসটা।

বেলা তিনটার সময় আমাদের মোটর নাগপুর হইতে ফিরিয়া গোরেওয়ারার ওপারে আসিয়া ভেঁপু দিল। সকালে পৌঁছাইয়া দিয়া গাড়ী দুখানা চলিয়া গিয়াছিল। আমরা যাওয়ার উদ্যোগ করিতে মিস সোরাবজি বলিল—সূর্য্যাস্তটা দেখে যাবেন না?

—ওদিকে দেরি হয়ে যাবে ফিরতে—আপনার বাবা কি ব্যস্ত হয়ে উঠবেন না?

—কিছু না মিঃ রায়, ভাববেন না। আমি বলে এসেছি—আমি ওই পাথরের ওপার থেকে দেখব সূর্য্যাস্তটা। তুমি এস না শুকরাম।

—যেমন ইচ্ছে আপনার। শীগগির আসবেন।

অদ্ভুত সূর্য্যাস্ত। এখানে আসিয়া অবধি হাইল্যাণ্ড ড্রাইভ হইতে সাতপুরা শৈলমালার দিকে প্রায়ই দেখিতেছি। সন্ধ্যার ছায়া নামে, আমি সামান্য শৈত্যের জন্য গরম আলোয়ান ভাল করিয়া গায়ে টানিয়া দিই, হাইল্যাণ্ড ড্রাইভে সাহেব মেমদের মোটরের ভিড় বাড়ে, আম্বাসিরি লেকে পার্কে দলে দলে সুসজ্জিতা নরনারীরা বেড়াইতে আসিতে আরম্ভ করে, আমি বড় একটা শাল গাছের তলায় নির্জ্জনে প্রস্তরখণ্ডে বসিয়া দেখি ধীরে ধীরে সাতপুরা শৈলশ্রেণীর আড়ালে লাল সূর্য্যটা নামিয়া পড়িতেছে। আজও দেখিলাম। গোরেওয়ারা হ্রদের বিস্তীর্ণ জলরাশি যেন আবীর-গোলা টকটকে লাল। যেমন সূর্য্য অস্ত গেল, অমনি চারিধারে ঘনছায়া নামিল, মোটর দুখানা অধীর ভাবে ভেঁপু বাজাইতে লাগিল, বাদুড়ের দল পাহাড়ের দিকে ফিরিতে লাগিল, ক্রমে ছায়া ঘন হইয়া অন্ধকার নামিল।

নবীনদা বলিলেন,—কই, মিস সোরাবজি কোথায়?

—এই তো ছিল, সূর্য্যাস্ত ভাল দেখা যাবে বলে পাথরটার ওপারে গিয়াছে বোধ হয়।

এমন সময় মুলোর সঙ্গে মিস সোরাবজি পাথরের ওপাশের ঘাট থেকে উঠিয়া আসিল। উভয়েই স্নান করিয়া আসিল এই অবেলায়, দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

মুলো কৈফিয়তের সুরে বলিল—বড় গরম, তাই জালু বললে, বেশ স্নান করা গেল।

নবীনদা বাংলায় বললেন—তার পর তোমার জালুর নিউমোনিয়া হলে তার বাবা দেখে নেবে তোমাকে—মুলোগিরি খাটবে না তখন—

মুলো বললে—কি?

আমি উত্তর দিলাম, জালু নামটা বড় চমৎকার! মিঃ বোসের মতে। অবশ্য আমারও সেই মত।

মিস সোরাবজি সলজ্জ হাসিয়া মেমসাহেবী সুরে বলিল—ও, ইউ হরিড ক্রিচারস্!

আমরা গাড়ীতে উঠিয়া চলিলাম।

সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের কিছু পূর্ব্বে পাহাড়ী ঢালুতে অনেক বনশিউলি ফুল ফুটিয়া আছে দেখিয়া মেয়েটি বলিল—ও মিঃ রায়, কি চমৎকার ফুল ফুটেছে! শেফালি—না?

মোটর থামাইয়া মুলো গোটাকয়েক ডাল ভাঙিয়া আনিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, জ্যোৎস্নার ক্ষীণ লেশ মাটির বুকে। সাউথ টাইগার গ্যাস রোডের এদিকটা নির্জ্জন, এ সময় খুব বেশি লোকজন নাই। হঠাৎ মেয়েটি বলিল—চলুন, আম্বাসিরি লেক দেখে আসি।

এ জ্যোৎস্নায় বেশ লাগবে।

আমরা সকলেই হতবুদ্ধি। আম্বাসিরির দিকে যাইতে হইলে আবার পাহাড়ে উঠিতে হইবে। বিপদে ফেলিল দেখিতেছি খেয়ালী পার্শী মেয়েটা। কি করা যায়, সুন্দরী তরুণীর আবদার উপেক্ষা করিবার সাধ্য নাই আমাদের—মোটর ঘুরাইয়া আবার সবাই পাহাড়ে উঠিয়া আম্বাসিরির দিকে ছুটিলাম। সেখানে লেকের ধারে পার্কে বিভিন্ন বেঞ্চিতে তখনও কেহ কেহ বসিয়া আছে। ক্রমে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠিয়া হ্রদের জলে পড়িয়া সেদিনকার খিন্‌সি লেকের স্মৃতি মনের মধ্যে আনিয়া দিল। পাহাড়ের উপর হু হু ঠাণ্ডা বাতাসে সমস্ত শরীরে কাঁপুনি ধরিল। জনবিরল হ্রদ-তীরের পার্কটিতে দূরে দূরে দু-একটি নরনারী বেড়াইতেছে। ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে সবাই নামিয়া চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই আরও চমৎকার লাগিতেছিল, নতুবা সাধারণত আম্বাসিরিতে বিকালের দিকে বড় ভিড় থাকে।

মিস সোরাবজিকে বলিলাম—কেমন লাগছে ?

সে মেমসাহেবী সুরে সরু মিষ্টি গলায় টানিয়া বলিল—ও, ইট্‌'জ ফা-ই-ন!

'ফা' হইতে 'ন' পর্যন্ত টানিয়া সুরের নামা-ওঠা করিয়া উচ্চারণ করিতে প্রায় পাঁচ সেকেণ্ড সময় লইয়া মধুর ধরনে গ্রীবা বাঁকাইয়া মৃদু হাসির সঙ্গে কথাটা বলিল। এই তো কলেজের ছাত্রী, কতই বা বয়স, কুড়ি-একুশের বেশি নয়—এ সব শিখিল কোথা হইতে কে জানে। নবীনদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বাংলায় বলিল—মেয়েটার আবার ভাবন দেখছ ?

আমিও বাংলায় বলিলাম—আমেরিকান ফিল্ম থেকে হলিউডের অ্যাক্‌ট্রেসদের সুর নকল করেছে কষ্ট করে। গলা মিষ্টি বলে মানিয়েছে।

মূলোর মনে কোনও কবিত্ব নাই। সে দেখিলাম মেয়েটির সহিত সূতা ও চরকা-কাটা সম্পর্কে কি কথা বলিতেছে। মিস সোরাবজি আমার কাছে আসিয়া বলিল,—একটা কবিতা বলতে হবে—বলুন। এমন জায়গায় টাগোরের কবিতা একটি শুনব!

আবৃত্তি করিলাম—কি আর করি। মেয়েটির প্রাণে দেখিলাম সত্যই কবিত্ব আছে। সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল প্রশংসায়। কিছু না বুঝিলেও ভাষার ধ্বনিতে ও ঝংকারে তাহার মন মাতিয়া উঠিয়াছে। সে আমাদের অনুরোধের অপেক্ষা না করিয়া সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় শেলির একটি কবিতা আবৃত্তি করিল।

বলিলাম—গান করুন না একটা!

মিস সোরাবজি হাসিয়া বলিল—ইংরিজি গান জানি, আপনাদের পছন্দ হবে না।

—ভারতীয় মেয়ে, দিশি গান শেখেননি কেন ?

—আমাদের কমিউনিটির সাহেবিয়ানা এজন্যে দায়ী মিঃ রায়। বাবা গভর্নেস রেখে ছেলেবেলায় পড়িয়েছেন, গান শিখিয়েছেন—তারা যে পথে নিয়ে গিয়েছে, সেই পথে যেতে হয়েছে আমায়। এখন জ্ঞান হয়ে সব বুঝতে পারি। এখন আমি গান্ধীবাদী তা জানেন ? খদ্দর পরি অনেক সময়, মা পরতে দেন না—এই হোল কথা। ইচ্ছে হয় আমি শিখি ভারতীয় গান—খুব ভাল লাগে আমার।

নবীনদা হাসিয়া মনের আনন্দে একটা ভাটিয়ালি গান বেসুরে গাহিয়া ফেলিলেন। মিস সোরাবজিকে ইংরিজিতে তাহার অর্থও বুঝাইয়া দেওয়া হইল। গানে, গল্পে, কবিতা-আবৃত্তিতে হাসিখুশিতে সারাদিনটা কাটাইয়া রাত্রে যখন বাড়ী আসিয়া শুইয়া পড়িলাম—তখন যেন মাথার মধ্যে উগ্র মদের নেশা। নবীনদাবও তাই, কারণ—তিনি আসিয়া পর্য্যন্ত গুন গুন করিয়া গান করিতেছিলেন।

মিস সোরাবজির বিবাহের অল্পদিন পরেই আমরা দুই বন্ধু নাগপুর হইতে চলিয়া গেলাম। বছরখানেক পরে আবার একবার বিশেষ কাজে নাগপুরে আসি।

সংবাদ লইয়া শুনিলাম বৃদ্ধ ডাক্তার সোরাবজি ইতিমধ্যে মারা গিয়াছেন। তাঁহার পরিবার-বর্গ কেহই এখানে নাই—বৃদ্ধের মৃত্যুর পরে তাহারা বোম্বাই চলিয়া গিয়াছে।

মুলোর খবর জানিবার বিশেষ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা কাহাকে তার কথা জিজ্ঞাসা করিব বুঝিতে পারিলাম না। ডাক্তার সোরাবজি শহরের বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে সকলের নিকটই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মুলো জনৈক বিদেশী তরুণ ছাত্র—অমন ছাত্র নাগপুরে বহু আছে—কে কাহার খবর রাখে! আমরা ছাড়া আর সে কাহার সঙ্গে মিশিত জানি না, সুতরাং মুলোর খোঁজ লইবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উপায় হইল না।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সপ্তাহখানেকের মধ্যে একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে গোরেওয়ারা হ্রদে বেড়াইতে গিয়া মুলোর দেখা পাইলাম। নবীনদা তাহাকে প্রথম দেখেন। একখানা পাথরে ঠেস দিয়া কে একজন নির্জ্জনে বসিয়া আছে দেখিয়া নবীনদাই বলিলেন—ওখানে কে দেখ তো হে!

গোরেওয়ারা শহর হইতে বহুদূরে, এত দূরে কেহ বেড়াইতে আসে না সাধারণত—স্থানটাও নির্জ্জন পাহাড়-জঙ্গলের মধ্যে। আমি একটু কাছে গিয়া দেখি—মুলো! নিখুঁত সাহেবী পোশাক পরা সেই রকমই, তবে দাড়ি কামায় নাই, মাথায় চুল ছোট করিয়া ছাঁটা।

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—মুলো একখানা খাতাতে কি লিখিতেছে। এত নিবিষ্টমনে লিখিতেছে যে, আমার পদশব্দ সে শুনিতে পাইল না। কবি হইয়া গেল নাকি ছোকরা?

তাহার পর আমাদের সঙ্গে সে নাগপুরে ফিরিল। শুনিলাম সে এবারও পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে নাই। আমাদের পাইয়া মুলো ছেলেমানুষের মত খুশী। চাপেবার দুগ্ধমন্দিরে লইয়া গিয়া আমাদের মিষ্টান্ন শরবত খাওয়াইয়া দিল। শুনিলাম দেশে তাহার মা মারা গিয়াছেন এই বৎসরেই।

বলিল—বড্ড একলা একলা বোধ করি এখানে। মিশব কার সঙ্গে? এখানে মেশবার লোক নেই। বাঙালীদের সঙ্গে মিশে আরাম। গোরেওয়ারা লেকে মাঝে মাঝে গিয়ে বসে থাকি। বেশ লাগে। একদিন ওখানে বেশ কেটেছিল। মনে আছে সেই আমাদের পিকনিক? ওরা কোথায় যে তা তো জানি নে।

দেখিলাম মুলোর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল একটা ছবি—কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বের রাজপুতানায় বিশাল মরুভূমির মধ্যে উটের পিঠে চড়িয়া ইহার সেই বীর পূর্ব্বপুরুষ চলিয়াছে জয়সিংহের সৈন্যদলের সহিত দেওয়ার যুদ্ধে, সেলিমগড়ের যুদ্ধে—চওড়া গালপাট্টাওয়ালা রুক্ষ-দর্শন মুখাবয়ব, দীর্ঘ দেহ, পাশে খোলা দীর্ঘ দুধার তলোয়ার, হাতে সাত হাত লম্বা বন্দুক—মৃদুতা নাই, ভয় নাই—কবাটের মত বিশাল বক্ষে জ্বলন্ত দুঃসাহস—কাহার সাধ্য ছিল তাহার মনোনীত কন্যাকে স্পর্শ করে! সে ছিনাইয়া আনিত তাহার প্রণয়িনীকে যে কোন লোকের হাত হইতে। লড়িত, খুন করিত।

আধুনিক যুগের আবহাওয়ায় জয়সিংহের সৈন্যদলের সেই বীর নায়কের বংশধর এই সাহেবী পোশাক পরা, নিখুঁত টাই বাঁধা, ঘাড় চাঁচা, ক্লিন শেভ্‌ড, হাতে রিস্টওয়াচ বাঁধা ছোকরা নিতান্ত নিরুপায়। কবিতা লেখা বা চোখের জল ফেলা ছাড়া সে হারানো প্রণয়িনীর জন্য কি করিতে পারে? বিশেষত যখন দুইবার ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী না পাইয়া সে আরও দমিয়া গিয়াছে।

ছোকরার জন্য এই সর্ব্বপ্রথম দুঃখ হইল।

সুলোচনার কাহিনী

১

সন্ধ্যা হইয়াছে, সুকিয়া স্ট্রীট দিয়া যাইতেছি। ডাক্তারখানা খুলিতে দেরি হইয়া গিয়াছে, সময় হইয়া আসিল, সুতরাং হন হন করিয়াই চলিয়াছি—এমন সময়ে বাড়ীঘরের থামের ছায়ায় আলো-আঁধারির মধ্যে একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়াই আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলাম।

এ যেন সেই সুলোচনার মা না? অবিকল সেই রকম দেখিতে, যদিও বহুকাল দেখি নাই। কিন্তু তাও কি সম্ভব? এতকাল পরে সুলোচনার মা বাঁচিয়া থাকিবে এবং কলিকাতা শহরেই থাকিবে?

একটু জোরগলায় ডাক দিলাম—শুনছেন? শুনছেন? বলি শুনছেন—এই যে! যে বৃদ্ধাটি ফিরিয়া দাঁড়াইল আমার ডাক শুনিয়া এবং হয়তো বা তাহাকেই কেহ ডাকিতেছে মনে করিয়া—বিস্ময়ের সহিত দেখিলাম সে সুলোচনার মা-ই বটে।

সুলোচনার মা কাছে আসিল। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরে পরিচয় দিতেই দন্তহীন মুখে এক গাল হাসিয়া বলিল—ও.তুমি যদু! আহা কতকাল দেখিনি তোমাদের! —ইত্যাদি বা ঐ ধরনের কোন উক্তি।

আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের যবনিকা হঠাৎ সরিয়া গেল। গত মহাযুদ্ধেরও কয়েক বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতা···ঘোড়ার ট্রাম সবে মাত্র বন্ধ হইয়াছে···তখনকার আমলের অতি সুন্দরী আধুনিকাদের মধ্যে যে আমার চোখে সর্ব্বপ্রধান সুন্দরী এবং সবচেয়ে

আধুনিকা ছিল, কিছুকাল পরে যাহাকে জীবনের জনসমুদ্রে একদম হারাইয়া ফেলি, এ সেই মেয়েটির মা।

. তখনকার মেয়েদের চুল বাঁধিবার রীতি বা কাপড়-চোপড় পরিবার ধরন একালের মত ছিল না বটে, কিন্তু সত্যিকার সুন্দরী যে হয়, তাহাকে যে-কোন সাজে, যে-কোন ঢঙে, যে-কোন ভঙ্গিতে মানায়, এবং সুলোচনা ছিল সেই ধরনের সুন্দরী মেয়ে। তাহার সেই দীর্ঘ ঋজু চম্পকগৌর যৌবনদীপ্ত দেহ, লম্বা টানা কালো কালো ডাগর চোখ, কালো কোঁকড়া চুলের রাশি, নিটোল সুগঠিত বাহু দুটি, সুন্দরী মুখশ্রী কলিকাতার পথেঘাটে, গলির আড়ালে আবডালে, পথের বাঁকে হঠাৎ ফিরিয়াই, কিম্বা কোন নির্জ্জন পার্কে পাদচারণরত অবস্থায় কত দিন কল্পনানেত্রে দেখিতাম; দেশে ফিরিয়া কত বর্ষণমুখর শ্রাবণ বা ভাদ্র রজনীতে এক-ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া প্রথম-যৌবনের রঙিন নেশায় যাহার মুখ কত বার মনে পড়িত—সেই সুলোচনার কোন খবর পাই নাই আজ এত বছর, ধীরে ধীরে কবে সে বিস্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল···আবার পুরানো যুগের সেই মেয়েটি ১৯৩০ সালের কলিকাতায় কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল।

একটি প্রেমের কাহিনী। তবে সে-প্রেমের নায়ক আমি নই, গোড়াতেই কথাটা বলিয়া রাখা ভাল। সব যুগেই মেয়েরা যেমন ভালবাসে, ভালবাসিয়া কষ্ট পায়, মুখ বুজিয়া সহ্য করে, তিলে তিলে নির্ব্বোধের মত নিজের দেহ ক্ষয় করে দুশ্চিন্তায়, দুর্ভাবনায় ··অত রূপ লইয়াও সুলোচনা সে-দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই জানিতাম, তাই পরবর্ত্তী সময়ে মেয়েদের যখন ভাল করিয়া জানিয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম তখন সেকালের তরুণী প্রেমিকা সুলোচনার জন্য মাঝে মাঝে মনটা কেমন করিয়া উঠিত।

যাক এখন সে-সব কথা। বর্ত্তমানের কথাই আবার বলি।

সুলোচনার মা অত্যন্ত বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছে, আজ দেখিয়াই বুঝিলাম। কিন্তু সুলোচনার মা ভিক্ষা করিতেছে কেন? সুলোচনা কোথায়? কারণ ভিক্ষাই সে করিতেছিল। থামের পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তার লোকের কাছে দু-একটি পয়সা চাহিতেছিল আমি লক্ষ্য করিয়াছি।

আমাকে পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধা একটু সংকুচিত হইয়া পড়িল। তাহার সে-ভাবটা কাটাইয়া দিবার জন্য বলিলাম—এখানেই কোথাও বাসা বুঝি? দোকানে জিনিস কিনতে এসেছিলেন?—ভাল আছেন?

—আর বাবা, ভাল আর মন্দ! তুমিও যেমন!

কথাটা ভাল লাগিল না, সুতরাং যে প্রশ্নটি এতক্ষণ করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল, সেটা করিয়া ফেলিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম সুলোচনার বয়স এখন হিসাবমত প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ —সুতরাং তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতে সংকোচের কারণ কি আছে? সে এখন আর ব্রীড়াবনতা সুন্দরী কিশোরী প্রণয়িনী নয় কারও।

—ইয়ে,—গিয়ে—সু—আপনার মেয়ে কোথায়?

—তাই তো বলছি বাবা, সে কি আর আছে? সে থাকলে আমার আজ এই···বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি এ উত্তরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। অপ্রতিভের মত বলিলাম—ও!···

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। পরে আমিই বলিলাম—আজকাল আছেন কোথায়?

—রাস্তায়—গবর্নমেণ্টের রাস্তায়।

সবই বুঝিলাম। বড় কষ্ট হইল এ-কথা বলিলে ঠিক কথা বলা হইবে না। কষ্ট হইলেও বুড়ীর জন্য হয় নাই। বুড়ীকে কিছু পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিব ভাবিতেছি এমন সময়ে সে বলিল—তোমাব সঙ্গে দেখা হোল বড ভাল হোল বাবা। আমার ঘাড়ে সব ফেলে দিয়ে হত-ভাগী তো পালাল, এখন তার দুটি ছেলে, একটির বয়েস ষোল আর একটি চোদ্দ, এদের নিয়ে আমার কি দুর্দ্দশা ভাব দিকি এ বয়সে! একটা ঘবে আছি—এখনই ভাড়া দিতে না পারলে তাড়িয়ে দেবে বলেছে। তাই বলছি রাস্তা ছাড়া এখন যাব কোথায়?

—সুলোচনা কত দিন মারা গিয়েছে?

—এই চোদ্দ বছর। ঐ কোলেব ছেলেটি যখন দু-মাসেব—সেই থেকে মানুষ কবছি।

আমার হঠাৎ একটি কথা মনে হইল। সুলোচনাকে আমি জানিতাম বটে, কিন্তু তার আসল ইতিহাস আমার কাছে রহস্যাবৃত ছিল। আমি খানিকটা বুঝিতাম, খানিকটা বুঝিতাম না—তাহার আর একটা কারণ, আমার বয়সও তখন কম ছিল। রূপসী সুলোচনা আমার কাছে চিরদিন নারীত্বের গহন রহস্যের প্রতীক হইয়া আছে। এই উত্তম সুযোগ। বড় কৌতূহল হইল উহার মায়ের মুখে তাহার ইতিহাস সব শুনিব।

বৃদ্ধাকে বলিলাম—আপনি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বসে থাকবেন কাল বিকেল পাঁচটার সময়—আমি আসব। বাড়ীভাড়ার ব্যবস্থা যা হয় করা যাবে।

বুড়ী ছাড়িল না, তাহার বাসা দেখিতে হইবে এখনই। অগত্যা গেলাম। বাসা দেখিয়া মনে হইল, তেমন ঘরে মানুষ থাকিতে পারে না, গরু থাকিলেও কষ্ট পায়। একতলায় ছোট্ট অন্ধকূপের মত ঘব, একটি মাত্র দোর, যেটা দিয়া ঢুকিতে হয়—দ্বিতীয় দরজা বা জানালা নাই। এই পচা ভাদ্রে কি ভীষণ গুমট ঘরের মধ্যে।

সুলোচনার ছেলেরা একটু পরে আসিল। বড সুন্দর ছেলে দুটি। সুলোচনার মুখচোখ ভুলিয়া গিয়েছিলাম; ইহাদের—বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেটিকে দেখিয়া আবার সুলোচনাকে স্পষ্ট মনে পড়িল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যাত্রাদলে কৃষ্ণ সাজে একটি, অপরটি গান গায়।

হায় অভাগী সুলোচনা!···

তখনকার কালের শৌখিন মেয়ে, তখনকার কালের আধুনিকা স্মার্ট মেয়ে সুলোচনার মা ও ছেলেদের এ কি গৃহ, এ কি গৃহসজ্জা! ছেঁড়া চটের বিছানা, চটের মধ্যে বিচুলির কুচি-পোরা বালিশ, ভাঙা কলাইচটা এক-আধখানা সানকি, একটা মাটির কলসী আর দড়ির আলনায় অতি মলিন থান দুই-তিন কাপড় ও জামা। একখানা কেওড়া কাঠের হাত-দুই চওড়া তক্তপোশ আছে—ছেলেদুটি তাতে শোয়, বুড়ী শোয় মেঝেতে। তাও এই ঘরে

আশ্রয় মিলিতেছে কই ? এই আস্তাবল হইতেও বাড়ীওয়ালা নাকি ইহাদের তাড়াইয়া দিবে বলিতেছে ।

এই কাহিনীটি আর বেশিদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া যাইবার পূর্ব্বে সুলোচনা কে ছিল, তাহার সহিত আমার কি ভাবে আলাপ—ইহা বলিব । নতুবা গল্পের অংশও ভয়ানক খাপছাড়া ঠেকিবে ।

২

১৯০৬ সালে দেশের ইস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া কলিকাতার কলেজে পড়িতে আসিয়াছি । বেচু চাটুজ্জের স্ট্রীটে আমারই স্বগ্রামস্থ এক বন্ধুর বাবা ছেলেপুলে লইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন, সেইখানেই উঠিয়াছি । আমার বন্ধুটির দাদা তখন বি. এ. পড়েন এবং তাঁহারই সঙ্গে দেখা করিতে প্রকাশচন্দ্র বসু নামে তাঁহারই এক বন্ধু বাসায় ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন । এই প্রকাশবাবু বড় অদ্ভুত লোক । বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে মনেপ্রাণে যোগ দেওয়ার ফলে পুলিশের হাতে গুরুতর প্রহার খাইয়া নাকি কিছুদিন হাসপাতালে এবং কিছুদিন জেলে ছিলেন । তিনি নিজের হাতে কাহাকেও বোমা মারিয়াছিলেন বলিয়া শুনি নাই—কিন্তু আলিপুর বোমার মামলার সময় পুলিশ দিনকতক তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিয়াছিল । খুব বলিষ্ঠ, দীর্ঘ চেহারা, মুখের ভাবে বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার ছাপ অতি সুস্পষ্ট । প্রেসিডেন্সি কলেজের বি.এ. ক্লাসের ছাত্র, ছাত্র হিসাবেও যথেষ্ট মেধাবী ।

আমরা প্রকাশদাকে যথেষ্ট খাতির করিয়া চলিতাম । তিনি বাড়ীতে আসিলে বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত খুশী হইয়া উঠিতেন । প্রকাশের জন্য এ-খাবার করা, প্রকাশের জন্য ও-খাবার করা ; চা কোথায়, চেয়ারের উপর পাতিবার কুশন কোথায় ; মিনি তাহার হাতের উলের কাজ দেখাইতে ছুটিতেছে ; ডলি পড়া বলিয়া লইবার ছুতা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে দুটি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে—প্রকাশদার কাছে যেন বাড়ীসুদ্ধ লোকের মন বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে । তাঁহার বিরুদ্ধে একটি কথাও বলিবার অধিকার ছিল না বাড়ীতে, তাহা হইলে সকলেই একসঙ্গে তুমুল প্রতিবাদ তুলিবে ।

প্রকাশদার সঙ্গে মাঝে মাঝে সতীশ রায় বলিয়া তাঁহার এক বন্ধু আসিতেন, মেডিকেল কলেজের ছাত্র, খুব বড় বড় চোখ, শ্যামবর্ণ দোহারা চেহারা । ইঁহারা সবাই খুব স্ফূর্ত্তিবাজ আমুদে ধরনের লোক—আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী মাতাইয়া তুলিতেন হাসি গল্পে গানে । মাঝে মাঝে আবার কয় বন্ধুতে ঘরে খিল দিয়া কিসের পরামর্শ করিতেন—তখন আমাদের জানালা দিয়া উঁকিঝুঁকি মারাও নিষেধ ছিল ।

কৌতূহল চাপিতে না পারিয়া একদিন বন্ধু শরৎকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওরা ঘরে দোর দিয়ে কি করে রে ?

শরৎ চুপিচুপি বলিল—কাউকে বলিস নি ভাই, ওরা সব অ্যানার্কিস্ট ।

—তোর দাদাও ?

—হ্যাঁ। ওরা দাদাকে দলে নিয়েছে।

শুনিয়া মনের মধ্যে একটা কৌতূহল ও উত্তেজনা অনুভব করিলাম। অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে এক বাসায় আছি ভাবিয়া ভয়ও হইল।

এইখানে একদিন প্রথম দেখিলাম সুলোচনার মাকে। নিজের ঘরটিতে বসিয়া পড়িতেছি, একটি প্রৌঢ়া বিধবা স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিল—প্রকাশ এখানে কবে এসেছিল ? আজ আসবার কথা আছে ?

দেখিলাম স্ত্রীলোকটির পরনে সাদা থান, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের বেশি নয়, গায়ের রং খুব ধপধপে ফরসা, বয়স হইলেও মুখশ্রী দেখিতে ভাল। আমার মুখে প্রকাশবাবুর আসিবার সম্ভাবনা আছে শুনিয়া আমারই ঘরে সে বসিল। আমায় বলিল—তুমি কি কর ছেলে ?

—পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে।

—এটা তোমাদেব বাড়ী ?

—আমার বন্ধুর বাড়ী, আমি এখানে থাকি। বাড়ীতে মেয়েরা আছেন—চলুন না বাড়ীর মধ্যে, এখানে কেন বসে থাকবেন ?

এই ভাবে সুলোচনার মার সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদেরও আলাপ হইয়া গেল। সুলোচনার মা কিন্তু প্রকাশদার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ছাডা অন্য কার্যে কখনও আসে না, একদিন আমার এ কথা মনে হইল। বাড়ীর মধ্যে মেয়েরাও এ-কথা বলিতে শুরু করিল। স্ত্রীলোকটি যে প্রকাশবাবুব কাছে টাকা লইতে আসে, তাহাও সকলে জানিয়া গেল। ক্রমে আমাদের সামনেই সে প্রকাশবাবুকে বলিত—ও প্রকাশ, বাবা এ-মাসে আর দশটা টাকা না দিলে মেয়ের বই হবে না। ক্লাসে তাকে বকে, বই না কিনে ইস্কুলে যাবে কি করে ?

আমার বন্ধুকে একদিন বলিলাম—ওঁর মেয়ে আছে তা তো এতদিন শুনিনি। ওঁরা প্রকাশদার কেউ হন ? প্রকাশদা টাকা দেন কেন ওঁদের ?

বন্ধু বলিল—জানি ওঁব এক মেয়ে এখানে স্কুলে পড়ে। আমি শুনেছি মেয়েটি সধবা, কিন্তু তার স্বামীর কাছে থাকে না। মা ও মেয়ে কোথায় যেন বাসা কবে থাকে, প্রকাশদা আর সতীশদা দুজনে খরচ দেন। দাদা এ-সব গল্প সেদিন মার কাছে করেছিল।

—তা প্রকাশদা আর সতীশদা টাকা দেন কেন ?

—ওঁরা অ্যানার্কিস্ট কিনা, দেশের আর দশের সেবা ওঁদের কাজ, বিশেষ করে প্রকাশদার। দাদা বলে, প্রকাশদা বাড়ী থেকে যে টাকা পান, তার বেশির ভাগ ওদের দিয়ে দেন, নিজে অনেক সময় টাকা ধার করতে আসেন দাদার কাছে। দুটো টিউশনি করেন, সে-টাকাও ওদের দিয়ে দেন।

আমার ক্রমে মনে হইল বুড়ী প্রকাশদার কাছে নানা রকম ফন্দি ও ছুতায় টাকা আদায় করিতে আসে। আর সব সময়েই মেয়ের অজুহাতে। আজ আমার মেয়ের এ নাই, আজ আমার মেয়ের তা নাই, একটা না একটা ছুতা বুড়ীর লাগিয়াই আছে। প্রকাশদাও যেন কল্পতরু, 'না' বলিতে শুনিলাম না কোনদিন। বুড়ীর উপর হাড়ে হাডে চটিয়া গেলাম।

বুড়ী বলিলাম বটে কিন্তু সুলোচনার মা সে-যুগে বুড়ী ছিল না।

কতবার ভাবিতাম প্রকাশদাকে বলি, উহারা ফাঁকি দিয়া আপনার কাছে টাকা লইতেছে, আপনি যখনই যা চায় তা দেন কেন? কিন্তু প্রকাশদাকে শ্রদ্ধা-সম্মান করিতাম, কখনও সাহস করিয়া কথাটা বলিতে পারি নাই।

৩

এখানে একদিন সুলোচনা আসিল তাহার মায়ের সঙ্গে।

দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। রূপসী বটে। পাড়াগাঁ হইতে কয়েক মাস মাত্র আসিয়াছি, অমন রূপ কখনও দেখি নাই। বছর ষোল কি সতের বয়স, পিঠে দীর্ঘ কালো চুলের বিহুনি দোলানো, যেমন চোখ তেমন ধপধপে গায়ের রং, তেমনই নিটোল স্বাস্থ্য, অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী।

বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে স্বভাবতই তার যথেষ্ট ভাব হইয়া গেল। তার পর প্রায়ই আসিতে লাগিল। বিশেষ করিয়া প্রকাশদার আসিবার সময়টাতেই আসে এবং বেশির ভাগ কথাবার্ত্তা বলে প্রকাশদার সঙ্গেই। প্রকাশদা উপস্থিত থাকিলে সেই যে তাহার চেয়ারের পিছনটি ধরিয়া দাঁড়ায়, তিনি যতক্ষণ এ বাড়ীতে থাকেন, বড় একটা অন্য কোথাও নড়িতে দেখি নাই।

প্রকাশদা উঠিয়া চলিয়া গেলে সুলোচনা আমাদের বড় বিরক্ত করিত। হয়তো বা আমাদের সে মানুষ বলিয়াই মনে করিত না, কে জানে। টেবিলে বসিয়া পড়িতেছি, সুলোচনা হঠাৎ আসিয়া বইখানা টানিয়া লইয়া গেল, নয়তো পিছন হইতে আসিয়া দুই হাত দিয়া চোখ চাপিয়া ধরিল, নয়তো ভূতের গল্প শুনিবার আবদার ধরিয়া বসিল। পড়িতে দিবে না কিছুতেই ; পড়া থাক, তাহার সঙ্গে ছাদে কে যাইবে? ডলির পুতুলের শুভ-বিবাহ এখনই ছাদে অনুষ্ঠিত হইবে তাহার পুতুলের সহিত—ইত্যাদি। এক-এক দিন এক-এক রকমের ব্যাপার।

কিন্তু প্রকাশদা থাকিলে সুলোচনা এ রকম করিত না। তখন তার অন্য মূর্ত্তি। ধীর, স্থির, বেশি হাসিত না, বেশি বকিত না, কেমন যেন সলজ্জ, সকুণ্ঠ চোখমুখের ভাব, কতদিন দেখিয়াছি।

প্রকাশদা সুলোচনাকে 'সু' বলিয়া ডাকিতেন বলিয়া আমরাও সবাই তাকে 'সু' বলিতাম। একদিন সুলোচনা তাহাতে আপত্তি করিল। শরৎকে বলিল—প্রকাশদা যা বলেন, তোমরাও তাই বলবে কেন? ও নামে ডেকো না, কানে ভাল লাগে না।···আমার বড় রাগ হইল। সুলোচনার চাল-দেওয়া ধরনের কথাবার্ত্তা আমার সহ্য হইত না—আমার মনে হইত মেয়েটি অত্যন্ত গর্ব্বিতা ও চালবাজ। রাগের ঝোঁকে বলিলাম—তাহলে তুমিও আমাদের সঙ্গে মিশতে এসো না। সুলোচনার সহিত আমাদের এ ধরনের খুনসুটি ঝগড়া প্রায়ই চলিত। তবে সে যে সব সময়ে আমাদের বাসায় আসিত তা নয়, মাসের মধ্যে দশ-বারো দিনের বেশি না। প্রকাশদা এখানে যে-যে দিন আসিবেন, এমন দিন ছাড়া সুলোচনার

এখানে আসা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিতাম। সতীশদার প্রতি সুলোচনা যেন তেমন সন্তুষ্ট নয়, অথচ সতীশদা সুলোচনা বলিতে অজ্ঞান ছিলেন। আমার বন্ধু শরৎ বলিত সুলোচনাদের কলিকাতার বাসাভাড়া ও বাসার সমস্ত খরচ নাকি সতীশদা দিতেন। কিন্তু সুলোচনা সতীশদাকে কেন যে দেখিতে পারিত না তাহা কি করিয়া বলিব ?

একদিনের কথা বলি। সেদিন সতীশদা আসিবার কিছু পরে সুলোচনা তাহার মায়ের সঙ্গে আসিয়া হাজির। সুলোচনার মা বলিল—সতীশ, আমাকে দক্ষিণেশ্বরে ঘুরিয়ে আনবে বাবা ? সুলোচনাও বলিল—হ্যাঁ মামা (সতীশবাবুকে সুলোচনা মামা বলিয়াই ডাকিত), চল আমিও যাব।

সতীশদা হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছেন, তাঁহার চোখমুখের খুশির ভাব দেখিয়া তাহাই মনে হইল। উৎসাহের সহিত বলিলেন—হাঁ হাঁ। বরং চল দক্ষিণেশ্বর থেকে আমরা বরানগরে স্বামী অবধূতানন্দের আশ্রম দেখে আসব—সেও বড চমৎকার জায়গা গঙ্গার ধারে।

সুলোচনার মা বলিলেন—তাহলে অমনি পেনেটির দ্বাদশ শিবের মন্দিরও দেখে আসি চল না ?

সুলোচনাও বলিল—বড্ড মজা হয় মামা। একখানা গাড়ী ডাক। সতীশদা গাড়ী ডাকিতে গিয়াছেন, এমন সময় প্রকাশদা আসিয়া পড়িলেন। সুলোচনা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিল তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। তিনি কেন যাইতে চাহিলেন না তাহা আমি জানি না, সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনাও তাহার মাকে বলিল—সে কোথাও যাইবে না, মায়ের ইচ্ছা থাকিলে তিনি একাই যাইতে পারেন। সতীশদা ইতিমধ্যে গাড়ী আনিয়া উপস্থিত করিলেন কিন্তু ঘটনার নূতন পরিস্থিতি দেখিয়া বড নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলেন। প্রকাশদাও সুলোচনাকে যাইবার জন্য যথেষ্ট বলিলেন, এমন কি শেষে রাগও করিলেন, সুলোচনা কিন্তু কিছুতেই গেল না। অবশেষে বেচারী সতীশদার শুধু সুলোচনার মাকে লইয়াই যাইতে হইল। অবশ্য আমার বন্ধুর বাড়ীর মেয়েরা কেউ কেউ সঙ্গে গেলেন—এতগুলি মেয়ে গেল, তবুও সুলোচনা এক পাও নড়িতে চাহিল না।

বছর দুই এইভাবে নানা সুখদুঃখের ঘটনার মধ্য দিয়া কাটিয়া পরে ১৯০৮ সালে আমাদের বাসা উঠিয়া গেল। আমি কলেজের হোস্টেলে আশ্রয় লইলাম। সুলোচনাদের সহিত সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। আমার ছাত্রজীবনের বাকি বৎসরগুলির মধ্যে সুলোচনা বা তাহার মায়ের সঙ্গে চোখের দেখাও নাই একদিনের জন্য। সতীশদাকেও আর কখনও দেখি নাই। ইহাদের না দেখিবার কারণও যথেষ্ট ছিল, পুলিশের চাপেই বাসা উঠাইতে হইয়াছিল।

তবে প্রকাশদার সম্বন্ধে বিশেষ ঘটনা এই যে আমার ছাত্রজীবনের তৃতীয় বৎসরে প্রকাশদা অদ্ভুত ভাবে নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। আর কেহ কোনদিন তাঁহাকে দেখে নাই ; পূর্ব্ববঙ্গের কোথায় স্বদেশী ডাকাতি করিতে গিয়া পুলিশের গুলিতে মারা পড়িয়াছেন, কয়েক বছর পরে বিশ্বস্তসূত্রে একথা শুনিয়াছিলাম।

বছর পাঁচ-ছয় পরের কথা। কলেজ হইতে বাহির হইয়া কলিকাতার বাহিরে চাকুরি করি। কি একটা ছুটি উপলক্ষে হাওড়া স্টেশনে নামিয়া শেয়ালদহ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছি। তখনকার আমলে শেয়ালদহ নর্থ স্টেশন হয় নাই—যেখানে আজকাল নর্থ স্টেশনের সম্মুখে ভাড়াটে গাড়ীর আড্ডা, ওখানে অনেক চা পান শরবত ইত্যাদির দোকান ছিল। একটি দোকানে শরবত খাইতে গিয়াছি, দেখিলাম একটি ছোকরা এবং তাহার সহিত একটি সুবেশা তরুণী সেখানে দাঁড়াইয়া ভাঁড়ে করিয়া শরবত খাইতেছে। দু-একবার গোপনে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম—বয়স বাইশ-তেইশ হইবে—চোখ যেন ফিরানো যায় না তাহার দিক হইতে। না, অপূর্ব্ব রূপসী বটে মেয়েটি!...আমিই শুধু চাহিয়া নাই, আশপাশের অনেকেরই দেখিলাম আমার দশা।

হঠাৎ আমাকে ভীষণ চমকিত ও আশ্চর্য্য করিয়া দিয়া তরুণী আমার একেবারে সামনে আসিয়া হাসিমুখে বলিল—আরে যদুদা যে!

বলিয়াই সে আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। চিনিতে অবশ্য বিলম্ব হইল না, বলিলাম—সুলোচনা যে! কোথা থেকে? তোমার মা কোথায়? কি করছ এখন?

সুলোচনা এ-সব কথার কোন উত্তর না দিয়া সর্ব্বপ্রথম আমায় প্রশ্ন করিল—প্রকাশদার কোন খবর পেয়েছ?

প্রকাশদার মৃত্যুসংবাদ তখন আমি শুনিয়াছি, কিন্তু সেকথা বলিলাম না।

সুলোচনা আমায় ছাড়িতে চায় না, তখনকার পরিচিতদের মধ্যে এ কেমন আছে, ও কেমন আছে, আমার বন্ধু শরৎ এখন কোথায়, তাহার দাদা বিনোদ কি করে, তাহাদের বিবাহ হইয়াছে কিনা—নানা মেয়েলি প্রশ্ন। আমার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল—অনেক-দিন পরে দেখা, খাওয়াও দেখি, চল তো রায় মশায়ের হোটেলে!

সেই পুরানো দিনের মতই নিঃসংকোচ ব্যবহার সুলোচনার; মেয়েমানুষ হইয়াও ছেলের মত ব্যবহার, ধরন-ধারণ, সেই সবই বজায় আছে অবিকল। তবে তাহার পরনে চওড়া জরিপাড় ফিকে নীল-শাড়ি ও ব্লাউজের বাহার, গলায় চিকচিকে সরু চেন ও পেনডেণ্ট, পায়ে রূপালি ব্রোকেডের জুতা, সুগঠিত পেলব সুগৌর হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে সরু-ফিতা বাঁধা হাতঘড়ি প্রভৃতি দেখিয়া মনে হইল সুলোচনার অবস্থা ফিরিয়াছে। সুলোচনার শৌখিনতার প্রতি স্নেহ হইল—এমন সুন্দরী মেয়েরা বেশভূষা না করিবে, সেণ্ট-পাউডার না মাখিবে—তবে সেসব সৃষ্টি হইয়াছে কাহাদের জন্য? সুলোচনার অঙ্গে শাড়ী ব্লাউজ অলংকার উঠিয়া নিজেরাই ধন্য হইয়া যায় নাই কি?

আমি বলিলাম—আরে ছাড় ছাড়, হাত ধরে ওরকম টানাটানি ক'রো না—রায়মশায় কেন, চল ট্রামে ন্যাশনাল হোটেলে যাই কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। কিন্তু সঙ্গের ছোকরাটি বাদ সাধিল, নতুবা সুলোচনাকে লইয়া যাওয়া কষ্টকর হইত না।

ঘড়ি দেখিয়া বলিয়া বসিল—ট্রেনের দেরি নেই, কোথায় যাবে এখন বৌদি? এস, চল

—বাঃ—! এমন কি, মনে হইল যে ছোকরা যেন সুলোচনার উপর জোর খাটাইতেছে। রাগ হইল—কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছ বাপু! সুলোচনাকে আমরা ছেলেবেলা হইতে জানি, তুমি তখন জন্মাও নাই। আজ আসিয়াছ আমাদের সামনে সুলোচনাকে ঘড়ি দেখিয়া টাইম বলিয়া দিতে! সুলোচনা যে খুব ভাল মেয়ে নয়, এ ধারণা আমার পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এখন সে-ধারণা আরও বদ্ধমূল হইল। বেচারী প্রকাশদা! মেয়েদের ভালবাসার এই তো মূল্য। অন্তত সুলোচনার মত মেয়েদের। মনটা অশ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গেল। সুলোচনাকে লইয়া ছোকরা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

সুলোচনা যাইতে যাইতে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—দমদমায় বাসা আজকাল। যেও একদিন—মা আছেন বাসায়। বিস্কুটের কারখানার পিছনে নরেশ পালের বাগানবাড়ী—

বলা বাহুল্য, দমদমার নরেশ পালের বাগানবাড়ী খুঁজিয়া সেখানে যাইবার সুবিধা ও সময় আমার হইয়া উঠে নাই।

• • •

বছরখানেক পরে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব বৎসর ১৯১৩ সালে আমি সন্ধ্যার দিকে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে ট্রাম ধরিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় একখানি ট্রাম আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ দেখিলাম প্রথম শ্রেণীর কামরায় একখানি বেঞ্চিতে সুলোচনা একা বসিয়া আছে। আমি তখনই বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া ট্রামখানাতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিয়া পড়িলাম। সুলোচনা প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়াছিল, পরে আমাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া ভারি খুশী হইল। বলিল—উঃ, যা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে! আমি বলি কে এসে ঝুপ করে পাশে বসে পড়ল রে বাবা।—ভাল? কতদিন দেখা হয়নি—সেই শেয়ালদা স্টেশনে সেবার—দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে চাঁদনির মোড়ে ট্রাম আসিল। সুলোচনা বলিল—নাম এখানে যদু-দা, কুরুশ কাঁটা কিনব আর ছেলেটার জন্তে হর্লিক কিনব। আমি উহার মুখের দিকে আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া আছি দেখিয়া সুলোচনা সলজ্জমুখে বলিল—আজকাল আমার স্বামী এসেছেন যে, আজ প্রায় বছরখানেক। এখন যে রোজগার করছি দু-পয়সা, আসবে বৈকি। এতদিন কেউ খোঁজও নেয়নি।

—আজকাল কি কর?

—বা রে, আজকাল তো ক্যাম্বেলে নার্সগিরি করি। এতদিন নার্সদের হোস্টেলে ছিলাম —এখন স্বামী ফিরে আসতে বাসা করেছি দমদমাতে। সেই আর বছর যখন তোমায় সঙ্গে দেখা তখন থেকে দমদমায় বাসা। এস না আজ, চল—আমার খোকাকে দেখে আসবে এখন—

—না, আজ থাক্, আর এক দিন হবে। চল—চা খাবে সুলোচনা?

—শোন বলি। তুমি হলে গিয়ে খোকার মামা, শুধু হাতে যেন যেও না। ওকে একটা হার কেন দাও না?

আমার বড় রাগ হইল। দম দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইতে সুলোচনা মায়ের মতই পটু হইয়া উঠিয়াছে। আপন মামা হইলেও আজকালকার বাজারে শুধু টাকা দিয়া মুখ-দেখা সারে, আর আমি কোথাকার কে, হার কেন দিতে যাইব? বলিলাম—এখন যাব না তোমার বাসায়। বড় ব্যস্ত আছি।

ট্রাম হইতে নামিয়া আমরা একটা গ্যাসপোস্টের তলায় দাঁড়াইয়াছি, গ্যাসের আলোয় সুলোচনাকে দেখিয়া সত্যই মুগ্ধ হইয়া গেলাম। এ রকম রূপসী মেয়েকে লইয়া কোন চায়ের দোকানে ঢুকিতে সংকোচ মনে হয়—বিশেষত মনে রাখিবেন, ১৯১৩ সালের কলিকাতা, তখনকার দিনে মেয়েরা পথেঘাটে খুব কমই বাহির হইত। হইলও তাই, চায়ের দোকানসুদ্ধ লোক হাঁ করিয়া একদৃষ্টে সুলোচনার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার উপর সুলোচনার মুখে খই ফুটিতেছে কথার। সে চুপ করিয়া থাকিতে জানে না, আমি বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

আমায় বলিল—যাবে না বই কি, ইঃ! ভাগ্‌নের মুখ দেখনি, দেওয়ার ভয়ে বোনের বাড়ী যাবে না—লজ্জা করে না বলতে? যেতেই হবে, আমি নেমন্তন্ন করছি সামনের শনিবারে যাবে, ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

ইহার সব ব্যাপারই রহস্যাবৃত; কোথায় এতদিন ইহার স্বামী ছিল, কোথা হইতে বা আবার আসিল, এ-সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইলেও চাপিয়া গেলাম। তবে সুলোচনা কখনও মিথ্যা বলে না ইহা আমি জানিতাম। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এমন সব অবস্থায় সত্য কথা বলিত যেখানে সত্য বলিলে তাহার নিজেরই ক্ষতির সম্ভাবনা। কাজেই সুলোচনার কথায় আমার অবিশ্বাস হয় নাই।

চা খাওয়া ও উলবোনার কাঁটা কেনার পরে আমি তাহাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে আসিলাম। গাড়ীর কামরায় বসিয়া সে তাহার পাশে বেঞ্চিতে হাত চাপড়াইয়া বলিল—এস, ব'স যদু-দা!

বলিলাম—আজ নয় সুলোচনা—মাপ কর। কাজ আছে।

সুলোচনা অভিমানের সুরে বলিল—না, থাক্ কাজ। এস—আসতেই হবে। কত কথা আছে তোমার সঙ্গে—রাস্তায় দেখা, কি কথাই বা হোল! পুরোনো দিনের কথা আর কার সঙ্গে কইব?

পরে হঠাৎ আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, প্রকাশদার আর কোনও খবর পাওনি?

বলিলাম—নাঃ, কই আর। মনে মনে ভাবিলাম—সে-কথা জেনে তোমার লাভই বা কি এখন।

—বেঁচে নিশ্চয়ই আছেন, তবে পুলিশের ভয়ে লুকিয়ে আছেন বলে মনে হয়। তাঁর কথা যে কইব, এমন আর লোক কই এক তুমি ছাড়া?

—কেন, সতীশদা কোথায়?

—মামা ? মামা বিয়েথা করে দেশে দিব্যি সংসারী হয়ে বসেছে। তার মত মানুষে আর এর বেশি কি করবে। প্রকাশদার মত কি সবাই ?

গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। সুলোচনা বিস্ময়ের সুরে বলিল—সত্যি, আসবে না নাকি যদু-দা ? এস বস।

বলিয়া আমার হাত ধরিতে গেল।

কিন্তু আমার যাওয়া হইল না। যাইবার প্রবৃত্তি হইল না। তা ছাড়া সেই রাত্রেই আমাকে কর্মস্থানে ফিরিতে হইবে—সুলোচনার সঙ্গে গেলে ট্রেন ফেল করি। চাকরি বজায় রাখিয়া তবে অন্য কথা।

তখন কি জানি সুলোচনার সহিত এই শেষ দেখা !

সতের-আঠার বৎসর পূর্ব্বের কথা এ-সব।

৪

সুলোচনার মা পার্কে আসিল।

তাহাকে বাড়ীভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া বলিলাম—এখন বলুন তো, আমি অনেক কথাই জানতাম না আপনাদের সম্বন্ধে। যা জানি, ভাসা-ভাসা ভাবে জানি। সবটা বলুন।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। পার্কে ছেলেমেয়েরা দোলনায় দুলিতেছে, চেঁচামেচি করিতেছে, ঘুগনি চানাচুর কিনিতেছে।

সুলোচনার মায়ের নিকট হইতে নানারূপ জেরা করিয়া যে তথ্যটি উদ্ধার করিয়াছিলাম সেদিন, তাহা যেমন করুণ, জীবনের গভীর অনুভূতির দিক হইতেও তেমনই অপূর্ব্ব। কিন্তু বৃদ্ধার কথায় বলিলে ঠিকমত গুছাইয়া বলা হইবে না। তাই নিজে খানিকটা গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম।—

ওদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। সুলোচনার যখন আট বছর বয়স, তখন ওর বিবাহ হয় পাশের গ্রামে। স্বামীর বয়স তখন ত্রিশ-বত্রিশ, স্বামীর চেহারা ভাল ছিল না বলিয়া ছেলে-মানুষ মেয়ে তার কাছে বড় একটা যাইতে চাহিত না। স্বামী ছিল মূর্খ ও গোঁয়ার প্রকৃতির লোক, আট বছরের স্ত্রীর উপর মারধোর ও নানা রকম অত্যাচার শুরু করে। ফলে ওর মা দেশের জায়গা জমি বিক্রয় করিয়া মেয়ের হাত ধরিয়া কলিকাতায় আসিল—তখন সুলোচনার বয়স দশ বৎসর। উদ্দেশ্য, মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাধীন ভাবে থাকিবার কোন সুবিধা করিয়া দিবে।

কিন্তু তখনকার কালে মেয়েদের লেখাপড়া শেখা বা স্বাধীন জীবিকা উপার্জ্জন প্রভৃতিকে লোকে ভাল চোখে দেখিত না। মা মেয়ের হাত ধরিয়া নানা জায়গায় বেড়াইল। হাতের পয়সা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া গেল—কিন্তু বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। এদিকে আরও নূতন উপসর্গ, মেয়ে অপূর্ব্ব রূপসী, দশ বছরের হইলে কি হয়, তাহাকে দেখায় তের-চৌদ্দ বছরের

মত—দুষ্ট লোকের চোখ পড়িল মেয়ের উপর।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া মা মেয়েকে বলিল—চল আজ গঙ্গায় ডুবে মরব দুজনে—এখানে আর কোনও সুবিধে নেই—এবার মান যাবে। গরিবের কেউ নেই।

মেয়ে তৎক্ষণাৎ রাজী হইল।

রাত নটার সময় মেয়ে বলিল—কখন আমরা ডুবব মা? অন্নপূর্ণার ঘাটে চল যাই।

মা বলিল—এখনও সব ঘাটে লোক। এখন না, দেরি কর—

রাত দশটার সময় মা মেয়ের হাত ধরিয়া বাগবাজারের অন্নপূর্ণার ঘাটে সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—হ্যাঁ রে, পারবি তো? বল আগে থেকে, পারবি তো?

মেয়ে এতটুকু ভয় পায় নাই। সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি সঙ্গে থাকলে মা ঠিক পারব।

সেই সময় যামিনী ঘোষ বলিয়া একটি ছোকরা, আপিসের কেরানী, ঘাটের কাছেই কোথায় বসিয়া হাওয়া খাইতেছিল। সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা এত রাত্রে এখানে কেন? আর ব্যাপারই বা কি? কি বলাবলি করছেন আপনারা? বাসা কোথায় আপনাদের?

যামিনী ঘোষের প্রশ্নের স্বরে বালিকা থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মা সব খুলিয়া বলাতে সে-রাত্রে যামিনী মা ও মেয়েকে নিজের বাসায় লইয়া গেল।

দিন পনের কাটিল মন্দ নয়। যামিনী ছেলেটি খুব ভাল, কিন্তু ইহার এক বন্ধু সম্ভবত যামিনীর মুখে ইহাদের ইতিহাস শুনিয়া একবার দেখিতে আসিল। সেই যে আসিল, আর সে বাড়ী ছাড়িতে চায় না। তার আসা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল। সুলোচনাও সকলের সামনে চিরকাল বাহির হয়, তখন তো আরও ছেলেমানুষ।

ছোকরা মাথার পিছন দিকে চুল ফিরাইত বলিয়া সুলোচনা আড়ালে মার কাছে তাহার নাম রাখিয়াছিল—কাকাতুয়া। একদিন মেয়ে মাকে বলিল—মা, কাকাতুয়া ভারি দুষ্টু। আমাকে গহনার বাক্স দেখিয়ে বলে কিনা—আমার সঙ্গে যাবি? তোকে এই সব গহনা দেব—আমি ওর সামনে আর বেরব না।

মা বলিল,—হতচ্ছাড়া মেয়ে, তুই বা যাস কেন সকলের সামনে? বাড়ীর মধ্যে থাকবি, যার-তার সামনে বেরনো, গল্প করা কি ভাল? আমরা গরিব লোক, আমাদের কত বিপদ জানিস? .

যামিনীর আর এক বন্ধু ছিল, সতীশ রায়। সতীশ মা ও মেয়ের দুঃখ শুনিয়া তাহাদের নিজের বাসায় লইয়া আশ্রয় দিল বটে কিন্তু দিনকতক পরে সেখানেও গোলযোগ বাধিল। সতীশ সুলোচনাকে দেখিয়া পাগল হইল। এমন কি, সতীশের মা সুলোচনা বিবাহিতা জানিয়াও ছেলের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন; সুলোচনার মায়েরও অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুলোচনা একেবারে বাঁকিয়া বসিল। মাকে বলিল—মেয়েমানুষের ক'বার বিয়ে হয়? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে—আমায় আর লেখাপড়া শেখাতে

হবে না তোমায়—তুমি আমাকে আমার শ্বশুরবাড়ী রেখে এস, সেখানে বাঁচি আর মরি। ঢের হয়েছে।

এখানে এই সময় একদিন আসিলেন প্রকাশদা।

প্রকাশদা সতীশের বন্ধু এবং ছাত্রমহলে নাম-করা স্বদেশী। অ্যানার্কিস্ট বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার যথেষ্ট রটিয়াছে তখন পুলিশের কৃপায়। প্রকাশদা সুলোচনার ইতিহাস সব শুনিলেন এবং প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় সুলোচনা বেথুন স্কুলে ভর্ত্তি হইল। প্রকাশদা মাঝে মাঝে তাঁহার পড়াশুনার তত্ত্বাবধান করিতে আসিতেন।

এদিকে সতীশ বড় বিরক্ত করিয়া তুলিল। একই বাড়ীতে থাকা, সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ, সামনে না আসিয়া উপায় নাই। নানারকম দামী জিনিসপত্র কিনিয়া দিতে আরম্ভ করিল—সেন্ট, সাবান, কাপড়-জামা ইত্যাদি। সুলোচনা বলিল—মামা, এ-সব কেন দিস? তুই বড় স্বার্থপর। এ-সব আমি নেব না।

মাকে বলিত—মা, অনেক মানুষ দেখলাম এ বয়সে, প্রকাশদার মত মানুষ এ পর্য্যন্ত আর দেখি নি। অন্য ধাতের একেবারে। উনি মানুষ না দেবতা তাই ভাবি।

সতীশ দিত দামী দামী কাপড়, একবার পূজায় একখানা ভাল বেনারসী শাড়ী দিল। প্রকাশদা দিলেন একজোড়া মোটা স্বদেশী তাঁতের শাড়ী। সুলোচনার কি আহ্লাদ প্রকাশদার দেওয়া সেই মোটা শাড়ী পরিয়া। সতীশদার দেওয়া ভাল শাড়ী সে কদাচিৎ ব্যবহার করিত, কিন্তু মোটা তাঁতের শাড়ী দুখানা পরিয়া রোজ স্কুলে যাইত।

একদিন সে প্রকাশদাকে সতীশের ব্যবহার সব খুলিয়া বলিল। প্রকাশদা বলিলেন—এখানে তোমাদের আর থাকা উচিত না। তোমার লেখাপড়া এখানে থাকলে কিছু হবে না, অন্য জায়গায় বাসা কর, খরচ যা হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।

সুলোচনার এক দূরসম্পর্কের ভগ্নীপতি কানাই ধরের গলিতে সস্ত্রীক বাসা করিয়া থাকিত। সুলোচনারা সেই বাসায় উঠিয়া আসিল। আসিবার সময় সুলোচনা প্রকাশদার দেওয়া মোটা শাড়ী পরিয়া, সতীশের দেওয়া দামী কাপড় জামা সেখানেই রাখিয়া আসিল। সতীশ এই ব্যাপারে দিনকতক নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রকাশদার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়িয়া দিল। মা মেয়েকে বলিল—কেন সতীশকে অমন করে চটিয়ে দিলি? ওর মনে কষ্ট দেওয়া হল না?

সুলোচনা বলিল—কষ্ট না পেলে মামার জ্ঞান হবে না মা। তা ছাড়া, দেখছ না, আমাদের জন্যে ও সর্ব্বস্বান্ত হতে বসেছিল, ওর দেওয়া জিনিস আর নেব না।

তা সত্ত্বেও সতীশ ওদের নূতন বাসায় যাতায়াত করিত, জিনিসপত্রও দিতে ছাড়িত না। সুলোচনা বলিত—মামা, আবার কেন আসিস? তুই বড় স্বার্থপর—স্বার্থের জন্যে সব করিস বলে আমার ভাল লাগে না। দেখ দিকি প্রকাশদাকে?

একদিন সতীশ বলিল—আচ্ছা, আমি কি করলে তুই খুশী হবি সুলোচনা? বল, আমি তাই করব।

সুলোচনা বলিল—তুই বিয়ে কর মামা। খুব খুশী হব তাহলে। আমায় যদি সন্তুষ্ট করবার তোর ইচ্ছে থাকে, খুব শীগ্‌গির একটি ভাল মেয়ে দেখে বিয়ে করে ফেল।

নূতন বাসায় প্রকাশদা কিন্তু বেশি আসিতেন না এবং আসিতেন না বলিয়াই আমাদের বাসায় যেদিন প্রকাশদার আসিবার কথা থাকিত, সেদিন সুলোচনা এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা করিত।

এই সময় আলিপুর বোমার মামলা আরম্ভ হইল। কি করিয়া প্রকাশদা ইহার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন সে-কথা সুলোচনার মা আমায় বলিতে পারে নাই। প্রকাশদা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত রহিলেন। সুলোচনা বড় ব্যস্ত হইয়া ছটফট করিত বলিয়া তাহার মা একদিন কলেজে খোঁজ করিতে গিয়া জানিল কলেজেও প্রকাশদা বহুদিন যাবৎ অনুপস্থিত।

ছ মাস পরে প্রকাশদা হঠাৎ একদিন এক হাঁড়ি রসগোল্লা হাতে ওদের বাসায় আসিয়া হাজির। সুলোচনা তো খবর পাইয়াই ছুটিতে ছুটিতে বাহিরের ঘরে আসিল। বলিল—কোথায় ছিলে প্রকাশদা এতদিন? চেহারা এমন হয়েছে কেন তোমার।

প্রকাশদা বলিলেন—সে কথা জিজ্ঞেস করিস কেন সু। তা ছাড়া, এই শেষ। আমি স্বদেশীর আসামী, পুলিশ পেছনে ঘুরছে—আর আসতে হয়তো পারব না। যাবার সময় একটা কথা জিজ্ঞেস করে যাই—হয়তো আর দেখাই হবে না—সু, তুই আমায় কখনও ঘৃণা করবি নে বল?

সুলোচনা বলিল—তোমাকে অনেক ভালবাসি প্রকাশদা। যদি স্বামী না থাকত, তবে তোমার আরও নিকটে আসতুম। পা ছুঁয়ে বলছি—তা না হলে তোমার এই বিপদের সময়ে তোমার সঙ্গে চলে যেতুম।—একলা যেতে দিতুম না।

বলিয়াই সে কাঁদিয়া ফেলিল।

সুলোচনার মা আমায় বলিল—মেয়ে আমার কখনও কাঁদত না। এই অনেকদিন পরে কাঁদল। যাবার সময় প্রকাশকে কড়ার করিয়ে নিলে বিপদ উদ্ধার হলেই আবার ফিরে এসে সকলের আগে ওর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু প্রকাশ সেই যে গেল, আর কখনও ফিরে আসে নি।

আমি বলিলাম—তার পর? আপনাদের কি হল?

—তার পর প্রকাশ তো চলে গেল। শোন সব কথা, বিশ্বাস করবে না হয়তো। এই কলকাতা শহরে সেই পোড়ারমুখী মেয়ের আগুনের মত রূপ নিয়ে সে কি কষ্ট, কি বিপদ গিয়েছে আমাদের! দেখেছিলে তো তাকে?

দেখিয়াছিলাম বই কি। আবার এই প্রায় কুড়ি-বাইশ বছর পরে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অপরাহ্ণের মৃদু স্তিমিত রৌদ্রালোকে সুলোচনার সেই অপূর্বসুন্দর কিশোরীমূর্ত্তি স্পষ্ট মনের চোখে ফুটিয়া উঠিল। তার সেই ডাগর ডাগর চোখ, ঘন-কালো চুলের রাশি···কথার সেই ভঙ্গি ··চমৎকার মুখের হাসি···সর্ব্বোপরি তার অনিন্দ্য মুখশ্রী···

তখন সুলোচনাকে বুঝি নাই, চিনি নাই—অভিজ্ঞতার অভাবের দরুন সুলোচনাকে সে

সময় চরিত্রহীনা, উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মেয়ে বলিয়া ভাবিয়াছি। শুধু আমি নই, আমার বন্ধুর বাসায় মেয়েরা সুলোচনা সম্বন্ধে এই মন্তব্যই হৃদয়ঙ্গম করিত। আমিও বিশ্বাস করিতাম। মনে মনে পরলোকবাসিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

সুলোচনার মা বলিল—মেয়ে রোজ কাঁদে প্রকাশ চলে যাওয়ার পরে। জানলা খুলে চেয়ে থাকে। সতীশকে দু-চোখে দেখতে পারে না। এদিকে যে বাসায় আমরা ছিলাম, তারা ঠিকমত টাকা দিতে না পারাতে আমাদের রাখতে চাইলে না। কালীঘাটে আমরা উঠে গিয়ে ছোট্ট একটি খোলার ঘরে আশ্রম নিলাম। একদিন সেখানে এল কোথাকার রাজার ম্যানেজার—দশ হাজার টাকার লোভ দেখালে। মেয়ের গা সোনায় মুড়ে দেবে। মেয়ে বললে—মা, চুলগুলো কেটে ফেলি, নয়তো আর পারি নে। আমি বাড়ী নেই, গুণ্ডার দল বাড়ী ঘিরে ফেলেছে—বললে বিশ্বাস করবে না—এই কালীঘাটে, ইংরেজ-রাজত্বের মধ্যে! মেয়ে মাথায় কেরোসিন তেল ঢেলেছে—চুলে আগুন জেলে মরবে। এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম —লোক-ডাকাডাকি করলাম, গুণ্ডার দল পালাল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সতীশদা যেত না বাসায়?

—যেত, টাকা দিয়ে আসত আমার হাতে মেয়েকে লুকিয়ে। মেয়েও বড্ড নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে সতীশের সঙ্গে। একটা মুখের ভাল কথাও ইদানীং বলত না। আগে আগে ওর চিঠির এক-আধখানার উত্তর দিত—শেষে তাও বন্ধ করে দিলে। আমায় বলত—না মা ওকে আসতে দিও না। ও যে সর্ব্বস্বান্ত হল আমাদের দিয়ে। কুকুরের মত আমরা ওর টাকা খাচ্ছি কেন? ও বিয়ে-থাওয়া করবে না আমাদের না ছাড়লে।

এই সময় পাড়ার এক সহৃদয় প্রৌঢ় ডাক্তার নিজে চেষ্টা করিয়া সুলোচনাকে মেডিকেল কলেজে নার্সের কাজ শিখিবার জন্য ভর্ত্তি করিয়া দিলেন—পাশ করিয়া প্রথমত সেই ডাক্তারের ডাক্তারখানাতেই কাজ পায়। কিছুদিন সেখানে কাজ করিবার পরে একদিন মাকে আসিয়া বলিল—মা, এ জগতে সব সমান। ওখানে আর আমার কাজ করা চলবে না। ছেড়ে দিয়ে এলুম।

মাস-দুই পরে ক্যাম্বেল হাসপাতালে কাজ জুটিল। তখন ওদের পটলডাঙায় বাসা। মা ক্যাম্বেলের গেট থেকে রোজ রাত এগারটার সময় মেয়েকে বাসায় আনে সঙ্গে করিয়া। তাহার মধ্যেও বহু বিপদ গেল। ক্যাম্বেলের নার্স সুলোচনার রূপের খ্যাতি তখন চারিদিকে ছড়াইয়াছে, ছাত্রমণ্ডলীর অনেকের বাসন্তী প্রেমের-স্বপ্ন সে—কত প্রলোভন তাহাকে যে প্রতিদিন এড়াইয়া চলিতে হইত! গুণ্ডার হাতে পড়িতে পড়িতে কতদিন বাঁচিয়া গিয়াছে। একদিন মাকে বলিল—প্রকাশদা ফিরে এসে এ রকম দেখে খুশী হবে না। সে দেখে অসন্তুষ্ট হয় এমন কাজ কখনও করব না। তুমি আলাদা ছোট বাসা কর—আমি ক্যাম্বেলে নার্সদের হোস্টেলে যাই।

তাহাই হইল। হোস্টেলে দুজনের নাম দিল যারা দেখা করিতে পারিবে—স্বামীর ও প্রকাশদার—আশা ছিল প্রকাশদা একদিন হঠাৎ আসিয়া পড়িবেই।

সুলোচনার মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা, কখনও এর পরে প্রকাশদার পত্র-টত্র আসত না ?

বুড়ী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—কখনও না। মেয়ে প্রকাশদা বলতে অজ্ঞান। ভাবত, প্রকাশ আসবে ফিরে। আমায় কতদিন বলেছে এ-কথা। প্রকাশ দেখে খুশী হবে বলেই তো দমদমায় অতিথিশালা খোলা হল ওর স্বামীকে নিয়ে এসে।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—অতিথিশালা! সে কি রকম ?

—মেয়ের খেয়াল! এদিকে প্রকাশের নাম ক্যাম্বেলের হোস্টেলে লেখানো, ওদিকে দমদমার অতিথিশালা খোলা প্রকাশকে খুশী করবার জন্যে—প্রকাশ তখন মরে ভূত হয়ে গিয়েছে।

—ওর স্বামীকে আনলেন বুঝি আবার ?

—আমরা আনি নি বাবা। ক্যাম্বেলে একজন রুগী এসেছিল সুলোচনার শ্বশুরবাড়ীর গাঁ থেকে। সে গিয়ে খবর দিলে। স্বামী এসে পড়ল, মাপ চাইলে—আমরাও জায়গা দিলাম এই ভেবে যে স্বামী ভিন্ন বাইরে পদে পদে বিপদ। স্বাধীন হয়েও রূপ নিয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত। কেউ মিত্র নেই, সবাই শত্রু। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। ওর স্বামীকে নিয়ে দমদমায় বাসা করা গেল। যে যায় সেই খায়, তাই নাম হল অতিথিশালা।

আমার সঙ্গে এই সময়েই সুলোচনার দেখা হইয়াছিল। সে-কথাও আমি বৃদ্ধাকে বলিলাম।

বৃদ্ধা বলিল—তোমার কথা বলেছিল এখন আমার মনে হচ্ছে বাবা। তার পর ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাক্‌টিস করতে লাগল। বেশ দু-পয়সা আয় হল। দুটি ছেলে হল। জামাইয়ের এক কাঁড়ি দেনা ছিল দেশে, সব ও শোধ দিলে। সেই সময় একদিন কে এসে বললে দমদমার বাসায়—প্রকাশ মারা গিয়েছে। শুনেই মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে গেল—সেই থেকে বুকের রোগ। তাতেই শেষে মারা গেল। খবরটা শোনার পর মোটে ছটি মাস বেঁচে ছিল।

দুজনেই অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

বৃদ্ধা অন্যমনস্কভাবে বলিল—সন্ন্যিসি হয়ে যাব বলে আপদ বিদেয় করবার জন্যে আট বছর বয়েসে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম। সে কোথায় চলে গিয়েছে আজ, আমি এই পঁয়ষট্টি বছর বয়েসে এখনও ভুগছি বন্ধনে। সে স্বামীকে ভাল করলে, তাকে মদ ছাড়ালে, মানুষ করলে—করে মরে গেল। জামাইও মারা গিয়েছেন। এখন আমি যদি মরে যাই ছেলে দুটো নিরুপায়। কোথায় দাঁড়াবে! রাস্তায়—গবর্নমেন্টের রাস্তায়!

আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ইদানীং আমাদের বড় সুখ হয়েছিল। সে তুমি দেখ নি। খাট, আলমারী, বাসন,—সুলোচনা প্র্যাক্‌টিসে বেশ রোজগার করত—টাকা জমিয়ে এ-সব করেছিল। শৌখিন ছিল খুব, সে তুমিও তো দেখেছ। ময়লা কি কুশ্রী জিনিস দু-চোখে দেখতে পারত না। হ্যাঁ, ভাল কথা মনে পড়ল—জামাইয়ের হাতে অনেক টাকা পড়ল মেয়ে মারা যাওয়ার পরে। জামাই তেজারতি করতে গিয়ে হাওড়ায় জমি বন্ধক রেখে দু হাজার

টাকা ধার দিয়েছিল—তার পরে সেও তো মরে গেল। হ্যাণ্ডনোটখানা এখনও আছে, হ্যাঁ বাবা, তাতে কিছু হয় ?

বুড়ীকে বলিলাম, চোদ্দ বছর পরে সে হ্যাণ্ডনোটে আর কিছু হইবে না। রাখিয়া ঘরের জঞ্জাল বৃদ্ধি ছাড়া অন্য কোন সার্থকতা তার নাই।

হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়িল। বলিলাম—আচ্ছা, ওর সঙ্গে একটা ছোকরাকে বেড়াতে দেখেছিলাম। সে কে জানেন ?

বুড়ী বলিল—শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা তো ? বছর বাইশ বয়েস ? ও তো তার দেওর। পুস্নর জ্যাঠতুত ভাই—দমদমার বাসায় থেকে পড়ত।

আমার কতদিনের ভুল ভাঙিয়া গেল। কি অবিচার করিয়াছি সুলোচনার প্রতি!

সুলোচনা যে-যুগে বাহিরে চলাফেরা করিত, সে যুগে মেয়েদের অমন ভাব কেহ পছন্দ করিত না বলিয়াই তাহার নামে নানা কথা উঠিয়াছিল। সেই তরুণীর সচেতন অন্তরাত্মা যাহাকে ভালবাসিয়াছিল, তাহারই একনিষ্ঠ ধ্যানে সে দিনের পর দিন বৃথা অপেক্ষা করিয়া মরিত আশার কুহকে।

ক্যাম্বেলের সামনে দিয়া ট্রামে যাতায়াত করিবার সময় অভাগী সুলোচনার কথা আজকাল বড় মনে পড়ে।

বেচারী

কলিকাতায় বোমার হাঙ্গামা উপলক্ষে বহুদিনের কলিকাতা-বাস ত্যাগ করিয়া সপরিবারে গিয়া ভগ্নীপতির বাড়ী আশ্রয় লইয়াছি।

একেবারে অজ পাড়াগাঁ। রেল স্টেশন হইতে সাত ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া অথবা গরুর গাড়ীতে গেলে গ্রামে পৌঁছানো যায়। ভগ্নীপতিদের মেটে বাড়ী, তাহাদেরই স্থান সঙ্কুলান হয় না; তবে বিপদের দিনে, আপাতত বোমায় মরিতে বসিয়াছি দেখিয়া তাহারা নিজেদের অসুবিধা করিয়াও বাহিরের ঘরখানি আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিল। আমরা গরুর গাড়ী হইতে নামিতেই দেখি বাহিরের ঘর হইতে তিনটি তোরঙ্গ, একটি বড় বিছানা, গোটা দুই পুঁটুলি স্থানান্তরিত হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম আমার ভগ্নীপতির মেজভাইয়ের শ্যালীপতি-ভ্রাতাও সপরিবারে ইছাপুর না দমদম হইতে সপ্তাহ খানেক পূর্ব্বে আসিয়া এখানে আশ্রয় লইয়াছেন এবং বাহিরের ঘরে তাঁহারাই ছিলেন। বাড়ীর মধ্যে রান্নাঘরের পাশে যে নাতিক্ষুদ্র ভাঁড়ার ঘর আছে, আপাতত সেখানাতেই তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইল।

বহুদিন কলিকাতার বাসা করিয়া আছি, বাড়ী করিবার সঙ্গতি অবশ্য নাই। সঙ্গতি ছিল না এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম, জাপানী বোমার ঘায়ে সে বাড়ী কতক্ষণ টিকিত ? আমার যে-সব বন্ধুবান্ধবকে কলিকাতায় বাড়ী করিবার জন্য এতদিন হিংসা করিতাম, আজ তাহাদের

প্রতি সে হিংসার ভাব করুণা ও সহানুভূতিতে পরিণত হইয়াছে। বেচারীদের পয়সাগুলা অনর্থক নষ্ট হইল।

দু একদিন কাটিয়া গেল।

চারিদিকে চাহিয়া দেখি গ্রামের মধ্যে ভীষণ জঙ্গল, খানা ডোবা বাঁশবন। শীতের শেষ, স্ত্রী একদিন আমায় আসিয়া বলিলেন, ওগো, কত চালতে পড়ে আছে বনের মধ্যে, দেখবে এস—

আমার স্ত্রী শহরের মেয়ে। পাড়াগাঁয়ের বনে বাগানে পাকা চালতে শীতকালে পড়িয়া থাকা বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়, তাহা না বলিয়া তাঁহার আনন্দটাকে আরো ঘনীভূত হইবার অবকাশ দিবার জন্য দুজনে বনের দিকে ছুটিয়া গেলাম।

—ওই দেখ এসে, ঢোক এই বনের মধ্যে।

—ওঃ তাই তো! এ যে অনেক দেখছি!

—এক একটা চালতের দাম কলকাতায় দু পয়সা—আর দেখ এখানে কিনতে হয় না। কুড়িয়ে নেব—হ্যাঁগো, কেউ কিছু বলবে না তো?

—কে আবার কি বলবে। বাগানে চালতে পড়ে আছে, কুড়িয়ে নেবে তা কে কি বলবে এসব পাড়াগাঁয়ে।

এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন—ও কে গো?

চাহিয়া দেখি একটি বাইশ-তেইশ বছরের যুবক একটা ঝুড়ি হাতে ওদিক হইতে বন ঠেলিয়া গাছতলায় সম্ভবত চলিতে কুড়াইতে আসিতেছে। আমাদের দুজনকে দেখিয়া সে একটু সমীহ করিয়া থমকিয়া পড়িল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলাম—চালতে গাছ কি তোমাদের? দুটো চালতে কুড়ুচ্ছি কিন্তু—

যুবক হাসিয়া বলিল—ইউ যে টেক, নট মাই ট্রি।

তাই তো, এ দেখিতেছি ইংরেজি-জানা লোক, নিতান্ত গ্রাম্য লোক নয় তাহা হইলে। যদিও আমার সঙ্গে ইংরেজি বলার সার্থকতা কি তাহা বুঝিলাম না।

বলিলাম—আপনার বাড়ী এখানেই বুঝি?

—নো, আই ওয়াজ এ ক্লার্ক য়্যাট ক্যালকাটা, নাউ আই য়্যাম হিয়ার।

—বেশ বেশ, তাহলে আমাদের মতই অবস্থা দেখছি। জাপানী বোমার ভয়?

যুবক হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল, হাঁ না কিছুই বলিল না।

বৈকালের দিকে ছোকরার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ হইল। জানিলাম, তাহার নাম সুরেশ। আমার ভগ্নীপতির বাড়ীর পাশে যে মুখুজ্যেবাড়ী, সে সেই বাড়ীর রাসু মুখুজ্যের শ্যালক। মুখুজ্যেবাড়ীর অন্যান্য লোকে কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন স্থানে চাকরি করে, কখনও বাড়ীঘরে না আসার দরুন পৈতৃক সুবৃহৎ দোতলা বাড়ী ভাঙিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, বর্ত্তমানে সেই বাড়ীর রাসু মুখুজ্যেই গবর্নমেণ্টের দপ্তরখানায় কেরানীগিরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বাড়ী আসিয়া তিন বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। গোটা

পঞ্চাশেক টাকা পেনশন পান বলিয়া দেশে আছেন, নতুবা কলিকাতায় বাসা করিতেন।

বলিলাম—তুমি কি এই তিন বছরই এখানে আছ ?

—হ্যাঁ দাদা। হোয়ার শ্যাল আই গো ? এখন চাকরি নেই কিনা। তবে শীগগিরই হবে।

—বেশ বেশ, খুব ভাল। তোমাদের দেশ কোথায় ?

—দেশ ছিল ক্যালকাটার পাশেই—ইয়ে রাজবল্লভপুর, টালিগঞ্জের ওদিকে। এখন সেখানে কেউ নেই। মা এখানেই থাকেন, দিদি আছেন। আমিও এখানেই এখন আছি, তবে আই হোপ, এই মার্চ মাসেই আই উইল সিকিওর এ সার্ভিস। আই অ্যাম এ ম্যাট্রিক পাস্‌ড্‌।

—বাঃ, খুব ভাল।

ছোকরার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে বেশ একটু কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। বেশ চেহারা, মাথায় চেরা সিঁথিটি যত্নে তৈরি করা, পরনে আধময়লা ধুতি, গায়ে গেঞ্জি, বোধ হয় কিছুক্ষণ আগে বিড়ি টানিতেছিল, আমায় দেখিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, কারণ বিড়ির ধোঁয়ার গন্ধ বাতাসে।

—আপনি বুঝি সার, ক্যালকাটাতেই—

—হ্যাঁ, আমার কর্ম্মস্থান কলকাতাতেই ছিল, স্কুলে মাস্টারি করতাম। এখন স্কুল সব বন্ধ, তাই এখানে—

—আপনি কি পাশ সার ?

—এম এ পাশ করেছিলাম।

ছোকরা বিনয়ে সম্ভ্রমে কাঁচুমাচু হইয়া বলিল—দেন্ ইউ আর এ কাল্‌চার্ড ম্যান সার—ভারি খুশী হলাম আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে। আই অ্যাম ওন্‌লি ম্যাট্রিক পাস্‌ড্‌—কিন্তু দেখুন সার, লেখাপড়া আমি বড় ভালবাসি।

—সে তো খুব আনন্দের কথা। ভদ্রলোকের ছেলে, হবারই তো কথা।

—প্রেন্টিস সাহেব দাদাবাবুদের বড়সাহেব। একদিন দাদাবাবুদের আপিসে গিয়ে চুপ করে বসে আছি, প্রেন্টিস সাহেব যাচ্ছে বারান্দা দিয়ে। জানেন তো সার, প্রেন্টিস সাহেব, চিফ সেক্রেটারি টু দি গভর্নমেণ্ট অব বেঙ্গল—কি চেহারা! গটমট করে যাচ্ছে কি—সাহেব বাচ্চা! দাদাবাবুর ঘরের সামনে দিয়ে গেল একেবারে। দেখেছেন প্রেন্টিস সাহেবকে দাদা ?

—না।

—মস্তলোক প্রেন্টিস সাহেব। দেখুন, কত বড় বড় লোকের সঙ্গে মিশে এসেছি, এখন এই পাড়াগাঁয়ে যত সব আনকাল্‌চার্ড লোকের সঙ্গে মেশা—আই ডু নট লাইক ইট।

যদিও বুঝিলাম না সে প্রেন্টিস সাহেবের সঙ্গে মেলামেশা কি ভাবে এবং কখন করিল, তবুও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া বলিলাম, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

বাড়ীতে আসিয়া স্ত্রীর কাছে সব বলিলাম। স্ত্রী বলিলেন—আহা, ছোকরাটি ভাল, এখানে ভগ্নীপতির বাড়ী পড়ে আছে কেন ? অল্প বয়েস—চাকরি করে না কেন ?

—বেকারের সংখ্যা তো জান না দেশের! কত বি এ, এম এ, ফ্যা-ফ্যা করছে এ বাজারে —ও তো সামান্য ম্যাট্রিক, ওকে চাকরি দিচ্ছে কে।

দিনকতক কাটিয়া গেল। একটি জিনিস খুব কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিলাম, পাড়াগাঁয়ে লোকে সময় কি করিয়া কাটায়। এসব নির্জ্জন পল্লীগ্রামে সময় কাটানো যে রুত কষ্টকর তা যাঁহার অভিজ্ঞতা নাই তিনি বুঝিবেন না। কলিকাতা হইতে আসিয়া নিতান্তই কষ্টে পড়িয়াছিলাম, অথচ দেখিলাম পেন্‌শন-প্রাপ্ত রাসু মুখুজ্যে সকালে উঠিয়া একখানা ন-হাতি কাপড় পরিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখস্থ জঙ্গল পরিষ্কার করিতেছেন, মানকচুর চারা এখান হইতে ওখানে পুঁতিতেছেন, মাঝে মাঝে তামাক খাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়া বলিলেন—নিতুবাবু যে? কোথায় চললে?

—যাব আর কোথায়! আপনাদের গ্রামে মোটে তিনঘর ভদ্রলোক, কার বাড়ী গিয়েই বা বসি?

—এস এস, আমার এখানে একটু বস। তামাক খাও?

—আজ্ঞে না।

তিনি আমার পাশে আসিয়া বসিলেন এবং কি করিয়া বাড়ীর পিছনের জমিতে আর-বছর কুমড়া লাগাইয়াছিলেন, এবার মানকচু কি রকম পুঁতিয়াছেন—এই সকল গল্প কিছুক্ষণ করিয়া আমায় বলিলেন—চা খাবে? ও সুরেশ—

রাসু মুখুজ্যের শ্যালক আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে দুজনের জন্য চা আনিতে বলিয়া আমায় বলিলেন—এই গ্রামে ধর পঁচিশ বছর পরে এসে আজ তিন বছর বাস করছি—তা আছি বেশ। ঝঞ্ঝাট নেই—খাঁটি দুধটুকু বাড়ীর গরুর—

পল্লীগ্রামের সুখ-সুবিধার নানারূপ গল্প করিতে করিতে চা আসিয়া গেল।

ছোকরা চা দিয়া বলিল—গুড় আর চিনি নেই, দিদি বলে দিলে।

রাসু মুখুজ্যে কর্কশকণ্ঠে বলিলেন—নেই তা নিয়ে এস গে না বাজার থেকে···আমায় বলতে এসেছেন চিনি নেই! যাও, বাজার থেকে এনে রাখ। তোমার দিদির কাছ থেকে পয়সা নাও গে যাও—কুড়েমি আমি একেবারে দেখতে পারি নে।

ছোকরা মুখ কাঁচুমাচু করিয়া চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই দুইটি তেলের ভাঁড় আর একটা ছোট থলের প্যাকেট লইয়া আমাদের সামনে দিয়াই, বোধ হয় বাজারেই চলিল। বেলা প্রায় দশটা বাজে, নেউলের বাজার এখান হইতে যাতায়াতে সাত মাইল পথ—রাসু মুখুজ্যে যে তাঁহার শ্যালকটির উপর যথেষ্ট স্নেহশীল নহেন, তাহা এই ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পারিলাম।

সন্ধ্যাবেলা দু ধারে জঙ্গলাবৃত সরু পথে একটু পায়চারি করিতেছি, রাসু মুখুজ্যের শ্যালক পিছন হইতে বলিল—সার?

—এই যে সুরেশ! খবর কি?

—ভাল লাগে না সার একটুও এখানে। আসুন কোথাও বসে গল্প করা যাক। আসুন আমার সঙ্গে।

কিছুদূর গিয়া একটা চারিদিক খোলা চালাঘর।

ছোকরা বলিল—এই হল গাঁয়ের বারোয়ারী ঘর, অর্থাৎ টাউন হল।

—ও

—দেখুন তো যত সব চাষার কাণ্ড! এমন গাঁয়ে ভদ্রলোক থাকে?

—তা তো হল, এখানে বসবে নাকি? কি পেতে বসবে এখানে?

—দাঁড়ান, নবীনের বাড়ী থেকে দুটো বিচুলি নিয়ে আসি। তা ছাড়া আর কি পাতি বলুন।

কিছুক্ষণ পরে ছোকরা বিচালি হাতে ফিরিয়া বলিল, একটু চায়ের বন্দোবস্ত করে এলাম। নবীনের বাড়ী বলে এলাম—এখুনি করে দিয়ে যাবে। ওরা জাতে কাপালী। আপনি যেন দাদাবাবুকে বলবেন না গিয়ে। দাদাবাবু বড় বকে! আচার-বিচের খুব কিনা? বড্ড গোঁড়া—ভেরি অর্থোডক্স।

বলিলাম—ও।

ছোকরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া হঠাৎ কোনও কথা মনে পড়িবার ধরনে বলিল—আমি আজ পাড়াগাঁয়ে আছি বটে, কিন্তু দাদা বড় বড় লোকের সঙ্গে—আচ্ছা আপনি ল্যাম্বেথ সাহেবকে চিনতেন? আমি তাঁকে ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবে দেখেছি সাত হাতের মধ্যে। জে. সি. ল্যাম্বেথ, ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল অফিসার ছিলেন, ইদানীং ডি আই জির পার্সোনাল য়্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছিলেন—সাড়ে সাত শ টাকা মাইনে।

সবিস্ময়ে বলিলাম—বল কি! সাত হাতের মধ্যে? পুলিশ ক্লাবে কি জন্যে গিয়েছিলে?

অতীত গৌরবের দিনের স্মৃতি মনে পড়াতে মানুষের মুখে যে আনন্দের রেখা ফুটিয়া ওঠে, ছোকরার সারা মুখমণ্ডলে তাহা পরিস্ফুট হইতে দেখিলাম। সে স্বপ্নভরা চোখ আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল—কুণ্ডু য়্যাণ্ড সন্স কেটারার ছিল পুলিশ ক্লাবের য়্যানুয়েল গ্যাদারিংএ; কুণ্ডুদের বড় ছেলে হরিচরণ আমার বুজম্ ফ্রেণ্ড কিনা! তারা একখানা করে কার্ড দিত, এতবড় কার্ড, সোনার জলে নাম লেখা। আমি দু বার গিয়েছি। গ্র্যাণ্ড হোটেলে গ্যাদারিং হত। আমি প্লেটে কেক দিতে গেলাম, আমায় হিউজেস বললে—নো মোর, থ্যাঙ্ক ইউ!

—হিউজেস সাহেব আবার কে?

—জোসেফ হিউজেস, ম্যাক-আর্থার কোম্পানির বড়সাহেব—ওই যে ক্লাইভ স্ট্রীটে পাঁচতলা মস্ত বড় বিল্ডিং—সাত শ ক্লার্ক খাটে তার আণ্ডারে। এই গোঁফ, চোখ দুটো দেখলে ভয় করে, বাঘের জাত। সে কিন্তু কেমন হেসে বললে—নো মোর, থ্যাঙ্ক ইউ। আচ্ছা, ওরা এমনি খুব ভদ্রলোক, কি বলেন?

—নিশ্চয় নিশ্চয়, বাঃ—

ছোকরার কিন্তু আমার উত্তরের দিকে আদৌ মন ছিল না, সে অন্যমনস্কভাবে পূর্ব্ববৎ স্বপ্নময় চোখে বলিয়া চলিয়াছে। একবার রামনগরের মহারাজা কাউন্সিল হাউস হইতে বাহির হইতেছেন, সে কোন্ বারান্দার দুয়ারে দাঁড়াইয়া ছিল, একেবারে তাহার গা ঘেঁষিয়া মহারাজা চলিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ মহারাজের হাতের সোনা-বাঁধানো বেতের গুঁতা তাহার গায়ে সামান্য ভাবে লাগিতেই খোদ মহারাজা স্বয়ং তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিলেন—ও, আই য়্যাম সো সরি!—আজও তাহার কানে কথাগুলি লাগিয়া আছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—সেখানে কি জন্যে গিয়েছিলে?

—বা রে, দাদাবাবু তো সেখানেই টাইপিস্ট ছিলেন, দেখা করতে গিয়েছিলাম যে ওঁর সঙ্গে।

বলিলাম—বাঃ, তুমি তাহলে তো অনেক বড় বড় লোক দেখেছ!

ছোকরা উৎসাহের সুরে বলিল—তা আপনার আশীর্ব্বাদে সার, অনেক দেখেছি। আজই পড়ে আছি এই অজ পাড়াগাঁয়ে। আই হ্যাভ সীন মেনি মেনি বিগ পিপ্‌ল্—সেই জন্যে আমার ভাল লাগে না এসব জায়গা।

এই সময় একটি বিধবা স্ত্রীলোক একখানা কাঁসার থালায় দু পেয়ালা চা সাজাইয়া আনিয়া আমাকে দেখিয়া একটু সঙ্কোচবোধ করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোকরা বলিল—এস না, দিয়ে যাও। ইনি পশুপতিবাবুর আত্মীয়। লজ্জা নেই, নিয়ে এস।

তবুও মেয়েটি না নড়াতে আমি বলিলাম—তুমি গিয়ে নিয়ে এস।

চা খাইতে খাইতে সুরেশ বলিল—আমার একটু ভাল লোকের সঙ্গে কথা বলবার ঝোঁক আছে চিরকাল। তা এই সব জায়গায় আপনি কোথায় পাবেন বলুন। সব মুখ্যু, নো ওয়ান ইজ ইভ্‌ন্ ম্যাট্রিক পাস্‌ড্। দুটো ভাল কথা বলি এমন মানুষ নেই। মন যেন কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে।

—সময় কাটাও কি করে?

—বাড়ীর কাজ করি। বাজারে যাই, নবীনদের বাড়ী এসে মাঝে মাঝে বসি। তা নবীন বরং ভাল, দুটো ভাল কথা শুনতে চায়। ওকে সেদিন বললাম, তোরা এখানে কেমন করে থাকিস? আমি দেখেছি কলকাতায় বড় বড় লোকের বাড়ী আলাদা নাইবার ঘর আছে, তাকে বাথ-রুম বলে। গরম জল, ঠাণ্ডা জল। মেদিনীপুরের জমিদারের রডন স্ট্রীটে যে বড় বাড়ী আছে দেখেছেন? একবার আমি তাঁদের বাড়ী গিয়েছিলাম আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। দোতলায় বাথ-রুম। বাড়ীখানা কি! বাথ-রুমে একখানা আয়না আছে, সমস্ত শরীর একসঙ্গে দেখা যায়. মেঝেতে আপনি কেন মুখ দেখুন না, এমনিই সুন্দর করে পালিশ করা। সকালবেলা গিয়েছিলুম, বাবুর জন্যে খাবার গেল—চেয়ে চেয়ে দেখলাম, ডিম সেদ্ধ, টোস্ট আর দুটি রসগোল্লা, দুটো কলা। আমাদের একমুঠো চাল ভাজা, তাও সবদিন জোটে না সকালে উঠে। তাই নবীনকে বললাম—তোরা বেঁচে আছিস ভূতের মত!

মানুষে এমন করে বাস করে না। মানুষের মত বাস করতে হলে কলকাতায় গিয়ে দেখে আয়।—আপনি কি বলেন দাদা ?

কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি, সুতরাং বলিলাম—সে কথা খুবই ঠিক। এসব জায়গায় বর্ষাকালে থাকা অসম্ভব। যেমন কাদা তেমনি মশা। চাহিয়া দেখিয়া বেশ আমোদবোধ করিলাম, বেশ জায়গাতে বসিয়া চা পান করিতেছি বটে! গ্রাম্য শেওড়া ভাট শিউলি গাছের জঙ্গলে ঘেরা একখানা চালাঘরে মাটির মেঝেতে বিচুলি বিছাইয়া আংটা-ভাঙা পেয়ালায় কাপালীদের বাড়ীর তৈরি চা খাইতে খাইতে দুজনে কলিকাতার সুখ-সুবিধার কথা আলোচনা করিতেছি!

ছোকরাও বোধ হয় একই কথা ভাবিতেছিল। কারণ সে এই সময় হঠাৎ বলিল—কতদিন কলকাতায় যে যাই নি! ঐ যেদিন, বললাম না কুণ্ডু এ্যাণ্ড সন্স্, পুলিশক্লাবে যারা খাবার সাপ্লাই করেছিল—প্লাম কেক, স্যাণ্ডউইচ, বিস্কুট, আরও সব মেলা কি কি—ওদের দোকান হল হগ মার্কেটে, কুণ্ডুদের বড় ছেলের সঙ্গে আমার ভাব—তা ওদের দোকানে সকালে বসে আছি, এমন সময় একজন মোটা মত ভদ্রলোক, দিব্যি চেহারা—দোকানে এসে কি চাইলে। কুণ্ডুদের ছেলে বললে—ইনি কে জান ? আমি বললাম, না। বললে, মহারাজা অব নাটাগোড়। আমি তো অবাক! বলব কি আপনাকে, আমার গা শিউরে উঠল। কত নাম, কত টাকাকড়ি, খবরের কাগজে কত ছবি বার হয়—এই সেই মহারাজা অব নাটাগোড়, দেখি মহারাজার আরদালি জিনিস নিয়ে গিয়ে, ইয়া বড় মটর দাঁড়িয়ে আছে, তাতে তুললে। সেসব এক দিন গিয়েছে! এই আমি আর ওই মহারাজা! এখন এখানে বসে বাগদি-দুলে বাড়ী বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি! আজ আপনি এসেছেন, তাই আপনার সঙ্গে দুটো ভাল কথা বলছি, নইলে এতক্ষণ নবীন কাপালীর বাড়ী বসে গল্প করতে হত।

—আহা, তোমার ভগ্নীপতি রামবাবু তো অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে মিশেছেন—তা এখন কি করে দিন কাটান ?

ভগ্নীপতির উপর দেখিলাম ছোকরার অসীম শ্রদ্ধা। ভগ্নীপতির সঙ্গে কতবার তাঁর আপিসে গিয়া বড় বড় লোক দেখিয়াছে—ইডেন গার্ডেনের পাশে প্রকাণ্ড বাড়ী, এই বড় থাম,—আবার ছোকরা স্মৃতির সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।

এই সময় কাপালীদের বাড়ী হইতে সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়া পূর্ব্ববৎ দূরে দাঁড়াইল। ছোকরা বলিল—পান নিয়ে এসেছে। চায়ের এগুলো দিয়ে আসি আর পান আনি।

একটা কাঁসার বাটিতে চার খিলি পান লবঙ্গ দিয়া মুড়িয়া পরিপাটি করিয়া সাজা। ছোকরা বলিল—আমি পান খাই নে—আপনি খান।

তার পর আবার আমরা গল্প শুরু করিলাম। দেখিলাম ছোকরার অদ্ভুত ধরনের ক্ষমতা তার নিজেকে প্রতারণা করিবার। তার বর্ত্তমান অবস্থাকে সে কেমন চমৎকার ভুলাইয়াছে ভবিষ্যৎ ও অতীতের সুখস্বপ্ন দ্বারা।

—চাকরি আমার হয়ে যাবে এই জানুয়ারি মাসে। আমার অনেক বড় বড় সহায় আছে

কলকাতায়। এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। একটা ভাল লোকের মুখ দেখতে পাই নি আজ তিন বছরের মধ্যে।

একথা তাঁহাকে অবশ্য জিজ্ঞাসা করি নাই, এতই যদি তাহার সহায়, তবে আজ তিন বছর এখানে পড়িয়া থাকিয়া ভগ্নীপতির বাজার-সরকারি করিতেছে কেন?

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন চৈত্র মাসের দুপুর রোদে দেখি সে সাত মাইল দূরবর্ত্তী বাজার হইতে প্রকাণ্ড একটি ভারী মোট ঝুলাইয়া আসিতেছে। খালের ধারে আমার সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখিয়া মোট নামাইয়া গাছের ছায়ায় একটু বসিল। বলিলাম—এতে কি?

—হাট-বাজার করে ফিরছি। আটা, ডাল, নুন, এই সব।

—রাসু মুখুজ্যে আজ সকালে বকাবকি করছিলেন কাকে?

—দাদাবাবুর মেজাজ বড় গরম। বাগ্‌দিপাড়ার এক প্রজাকে ডাকতে পাঠালেন, একটু দেরি হয়েছে ফিরতে আমার, আর অমনি বকাবকি শুরু করেছেন।

—তোমার দিদি কিছু বলেন না?

—দাদাবাবুকে দিদি বড় ভয় করে চলে।

ছোকরা চলিয়া গেল। সে রাত্রেই আমার স্ত্রী বলিলেন—আচ্ছা, রাসু মুখুজ্যের শাশুড়ি এখানে থাকেন কেন?

—তা কি করে বলব?

—বড় ভাল লোক। এমন হাতের রান্না! আমায় বিকেলে আজ জলখাবার খাইয়েছিলেন। যেমন মিষ্টি কথাবার্ত্তা—বাবা, রাসুবাবু ওঁর শালাকে যা বকলেন আমার সামনে! বাজার থেকে কি জিনিস ভুলে আনে নি। একেবারে ননসেন্স, বেরিয়ে যাও, বসে বসে গিলছ! এমন সব যা তা বললেন, মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—মুখুজ্যে মশায়ের স্ত্রী কিছু বললেন না?

—ও বাবা, তিনি ভয়ে কাঁটা! মানে, একটু কিন্তু-কিন্তু মনেই হয় তো? এই বাজারে মনে ভাব, মা ভাই সংসারের গলগ্রহ তো? আচ্ছা, কেন ছেলেটিকে বল না কোথাও গিয়ে কিছু করতে? এর চেয়ে যে, বেরিয়ে গিয়ে যা হয় একটা কিছু করাও ভাল। যতদূর বুঝলাম মায়ের মনে খুব দুঃখু। জামাইয়ের ভাত গলা দিয়ে নামে না।

শুনিয়া খুবই দুঃখিত হইলাম। ভাবিলাম কালই ছোকরাকে বুঝাইয়া বলি। অল্প বয়স, এই তো জীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যুঝিবার সময়; সারা-জীবন তার সামনে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে অগ্রসর হোক বীরের মত—তবে তো সে নিজেকেও খুঁজিয়া পাইবে। এ বাঁচা তো জড় পদার্থের অচলত্ব, ইহা তাহাকে বুঝাইতেই হইবে।

পরদিন তাহার সঙ্গে আবার দেখা। সে নিজেই আমাকে বলিল—দেখুন, একটা কাজ

পাচ্ছি এখানেই বাড়ী বসে—নেব? কাপালীপাড়ার সবাই বলছে গ্রামের বারোয়ারী ঘরে একটা পাঠশালা খুলতে। ছাত্র-পিছু চার আনা দেবে। বিশ-পঁচিশটে ছাত্র আপাতত হবে। তার পর ওরা আরও জোগাড় করে দেবে বলেছে। কি বলেন? ভাল হবে?

—বসে না থেকে ভালই, যা পাও। তোমার পক্ষে বসে থাকাটা—

দিন কয়েক পরে বারোয়ারী ঘরের দিকে বেড়াইতে গিয়া দেখি ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে শটকে' পড়িতেছে—

ছয়ের পিঠে সাত দিলে সাতাশ হয়,
সাতাশের সাত নামে হাতে দুই রয়।

আমাকে দেখিয়া সুরেশ বলিল—আসুন স্যর, বসুন একটু।—সাতটি ছাত্র আর এই চারটি ছাত্রী জুটেছে—আরও অনেক আসবে বলেছে সামনের মাস থেকে। নবীন, সাধু বাগ্দী, হরি কলু এরা সব ভরসা দিয়েছে।

আমি কিন্তু খুব ভরসা পাইলাম না। ছোকরা যে রকম খুশির সুরে পাঠশালাটিকে কেন্দ্র করিয়া স্বীয় উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অঙ্কিত করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার উপর বড় মায়া হইল। এই অতি সামান্য মোচার খোলায় সে সমুদ্রপারের যে কল্পনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কত ক্ষণভঙ্গুর সে সম্বন্ধে এই অনভিজ্ঞ যুবক কিছুই জানে না। পাড়াগাঁয়ের পাঠশালা! এইসব খেড়ে ছাত্রেরা গরু চরাইত, লেখাপড়ায় ইহাদের মন নাই। দুর্গন্ধ মলিন বস্ত্র পরিয়া ভাঙা শেলেট ও কোণ-কোঁকড়ানো প্রথম ভাগ হাতে এই বয়সে বিদ্যালয়ে পড়িতে আসিয়াছে, তাহার কারণ—এখন মাঠে মাঠে ধান, গরু চরাইবার সুবিধা নাই—ভাদ্রের প্রথমে আউস ধান কাটিবার পর যেমন মাঠ ফাঁকা হইয়া যাইবে, ইহাদেরও ছাত্রজীবন সাঙ্গ হইয়া রাখাল-জীবনের শুরু হইবে। পাড়াগাঁয়ের ধাত জানিতে আমার বাকি নাই।

সুরেশ আমার কাছে বসিয়া হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বি এ পাশ করে চাকরি করার চেয়ে এ ঢের ভাল। আপনি দেখুন হিসেব করে, এরা দেবে চার আনা করে মাথা পিছু—পঞ্চাশটি ছাত্র হলেই পঞ্চাশ সিকে অর্থাৎ সাড়ে বার টাকা। তাছাড়া এরা ধানের সময় ধান দেবে, ক্ষেতে ডাল হলে ডাল দেবে, কলাটা মুলোটা—। বাড়ীর খেয়ে এ যে-কোন চাকরির চেয়ে ভাল। আমি কেবল ভাবছি এ আমি এতদিন করিনি কেন।

—রামু মুখুজ্যে মশায় কি বলেন?

—তিনিও বললেন বাড়ী বসে না থেকে ও খুব ভাল। আচ্ছা, ইন্‌স্পেক্টরের আপিসে লিখলে কিছু গ্র্যান্ট পাওয়া যাবে না? মর্গ্যান সাহেবকে আমি ধরতে পারি গিয়ে। মর্গ্যান সাহেবের সঙ্গে ডি. পি. আই-এর খুব আলাপ। দাদাবাবুর মামাতো ভাই মর্গ্যান সাহেবের আপিসে কাজ করে—তাকে দিয়ে ধরাতে পারি মর্গ্যান সাহেবকে।

—কে মর্গ্যান সাহেব?

—ক্যালকাটা ট্রেডিং কোম্পানির ম্যানেজার। নাম শোনেন নি? মস্ত লোক।

—তুমি তাকে দেখেছ নাকি?

ছোকরা আমার কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া উৎফুল্ল মুখে বলিল—আপনি বললে বিশ্বাস করবেন না, দাদাবাবুর মামাতো ভাই তো সেই অফিসে কাজ করেন, আমি একবার চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে! ঢুকতেই বাঁ দিকের যে বড় ঘর, মাইকার পর্দ্দা বসানো কাটা দরজা ঠেলুন, এমন স্প্রিং লাগানো আছে, তখনই বন্ধ হয়ে যাবে—সেই ঘরে মর্গ্যান সাহেব বসেন। আমি ফাঁক দিয়ে দেখি এমনি মোটা চুরুট খাচ্ছে! আচ্ছা ওসব চুরুটের দাম কত?

—অনেক। আচ্ছা, তুমি স্কুল কর আমি আসি বেড়িয়ে।

যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। স্কুল উঠিয়া গেল দু মাসের মধ্যে। যতদিন টিকিবে ভাবিয়াছিলাম, ততদিনও টিকিল না। একদিন দেখি সুরেশ বেলা একটার সময় বাড়ীর পাশের কাঁচকলার ঝাড়ে কোপ মারিয়া গাছ কাটিতেছে।

বলিলাম—স্কুলে যাও নি?

—ইয়ে—স্কুল উঠে গেল।

—সে কি! কেন?

—ছাত্র হল না। দু মাস দেখলাম, তার পর কেউ মাইনে দেয় না। ভূতের বেগার আর কতদিন খাটি বলুন। চাষার ছেলে, ওরা স্কুল-কলেজের মর্ম্ম কি বুঝবে বলুন দেখি। নিউটন বলেছেন—আমি সমুদ্রের ধারে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। সার আইজাক নিউটন—একজন কত বড়দরের সাহেব, ভাবুন তো—এদের সেসব কথা বুঝিয়ে লাভ কি। মরুক গে, আমার ও ভূতের বেগার না খেটে—

রাসু মুখুজ্যে আমায় একদিন বলিলেন—ছোঁড়াটা একেবারে ওয়ার্থলেস। একটা কাজে পাঠাও, তিন ঘণ্টা দেরি করে আসবে। ও হয়েছে আমার একটা বোঝা।

—একটা কিছু চাকরিতে ঢুকিয়ে দিন না ওকে। এ রকম ঘরে বসিয়ে রেখে—

—বসিয়ে রেখেছি কি সাধে! ম্যাট্রিক থার্ড ডিভিসনে পাশ—ওকে কোথায় ঢুকুই বল তো? বি. এ, এম. এ, এ বাজারে···আমার ঘাড়েই যত—

—কেন, এখানেও খাটে তো কম নয়। হাটে বাজারে যাচ্ছে, জিনিসপত্র বয়ে আনছে—

রাসু মুখুয্যে অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন—ওইটেই সবাই দেখে। আমি কি তবে অত বড় ছেলেকে বসিয়ে বসিয়ে খেতে দেব? আমার তো সে অবস্থা নয়। আমি নিজে কত খাটি দেখ তো—সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত—

সুতরাং ছোকরার আবার চাকরের জীবন শুরু হইল। গরুর জাব কাটা, গরু মাঠে দিয়া আসা, হাট বাজার করা, আরও সংসারের যাবতীয় পরিশ্রমের কাজ। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, ছোকরার স্বপ্ন তেমনি মায়াময়, কল্পনা তেমনি রঙিন রহিয়া গেল। বাস্তবকে সে স্বীকার করিতে আদৌ রাজী হইল না।

গ্রীষ্মকাল কাটিয়া আষাঢ় মাসের প্রথম সেই যে ভীষণ বর্ষা পড়িল, শ্রাবণ মাস যায় যায় সে বর্ষার বিরাম বিশ্রাম নাই। চারিধার জলে ডুবুডুবু, রাস্তাঘাট কাদায়, হাবড়, বন জঙ্গলে

উঠান ঢাকিয়া গেল। আমার স্ত্রী বলিলেন—ওগো, কলকাতায় সবাই ফিরছে, চল আমরাও যাই—এখানে আর থাকা যায় না। মরি, সেখানে বোমা খেয়ে মরব। ভিজে কাঠে উনুন ধরিয়ে আর ফুঁ পেড়ে চোখ কানা হয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে, এ আর সহ্য হয় না।

অতএব চলিয়া আসিলাম কলিকাতায়।

আশ্বিন মাসের প্রথমে এই সেদিন ভগ্নীপতির অসুখ উপলক্ষে একবার সেই গ্রামে গিয়াছিলাম। স্টেশনে নামিয়াই সেদিন ভীষণ বর্ষা। অতি কষ্টে সাত মাইল হাঁটিয়া প্রায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে গ্রামের মাঠে পৌছিলাম। তখনও সমানে বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিধার ধোঁয়া ধোঁয়া। হঠাৎ চাহিয়া দেখি সেই দুর্য্যোগের মধ্যে সুরেশ এক বোঝা কাঁচা ঘাস মাথায় করিয়া কোথা হইতে আসিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম—সুরেশ যে! এত বাদলায়—

সুরেশ আমাকে দেখিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়াছে তাহার ধরন দেখিয়া বুঝিলাম। কতকটা কৈফিয়তের সুরে বলিল—এই বাদলায় গরুর খাবার নেই কিছু একেবারে। খালপারের মাঠ থেকে দু বোঝা কাঁচা ঘাস···আমি বলি, যাই নিয়ে আসি, দিদি বারণ করেছিল।

সাহস দিয়া বলিলাম—বেশ তো, ভালই তো। নিজের কাজ নিজে করবে এর মধ্যে কিছু ···খুব ভাল। ছোকরার এতটা অভ্যাস নাই, দেখিলাম তাহার রীতিমত কষ্ট হইতেছে। ভগ্নীপতির অন্নদাস, না করিয়া উপায়ই বা কি। রাম মুখুজ্যে বসিয়া খাইতে দিবে না।

ছোকরা বলিল—কলকাতার অবস্থা কেমন?

—এখন ঢের ভাল। আবার যেমন তেমনিই হয়েছে।

—যুদ্ধের খবর কি? একখানা খবরের কাগজ আসে না যে পড়ি।

—ঐ এক রকম চলছে।

—তাহলে এবার কলকাতায় গিয়ে একটা কাজে লেগে যাই, কি বলেন? বোমার হাঙ্গামা যখন অনেকটা মিটেছে চাকরি একটা জুটিয়ে নেবই। আর্মি অ্যাণ্ড নেভি স্টোর্সের গ্রিফিথ সাহেব আমায় বললে—ইউ আর দি সন অব এ নোবল ফ্যামিলি, গাঙ্গুলি। আই উইল সি ইউ।—সেবার আমায় নিয়ে গিয়েছিল সেখানে—ওই যে কুণ্ডু ব্রাণ্ড সন্স, তাদের মেজ ছেলে কণ্ট্রাক্টর কিনা ওখানকার, তাই। একেবারে স্পষ্ট বললে, আই উইল সি ইউ—

তাহাকে মনে করিয়া দিলাম না যে, সে বোমার ভয়ে কলিকাতা হইতে পলাইয়া আসে নাই, আসিয়াছে তাহার তিন বৎসর পূর্ব্বে। চাকরি এতদিন করে নাই কেন? ছোকরা এখনও স্বপ্নরাজ্যেই বাস করিতেছে—কিছুতেই সে রূঢ় বর্ত্তমানকে স্বীকার করিতে চায় না —আমি তার স্বপ্ন ভাঙিয়া দিব কেন? তবুও কি জানি ছোকরার উপর কেমন সহানুভূতি ও করুণা হইল।

বেচারী!

অভয়ের অনিদ্রা

অভয়ের সারারাত্রি ঘুম হইল না। শত চেষ্টা করিয়াও সে তাহার চক্ষু নিমীলিত করিতে পারিল না। সেই যে আচমকা কিসের যেন শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল তার পর আর কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। চক্ষু যেন তাহার ঠিকরাইয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল। বেশ শান্তিতে সে ঘুমাইতেছিল, অকস্মাৎ কে যেন তাহার দ্বারে করাঘাত করিয়া গেল। সেই শব্দে অভয়ের সুপ্ত চেতনা জাগিয়া উঠিল। অভয় ধীরে ধীরে তাহার শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে ক্ষীণপ্রায় হ্যারিকেনটি উজ্জ্বল করিয়া দিল, ধীরে ধীরে চারিদিকে সাবধানে চাহিয়া দেখিল। না, কোথাও এতটুকু অসামঞ্জস্য ঘটে নাই। যেখানকার জিনিসটি যেমন ছিল তাহা ঠিক সেখানেই আছে, এতটুকু নড়ে নাই। অভয় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ভয় তাহার নিশ্চয় অহেতুক। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল হয়তো ডাকাত পড়িয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই স্মরণ হইল ইহা কলিকাতা, ডাকাত পড়িবার সম্ভাবনা নাই আদৌ। তার পর মনে পড়িল হয়তো চোর পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ কান খাড়া করিয়া রহিল। চোরের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তবে কিসের এই বিকট শব্দ? অভয় ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল।

মুহূর্ত্তে তাহার পাশের শূন্য বিছানায় নজর পড়িল। সাতদিন আগে ঐ শয্যা পূর্ণ ছিল। সাতদিন আগে তাহার এ গৃহ এমন মহাশূন্যতা প্রকট করিয়া খাঁ খাঁ করিত না। মনে পড়িল বেচারা বকুলের কথা—তাহার সহধর্ম্মিণী, তাহার স্ত্রী, অগ্নিসাক্ষী করিয়া যাহাকে গৃহলক্ষ্মীরূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তিন বছর পূর্ব্বে এই শ্রাবণের এক শুভলগ্নে বকুলকে সে সগোত্রের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। সেদিনও আকাশে এমনি করিয়া পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন তাহার মা ছিলেন। দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল। তার পর একদা পরপার হইতে মার ডাক পড়িল। বকুল নিপুণ হস্তে সংসারের হাল টানিয়া ধরিল। অভয় তাহার পানে তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহিল। মাতার অভাব বকুলকে দিয়া পূরণ করা হইল। প্রথম প্রথম বকুলকে অবশ্যই বেগ পাইতে হইয়াছিল; কিন্তু অচিরেই সে অভ্যস্ত হইয়া গেল। সংসারের হিসাবপত্র হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না পর্য্যন্ত তাহাকে নিজ হস্তে করিতে হইত।

কালক্রমে বকুল স্বামীর বিরাট বহুবিস্তৃত সংসারের সহিত এমনভাবে জড়িত হইয়া গেল যে তাহার অভাব একদিনও সহ্য করা যাইত না। বাপের বাড়ী যাইবার ফুরসত সে পাইত না। ভোর হইতে উঠিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত কর্ম্মে তাহার বিশ্রাম ছিল না। কলের পুতুলের ন্যায় সে অক্লান্ত কর্ম্ম করিয়া যাইত। একবেলা তাহার অসুখ করিলে সংসার অচলপ্রায় হইয়া যাইত। ছেলেমেয়েদের পেট ভরিয়া খাওয়া হইত না। অতিথি-অভ্যাগত ফিরিয়া যাইত। খাদ্যদ্রব্য এমনই অখাদ্য হইত যে কাহারও মুখে তুলিবার রুচি হইত না। পাশের বাড়ীর চাঁপা একদা মধ্যাহ্নে বেড়াইতে আসিয়াছিল। সে বকুলকে দেখিয়া বলিল, দিদির চেহারা কি বিশ্রী হয়ে গেল!

বকুল কহিল, হবে না ভাই? যা খাটুনি।

চাঁপা কহিল, খাটুনি একটু কম করতে পার!

বকুল মৃদু হাসিল, তাহার মুখে প্রশান্তির ছায়াপাত হইল। সে বলিল, খাটুনি কম করব, কি করে ভাই। নিজের সংসার, পর তো আর কেউ নয়। একটুকু বিশ্রামের ফুরসত নেই। আজ যদি যম আমায় নিতে আসে তাহলে তাকে বলব, একটু বোস, আমার এখনও অনেক কাজ বাকি।

চাঁপা কহিল, বালাই ষাট, ওকি অলক্ষুণে কথা ভাই!

বকুল কহিল, আমার আবার লক্ষণ অলক্ষণ! আমি যমের অরুচি।

এহেন বকুলকে পাইয়া অভয়ের বিপর্যস্ত সংসারের মধ্যে বেশ একটা সুশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অভয় বকুলকে নিঃশব্দে চুপিচুপি নাকি ভালবাসিয়াও ফেলিয়াছিল। কেন না, যে অভয় বন্ধুদের ফেলিয়া একদণ্ড কাটাইতে পারিত না, সেই কিনা বিবাহের পর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির হইয়া গেল। গৃহকেই সে যথাসর্বস্ব জানিয়া ফেলিল। বন্ধুরা বিদ্রূপ করিতে কসুর করে নাই। বলিল, বৌদি তোকে এমন করে তুক করে ফেলবে জানলে কখনও বিয়ে করতে দিতুম না।

কেহ বলিল, বৌদির দেওয়া খাবার-টাবার দেখে খাস বাবা।

কেহ বলিল, কামরূপ-কামিখ্যের ভেড়া হয়ে যাস নে যেন।

অভয় কেবল হাসিতে লাগিল। কাহারও কথায় সে জবাব দিল না।

এমনি করিয়া অভয়ের দিন কাটিতে লাগিল। বন্ধুরা ধীরে ধীরে তাহার নিকট হইতে সরিয়া সরিয়া যাইতে লাগিল। ধীরে ধীরে তাহাকে সকলে বিস্মৃত হইল। আপিসের ছুটি হইলে সন্ধ্যায়, বা রবিবারে, কেহ তাহার বাড়ী আর তাশপাশা খেলিতে আসিত না। তাহার বহুদিনের বৈঠকখানা অনাদৃত হইয়া পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যায় আলো জ্বলিল না, বৈকালে ঝাঁট পড়িল না, অভয় হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বকুল একদিন জিজ্ঞাসা করিল, ওরা, আর তাস খেলতে আসে না কেন?

অভয় মুক্তির হাসি হাসিতে হাসিতে বলিল, অমন বিলাসিতা করবার সঙ্গতি আমার নেই।

বকুল কহিল, এতদিনের অভ্যেস!

—অভ্যেস বলে তো সব-কিছু করা যায় না। পয়সা চাই—চকচকে পয়সা। তাস চাই, আলো চাই, চা চাই, বিস্কুট চাই। পয়সা দিয়ে তো অমন বন্ধুত্ব কিনতে পারি না বকুল। পয়সা কোত্থেকে আসে সে কথা কি কোনদিন চিন্তা করেছ একবার।

কথা শেষে অভয় হা হা করিয়া তাহার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে হাসিতে লাগিল। বকুল বলিল, আমায় বিয়ের পর তার এমনি করে যবনিকাপাত করলে আমার লোকে দুষবে, এটা জান তো?

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, লোকে মনে করবে তাদের এ আনন্দ বন্ধ হয়েছে আমারই ষড়যন্ত্রে।

অভয় আবার সেইরূপ সারা ঘরটি কাঁপাইয়া হাসিতে লাগিল। তার পর বলিল, ওঃ! দুষবে তো তোমার? তা যত খুশি দোষ দিক। তুমি তো আর শুনতে যাচ্ছ না। তাতে আর কোন ক্ষতি নেই।

দুই মাস অভয়ের সহিত ঘর করিয়া বকুল বেশ বুঝিয়াছিল যে তাহার স্বামীর হাতটানটা বেশই আছে। হাতের আঙুল নাকি তাহার ফাঁক হয় না! বিবাহের পর এই সুযোগে সে বন্ধু-বান্ধবকে ফাঁকি দিয়া বসিল। সাবান স্নো কিনিয়া দিতে বলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত, সেকালের দোহাই পাড়িয়া স্ত্রীকে আধুনিকতার বিশেষণে জর্জ্জরিত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। সেই হারানো যুগের সোনার দিনের বর্ম্মে নিজেকে আবৃত করিয়া সে আত্মরক্ষা করিত। বকুলের মুখে আর কোন কথা সরিত না। আর তাহার বলিবারই বা কি থাকিত? তখন তাহার সবে-মাত্র বিবাহ হইয়াছে।

ধীরে ধীরে দীর্ঘ তিনটি বৎসর কোন্ ফাঁকে কাটিয়া গিয়াছে তাহার হিসাব নাই। অকস্মাৎ একদিন বকুলের সামান্য অসুখের সামান্যভাবেই সূত্রপাত হইল। বুধবার রাত্রি দুইটায় সে অভয়কে সহসা ডাকিতে লাগিল। অভয় জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি?

বকুল বলিল, আমার বড্ড শীত করছে। উঃ হুঃ হুঃ! জানলা দরজা সব বন্ধ করে দাও। আমার ঘাড়ের ওপর লেপ দাও, গায়ের কাপড় দাও, তোশক দাও, গদি দাও, যা কিছু আছে সব দাও।

অভয় লেপ দিল, গায়ের কাপড় দিল। বকুলের শীত তবুও তিলার্দ্ধ কমিল না। সে হি-হি করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চীৎকার করিতে লাগিল—আরও দাও, আরও দাও।

দিবার আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না, তথাপি বকুল কাঁপিতে লাগিল। অভয় তার কপালে হাত দিয়া দেখিল গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। স্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া সে মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন এই গভীর রাত্রে সে কি করিবে, করিবার তাহার কিই বা আছে? সে কি ডাক্তার ডাকিবে? ডাক্তারের কথা স্মরণ হইলে তাহার মনে শিহরণ জাগিল। ডাক্তার কবিরাজ ডাকা তো বিলাসিতার নামান্তর। আর রাত্রে নাকি ডাক্তারের ডবল ভিজিট। না, এ সামান্য জ্বরে মানুষের কোন ক্ষতি হয় না। একবার ভাবিল মাথায় আইসব্যাগ দিবে বা কপালে জলপটি দিবে। কিন্তু কোথায় আইসব্যাগ, কোথায় ওডিকোলন! এদিকে বকুল চীৎকার করিতে লাগিল—আমার মাথা জ্বলে গেল, পুড়ে গেল।

অভয় বলিল, বেশ তো ভালমানুষ খাওয়া-দাওয়া করে শুলে। হঠাৎ এমন কিই বা অসুখ করল বল দিকি? এ নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া। আমি হলফ করে বলতে পারি এ ম্যালেরিয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

বকুল তখন গান জুড়িয়া দিয়াছে, অনর্গল এলোমেলো বকিয়া চলিয়াছে, সজনি, কি পুছসি··· ঐ যমুনারি কূলে···শ্যাম কালো, তার কালো মাথার চূড়া, তার মোহন বাঁশি···

অভয় বিপদ গণিল। সারারাত্রি স্ত্রীর মাথায় পাখার বাতাস করিতে লাগিল। নিজের

শরীরের উপর দিয়া যাহা কিছু করা যায় তাহা সে করিতে প্রস্তুত। শুধু এই রাত্রে অযথা সে থামোকা পয়সা খরচ করিতে পারিবে না। পয়সা তাহার বুকের বত্রিশখানা হাড়ের সামিল। বকুল সারারাত্রি হাসিয়া-কাঁদিয়া-গাহিয়া চীৎকার করিয়া কাটাইয়া দিল। জ্বর কমিল না। ভোর হইলে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আসিয়া হাজির হইল। যথাসময়ে পাড়ার একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনা হইল। ডাক্তার অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, টাইফয়েড। রোগ বড় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন।

অভয় প্রমাদ গণিল। বিপদ কি মানুষের এমনি করিয়াই হয়? তাহার বড় ইচ্ছা হইল সে ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদে। কিন্তু সে কাঁদিল না, বরং স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য জলের মত না বলিয়া না কহিয়া দশটি টাকা খরচ করিয়া বসিল। হিসাবের খাতায় খরচের অঙ্কটা হয়তো আরও বড় হইবে; কিন্তু স্ত্রী তাহার ভাগ্যবতী, স্বামী-সোহাগিনী, 'পতি পরম গুরু'কে অযথা ব্যয়ের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিল। পরের দিনই সে ইহজগতের মায়া কাটাইয়া গোলোক-ধামে চলিয়া গেল, কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিল না।

অভয় পত্নীশোকে ধূলিতলে আছড়াইয়া পড়িল। সে আর্তকণ্ঠে বিনাইয়া বিনাইয়া রমণীর ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তাহার অত সাধের তাসের ঘর মরণের তীব্র আঘাতে ভাঙিয়া চুরিয়া লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। সে প্রতিরোধ করিতে পারিল না, কেবল তীব্র সুরে শোক-প্রকাশ করিয়া চলিল। সেইসব পুরনো দিনের হারানো বন্ধুরা আজ বিপদ দেখিয়া আসিয়া জুটিল। সেই হাবু, পটল, রমেন, ভুপেশ, বিপিন—সকলেই একে একে দেখা দিল। দীর্ঘ তিন বৎসর যাহারা অভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াইত না, সকালে যাহার মুখ দেখিলে অযাত্রা বলিয়া ঘোষণা করিত, অযথা হাঁড়ি ফাটিবার আশঙ্কায় সারাদিন সচকিত থাকিত, আজ সেই অভয়ের বিপদে আর তাহারা, বেচারার হাত দিয়া জল গলে না বলিয়া, দূরে সরিয়া রহিল না। অভয় তাহাদের দেখিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাহারা অভয়ের কান্না দেখিয়া নিজেরাই কাঁদিয়া ফেলিল। তাহারা জানে অভয় তাহার স্ত্রীকে কি দারুণ ভালবাসে, স্ত্রীর অভাবে তাহার জীবন কিরূপ বিষময় হইয়া যাইবে। অগত্যা তাহারা তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

সন্ধ্যায় শবদাহ শেষ করিয়া সকলে গৃহে ফিরিল।

সত্যই নাকি অভয় তাহার স্ত্রীকে নিবিড়ভাবে ভালবাসিত। সে ভালবাসায় নাকি এতটুকু গলদ ছিল না। উঠিতে বসিতে সব সময়ে সে 'বকুল' 'বকুল' বলিয়া অস্থির হইত। বকুল হাসিয়া বলিত, আমি মলে তুমি কি করবে বল ত?

—শুভ্র তাজমহল।

বকুল হাসিমুখেই বলিত, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি অত খরচ করো না।

অভয় কহিত, পয়সা-কড়ি তো সবই তোমার। তোমার পয়সা তোমার জন্যে খরচ করব,

তাতে পায়ে পড়ে বাহাদুরি কেনবার কি এমন আছে।

—বেশ, মানলুম সমস্ত পয়সাকড়ি আমার, আমার কলকাতা শহরে চোদ্দখানা বাড়ী, তার মাসিক আট শ টাকা ভাড়া। এখন আপাতত দয়া করে আমার জন্তে একখানা লালাবাই সাবান এনে দাও দিকি।

অভয় তাহার স্ত্রীকে প্রবোধ দিল, পাগল নাকি! ফেনা করে সাড়ে চার আনা পয়সা জলে দেবে? না, ও বিলাসিতা আমাদের এখানে চলবে না।

সেই স্ত্রীর মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হইয়া অভয় ছয় দিন ছয় রাত্রি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। বন্ধুরা সকলে বিপদ গণিল। এই নিদারুণ শোকাবেগের হাত হইতে কি করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবে! সকলে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল, প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত বিরহে কাতর মানুষটিকে সেই বহুশ্রুত দার্শনিক মতবাদ দিয়া বুঝাইবার হাস্যকর প্রচেষ্টা। সেই—মানুষ মরণশীল, মৃতব্যক্তির জন্য শোকপ্রকাশ করা নাকি দুর্ব্বলতার লক্ষণ, রাজর্ষি জনকের নির্লিপ্ততার দৃষ্টান্ত, সরিষা আনিবার জন্য বুদ্ধের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মরাজ বকের প্রশ্ন—ইত্যাদি ইত্যাদি নানাবিধ কথায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল। অভয় তবুও প্রথমটা ভোলে নাই।

ছয় দিন ছয় রাত্রির পর আজ সবে সে পত্নীশোক কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইয়া সামান্য ঘুমাইয়াছে এহেন সময়ে সেই বিকট শব্দ হইল। অভয় একদৃষ্টে বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিয়া রহিল। বুকখানার ভিতর হু হু করিয়া উঠিল। ডাকাত নয়, তবে চোর হইলে হইতে পারে।

কিন্তু চোর বলিয়াও তো বোধ হইতেছে না।

তবে এ কিসের শব্দ? অভয় দরজার একটি গর্ত্ত দিয়া দেখিল ফুটফুটে জ্যোৎস্না, আকাশের মাঝে উজ্জ্বল চাঁদ সাদা, দীপ্তিময়ী তারকারাশি। অভয় বিছানায় আসিয়া ঝুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কিসের এ শব্দ?

আচমকা মনে পড়িল হয়তো তাহার মৃত স্ত্রীর কীর্ত্তি, হয়তো বেচারা এ জগতের মায়া-পাশ ছিন্ন করিয়াও স্বামীকে ভুলিতে পারে নাই। তাই কি নিঃশব্দ রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে? তৎক্ষণাৎ ভয়ে তাহার গা ডোল হইয়া শিহরিয়া উঠিল। না, স্ত্রীর এই উৎকট ভালবাসা সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিবে না। ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত চেতনা লোপ পাইতে লাগিল। বকুলের শূন্য শয্যার পানে চাহিবার সাহস আর তাহার রহিল না। সমস্ত শোক-দুঃখ-বেদনা ভয়ে ও ভাবনায় রূপান্তরিত হইল। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া শয্যার উপর অবশ ভাবে বসিয়া রহিল। কি সে করিবে? চিৎকার করিবে, না জ্ঞান হারাইয়া ফেলিবে? ভাবিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না। সে ছেলেবেলায় কত ভৌতিক কাহিনী পড়িয়াছে, আজ কেমন যেন সেই সব নানা ভৌতিক ব্যাপার জীবন্ত হইয়া উঠিল। সে বন্ধ জানালা-দরজার পানে সচকিত চিত্তে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কে জানে কোন্ মুহূর্ত্তে দমকা বাতাসে জানালা-দরজাগুলি হুড়মুড় করিয়া খুলিয়া যায়।

অকস্মাৎ আবার সেই পূর্ব্বের ন্যায় দ্বারে শব্দ হইল। বাহির হইতে মানুষে যেন দ্বার ঠেলিতেছে। অভয় ছুটিয়া দ্বারপ্রান্তে গিয়া সেই ফুটা দিয়া বাহিরে তাকাইল। কিন্তু আশ্চর্য্য, স্থূল দৃষ্টিতে দেখিল একটি হৃষ্টপুষ্ট ভিটামিনের মাপকাঠির চিহ্নস্বরূপ পাঞ্জাবী ইঁদুর হন্‌হন্‌ করিয়া তাহার রুদ্ধদ্বারে মাথা খুঁড়িয়া পলাইয়া গেল।

বিপুল বিস্ময়ে অভয়ের মুখে কোন কথা সরিল না, কেবল তৃপ্তি ও প্রশান্তির হাসি খেলিয়া গেল। যাহা হউক, যদি ডাকাতই পড়িত বা চোরই আসিত! কতদিন হইতে সে ভাবিয়াছে গহনাপত্র পয়সা-কড়ি অন্যত্র সাবধানে রাখিয়া দিবে, কিন্তু ফুরসত পায় নাই। তাই আজ গুপ্তস্থান হইতে চাবি বাহির করিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখিবে তাহার সবকিছু মজুত আছে কিনা। ধীরে ধীরে সে সিন্দুক খুলিয়া ফর্দ্দ মিলাইয়া তাহার সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। ফর্দ্দ মিলাইতে মিলাইতে তাহার তৃষ্ণা পাইয়া গেল। ভাবিল বকুলকে জল আনিতে বলে, হয়তো বলিতও তাহাকে, যদি-না তৎক্ষণাৎ মনে পড়িত তাহার মৃত্যুর কথা। না, একটা চাকর ও একটা ঝি না রাখিলে চলিবে না। বকুল আসিয়া পর্য্যন্ত সে উহাদের বিদায় করিয়াছিল; কিন্তু আজ তো তাহাদের না হইলে অভয়ের আদৌ চলে না। কম করিয়াও খাওয়া-পরা বাদে তাহাদের জন্য অভয়কে মাসে অন্তত দশটা টাকা ব্যয় করিতে হইবে, বৎসর শেষে এই দশটি টাকা আবার এক শ কুড়ি টাকায় পরিণত হইবে! বাৎসরিক মোটা অঙ্কটা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

যথাসময়ে রাত্রি দুইটা বাজিল। অভয় তখন বাক্স হাতড়াইতেছে। তাহার চুল উস্কো-খুস্কো হইয়া গিয়াছে, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, ঘন ঘন অস্বস্তির নিশ্বাস পড়িতেছে। গভীর রাত্রেই সে স্ত্রীর শূন্য শয্যায় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। আবার সে বিনাইয়া বিনাইয়া চাপা-কণ্ঠে কাঁদিতে লাগিল। দেওয়ালে টাঙানো স্ত্রীর ফটোখানার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ফটো দেখিয়া বকুলকে চেনা মুশকিল। কোন্ মান্ধাতার আমলে ঐখানি তোলা হইয়াছিল। তার পর ফটো তুলিবার প্রয়োজন বা সদিচ্ছা আর তাহার হয় নাই।

দুইটা তিনটা করিয়া রাত্রি ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতে লাগিল। অভয়ের চোখে তখনও ঘুম নাই। তখনও সে তাহার দীর্ঘ চুলের মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিয়া কি যেন আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিল। হয়তো সে পত্নীশোকে বিবশ হইয়া গিয়াছে। শয্যা হইতে উঠিয়া অভয় ঘরময় পায়চারী করিতে লাগিল। খোলা জানালা দিয়া বাহিরে আকাশের পানে অনিমেষে চাহিয়া রহিল। চাঁদ অনেকটা হেলিয়া পড়িয়াছে, তারায় তারায় সারা আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। তাহার বুকের ভিতর সহসা হু হু করিয়া উঠিল। কয়েক বিন্দু অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুতেই সে ঘুমাইতে পারিল না। ঘুম দূরের কথা, সে তাহার বিছানায় শুইতেই পারিল না। শয্যা তাহাকে কাঁটার ন্যায় বিঁধিতে লাগিল।

একবার ভাবিল যে লোটাকম্বল লইয়া যেখানে দুচোখ যায় সেখানে চলিয়া যাইবে? আর সে সংসার করিতে পারে না। সে হয়তো পাগল হইয়া যাইবে। পাগল হইবার তাহার বাকিই বা কি আছে। "বিপদ যখন আসে তখন সে তো আর একা একা চুপি চুপি আসে না। এমন করিয়া অঘটন ঘটিলে সে কি করিয়া বাঁচিবে?

আজ সে যে-শোক পাইয়াছে তাহার কাছে তাহার মৃত্যুজনিত শোক সম্পূর্ণ তুচ্ছ। স্ত্রীর শোক সে ভুলিতে পারে; কিন্তু এ শোক তো সে কখনও কোন কালে ভুলিতে পারিবে না। গত ছয় দিন ছয় রাত্রি এই দারুণ উদ্বেগে কাটিয়াছে, যতটা স্ত্রীর বিরহে না হউক, তাহার বেশি ওই বৎসরে এক শ কুড়ি টাকা খরচের ভয়ে। সেই ভয়েই তাহার ছয় দিন ছয় রাত্রি ঘুম হয় নাই। বকুল ছিল সংসারে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাহার মৃত্যুতে সংসার একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে; কি দিয়া অভয় সে সংসারকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অভয় আজ ছয় দিন ধরিয়া হদিস পায় নাই। স্ত্রী মানুষের মরে, অভয়ের তাহাতে তত দুঃখ নাই। কিন্তু ঐ যে কথা আছে, ভাগ্যবানের বউ মরে, অভাগার ঘোড়া মরে—তবে স্ত্রীর মৃত্যুর পর অভয় ভাগ্যবান হইল কই?

স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার আদৌ দুঃখ নাই। সে তাহার স্ত্রীর গহনার বাক্সটি আবার ফর্দ্দ মিলাইয়া দেখিল। না, সে জিনিসটি নাই। অভয়ের চোখ দিয়া হু হু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মানুষ মানুষকে কি এমন করিয়াই ফাঁকি দেয়? লোকসানের পর এমন করিয়া লোকসান হইলে সে কি করিয়া সহ্য করিবে? না, এই লোকসান সহিয়া সে কখনও সংসারের মধ্যে পড়িয়া থাকিবে না। গহনার বাক্সটির পানে সে শ্যেনদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। স্ত্রীর ব্যবহৃত গহনার সব কিছুই আছে, সব কিছুই সে নিপুণ হস্তে মৃত বকুলের গা হইতে খুলিয়া লইয়াছে। কাশী হইতে তাহার ছোট বোন সেই যে কারুকার্য্যখচিত কাচের চুড়ি চারগাছি পাঠাইয়াছিল, সেগুলিও সে সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছে। সব তুলিয়াছে, কিন্তু ভুল করিয়াছে বকুলের কানের ফুল দুটি খুলিতে! এক আনা সোনা দিয়া সে-দুটি সে গড়াইয়াছিল। চুলের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া সে-দুটি শবদেহের সহিত গিয়া চিতায় ভস্মীভূত হইয়াছে।

সেই কারণে অভয়ের আজ সারারাত্রি ঘুম হইল না। স্ত্রীর মৃত্যু সে সহ্য করিতে পারে; কিন্তু এই লোকসানের আঘাত সে ভুলিবে কেমন করিয়া? যতবার সে ঘুমাইতে যায়, ততবারই ঐ ফুল দুটির হিংস্র উজ্জ্বলতা যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে মাথায়। আর অভয় কিছুতেই ঘুমাইতে পারে না।

সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল, সারারাত্রি সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। স্ত্রীর মৃত্যুতে কেন সে ভাগ্যবান হইল না?

অসমাপ্ত

কোন্নগরে সাহিত্য-সভা করিতে গিয়াছিলাম।

আমিই সভাপতি। টানা মোটরে কলিকাতা হইতে আমায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। সভাস্থলে পৌঁছিয়া বেজায় খাতির, কলিকাতা হইতে সমাগত আরও কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর সহিত পুষ্পমাল্যশোভিত আমারও ফটো নেওয়া হইল স্থানীয় উৎসাহী সাহিত্যবাতিকগ্রস্ত তরুণদের দ্বারা।

—এইবার আসুন, একটু জলযোগ—

—সভা কখন? সময় হল তো—

—সভার আগে সামান্য একটু চা—

বন্ধুদের দিকে ফিরিয়া বলিলাম—চল হে তবে। ওঁরা যখন নিতান্তই ছাড়বেন না—

—আসুন এদিকে—ইনিই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রামকিঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, এখানকার জমিদার—

—ও! নমস্কার! হেঁ—হেঁ—

একগাল হাসিয়া রায় বাহাদুর প্রতিনমস্কার করিলেন।

—গরিবের বাড়ীতে—সামান্য একটু—হেঁ হেঁ—। আপনার নাম অনেকদিন থেকে শোনা ছিল। আজ বড় সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে দেখা হল। আপনার শাপমোচন পড়ে আমাদের বাড়ীর এরা কেঁদে বাঁচে না। আমি এখনও পড়ি নি। সময় পাই নে, মিউনিসিপ্যালিটির কাজ বড় বেশি—যদিও রিটায়ার করেছি, তবুও কাজের অন্ত নেই।—ওঁরই নাম বিনয়বাবু? আসুন আসুন, আপনার বইও—মানে, পড়ি নি—তবে নাম কে না শুনেছে আপনাদের বাংলা দেশে, বলুন!

আমরা সবাই খ্যাতির গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠি।

প্রকাণ্ড ঘর। মাঝখান জুড়িয়া লম্বালম্বি একখানা বড় টেবিল সাদা কাপড় দিয়া ঢাকা—চার পাঁচটা ফুলদানিতে ফুল সাজানো। বড় বড় চীনামাটির প্লেটে সিঙাড়া, কচুরি, নিমকি ও রসগোল্লা। কাচের গ্লাস সারি সারি ও কাচের জগে জল। চায়ের সরঞ্জাম।

—আসুন, বসুন—এই যে, আপনি এইদিকে—বিনয়বাবু এখানে। ওরে ফল কই? এখনও কাটা হয় নি? কখন আর কাটবি? নিয়ে আয়।…ওহে সুশীল, তোমরাও বসে পড়, দাঁড়িয়ে রইলে কেন সব? কেনারাম কোথায় গেল? ডেকে নিয়ে এস। বাঃ, চা খেয়ে নাও সকলে একসঙ্গে—না না, দেওয়ার লোকের অভাব হবে না।

—ওই ছবিখানা কার? বেশ সুন্দর চেহারা—

—আজ্ঞে, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের! ফ্রেঞ্চ গভর্নমেণ্টের দেওয়ান ছিলেন—একেবারে ডান হাত বা বাঁ হাত। আর ওই বাঁ পাশে আমার পিতামহ। আমাদের আদি বাড়ী শশধরপুর, নিমতের কাছে। আমার ঠাকুরদাদার বাবার নামে গ্রামের নাম—নিমকির দারোগা ছিলেন

সেখানে। ওই অঞ্চলে জমিদারী কেনেন—ওরে সিঙাড়া আরও নিয়ে আয়—খান খান—গরম সিঙাড়া—সব বাড়ীতে তৈরি—দোকানের জিনিস মশাই এ বাড়ীতে ঢোকে না। আমার বড়বৌমার হাতে ভাজা সব। বড় ছেলে? সে এখানে নেই—কাস্টম্‌স্‌-এ কাজ করে—এবার আড়াই-শ-হল—বিয়ে দিয়েছি আজ পাঁচ বছর—তার শ্বশুরও জমিদার—রায় সাহেব হরিনাথ বাঁড়ুজ্যে, হালিসহরের—নাম শুনেছেন বোধ হয়? চা দিয়ে যা এবার—

একটি বার-তের বছরের সুশ্রী বালিকা পান লইয়া আসিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে দরজার নিকট দাঁড়াইল।

—কি ওতে রে খুকি? পান? রাখ এখানে রাখ—এইটি আমার ছোট মেয়ে মিনতি। লজ্জা কি এঁদের কাছে। বেশ গান গায়, আজ সভাতে গাইবে এখন। আবৃত্তিতে আর বছর মেডেল পেয়েছিল—জলধর সেন শুনে কেঁদে ফেললেন একেবারে—

কর্ত্তব্য ও শোভনতার খাতিরে খুকিটিকে কাছে ডাকিয়া দু-একটি মামুলি ছেঁদো কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহার আবৃত্তি পুনরায় আমাদের কাছে করিবার জন্ত জিদ ধরি, এবং পরক্ষণেই জিজ্ঞাসা করি—তাহলে ওঠা যাক সব—কি বলেন? সভার টাইম তো হল—

—ওরে কানাই, গাড়ীখানা আনতে বল্ চট করে, গেটের কাছে নিয়ে আসুক—

—না না, গাড়ী কি হবে। দরকার নেই রায় বাহাদুর। হেঁটেই এটুকু—

—বিলক্ষণ! ক্লাব ঘর এখান থেকে দশ মিনিটের রাস্তা। হেঁটে যাবেন কেন, গাড়ী যখন রয়েছে—নিয়ে আয় রে—বলে দিলি না গাড়ীর কথা?

সদলদলে গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি এমন সময় একটি আট ন বছরের বালক পিছন হইতে আমায় ডাকিয়া বলিল—মা আপনাকে ডাকছে—

প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম আর কি। বিস্ময় ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলাম—কাকে? কে ডাকছেন বললে খোকা?

বালকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—আপনাকে মা ডাকছেন।

উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সকলেই বিস্মিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কারণ আমি এ স্থানে পূর্ব্বে কখনও আসি নাই, বালকটি আমায় কখনও দেখে নাই ইহা নিশ্চিত। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের বাড়ী কোথায় খোকা?

আর একজন বলিলেন—আরে ও তো আমাদের হরিজীবনের ছেলে। তুমি হরিজীবনের ছেলে না? হাঁ। ওই দোতলা বাড়ী। এঁকে ডাকছেন তোমার মা? এই বাবুকে?

বালক চারিদিক হইতে জেরায় একটু দমিয়া গিয়া সঙ্কোচের সুরে বলিল—এই বাবুকেই তো মা বললেন ডাকতে। মা বললেন—যিনি চাদর গায়ে গাড়ীতে উঠছেন—

—যান মশায়, দেখে আসুন। ওর বাবার নাম হরিজীবন মুখুজ্যে, রেলে কাজ করে, আমাদের এখানে বাসা। চিনতে পেরেছেন? হরিজীবন এখন বাড়ী নেই, বোধ হয় ডিউটিতে

গিয়েছে। তোমার বাবা বাড়ী আছেন খোকা ?

বুঝিতে পারিলাম না কে হরিজীবন। কিন্তু এই বালকটির মুখের আদল আমার অত্যন্ত পরিচিত মনে হইল, যেন পূর্ব্বে এ ধরনের মুখ কোথায় দেখিয়াছি।

বাড়ীর দরজায় পা দিতেই দরজার আড়াল হইতে যে হাসিমুখে বাহির হইয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়াই চমকাইয়া উঠিলাম। ইহাকে তো চিনি! অনেক দিন আগে ইহার সহিত খুব জানাশোনা ছিল। কিন্তু নাম কিছুতেই মনে আনিতে পারিলাম না। মেয়েটি আমার পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—কি যতীনদা, চিনতে পারেন ? কে বলুন তো ?

—এস এস—থাক্। কল্যাণ হোক। ভাল আছ বেশ ? সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রাণপণে মেয়েটির নাম মনে আনিবার চেষ্টা করিলাম। আমার মনে পড়িল ইহার সঙ্গে আলাপ হইবার একমাত্র সম্ভবপর স্থান হইতেছে কৃষ্ণনগর, যেখানে থাকিয়া কলেজে পড়িয়াছিলাম—অন্য কোথাও মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় নাই। কিন্তু ষোল-সতের বৎসর পূর্ব্বের সেই দিনগুলিতে, ভাবিয়া দেখিলাম অনেকগুলি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল শুধু এই কারণে যে, আমি যে বাড়ীতে থাকিতাম সে বাড়ীতে সঙ্গীতচর্চ্চা উপলক্ষে পাড়ার অনেক মেয়ে জড় হইত। তাছাড়া কবিতা আবৃত্তির প্রতিযোগিতা, ছোট ছোট মেয়েদের থিয়েটার প্রভৃতি সম্পর্কে মেয়েদের সাহায্য করিতে অনেকবার অনুরুদ্ধ হইতাম—সে উপলক্ষেও অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম! সেখানেই যদি ইহার সহিত দেখাশুনা হইয়া থাকে তবে নাম মনে আনিবার চেষ্টা বৃথা। কারণ their name is Legion.

—বসুন যতীনদা।

—ইয়ে—গিয়ে, বসব বটে, কিন্তু ঘুরে আসি, সভা রয়েছে কিনা? সভার টাইম প্রায় হয়ে গেল।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—উঃ, আপনি আবার সাহিত্যিক হয়েছেন, সভায় সভাপতিত্ব করবেন, এসব ভাবলে আমার হাসি পায়। উঃ কি বখাটেই ছিলেন!

চুপ করিয়া রহিলাম—যদিও ঠিক বুঝিলাম না আমার মধ্যে বখাটেগিরির কি দেখিয়াছিল এ। এবং আমার তো মনে হয় না আমি সত্যিকারের বখাটে যাহাকে বলে, তাহা ছিলাম কোনদিন। কিন্তু তাহা লইয়া তর্ক তুলিবার ইহা সময় নয়।

মেয়েটি আবার বলিল—কতদিন ভেবেছি আপনি কোথায় চলে গেলেন, আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না! কিন্তু ভগবান দেখা করিয়ে দেন এমনি করে।

আমি এবার ইহাকে অনেকখানি মনে আনিতে পারিয়াছি।

জিজ্ঞাসা করিয়াই ফেলিলাম—তোমার নাম শান্তি না ?

মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

—কেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে নাকি ?

বলিতে পারিলাম না যে, সন্দেহ তো দূরের কথা, নামটাই মনে ছিল না এতক্ষণ। কিন্তু এবার ইহাকে বুঝিয়া ফেলিয়াছি। আজ পনের-ষোল বছর আগে ইহার সঙ্গে আলাপ হইয়া-

ছিল—তার পর আর কখনও দেখি নাই বটে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে অতগুলি মেয়ের মধ্যে এই মেয়েটির ব্যবহার ছিল সর্ব্বাপেক্ষা আন্তরিক ও সরল, তখনকার মনোভাবে আমি ইহাকে সেইজন্যে আমল দিই নাই—গায়েপড়া বলিয়া মনে করিতাম।

শান্তি বলিল—আপনি আজকাল থাকেন কোথায় ?

—কলকাতাতেই আছি আজ আট ন বছর। খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি।

—বিয়ে করেছেন ?

—বহুদিন।

—ছেলেপিলে হয়েছে ?

—চার মেয়ে। আর কিছু শুনতে চাও ?

—বাজে কথা। আপনি কক্ষনো বিয়ে করেন নি।

—এ কথা ভাববার হেতু কি ?

—আপনাকে আমি খুব ভালই জানি। আমার চোখে ধূলো দিতে পারবেন না। বলুন সত্যি কি না ?

হাসিয়া ফেলিলাম, সঙ্গে সঙ্গে বড় ভালও লাগিল। পনের বছর পূর্ব্বে এক-আধ বছরের জন্য যে মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ধরনের আলাপ হইয়াছিল তাহাকে আমার চরিত্র ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এমন নিঃসন্দিগ্ধ মত প্রকাশ করিতে দেখিয়া ভাল লাগিবার কথা বটে। এ এমন এক ধরনের আত্মীয়তা যাহা অন্য কোনও উপায়ে প্রকাশ করা যায় না, বা অন্য কোনও ধরনের ব্যবহার দ্বারা ইহার স্থানও পূর্ণ হয় না।

বলিলাম—ধরে যখন ফেলেছ শান্তি, তখন মিথ্যে বলে লাভ নেই। বিয়ে এখনও করি নি।

শান্তি সগর্ব্বে বলিল—দেখুন, বললাম যে আপনাকে তখনই আমি চিনে ফেলেছিলাম, ঠিক কিনা ভাল করে বলুন এবার।

বলিলাম—তাহলে এখন আসি শান্তি—সভার পরে না হয় আসব এখন একবার। তোমার স্বামী কখন আসবেন ? আলাপ হলে বেশ আনন্দ হত। সন্ধ্যের পর ? বেশ, আমারও আসতে রাত আটটা বাজবে, বুঝেছ।

—এখানে আজ রাত্রে খাবেন কিন্তু, বলা রইল।

সভার পরে পুনরায় শান্তির ওখানে ফিরিতে প্রায় রাত্রি নয়টা বাজিল। শান্তির স্বামীর সঙ্গে আলাপ হইল—বেশ ভাল লোক। আমার আসিবার খবর শুনিয়া ভদ্রলোক বাছিয়া বাছিয়া বাজার করিয়াছেন, সব রান্না শেষ করিতে শান্তির বেশ সময় লাগিবে—রাত দশটার কমে রান্না সাঙ্গ হইবে বলিয়া মনে হইল না। শান্তি চা করিয়া দিয়া গেল। আমি বসিয়া তাহার স্বামীর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিলাম।

একবার শান্তি রান্নাঘর হইতে আসিয়া বলিল—বড্ড খিদে পেয়েছে ?

—ও জিনিসটির প্রাদুর্ভাব তোমাদের আতিথেয়তার কল্যাণে আদৌ হবার উপায় নেই।

এসে পর্য্যন্ত খাওয়া চলছে। তুমি নিরুদ্বেগে বসে রাঁধতে পার যতক্ষণ খুশি।

আহারাদির পরে শান্তি বসিয়া গল্প করিতে লাগিল। শান্তির স্বামী দু-একবার হাই তুলিয়া বলিলেন—আমার কাল খুব সকালে ডিউটি—যদি কিছু মনে না করেন, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি—

—বিলক্ষণ! শোবেন বই কি। আমিও তাহলে—

—শান্তি, তুমি বরং বসে গল্প কর। আমি যাই। এঁর বিছানা করে রেখেছ তো? মশারিটা খাটিয়ে দিও। ··স্বামী উঠিয়া চলিয়া গেলে শান্তি বলিল—ঘুম পেলে শুনছি নে কিন্তু। আজ সারা রাত বসে গল্প করতে হবে। কতকাল পরে দেখা!

—সারা রাত! বল কি!

হঠাৎ শান্তি বলিল—কেন না? আপনি আমায় কত কষ্ট দিয়েছিলেন জানেন?

আমি অবাক হইয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম—কিসের কষ্ট?

—কিসের কষ্ট জানেন না তো? জানবেনই বা কি করে। আচ্ছা দাঁড়ান দেখাচ্ছি। বলিয়াই সে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে একটি ছোট কাঠের বাক্স আনিয়া আমার সামনে খুলিল। একটা পত্র আমার সামনে ধরিয়া বলিল—দেখুন পড়ে।

পড়িয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমার মাসীমা পরলোকে গমন করিয়াছেন আজ দশ বছর কি তার বেশি। তাঁর হাতের লেখা খুব ভাল করিয়াই চিনি। মাসীমা শান্তির মাকে চিঠিতে আমার সহিত শান্তির বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন এই চিঠিতে।

বলিলাম—তুমি এ পত্র পেলে কোথায়?

—যেদিন এ পত্র এসেছিল, সেই দিনটি থেকে পত্রখানা আমার কাছে। আপনিও তার পর আর কখনও আজিমগঞ্জে যান নি। সেই শ্রাবণ মাসে যে চলে এলেন—এই আবার এত-কাল পরে দেখা।

—কিন্তু আমি এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতাম না একথা বললে তুমি কি বিশ্বাস করবে শান্তি?

শান্তি অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—জানতেন না মানে? সব জানতেন।

—কেন বল তো তুমি একথা বলছ?

শান্তি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—সব জানি যতীনদা, সব জানি। আমার চোখে আবার ধুলো দেবার চেষ্টা? একবার তো করে দেখলেন, ঠকে গেলেন নিজেই।

—কি চেষ্টা করলুম তোমার চোখে ধুলো দেবার?

—ওই যে বললেন বিয়ে করেছেন, চার মেয়ে হয়েছে। আমি আর জানি নে আপনাকে? বিয়ে আবার আপনি করবেন! কেন বিয়ে করেন নি, তাও কি আমার অজানা ভাবছেন? এক এক সময় তাই মনে হয়েছে, এই ষোল বছরের মধ্যে—যদি কখনও দেখা হয়, পায়ে ধরে আপনার কাছে মাপ চেয়ে নেব। আমি তো গিয়েছিই—আপনি কেন যাবেন সেই সঙ্গে?

—সেই কথাটা বলবার সুযোগ পেলুম এতকাল পরে।

বিস্ময়ে আমার মুখে কথা যোগাইল না। শান্তি বলে কি! এমন ভুলও মানুষের হয়? সমস্ত কথাটা বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় নয় এটা—তবুও এক চমকে ইহার মনের অনেকখানিই দেখিতে পাইলাম। সভা করিতে আসিয়াছি বিদেশে, আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া এতখানি দরদ দেখাইবার ঠিকমত কারণ আমি অনেক হাতড়াইয়া খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না—অনেকখানি পরিষ্কার হইয়া গেল এবার।

কিন্তু মেয়েটি কি ভুলই নিজের বুকের মধ্যে এই ষোল বছর পুষিয়া রাখিয়াছে! আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইল কতকগুলি কথা জানিবার। বলিলাম—আজ যখন এখানে এলাম, তুমি কি করে আমায় চিনলে এতকাল পরে?

—সভার জন্যে কাগজ ছাপিয়ে বিলি করেছিল—আপনার নাম দেখলাম। তা ছাড়া স্বরজিৎবাবুর ছেলে আপনার পরিচয় সেদিন দিচ্ছিল ওঁর কাছে আমাদের বাড়ী বসে। আমি তখনই ওঁকে বললাম, যতীনদা আমার বাপের বাড়ীর দেশের লোক। উনি বললেন, রায় বাহাদুরের বাড়ী আপনাদের চা খাওয়ার আয়োজন হয়েছে—তাই শুনে জানলায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

—দেখেই চিনলে এতকাল পরে?

—ওমা, কেন চিনব না! আপনারা আমাদের ভাবেন কি?

এখন ইহাকে ভাল করিয়াই মনে পড়িয়াছে—আমার কিছুদিনের বাল্যসঙ্গিনী একটি অত্যন্ত মুখরা, চঞ্চলা বালিকার ছবি। আবছায়াভাবে ইহার দু-একটি বাল্যলীলাও মনে পড়িতেছে।

বলিলাম—শান্তি, নিতাইয়ের মা সেই বুড়ো গিন্নীর শিব চুরির কথা মনে পড়ে?

শান্তি হাসিয়া বলিল—খু-উ-ব। চুরি করলেন আপনি আর ধনা—ধনাকে মনে আছে? —সে আজকাল পাটের কলে কাজ করে নৈহাটিতে, মধ্যে একদিন এখানে এসেছিল আজ বছর তিন চার আগে—আর গাল খেয়ে মলুম আমি আর ছোড়্দি।

—কেন, তোমরা তো সাহায্য করেছিলে, কর নি? পুজোর ঘরের শেকল তুলে দিতে বলেছিল বুড়ো গিন্নী—শেকল তুলে না দিয়ে বলেছিলে, দিয়েছ। আর একদিন তুমি জাঁতি দিয়ে আঙুল কেটে ফেলেছিলে মনে আছে? কেঁদেছিলে খুব।

শান্তি ছেলেমানুষের মত মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল—হ্যাঁ, কেঁদেছিলে খুব! ছাই মনে আছে। কাঁদবার মেয়েই আমি ছিলাম কিনা।

—তবু যদি আমার মনে না থাকত!

—কি মনে আছে শুনি?

—মনে আছে তুমি কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলে।

শান্তি অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া বলিল—ওমা, কি মিথ্যেবাদী!

আমার হাসি পাইল। বলিলাম—ছেলেবেলার মত ঝগড়া পাকিয়ে তুলছ শান্তি! অভ্যেস কি কখনও যায়!

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—আচ্ছা, যতীনদা—শিবতলার বটগাছে ডারা বেঁধে দিতে তো কি বছর পরীক্ষার আগে—খুলেছিলে কোনদিন ?

সত্যিই অনেক কথা দেখিতেছি মনে রাখিয়াছে শান্তি। আমার নিজেরই মনে ছিল না। মেয়েরা বড় মনে রাখে।

রাত অনেক। শান্তি বলিল—আর না যতীনদা, রাত হয়েছে, শুতে যান। যদিও আমার ইচ্ছে করছে আজ সারারাতটা আপনার সঙ্গে বসে গল্প করি। কাল সকালে উঠেই যেন চলে যাবেন না, খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে—

—কাল তা কি করে হবে শান্তি। কাল সোমবার, সব খোলা—খেয়ে যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে। আমি সকালে চা খেয়েই চলে যাব।

শান্তি কর্তৃত্বের সুরে বলিল—সে হবে এখন। সেজন্যে আপনার ভাবতে হবে না —কাল সকালে উঠে দুটো আপিসের ভাত দিতে আমার আর হাত পা খোঁড়া হয়ে যাবে না।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া ভাবিলাম ব্যাপারখানা। শান্তিকে প্রতারণা করিলাম বটে, স্বীকার করি সেটা বড়ই খারাপ কাজ, কিন্তু সত্য কথা খুলিয়া বলিলেই কি সে খুশী হইত ? ওর জীবনে হয়তো এইটুকু ভাবিয়াই উহার সুখ—কেন সে সুখটুকু নষ্ট করিবে ?

পরদিন সকালে না খাওয়াইয়া শান্তি কি ছাড়ে ! খুব ভোরে উঠিয়া এটা সেটা রাঁধিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সাড়ে আটটায় আমার গাড়ী। তার অনেক আগে সে আমার চার পাঁচ রকমের তরকারি করিয়া খাওয়াইয়া দিল।

পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আবার কবে আসবেন দাদা ?

—সময় তো পাই নে। তবে—ইয়ে—আসব বইকি।

হঠাৎ খপ করিয়া আমার হাত দুখানা তাহার দুই হাতের মধ্যে লইয়া আর্দ্র কণ্ঠে অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল—না দাদা, আমি সব জানি, সব বুঝি। আপনি যে নিজের জীবনটা এভাবে কাটিয়ে দিলেন, সেজন্যে আমার মনে তুষের আগুন জ্বলে দিন-রাত। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে, রাখবেন বলুন ?

—কি অনুরোধ বল শান্তি।

—আপনি বিয়ে করুন—করতেই হবে আপনাকে বিয়ে। আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়াবেন না। বলুন অনুরোধ রাখবেন ?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। এ কথার কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না।

শান্তি আবার বলিল—চুপ করে থাকলে হবে না ! আমার কাছে বলে যান।

—আচ্ছা, ভেবে দেখি শান্তি।

—বেশ, তা ভাবুন। এইটুকু যে বলেছেন এবার সেই যথেষ্ট। আবার এই মাঘ মাসে সরস্বতী পূজোর সময় আসবেন বলুন ?

—আচ্ছা, তা বরং—

—না, ওসব শুনব না। বরং টরং না, আসতেই হবে বলে দিলাম। আমি পথের দিকে চেয়ে থাকব—

—আসব।'

পথে উঠিয়া দেখি, শান্তি রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীর কাছে ঘটনাটা বলিব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না বলাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম।

কবি কুণ্ডু মশায়

আজ দশ বৎসর পূর্ব্বে এ ঘটনার প্রথম আরম্ভ। আমি খুব আশ্চর্য্য হয়েছি বলেই এ গল্প লিখতে বসেছি। পুজোর সময় প্রত্যেক লেখকের কাছেই সম্পাদকের তাগিদ যায় 'মশাই, গল্প দেবেন একটা যত সম্ভব হয়।'

এঁরা হলেন পেশাদার গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। হাতে পয়সা না পেলে এঁদের মন ভার হয়ে ওঠে, লেখনীও বিরূপ হয়। 'গল্প আছে, টাকাটা পাঠিযে দেবেন।' কেনই বা বলবেন না, লেখকদেরও তো খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে।

খুব বড একটা সাহিত্যসভায় বসে এই কথাটা মনে হয়েছিল। পত্রপুষ্পশোভিত তোরণদ্বার, মস্ত বড মণ্ডপ, বহু বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যামোদী জনগণের সমাগম, আদর-আপ্যায়নও যথেষ্ট। পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতনামা কত কবিযশঃপ্রার্থী হতভাগ্যদের সঙ্গে আমার কতবার পরিচয় ঘটেছে, কোনও সাহিত্যসভায় তাদের স্থান হয়নি কোনদিন। অথচ তাদের মধ্যে প্রকৃত কবিমন, কল্পনার উদার প্রসার, ছন্দের বা কোনও শব্দের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান নিতান্ত দুর্লভ নয়—কিন্তু তাদের নেই কি, তাও আমি জানি। তাদের নেই বর্ত্তমানের উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচনের ক্ষমতা। তাদের দৃষ্টি ১২৯০ সালেব বাংলায় পড়ে আছে আজও—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের, দাশরথি রায়ের প্রভাব তারা আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

সেবার গরমের ছুটিতে দেশে আছি।

রাত প্রায় এগারটা বাজে, বিছানায় ছটফট করার পবে একটু নিদ্রাকর্ষণ হয়েছে মাত্র।

—আছেন নাকি শ্যামবাবু?

এত রাত্রে অপরিচিত স্বরে কে ডাকে বুঝতে না পেরে বাইরে এসে বললাম—কোথা থেকে আসছেন?

অন্ধকার রাত। দেখলাম আগন্তুক বিনা আলোয় এসেছে, যেখান থেকেই আসুক। লণ্ঠন জ্বেলে বাইরে আবার গিয়ে আগন্তুকের চেহারা এবার ভাল করে দেখলাম। বৃদ্ধ লোক,

ষাটের কাছাকাছি বয়স, গায়ে আধময়লা পিরান, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো—বগলে এক তাড়া বই বা কাগজ।

আগন্তুক বলল—আমায় চিনতে পারলেন না? আমাকে সকলে কুণ্ডু মশাই বলে জানে। বসাকদের কাপড়ের গুদোমে কাজ করি বল্লভপুরের বাজারে। তা আপনারা দেশে ঘরে থাকেন না, গরমের ছুটির পরই চলে যাবেন—চিনবেন কি করে।

কথাটা সত্যি। দেশে থাকলে চিনতাম বই কি—দেশেরই লোক যখন। বললাম—কি জন্যে আসা হয়েছে?

—আপনি একজন রাইটার লোক, আমার লেখা কবিতা কিছু আপনাকে আজ শোনাতে এসেছি।

—ও, বসুন বসুন। সে বেশ কথা। দাঁড়ান একটা কিছু পাতি।

দস্তুরমত অবাক হয়ে গেলাম। বল্লভপুরের বাজার এখান থেকে দু মাইলের সামান্য কিছু বেশি, এত রাত্রে নিছক কবিতা শোনাতে লোকটা কষ্ট করে এতদূর এসেছে—না, এমন ব্যাপার যে দেখিনি আদৌ একথা বললে ভুল হবে—জীবনে বার কয়েক এ প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছে এবং আমি এদের ভালও বাসি।

এরা সরস্বতীর নিঃস্বার্থ সেবক, এরা যশ পায় না, অর্থ তো পায়ই না—লেখার নেশায় লিখে যায়, যশের পরিবর্তে পায় অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ—তবু মদ ধরলে যেমন ছাড়া কঠিন হয়, তেমনই কঠিন হয়ে পড়ে লেখার বাতিক মাথায় একবার ঢুকলে তাকে তাড়ানো।

এ সবই আমি জানি। বললাম যে, এ ধরনের লোক এর আগেও আমি দেখেছি। সুতরাং এঁকেও যত্ন করে বসালাম। বাড়ীতে থাকি আমি একা, দ্বিতীয় প্রাণী কেউ নেই—নতুবা একটু চা খাওয়ালে দেখাত ভাল। কুণ্ডু মশায় তাঁর দপ্তর খুলে তিনখানা মোটা খাতা বার করে পড়ে যেতে লাগলেন অবিরাম একটানা। এসব দলের লোকেরা তাই করে থাকে। আমি কতবার কত জায়গায় দেখেছি।

মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলছিলেন—কেমন লাগছে শ্যামবাবু?

—চমৎকার!

—হেঁ হেঁ—আপনারা রাইটার লোক, আপনাদের ভাল লাগলেই—। তার পর শুনুন এটা, 'সুভদ্রা-হরণ'—

—পড়ে যান।

একটানা চলেছে আবৃত্তির স্রোত—রাত বারটা বেজে গেল।

কুণ্ডু মশায় নাকের চশমা নামিয়ে আমার মুখের দিকে হাসি-হাসি মুখে চেয়ে বললেন—কেমন?

অর্থাৎ এটা আপনার ভাল লাগতেই হবে, উপায় নেই।

পুনরায় বললাম—চমৎকার!

এসব স্থলে এই জবাবই দিতে হয়, দেওয়া নিয়ম—অভিজ্ঞতা থেকে জানি।

—আচ্ছা এটা শুনুন—'বাণ রাজার প্রতি উষা'।

পুরাণ ভাল পড়া নেই, বললাম—বাণ রাজা কে ?

আমার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে চেয়ে কুণ্ডু মশায় বললেন—বাণ রাজার কথা জানেন না ? বাণ রাজার মেয়ে উষা, দৈত্যরাজ বাণ—

বাল্যকালে দৃষ্ট 'উষা-হরণ' নামে এক যাত্রার অভিনয় অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল। বললাম, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই যুদ্ধ হল, অনিরুদ্ধ-টনিরুদ্ধ—উষা-হরণ—

আমার পৌরাণিক জ্ঞানের অবস্থা বোধ হয় কুণ্ডু মশায়ের মুখে ক্ষীণহাসির রেখার সৃষ্টি করল। তিনি আবার পড়ে যেতে লাগলেন। সাড়ে বারটা—পৌনে একটা। তিন চারটি কবিতা ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলে কুণ্ডু মশাই এবার ওঠবার জোগাড় করবেন বলে মনে হল। আমার দিকে চেয়ে বললেন—দোকানের কাজ করি সারাদিন, ফুরসত পাই নে। আপনারা কলকাতায় থাকেন, রাইটার লোক—আপনাদের শোনালে মনটা তৃপ্ত হয়। আর কাকে শোনাব বলুন—সব মুখ্যুর দল—

—আপনি বুঝি কাপড়ের দোকানে কাজ করেন ?

—হ্যাঁ, খাতাপত্তর লিখি। রাত দশটার সময় ছুটি পেয়ে আহারাদি সেরে তবে আপনার কাছে আসছি। একটু শুনিয়ে মনটা ভাল হয়।

—কতদিন থেকে লিখছেন ?

—বাল্যকাল থেকে। পাঠশালায় যখন পড়ি, হাতের লেখার খাতায় কবিতা লিখতাম। গুরু মশায়ের কত বেত খেতে হয়েছে সেজন্যে, মশায়। এখনও তাই। কেউ বোঝে না। দোকানে যাদের সঙ্গে কাজ করি, তারা সবাই আমাকে খুব মানে, ভয় করে চলে—ভাবে, কবিতা লেখে এ মস্ত পণ্ডিত। যা লিখি, তাই ভাল বলে। আমার তাতে তৃপ্তি নেই—যত গণ্ডমুখ্যুর দল, ভাল বললেই বা কি, আর মন্দ বললেই বা কি !

ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতরতানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ ॥

আমার হয়েছে ভাগ্যে প্রত্যেক দিন মশাই ওদের সঙ্গে কারবার—অরসিক নিয়ে রসের কারবার। আমার ভাল লাগে মশাই, বলুন দিকি আপনি ?

—আপনি রবি ঠাকুরের নাম শুনেছেন ?

—হ্যাঁ শুনিছি মশাই। রবি ঠাকুর মস্ত বড় কবি। কোথায় যেন বাড়ী, যশোর না বীরভূম—

—কোনও কবিতা পড়েছেন তাঁর ?

—আজ্ঞে না।

কুণ্ডু মশায় বিদায় নিয়ে উঠলেন রাত একটার সময়।

•

এর পর আমার ছুটি ফুরিয়ে গেল—কলকাতায় কর্মকোলাহলের মধ্যে কুণ্ডু মশায়ের কথা ভুলেই গেলাম একরকম। বড়দিনের ছুটিতে দুদিনের জন্যে বাড়ী গিয়ে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি যে দোকানে কাজ করেন, সে দোকানের মালিক ও অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট ধনী, জাতিতে তাঁতি—ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, তবে লেখাপড়া কিছু তেমন জানেন না। লোকটি সজ্জন, রায় সাহেব খেতাব পেয়েছেন।

রায় সাহেবের বাড়ী কি-একটা কাজ উপলক্ষে আমিও নিমন্ত্রিত। সেখানেই কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে আমার পুনরায় সাক্ষাৎ। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের পান-বিড়ি বিতরণে তাঁকে ব্যস্ত দেখা গেল। আমি একবার বললাম—কি কুণ্ডু মশায়, ভাল তো?

আমার দিকে চেয়ে তিনি একবার হাসলেন মাত্র, ব্যস্ত বলে আমার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ তাঁর তখন হল না।

রায় সাহেব হেঁকে বললেন—কুণ্ডু মশায়, চা দেওয়া হয়েছে কি না সকলকে দেখুন একবার বাইরে গিয়ে।

আহারাদির পরে দেখি সদর দরজায় কুণ্ডু মশায় দাঁড়িয়ে। বললেন—কাল বাড়ী থাকবেন নাকি?

—হ্যাঁ থাকব।

—কাল যাব একবার আপনার কাছে।

—নিশ্চয়ই আসবেন। লেখাটেখা আছে নাকি কিছু?

—অনেক লিখে ফেলেছি তার পর। শোনাব।

কিন্তু বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে তার পরদিন আমাকে চলে যেতে হল অন্যত্র। কুণ্ডু মশায়ের কবিতা শোনবার সুযোগ সেবার আমার হয় নি।

•

এক বৎসর পরে আবার দেশে গিয়েছি। বর্ষাকাল, পথে-ঘাটে এক হাঁটু জলকাদা। বল্লভপুর ছাড়িয়ে নদীর ধারে বাবলাতলায় দেখি কে বসে মাছ ধরছে। আমি রাস্তা থেকেই পাড়াগাঁয়ের ধরনে জিজ্ঞেস করলাম···কি মাছ হল?

লোকটা আমার দিকে পেছন ফিরে চাইতেই দেখি কুণ্ডু মশায়।

—কুণ্ডু মশায়, মাছ, ধরতে এসেছেন নাকি? ভাল সব?

কুণ্ডু মশায় আমায় দেখে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে যুক্তকরে বললেন—প্রাতঃপ্রণাম। এই আসছেন বুঝি?

—কি মাছ পেলেন?

—আজ্ঞে, মাছ ধরছি নে তো। এই এমনি একটু বসে—মানে—একটু আধটু লিখছি—

কৌতূহল হওয়াতে রাস্তা ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি কুণ্ডু মশায় ভিজে ঘাসের ওপর কাঁচা

ডালপালা ভেঙে পেতে বসেছিলেন—পাশেই একখানা মোটা পুরনো রোকড় কি খতিয়ানের খাতা। একটা শরের কলম ও পাঠশালার ছেলেদের মত দড়ি-বাঁধা দোয়াত, যাতে ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। একখানা মসীলিপ্ত ব্লটিং কাগজ মাটির ঢেলা-চাপা এক পাশে।

—বাঃ এ যে কবিকুঞ্জ বানিয়ে তুলেছেন দেখছি।

—আজ আর দোকানে যেতে ভাল লাগল না। অনেকদিন বর্ষার পরে আজ একটু রোদের মুখ দেখা গিয়েছিল—এখন আবার মেঘ করেছে। বলি, যাই নদীর ধারে বসে··· লেখার নেশা মাথায় একবার চাপলে—

—একটু শোনান কুণ্ডু মশায়। না শুনে আর যাচ্ছি নে।

কুণ্ডু মশায়ের কবিতার খাতা একখানা প্রাচীন খতিয়ান। খানিকটা পড়ে শোনালেন, কয়েক লাইন মনে আছে—

যদুকুলবধূ চতুরঙ্গিণী সহায়ে
কৃষ্ণতুল্য সুভদ্রারে সারথি করিয়া
আরোহিয়া কপিধ্বজে অর্জ্জুনসমান
গাণ্ডীব কোদণ্ড ধরি উতরিব রণে।
শিখণ্ড আমার জ্যেষ্ঠ, তারে নারী ভাবি।
ধরে না ধনুক ভীষ্ম ;···(মনে নেই)
ভূমণ্ডল অকৌরব করিবে দ্রৌপদী।

মজানদীর পাড়ে বিকেলে বসে বেশ ভাল লাগল। বললাম—চমৎকার! আপনার শব্দ সাজাবার ক্ষমতা, ধ্বনির জ্ঞান, সব চমৎকার। দ্রৌপদী যুদ্ধযাত্রা করতে চাইছেন বুঝি?

কুণ্ডু মশায় হেসে বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু কোন জায়গায় বলুন তো?

মাথা চুলকে বললাম—তা তা—কই ঠিক তো বুঝতে পারছি নে—

কুণ্ডু মশায় আমার উত্তরের দিকে কান না দিয়ে বললেন—শুনে যান আর একটু—

শত তীক্ষ্ণ শর
মম করোন্মুক্ত যবে উঠিবে উড়িবে
গৃধ্রপংক্তি সম ব্যোমে শোণিতপিপাসু,
দেখিব কি করি করে ব্রতরক্ষা তাঁর
দেবব্রত। রণচণ্ডী শিখণ্ডী-ভগিনী
আখণ্ডলে রক্ষিলেও ছাড়িবে না তাঁরে।

হাসি-হাসি মুখে বললেন—কেমন?

—এ আর বলতে! আমার খুব সৌভাগ্য যে, আজ কবির মুখে—কি ঝঙ্কার!

কুণ্ডু মশায় বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বললেন—অমন কথা বলবেন না, আপনারা রাইটার লোক—

—ভাষার উপর সমান অধিকার সব লেখকের থাকে না। আপনার তা আছে কুণ্ডু

মশায়। আর আপনি একজন সত্যিকার কবি। নয় তো পালিয়ে এসে এই নদীর ধারে বসে আপন মনে—

কুণ্ডু মশায় পাশের একটি থেলো হুঁকোয় তামাক সাজছিলেন এতক্ষণ। আমায় বললেন —খান ?

—না। আপনি খান।

হুঁকোয় বেশ আরামে টান দিয়ে বৃদ্ধ এমন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওপরের দিকে চাইলেন, যেন জীবনের এক বড় আনন্দের সম্মুখীন হয়েছেন—অর্থাৎ থেলো হুঁকোটিতে টান দেবার অবকাশ পেয়েছেন।

বললেন—আমার মাথায় যখন লেখার নেশা চেপে যায়, তখন আর কিছুই ভাল লাগে না। পালিয়ে আসতেই হবে—একটু ফাঁকা নির্জ্জন জায়গা খুঁজতেই হবে।

—আপনার বাসা তো নির্জ্জন ? আপনি তো একাই থাকেন শুনেছি ?

—মোটেই না। কাপড়ের গদির সাতজন কর্ম্মচারী সব এক ঘরে থাকি। সব কজন সমান গোলমাল করে। সেখানে বসে লেখা ··কাল আসবেন দয়া করে ? দেখবেন ?

পরদিনই কুণ্ডু মশায়ের বাসায় গেলাম। কুণ্ডু মশায় এক বর্ণ অতিরঞ্জিত বলেন নি। বসাকদের কাপড়ের গদির পেছনে অতি অন্ধকার, প্রায় জানালাবিহীন নাতিক্ষুদ্র একটা ঘরে চারখানি সরু সরু তক্তপোশ পাতা। প্রত্যেক তক্তপোশে কাপড়ের গাঁটবাঁধা চট আগে পেতে তার ওপর অতি মলিন শয্যা বিস্তৃত। বালিসগুলো থেকে চিমটি কাটলে তেল আর ময়লা ওঠে। ঘরে আড়া-আড়ি অনেকগুলো দড়ি টাঙানো—তাতে ময়লা ও আধময়লা লুঙ্গি, ন-হাতি কাপড়, সেলাই করা পুরনো কাপড় ছড়িয়ে দেওয়া। একটা তক্তপোশের তলায় একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপর এক জোড়া নতুন বাদামী রঙের ফিতে-আঁটা জুতো সযত্নে তোলা। দেওয়ালে পেরেক দিয়ে আঁটা বিবর্ণ পুরনো খবরের কাগজ। তার ওপরে কাঠের ছোট আলনায় দু-একটা ছিটের কফ-আঁটা কামিজ, কোনটায় কুষ্টিয়ার ছিটের একটা আলোয়ান। সমস্ত ঘরটা স্থূলত্ব, নোংরামি, কুশ্রীতা, রুচিহীনতার একখানি সুস্পষ্ট ছবি।

একপাশের তক্তপোশে জনচারেক লোক বসে তাস খেলছে, কারও গা খোলা, কারও গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। আমার প্রশ্নের উত্তরে একজন বললে, কুণ্ডু মশায় গদি থেকে ফেরেন নি। একজন কুণ্ডু মশায়ের খাটখানা আমায় দেখিয়ে দিলে। তাঁর বালিস ততোধিক ময়লা, উপরন্তু একটা ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ বসবার পরে তাস-খেলোয়াড়দের হর্ষধ্বনি ও চীৎকার আমার নিকট অসহ্য মনে হওয়ায় একটু বাইরে যাব ভাবছি, এমন সময় কুণ্ডু মশায় ঘরে ঢুকলেন।

ওদিকে খেলোয়াড়দের একজন বলে উঠল—ও দাদু, তোমার ইলিশ মাছ সব কাম খেয়ে —এই দেখ !···বক্তা মুখে পুরে দেবার অভিনয় করে ব্যাপারটা বোঝালে।

আর একজন বললে—এত দেরি হল কেন ? বাবুর হাতে নাকানিচোবানি খেয়েছ কেমন, বল ?

আমার দিকে চেয়ে কুণ্ডু মশায় বললেন—আপনি যে! আপনি যে এখানে আসবেন, তা ভাবি নি। বসুন, ছুটো খেয়ে আসি। এখন ছুটি পেলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে—

বেলা আড়াইটে উত্তীর্ণ প্রায়। ক্ষুধার্ত্ত বৃদ্ধকে আমি একটুও দেরি করতে দিলাম না। বললাম—যান শীগগির যান, আহার করে আসুন।

কুণ্ডু মশায় চলে গেলে আমি তাস-খেলুড়েদের উদ্দেশ করে বললাম—এখানে খাওয়া হয় কোথায়?

একজন বললে—এই ঘরের পর উঠোন, তার ওদিকে রান্নাঘর। গদির ঠাকুর আছে, সেই রাঁধে।

—কি রকম খাওয়ায়?

—সে কথা আর ওঠাবেন না দাদা। উরস্থনি ডালের জল, এই এতটুকু খয়রা মাছ কি তিৎপুঁটির ঝোল, একটা লাল ডাঁটা দিয়ে কুমড়ো দিয়ে ঘ্যাঁট—ছিঃ—মানুষের যুগ্যি নয়।

একজন বলে উঠল—পরের পয়সায় খেতে আর কত দেবে বল? ওই যা পাচ্ছ, তাই ঢের।

কুণ্ডু মশায় পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করে এলেন, তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারা গেল। তার পর কাপড়ের গাঁট-বাঁধা চটের উপর শ্রান্ত দেহ প্রসারিত করে আমার দিকে চেয়ে বললেন—এখানে এসে বসুন।

—চলুন না দীঘির ধারে গিয়ে একটু বসা যাক।

—আজ আর ছুটি নেই, কলকাতা থেকে মহাজন আসবে এই ট্রেনে, হিসেব ঠিক করে দিতে বলেছেন বাবু—ও গোষ্ঠ, পাইকেরী মালের ফিরিস্তিগুলো করে ফেল গিয়ে—বসে তাস পিটলে চলবে না।

এমন সময়ে হঠাৎ হল্লা ও হাসি মন্ত্রমুগ্ধবৎ থেমে গেল।

রায় সাহেব ঘনশ্যাম বসাকের স্থূল, চিক্কণ, সুখাদ্য-পরিপুষ্ট দেহ দোরের কাছে দেখা যেতেই তাস-খেলোয়াড় কজন এবং কুণ্ডু মশায় তড়াক করে চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

রায় সাহেব বললেন—এত গোলমাল কিসের কুণ্ডু মশায়?

ঘরের মধ্যে সকলের অবস্থা তখন হঠাৎ হেডমাস্টার ক্লাসে ঢুকলে কোলাহলরত স্কুলের ছাত্রদের মত। সবাই পাষাণ-মূর্ত্তির মত একদম জমে গেল। আমাকে ঘরের মধ্যে দেখতে পেয়ে রায় সাহেব বললেন—এই যে, শ্যামবাবু যে—এখানে আপনি?

—একটু কুণ্ডু মশায়ের কাছে দরকার ছিল।

—কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে আপনার বনবে ভাল। কুণ্ডু মশায় শুনেছি কবিতা লেখেন। মানে, লোকটা ছিল ভালই, কিন্তু ওর মাথায় কি পোকা আছে—থাকে থাকে, ফট করে একদিন দেখি গদিতে নেই। কোথায় গেল? বসে নাকি কোথায় কবিতা লিখছে। আমার গদির কাজ চলে কি করে? কবিতা-লিখে তো পেট ভরবে না দাদা। কি বলেন?

তা বটে।

রায় সাহেব কুণ্ডু মশায়ের দিকে চেয়ে বললেন—যাও সব, শদিক্তে যাও। এখানে হল্লা করবার জন্তে তোমাদের রাখা হয় নি—কবিতা লেখবার জন্তেও নয়। যাও—কুণ্ডু মশায়, মহাজনের দেনাপাওনার হিসেবটা বেলা পাঁচটার মধ্যে ঠিক করে ফেল গিয়ে। যাও সব।

পরে ঘরের চারিদিকে অপ্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়ে বললেন—নিজেরা থাকে—অথচ ঘরদোর বিছানাপত্তর কি নোংরা করেই রাখে—রামোঃ। ওসতীশ, দশগজা ফুলন শাড়ীর একজোড়া কাল হিসেবের খাতায় ওঠে নি কেন?

সতীশ-নামধেয় লোকটি এতক্ষণ তাসের আড্ডায় বেশি চেঁচামেচি করছিল। সে যেন অতিরিক্ত বিস্ময়ে হঠাৎ কাঠ হয়ে বললে—সে কি বাবু! দশগজা ফুলন শাড়ী কাল কে বিক্রি করলে? এই তো কুণ্ডু মশায়, জানেন?

কুণ্ডু মশায় নিজের গা থেকে ঝেড়ে ফেলে বললেন—আমি কি জানি বাপু। আমি খতেন রোকড় নিয়ে আছি, তোমাদের খুচরো বিক্রির তবিলে কি হয় না হয়—

রায় সাহেব বলিলেন—সব চোরের আড্ডা হয়েছে। ভাত-কাপড় দিয়ে চোর পোষা। আচ্ছা, আজ ধরা পড়লে তাকে আমি জবাব দেব, নয় এক মাসের মাইনে কাটব।

রায় সাহেব চলে গেলেন।

এই হল কুণ্ডু মশায়ের প্রতিদিনের জীবন। এই অত্যন্ত স্থূল আবহাওয়ার মধ্যে একটি কবিপ্রাণ কিভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে, তা আমার অভিজ্ঞতায় লেখা নেই। কুণ্ডু মশায়ের এই বয়সেও যে সজীবতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরিস্ফুট, ছাইপাঁশ আহারেও তাঁর যে তৃপ্তি, এত হট্টগোল ও অপমানের মধ্যেও তাঁর যে আনন্দ—এ সবের জন্য সমঝদার লোকমাত্রেই তাঁকে হিংসে না করে পারবে না।

তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ আর অনেকদিন হয় নি।

•

এর প্রায় পাঁচ বছর পরের কথা। অন্য জায়গায় কাজ করি বলে দেশে আসা ঘটে নি অনেকদিন। দেশের বাড়ীঘর ভেঙে গিয়েছিল, মিস্ত্রি লাগিয়ে মেরামত করছি।

—এই যে শ্যামবাবু, প্রাতঃপ্রণাম!

চেয়ে দেখি, কুণ্ডু মশায়। আরও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন, মাথায় আর এক গাছাও কাঁচা চুল নেই। সেই পুরনো ধরনেই বেনিয়ান গায়ে।

—কি ব্যাপার কুণ্ডু মশায়? ভাল আছেন বেশ? খবর কি?

—বাবু পাঠিয়ে দিলেন। আপনি বাড়ী করবেন,—চুন সিমেণ্ট নেবেন আমাদের নতুন আড়ত থেকে। দর সস্তা।

—ও। কে, ধনশ্যামবাবুরা চুনের আড়ত খুলেচেন বুঝি?

—চুন, সিমেণ্ট, মগরার বালি—

—বেশ বেশ। বসুন।

—না, আর বসব না। অনেকক্ষণ বেরিয়েছি বাড়ী থেকে।

—কবিতা লেখা-টেখা হয় কি আর?

—আপনি আছেন তো এখন; আসব একদিন।

বলে সামান্ত কয়েক পা গিয়েই ফিরে এসে বললেন—ভাল কথা, পকেটেই আছে, আজ আপনার এখানে আসতে আসতে বটতলায় বসে লিখলাম কটা লাইন—

প্রকৃতির কোলে শুয়ে সৌন্দর্য্যে ভাসায়ে আঁখি
সাধ হয় অনিমেষে শুধু যেন চেয়ে থাকি।
নীরবে নিঝুমে সেথা কি যেন মুখের পরে
স্বপ্নরেণু কিংবা মায়া নিয়ত ঝরিয়া পড়ে।
পরমাণু নিভে যায় ভাঙিয়া জড়ের কারা;
কে তুমি ডাকিছ মোরে করিয়া পাগলপারা?

কুণ্ডু মশায়কে কোলে তুলে নিয়ে নাচবার ইচ্ছে হল, ব্রাহ্মণ না হলে পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিতাম। বললাম—এই কটা লাইন এইমাত্র লিখলেন পথে আসতে আসতে?

কুণ্ডু মশায় হেসে বললেন—বটতলার ছায়ায় বসে, খানিকটা আগে।

—আপনি ঘনশ্যামবাবুর দোকানে কাজ করেন বটে কিন্তু আপনি সে জায়গায় উপযুক্ত নন। কবিতায় আর্টের কোন দরকার নেই। আপনার মনের আনন্দের অনুভূতিকে ধ্বনি ও ঝঙ্কারের মধ্যে প্রকাশ করছেন এবং সফল হয়েছেন, সেইটেই বড় কথা। আমি আপনার মনের সেই সময়ের অনুভূতিকে ওই কটা কথার মধ্যে দিয়ে নিজের মনে ধরতে পারছি—ওই হল কবিতা।

চুন কিনতে গিয়ে রায়সাহেবের দোকানে বসলাম খানিকটা। মস্ত বড় গদি, লোকজন খাটছে, নানারূপ ব্যবসাদারী শব্দ ও বোল উত্থিত হচ্ছে—'ছএর দাগের নিয়ে এস', 'বাইশ শ বাইশ রেলি দশ জোড়া', 'মিহি জরিপাড় চন্দননগর', 'খতেনের আঠাশ্বর পাতা' ইত্যাদি। পাইকারী ক্রেতাদের বড় ভিড় লেগেছে, ঝম্ ঝম্ টাকার শব্দ উঠছে—ওদিকে গদির এক পাশে আনকোরা টাটকা দশটাকার নোট তাড়াবন্দী হচ্ছে।

ঘনশ্যামবাবুকে একপাশে বসে থাকতে দেখে কাছে গেলাম। গত পাঁচ বৎসরে রায় সাহেবের বয়স যেন পনের বছর বেড়েছে। আমায় বললেন—আসুন, বসুন শ্যামবাবু, অনেকদিন দেখি নি।

—ভাল আছেন?

—ভাল কোথায়? আজ বছরাবধি ভুগছি নানা অসুখে। আর এইবার বোধ হয় চললাম—

—না না, সে কি কথা! আপনার বয়েসটা কি!

—আপনি জানেন না, দুটি হাজার টাকা খরচ করেছি এক বছরের মধ্যে। কিন্তু

সারবার নামটি নেই, বেড়েই চলেছে। দোকানে আসি যাই—মনেও বল পাই নে, শরীরেও না। ডাক্তারের কথায় মাগুরমাছের ঝোল খাই, কাঁচকলা আর পটল দিয়ে—একবেলা দুখানি সুজির রুটি।

—কোথাও চেঞ্জে যান না কেন?

—ব্যবসা ফেলে যেতে পারি নে। আবার নতুন চুন সিমেন্টের আড়ত খোলা হয়েছে, এসব কার ওপর দিয়ে—

রায়সাহেবের কথার সুরে এবং মুখের চেহারায় একটা জিনিস বেশ সুস্পষ্ট হল আমার কাছে, তাঁর মনে আনন্দের অভাব এবং একটা ভয়ের ভাব। কথাবার্ত্তার মধ্যে কণ্ঠের যে মিহি-সুর ধ্বনিত হচ্ছে, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মৃত্যুভয়, জড়িয়ে রয়েছে নৈরাশ্য ও মূঢ় অন্ধতা। এত ঐশ্বর্য্য থেকেও ভোগের তৃপ্তি নেই।

যতক্ষণ আমি সেখানে বসে ছিলাম, ঘনশ্যামবাবুর মুখে আমি আনন্দের রেখা খোঁজবার বহুবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি। আনন্দের পরিবর্ত্তে বরং ভয়টা এত বেশি দেখেছি যে লোকটার কাপুরুষতার ওপরে আমার ঘৃণা জন্মেছে। এত টাকা থেকেও লোকটা সত্যিকার অসুখী। বাইবেলের সে বাণী মনে পড়ল—Men cannot live by bread alone—জীবনের বড়-পুঁজি নেই যেখানে, সেখানে শুধু টাকার পুঁজি মানুষকে অমৃতের পুত্রত্ব দান করে সাধ্য কি তার?

তারও চার বৎসর পরে এবারের কথা।

বাড়ীতে এসেছি দশ-বার দিন কি তার বেশি। কাজের গোলমালে অন্য কোথাও যেতে পারি নি—কেবলমাত্র একদিন বল্লভপুর বাজারে অতি অল্প সময়ের জন্যে রায়সাহেবের গদিতে গিয়েছিলাম। কুণ্ডু মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল এই পর্য্যন্ত, কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু হয় নি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে বসে আছি, একজন লোক এসে বললে—শ্যামবাবু এ বাড়ীতে থাকেন? লোকটার খালি পা, হাতে একটা লাঠি আর হারিকেন লণ্ঠন।

—কোথা থেকে আসছ?

—আজ্ঞে বাবু, প্রণাম হই। বল্লভপুরের আড়তের কুণ্ডু মশায় আপনাকে ডেকেছেন। তিনি বাঁচেন না, আপনাকে এখুনি যেতে হবে।

—কুণ্ডু মশায় বাঁচেন না! কেন, কি হয়েছে তাঁর?

—বাবু, তিনি আজ সাত দিন শয্যাগত। জ্বর, কাসি—

—তা আমি তো ডাক্তার নই? আমি কেন যাব?

—তিনি সন্ধ্যে থেকে কেবল আপনার কথা বলছেন। আমায় বলে দিলেন, যে-করে হোক নিয়েই আসতে হবে তাঁকে।

আমি একটু বিরক্ত না হয়ে পারলাম না। অনেক দিনের অদর্শনে কুণ্ডু মশায়ের ওপর

পূর্ব্বের আন্তরিকতা অনেকখানি চলে গিয়েছে। তবুও গেলাম। মুমূর্ষু বৃদ্ধের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। সেই আড়তের ঘরের সেই বিছানাতে কুণ্ডু মশায় শুয়ে। মাথার শিয়রে কেবল একটা ছোকরা বসে আছে—ঘরের মধ্যে আর কেউ নেই। একটা লণ্ঠন আধ-নেবানো ভাবে জ্বলছে ঘরের মেজেতে। একটা বাটিতে আধবাটি জল-বার্লি। গোটাকতক কাগজি নেবুর খোসা লণ্ঠনের পাশে।

কুণ্ডু মশায় বোধ হয় ঘুমুচ্ছিলেন কিংবা অর্দ্ধচেতনভাবে শুয়ে ছিলেন। ছেলেটি ডাকলে—ও দাদু, দাদু, বাবু এসেছেন—

কুণ্ডু মশায় চমকে বলে উঠলেন—অ্যাঁ—

—ঐ সেই বাবু এসেছেন—

ততক্ষণ আমি গিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছি। কুণ্ডু মশায় হাতের ইঙ্গিতে আমায় বসতে বললেন। আমি বিছানার একপাশেই বসে বললাম—কি হয়েছে কুণ্ডু মশায়? জ্বর নাকি?

প্রায় এক মিনিট কুণ্ডু মশায়ের কাছ থেকে কোন উত্তর পেলাম না। তার পর ক্ষীণ স্বরে বললেন—আর কি, এবার চললাম শ্যামবাবু—

আমি ভরসা দেওয়ার সুরে বললাম—সে কি কথা। এখনও কত কবিতা শোনাবেন আমাদের—যেতে দেব কেন?

কুণ্ডুমশায়ের মুখে অস্পষ্ট লণ্ঠনের আলোয় যেন ক্ষীণ হাসির রেখা দেখতে পেলাম। বললেন—ডাক এসেছে। আপনার কাছে একটা অনুরোধ—সেইজন্যে—

—বলুন, বলুন।

—এই ছেলেটি দেখছেন—বড় সৎ, বাবুদের গদিতে কাজে ঢুকেছে এ বছর, ছেলেমানুষ—ওই দেখে।

আমি ছেলেটিকে বললাম—তোমার নাম কি?

—সুশীল।

—এই ঘরের আর সব লোক কোথায়?

—সব পালিয়েছে। দুজন কাল ছুটি নিয়ে দেশে গিয়েছে, দুজন দোকানঘরে শুয়ে আছে বারান্দায়।

কুণ্ডু মশায় যেন মাছি তাড়াচ্ছেন মুখের কাছ থেকে—দুর্ব্বল হাতে দু একবার এমনি ভঙ্গি করে চুপ করে রইলেন। প্রায় দশ মিনিট ঘরের মধ্যে কোন শব্দ নেই। তার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন—আমার খাতাগুলো—

বুঝতে না পেরে বললাম—খাতা?

—কবিতার খাতাগুলো আপনার হাতে দিয়ে যাব। বড় আদরের! ছেলেমেয়ে নেই! ওই ছেলেমেয়ে। খাতাগুলো—থেমে থেমে যেন হাঁপাতে হাঁপাতে কুণ্ডু মশায় কথাগুলো শেষ করলেন।

—ব্যস্ত হবেন না। স্থির হয়ে শুয়ে থাকুন। আচ্ছা সে হবে—সেগুলো কোথায়?

কুণ্ডু মশায় স্তিমিতনেত্র হয়ে শিয়রে উপবিষ্ট ছোকরার দিকে তাকাবার চেষ্টা করলেন। ছেলেটি তখনই নিজে থেকে বললে—উনি আমায় সন্ধ্যেবেলা বলেছিলেন গুছিয়ে রাখতে—ওঁর তোরঙ্গ থেকে বের করে রেখেছি।

কুণ্ডু মশায় বললেন—এঁর হাতে দাও।

আমি হাতে নিয়ে বললাম—পেয়েছি। এগুলো কি করব বলুন আমায়।

আবার তিন চার মিনিট কেটে গেল—রোগী নিরুত্তর। তারপর আমার হাতে দুর্ব্বল হাত তুলে দিয়ে বললেন—আপনার কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন। ওদের যত্ন আর কোথাও হবে না। ভার নিলেন?

—নিলাম, ভাববেন না।

কুণ্ডু মশায় দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললেন—আর কোন ভাবনা নেই। মরণে ভয় করি নে, বয়েস হয়েছে। এই খাতাগুলো—। শেষের দিকের কথাগুলো যেন কুণ্ডু মশায় আপন মনেই বললেন।

এই তাঁর শেষ কথা। আমি সারারাত বসে ছিলাম তাঁর শয্যাপার্শ্বে। রাত্রিশেষে কুণ্ডু মশায় মারা গেলেন। শবানুগমনের সময় আমি সঙ্গে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করলাম। আমারই অনুরোধে তাঁর প্রিয় মজা খালের ধারে তাঁর দাহকার্য্য সমাধা হল। চিতার ওপর আমি আমার নিজের হাতে বন্য ছোটগোয়ালে লতার ফুল নিকটবর্ত্তী ঝোপ থেকে তুলে এনে ছড়িয়ে দিলাম।

ম্যার সাহেবের সঙ্গে দিন চারেক পরে দেখা। আমায় বললেন—আপনি সেদিন শুনলাম খুব করেছেন। লোকটা নিজের দোষেই মারা গেল।

সঞ্চয়

অতুল স্ত্রীকে ডেকে বললে—সে টাকা কোথায় গেল? বাক্সের মধ্যে যে টাকা ছিল?

স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের বৌ, স্বামীকে বেশ ভয় করে। সম্প্রতি টাইফয়েড থেকে উঠে অনেক কথাই মনে করে রাখতে পারে না।

ভয় পেয়ে বললে—কেন, বাক্সের মধ্যে তোয়ালে-বাঁধা ছিল—নেই?

—দেখছি নে তো। তুমিও দেখ না খুঁজে।

যা গিয়েছে তা আর পাওয়া যায় না। সে টাকাও পাওয়া গেল না। বাক্সের মধ্যে তো নেইই—কোথাও তা নেই। বিমলা সারা দুপুর ধরে শত জায়গায় খুঁজেও তার কোন কিনারা করতে পারলে না। সন্ধ্যার সময় ম্লান মুখে এসে স্বামীকে বললে—সে তো পেলাম না?

—পাবে না আমি জানি। আমার জিনিসে তোমাদের কোন মায়া নেই। যেদিন নিরুপমা (প্রথম পক্ষের স্ত্রী) গিয়েছে, সেদিনই সব গিয়েছে। তোমার বাক্সে অতগুলো টাকা রইল ; কাপড় আছে, সায়া-সেমিজ, পাউডারের কৌটো ঠিকই রইল—তোয়ালে-বাঁধা টাকাটাই গেল চুরি !

সন্থ টাইফয়েড থেকে উঠেছে বিমলা।

তার অধিকাংশ কথাই মনে থাকে না। তোরঙ্গের মধ্যে তার জামাকাপড় সাবান এসেন্স ছিল সবই সত্যি বটে, কিন্তু সে ভেবে দেখলে গত তিন মাসের মধ্যে সে রোগশয্যায় পড়ে ছিল মাস দুই—মরণের দ্বার থেকে ফিরে এসেছে তাও সে জানে। স্বামীই সর্ব্বদা শিয়রে বসে পাখার বাতাস করে, মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলে, কত রকমে সেবা শুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে—একথা তার ভাসা-ভাসা মনে আছে। অসুখ সেরে উঠে আজ দিন কুড়ি সে বাপের বাড়ী এসেছে—সেই তোরঙ্গটাও এখানে এসেছে সঙ্গে।

অসুখের আগে একদিন অতুল খাজনা আদায় করে অনেকগুলো টাকা আনে। বিমলা বায়না ধরলে—ওগো, কিছু টাকা আমায় দাও—দিতেই হবে—ছাড়ব না কিছুতেই।

অতুল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অন্যায় আবদারে একটু বিরক্ত না হয়ে পারলে না। সংসার-খরচের টাকা, জমাবার মত বেশি টাকা যদি থাকত তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তা যখন নেই অত বড় মেয়ের বোঝা উচিত। কিন্তু স্ত্রী বায়না ধরলে ছেলেমানুষের মত—এ টাকাগুলো আমি আমার বাক্সে তুলে রাখব—দাও আমাকে, ওগো ?

অতুল পাঁচটি টাকা অন্য খরচের জন্য রেখে বাকি টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। অতুলেরই একটা আধ-ময়লা রুমালে বিমলা টাকাগুলো বেঁধে তাকে ছোলার কলসীর মধ্যে রেখে দিল।

রাত্রে অতুল বললে—টাকা কোথায় রেখেছ ?

—তাকে, ছোলার কলসীর মধ্যে।

—থাক, ভাল জায়গা। কেউ টের পাবে না।

এর কিছুদিন পরে বিমলা পড়ল শক্ত টাইফয়েডে। দুদিন পাঁচদিন করে যখন আঠার দিন কেটে গেল—তখন বাড়ীর ঝি একদিন বিমলার ভাগ্নীকে বললে—দিদিমণি, ছোলাগুলো রোদ্দুরে দেব ? বর্ষাকাল, নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে।

বিমলার এই ভাগ্নী তার মামার সংসারেই থাকত। অবিবাহিতা, তের-চৌদ্দ বছর বয়েস। সে ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না টাকার খবর। তার সম্মতি পেয়ে ঝি ছোলার কলসী তাক থেকে পেড়ে ছোলা ঢালতে গিয়ে রুমালে-বাঁধা কি একটা দেখতে পেলে।

প্রথমে সে বুঝতে পারে নি জিনিসটা কি। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে যখন বুঝলে এতে পয়সাকড়ি বাঁধা, ততক্ষণ বিমলার ভাগ্নী জয়ন্তী সেখানে চুলের দড়ি রোদে দিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্তী বললে—কি গো ওটা ?

—তা কি জানি দিদিমণি, এই তো বেরুল এর ভেতর থেকে—কি জানি।

—দেখি দেখি, দাও তো ?

বাড়ীতে কেউ নেই, মামা কোথায় বেরিয়েছে, সে শয্যাগত মামীর কাছে রুমালে-বাঁধা টাকা এনে বললে—মামীমা, এ টাকা তুমি রেখেছিলে ছোলার কলসীতে ?

বিমলার তখন ভীষণ জ্বর, গা তেতে তপ্ত খোলার মত। সে তাড়াতাড়ি জ্বর-অবস্থায় উঠে হাত বাড়িয়ে বললে—দে, আমার টাকা—

অতুল সেই সময় ঘরে ঢুকে সব শুনে বলল—তুমি শোও, শোও—টাকার জন্তে কি ? শুয়ে পড়।

—আমার এই টাকাগুলো রেখে দেবে ?

—হ্যাঁ, আমি রেখে দিচ্ছি, রেখে দিচ্ছি।

—দাঁড়াও ক টাকা গুণে রেখে দিই। এক, দুই, তিন—এই আঠার টাকা সাত আনা। কোথায় রেখে দেবে ?

—আমি ঠিক জায়গাতে রেখে দেব। তুমি নিজের বুদ্ধিতে টাকা রাখতে গিয়ে হারিয়েছিলে তো টাকাটা ? বিন্দি না দেখলে ঝি মাগী চক্ষুদান করেছিল আর কি! আমার কাঠের বাক্সটাতে রেখে দেব, কেমন ?

—রেখে দাও। তুমি যেন খরচ করে ফেলো না তা বলে ? ও আমার টাকা, আঠার টাকা সাত আনা—মনে করে রেখে দিলাম।

তার পর বিমলার অসুখ ভীষণ বেড়ে গেল। অতুলের পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট সংসার—মেটে ঘর, খড়ের চালা। সংসারে আছে মাত্র ভাগ্নী আর স্ত্রী। আর দ্বিতীয় পুরুষমানুষ নেই। সে পড়ে গেল মহা মুশকিলে। রোজ মহকুমা থেকে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করে ডাক্তার আনতে হয়। খরচ যা পড়ে, তাতে সামান্ত খাজনাপত্রের আয়ে কোনমতেই কুলোয় না, কদিনেই বেশ কিছু ঋণগ্রস্ত হতে হল।

বিমলার জ্ঞান-চৈতন্ত নেই। যখন একটু জ্ঞান হয়, তখন কেবল বলে—জল খাব, আমায় জল দাও—এক ঘটি জল দাও—

তার পরেই আর জ্ঞান থাকে না।

ডাক্তার বললে, চেষ্টার তো ত্রুটি করেছি নে অতুলবাবু, তবে এই সোমবারটা না কাটলে কিছু বলতে পারব না।

—ও বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু ?

—কি করে বলি বলুন, সবই ভগবানের হাত। কাল একটা ইনজেকশন দেব ভাবছি।

ইনজেকশনের কথা শুনে বিমলা ভয় পেয়ে গেল। ইনজেকশন করলে ভারি নাকি লাগে, গা ফুঁড়ে ওষুধ দেওয়া, সে নাকি বড় খারাপ কথা। অতুল নানারকমে তাকে বুঝিয়ে রাজী করালে।

রাত্রে আবার বিমলা বললে, হ্যাগা, কাল সকালে আমাকে নাকি ইনজেকশন দেবে ?

—কেন, তখন তো তুমি রাজী হলে ?

—একটা কথা বলব ? আমার আর ওসব কষ্ট দিও না।

—কেন, কি হল আবার ?

—আমি এবার বাঁচব না। তোমার অদৃষ্টে বৌ নিয়ে সংসার করা নেই দেখছি।

—ওসব কথা বলতে নেই এখন। ছিঃ, চুপ করে শুয়ে থাক।

—তোমার কোন বুদ্ধি নেই। যা বলছি তাই শোন।

—শুনেছি। তুমি বেশি কথা বলো না। ডাক্তারে বারণ করে গিয়েছে।

—হ্যাগা, তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারবে।

—সে আবার কি কথা! নিশ্চয়ই। তোমার কি হয়েছে ? এর চেয়েও শক্ত অসুখ হয় লোকের, তারা বেঁচেও ওঠে।

বলে, অতুল কে কোন্ দুঃসহ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়েছে তারই তালিকা, কতক স্মৃতি থেকে কতক কল্পনার ওপর নির্ভর করে আবৃত্তি করতে লাগল স্ত্রীর শিয়রে বসে। রায়দের বাড়ীর বড়-বৌ পাঁচ মাস অসুখে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল, ননী চক্কত্তি এই ধরনের টাইফয়েডে ভুগে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তারা সেরে সামলে উঠে দিব্যি সংসারধর্ম্ম করছে।

বিমলা বললে, সে কতদিন আগে ?

—ওঃ, তখন নিরু বেঁচে আছে। তুমি তখন হয়তো জন্মাও নি।

—আমাকে তুমি বাঁচাও। তোমার কাছ ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, স্বর্গেও না।

—তোমার তো সেরে গিয়েছে। ভাবনা কিসের ? চুপটি করে শুয়ে থাক তো!

—সত্যি আমায় তুমি বাঁচাতে পারবে ?

অতুল দেখলে বিমলার রোগজীর্ণ কপোল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, মুখের ভাব এত বদলে গিয়েছে যে ওকে সেই বিমলা বলে চেনাই যায় না। ওর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে আদর করতে করতে অতুল বললে, অমন কথা বলে না। নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে, সে আবার একটা কথা কি।

বিমলা নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেমানুষের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

সোমবারের বিপদ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কেটে গেল এবং বিমলা ক্রমে ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হয়ে পথ্য পেলে দু মাস অতি কঠিন রোগভোগের পরে। অসুখ সেরে উঠে বিমলার মস্তিষ্ক কেমন দুর্ব্বল হয়ে গেল, কোন কথাই সে মনে রাখতে পারে না। আট দশ দিন এভাবেই কাটল। সকালবেলা আহারাদির পরে হয়তো একটু চুপ করে শুয়ে থাকে, তার পর দুপুরের দিকে উঠে বিছানায় বসে জয়ন্তীকে ডাকাডাকি করে—ও বিন্দি, শুনে যা—ও বিন্দি—

—কি মামীমা ?

—কত বেলা হয়ে গেল, আমায় ভাত দিবি নে ?

—সে কি মামীমা। তুমি রোগা মানুষ, নটার সময় যে তোমাকে ভাত দিয়ে খাইয়ে গেলাম পাশে বসে।

—না, আমি খাই নি—দে, ভাত দে—

—তুমি ভুলে গেলে মামীমা, ভাত দিয়ে গেলাম যে। তুমি যে খেয়ে শুয়ে ছিলে—

—হাঁ, তোদের সব মিথ্যে কথা। আমায় খেতে দিবি নে তাই বল্। দে দুটো ভাত !··· বিমলা ছেলেমানুষের মত কাঁদতে শুরু করলে।

জয়ন্তী স্নেহের স্বরে বললে—কাঁদতে নেই মামীমা ছিঃ, তোমার মনে থাকে না কিছু। ভাত তোমাকে খাইয়ে গিয়েছি—আচ্ছা মামাবাবু এলে জিজ্ঞেস করো—

—হাঁ, যেমন তুই, তেমনি তোর মামাবাবু—আমি এদিকে খিদের জ্বালায় মরছি—

জয়ন্তী নানারকমে ভুলিয়ে তার দুর্ব্বলমস্তিষ্ক মামীমাকে শান্ত করে ঘুম পাড়ালে।

•

শ্রাবণের শেষ। ভীষণ বর্ষা পড়ে গেল। দিন নেই রাত নেই, সব সময় বৃষ্টি। খানা-ডোবা জলে থৈ থৈ করছে, পটলের ক্ষেত সব জলে ডুবে গিয়েছে বলে হাটে-বাজারে পটল বেজায় আক্রা।

একদিন বিমলা স্বামীকে ডেকে চুপি চুপি অপরাধিনীর মত বললে—ওগো, একটা কথা বলব ?

—কি ?

—আমি একটা ভুল করে বড় লোকসান করে ফেলেছি,—বল, আমায় বকবে না ?

—আগে শুনি না ?

—বকবে না আগে বল—

—আচ্ছা, বকছি নে।

—দেখ, তুমি সেই একবার আমায় টাকা দিয়েছিলে মনে আছে। আমার অসুখের আগে ? সে আমি তাকের ওপর ছোলার কলসীটার মধ্যে রেখেছিলাম। আজ আস্তে আস্তে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ছোলার কলসীটা পেড়ে দেখলাম সে টাকা নেই! সে তো কেউ জানত না। আমার অসুখের সময় কে বের করে নিয়েছে। আমার মনে হয় ঝি মাগীটা—এখন কি ও কবুল যাবে ? কত টাকা ছিল তোমার মনে আছে ?

অতুলের মনে কি কুবুদ্ধি চাপল। অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে স্ত্রীর অসুখে। বেশি তো নয়, আঠার টাকা সাত আনা মাত্র। বিমলার মনে নেই যে ভীষণ অসুখের সময় টাকাটা সে তারই হাতে দিয়েছিল। বললে, তা থাক গে। গিয়েছে তো গিয়েছে—সামান্য টাকা—

—ঝিকে একবার বল না ?

—ও ঝগড়া বাধাবে তা হলে। কেউ তো ওকে দেখে নি টাকা নিতে ? কি আর হবে!

—কত টাকা তোমার মনে আছে? একটা ময়লা রুমালে বাঁধা ছিল মনে হচ্ছে যেন। আহা, কতগুলো টাকা—আমার অদেষ্টেই গেল! তুমি কিছু মনে ক'রো না—লক্ষীটি। রাগ করবে না আমার ওপর? তোমার ক্ষেতি-লোকসান করতেই আমি আছি।

বিমলা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

একবার অতুলের মনে হল সব কথা স্ত্রীকে মনে করিয়ে দেয়। বলে, ভেবো না, লক্ষীটি—ঠাট্টা করছিলাম। টাকা যে সেই তুমি আমার হাতে—

কিন্তু তখনই ভাবলে, হবে হবে—এর পরে দেব। এই ধাক্কাটা সামলে নিই তো। সামান্য টাকা, দিলেই হবে এর পরে।

ভাদ্র মাস পড়বার আগেই ঘুঘু-ডাকা সুদীর্ঘ শ্রাবণের এক দ্বিপ্রহরে নৌকাযোগে সে তার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রেখে এল। এত বড় অসুখ থেকে উঠল, বাপ-মায়ের কাছে একবার যাওয়া উচিত।

বিমলা আর ফেরে নি।

শীতের প্রথমে সামান্য জ্বর থেকে দাঁড়াল নিউমোনিয়া, দুর্ব্বল শরীর সামলাতে পারলে না সে ধাক্কা। অতুলের সঙ্গে দেখাও হয় নি শেষ সময়টা। স্বামী—বা দু-পাঁচটা সঞ্চিত টাকা যা পাউডারের কৌটোটাতে ছিল নিজের তোরঙ্গটাতে—সব ফেলে রেখে চলে গেল।

এর পর সাত বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে।

অতুলের বয়সও ভাঁটিয়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে, দেখলেই মনে হবে যৌবন বিদায় নিয়েছে কিছুকাল আগে। এখন রাস্তার কনট্রাক্টরি করে হাতে দু পয়সা করেছেও। আগের চেয়ে অবস্থা ঢের ভাল। গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিপন্ন লোক সে বর্ত্তমানে। এবার স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টও নির্ব্বাচিত হয়েছে।

শীতকালের দিন। সে বসে চৌকিদারের মাসিক বেতনের বিল পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে সরোজিনীর (তৃতীয়পক্ষের স্ত্রী; দুটি ছেলে ও একটি মেয়েও হয়েছে) উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—শোন শোন, শীগ্‌গির ইদিকে এস তো? দেখ দেখ—

কি না জানি বিপদ ঘটেছে ভেবে অতুল ছুটে গিয়ে দেখল স্ত্রী ঘর পরিষ্কার করতে করতে পৈতৃক আমলের যে বাক্সটাতে সাবেক আমলের জমিজমার খাতা, পুরোনো চেকদাখিলা, কাগজপত্র ইত্যাদি আছে তার মধ্যে থেকে কীটদষ্ট বিবর্ণ একটা নেকড়ার পুঁটুলি বার করে হাতে তুলে ধরে বলছে, এই দেখ! আজ ভাবলাম পুরনো বাক্সটা ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ করি, কাগজপত্তরের ভেতর এই দেখ কি ছিল। কি বল তো এটা? বোধ হয় টাকাকড়ি। খুলে দেখি দাঁড়াও।

পরে ক্ষিপ্রহস্তে পুঁটুলির গেরো খুলে বললে, দেখ দেখ—টাকা আর খুচরো! দাঁড়াও গুণি—

আনন্দপূর্ণ উত্তেজিত কণ্ঠে সে গুণতে লাগল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—ওঃ দেখি—

গোণা শেষ করে খুশির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, হুঁ হুঁ। এ-কিন্তু আমি দেব না। কর্তাদের আমলের রাখা নিশ্চয়ই। এতদিন তোমরা তো কেউ পাও নি। একখানা রুমালে বাঁধা—দেখ না ?

অতুল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।

অনেকদিন আগেকার একখানা জ্বরদীপ্ত আরক্ত মুখ···ছেলেমানুষের মত লোভার্ত দৃষ্টি··· এক বর্ষার মেঘমেদুর দিন··· শ্রাবণ মাস···

সে শুধু কলের পুঁতুলের মত বললে, কত আছে বললে ?

সরোজিনী হেসে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, আঠার টাকা সাত আনা। এ আমি আর দিচ্ছি নে! আমি পেলাম, এ আমি নেব।

সুহাসিনী মাসীমা

সুহাসিনী মাসীমাকে আমি দেখি নি। কিন্তু খুব ছোট বয়সে যখনই মামার বাড়ী যেতুম, তখন সকলের মুখে মুখে থাকত সুহাসিনী মাসীমার নাম।

—সুহাস কি চমৎকার বোনে! এই বয়েসে কি সুন্দর বুনুনির হাত!

—সুহাসিনী বললে, এস দিদি ব'স। বেশ মেয়ে সুহাসিনী।

—সেবার সুহাসিনীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালুম পূর্ণিমার দিন।

—সুহাসিনী ওসব অনেষ্য দেখতে পারে না, তাই জন্যে তো মায়ের সঙ্গে বসে না।

সুহাসিনী গ্রামের সকলের যেন চোখের মণি। সুহাসিনী মাসীমা সম্বন্ধে কথা বলবার সময় সবারই অর্থাৎ আমার বুড়ী দিদিমার, গন্নু দিদিমার, মাসীমাদের, মায়ের, মামাদের গলার সুর বদলে যেত, চোখে কি রকম একটা আলাদা ভাব দেখা যেত। আর একটা কথা। রূপের কথা উঠলে সকলেই বলত আগে সুহাসিনী মাসীমার কথা, অমন রূপ কারও হয় না, কেউ কখনও দেখেনি।

শুনে শুনে আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহল হল যে, সুহাসিনী মাসীমাকে একবার দেখব। দেখতেই হবে।

দিদিমাকে একদিন বললুম, সুহাসিনী মাসীমা এখানে কোথায় থাকেন ?

—কেন রে ?

—আমি একদিন দেখতে যাব।

—সে তোর ওই কানাই মামার বোন ওপাড়ার। মুখুজ্যেদের দোতলা বাড়ী পুকুরধারে দেখিসনি ? তা সুহাস তো এখন এখানে নেই। শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে।

—বিয়ে হয়ে গিয়েছে বুঝি ?

—তা হবে না ? উনিশ-কুড়ি বছর বয়েস হল, বিয়ে কোন্ কালে হয়েছে।

সুহাসিনী মাসীমার বিয়ে হওয়ার কথাটা যেন খুব ভাল লাগল না। কেন ভাল লাগল না তা কি করে বলব। আমার বয়স ন বছর আর সুহাসিনী মাসীমার বয়স উনিশ-কুড়ি; বিয়ে হলেই বা আমার কি, না হলেই বা আমার কি।

মামার বাড়ীতে প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে যাই, কিন্তু কোনও বার সুহাসিনী মাসীমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। হয় তিনি বৈশাখের মাঝামাঝি চলে গিয়েছেন, নয়তো তিনি আসবেন শ্রাবণ মাসে শ্বশুরবাড়ী থেকে।

—ফাল্গুন মাসে এসেছিল সুহাস, বোশেখ মাসে চলে গেল। আজকাল থাকে ভাল জায়গায়। যেমন রং, তেমনিই রূপ, যেন একেবারে ফেটে পড়ছে।

অন্য লোকের প্রশ্নের উত্তরে দিদিমা কিংবা আমার মাসীমারা এ ধরনের কথা বলতেন, শুনতে পেতাম। আমি কোনও প্রশ্ন এ-সম্বন্ধে বড় একটা করতুম না, অথচ ইচ্ছে হত সুহাস মাসীমার সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু জানবার, আরও অনেক কথা শোনবার। কিন্তু কেমন যেন লজ্জায় গলার কথা আটকে যেত, জিগ্যেস করতে পারতুম না।

—না, তা কি করে থাকবে, সুহাসিনী না হলে শ্বশুর বাড়ীর একদিন চলে না—কাজেই চলে যেতেই হল, নইলে জষ্টি মাসে আম কাঁটাল খেয়ে যাবার তো ইচ্ছে ছিল। শাশুড়ি বলে—বৌমা এখানে না থাকলে যেন হাত পা আসে না—বৌমার মুখ সকালে উঠে না দেখলে কাজে মন বসাতে পারি নে।—তাই ছেলে পাঠিয়ে নিয়ে গেল।

—একদিন কি হল জান, দুপুরবেলা সুহাসের ফিট হয়েছে শুনে তো ছুটে গিয়ে দেখি রান্নাঘরের সামনে সানের রোয়াকে সুহাস অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে—আর তার মাথায় জল ঢালা হচ্ছে। মাথায় একরাশ কালো কুচকুচে ভিজে চুল, দেহ এলিয়ে পড়ে আছে। অমন রূপ কখনও দেখি নি মানুষের, কি রূপ ফুটেছে সুহাসের—সত্যি—

সুহাস মাসীমার রূপের ও গুণের প্রশংসায় এই গ্রামের সবাই পঞ্চমুখ। তারা জীবনে যেন এমন মেয়ে আর দেখে নি। ওদের মুখে মুখে সুহাসিনী মাসীমাও আমার মনে অত্যন্ত বেড়েই বললেন—কল্পনায়, চোখের দেখায় নয়।

অল্প বয়সে যখন মনের আকাশ একেবারে শূন্য, তখন লোকের মুখে শুনে শুনে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ নারীমূর্ত্তি আমার মনে গড়ে উঠেছিল—বহুকাল পর্য্যন্ত এই মানসী নারীপ্রতিমার কষ্টিপাথরে বাস্তবজীবনে দৃষ্ট সমস্ত নারীর রূপ ও গুণ যাচাই করে নিতাম, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বোধ হয়। সে মানসী প্রতিমা ও আদর্শ নারী ছিলেন সুহাসিনী মাসীমা—যাঁকে কখনও চোখে দেখলুম না।

তখন কলেজে পড়ি। কি একটা ছুটিতে মামার বাড়ী গিয়েছি। তখন অনেকটা গম্ভীর হয়ে পড়েছি আগেকার চেয়ে এবং রান্নাঘরের কোণে বসে দিদিমা ও মাসীমাদের মুখে মেয়েলি গল্প শোনার চেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে মেজ দাদু ও মামাদের সঙ্গে জার্মান যুদ্ধের আলোচনা ও সে

সম্বন্ধে নিজের সম্ভ অধীত লজ-এর মডার্ন ইউরোপের ঐতিহাসিক জ্ঞান 'সগর্ব্বে প্রদর্শন করবার ঝোঁক তখন অনেক বেশি। সকাল বেলা, আমি সমবেত দু-পাঁচ জন লোকের সামনে বিসমার্কের রাজনীতি ও জীবনী (লজ-এর 'মডার্ন ইউরোপ' অনুযায়ী) সোৎসাহে বর্ণনা করছি, এমন সময়ে ওপাড়ার কানাই মামা (সুহাসিনী মাসীমার ছোট ভাই) এসে সেখানে দাঁড়াল।

মেজ দাদু জিজ্ঞেস করলেন—কি কানাই, কবে এলে কলকাতা থেকে ?

কানাই বললে—আজই এলুম কাকাবাবু। দিদি আজ ওবেলার ট্রেনে আসবে কিনা। দাদাবাবু পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে আসবেন। তাই আমি সকালের গাড়ীতে চলে এলুম স্টেশনে গাড়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে।

শুনে মনে কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা অনুভব করলুম। সুহাসিনী মাসীমা আসবেন আজই, দেখব—এতকাল পরে সুহাসিনী মাসীমার সঙ্গে চাক্ষুষ দেখা হবে। আমার মনের সেই মানসী প্রতিমা সুহাসিনী মাসীমা! তার পর আবার নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম নিজের মনের ভাবে। আসেন আসুন, না আসেন না আসুন—আমার কি তাতে ?

অথচ সন্ধ্যাবেলার দিকে কাঁটালতলাটার পায়চারি করছিলুম, বোধ হয় কিছু উৎসুক ভাবেই। এই পথ দিয়েই সুহাসিনী মাসীমার গরুর গাড়ী স্টেশন থেকে আসবে। এই একমাত্র পথ।

সন্ধ্যার কিছু আগে গরুর গাড়ী স্টেশন থেকে ফিরে এল—কানাই মামার ছোট ভাই বীরু তাতে বসে।

জিজ্ঞেস করলুম—কোথায় গিয়েছিলি রে বীরু ? গাড়ী গিয়েছিল কোথায় ?

বীরু বললে—স্টেশনে। বড় দিদির আসবার কথা ছিল, এল না।

বললুম—রাত্রের ট্রেনে আসতে পারেন তো—

—না, তা আসবেন না। অন্ধকার রাত, মেঠো পথ দিয়ে আসা—রাত্রের গাড়ীতে কখনও আসবে না। কঁধাই আছে।

গাড়ী চলে গেল।

জীবনের গত দশ বছরের মধ্যে—তখন আমার বয়স ছিল নয়, এখন উনিশ—এই প্রথম বার সুহাসিনী মাসীকে দেখবার সুযোগ ঘটবার উপক্রম হয়েছিল, কিন্তু উপক্রম হয়েই থেমে গেল, ঘটল না।

সেদিন কেন, তার পর প্রায় এক মাস সেখানে ছিলাম—সুহাসিনী মাসীমা তার মধ্যেও আসেন নি।

কলেজ থেকে বার হয়ে ক্রমে চাকরিতে ঢুকে পড়লুম। বয়স হয়েছে চব্বিশ, ষোল বছর কেটে গিয়েছে বাল্যের সেই মামার বাড়ীর দিনগুলি থেকে। দিদিমা বেঁচে নেই, মামার বাড়ী যাওয়া আগের চেয়ে অনেক কমে গিয়েছে, সুহাসিনী মাসীমার কথা শুনতে পাই কেবল আমার

আপন মাসীমাদের মুখে। তাও তত বেশি করে নয় বা তত ঘন ঘন নয়, বাল্যকালে যেমন দিদিমার মুখ থেকে শুনতুম।

কিন্তু তা বলে স্নহাসিনী মাসীমা কি আমার মনে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন?

আশ্চর্য্যের বিষয়, তা মোটেই নয়।

বাল্যের সে মানসী প্রতিমা যেমন তেমনই ছিল, তার রূপের কোথাও একটুকু ম্লান হয় নি। বন্ধুবান্ধবের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে কত নববধূকে সেই মানসী প্রতিমার কষ্টি-পাথরে যাচাই করতে গিয়ে তাদের প্রতি অবিচার করেছি।

বয়স যখন ত্রিশ-বত্রিশ, তখন কলকাতায় এসে থাকতে হল কার্য্য উপলক্ষে। একদিন আমার মামার মুখে কথায় কথায় শুনলাম—স্নহাসিনী মাসীমার স্বামী এখন বড় এঞ্জিনীয়ার, অনেক টাকা রোজগার করেন, বাগবাজারে নবীন বোসের লেনে সম্প্রতি বাসা করে আছেন। এমন কি মামা বললেন—যাবি একদিন? স্নহাস দিদির সঙ্গে আমারও অনেকদিন দেখা হয় নি। তুই কখনও দেখেছিস কি? চল, কাল যাওয়া যাক, ঠিকানাটা আমার ডায়েরিতে লেখা আছে।

পরদিন আমার কি একটা গুরুতর কাজ ছিল, তাতেই যাওয়া হল না। মামাও আর সে সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করলেন না। আমি ইচ্ছে করলে একাই যেতে পারতাম—মামা ঠিকানাটা আমায় বলেছিলেন তার পর, কিন্তু তারা আমায় কেউ চেনে না, এ অবস্থায় যেচে সেখানে যেতে বাধত।

আরও বছর দুই-তিন কেটে গেল। আমার বয়স চৌত্রিশ। সংসারী মানুষ, ছেলেপুলে হয়ে পড়েচে অনেকগুলি। পশ্চিমের কর্ম্মস্থান থেকে দেশে ঘন ঘন আসা ঘটে না। এ সময় একবার মামার বাড়ীর গ্রামের কানাই মামার সঙ্গে জামালপুর স্টেশনে দেখা। কানাই আমার বাল্যবন্ধু এবং স্নহাসিনী মাসীমার ছোট ভাই।

—কি হে, কানাই মামা যে! এখানে কোথায়?

—আরে শচীন যে! তুমি কোথায়? আমি এখানে আছি বছরখানেক, ওয়ার্কশপে কাজ করি।

—বেশ, বেশ। বাসা করে মেয়েছেলে নিয়ে আছ?

—না, দিদি মুঙ্গেরে রয়েছে কিনা, জামাইবাবুর, শরীর খারাপ, চেঞ্জে এসেছে। সেখান থেকেই যাতায়াত করি। এস না একদিন? বেলুন বাজারে, গঙ্গার কাছেই। কবে আসবে?

আমি থাকি সাহেবগঞ্জে। সর্ব্বদা মুঙ্গেরের দিকে যাওয়া ঘটে না—তবু কানাইএর কাছে কথা দিলাম একদিন স্নহাসিনী মাসীমার বাসায় যাব মুঙ্গেরে।...সেটা কর্ত্তব্যও তো বটে, দেশের লোক অসুস্থ হয়ে রয়েছেন দূর দেশে—আমরা যখন এদেশ-প্রবাসী—যাওয়া বা দেখা-শুনো করা তো উচিতই।

সাহেবগঞ্জে ফিরে এসে স্ত্রীকে কথাটা বলতে সেও খুব উৎসাহ দেখালে।

বললে—চল না মাসীমার সঙ্গে দেখা করে সীতাকুণ্ডে স্নান করে আসা যাবে। কখনও মুঙ্গেরে যাই নি—ভালই হল, চল এই মকর-সংক্রান্তির ছুটিতে—

একথা ঠিকই যে, এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর পরে সুহাসিনী মাসীমাকে দেখবার সে বাল্য-ও প্রথম-যৌবন-দিনের আগ্রহ ছিল না—তবুও কৌতূহলে এবং মনের পুরনো অভ্যেসের বশে একদিন মুঙ্গেরে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করবার সঙ্কল্প করলুম। কিন্তু পুনরায় বাধা পড়ল। পৌষ মাসের শেষের দিকে সাহেবগঞ্জে ভীষণ কলেরার প্রাদুর্ভাব হল—আমি ছুটি নিয়ে সপরিবারে দেশে পালালুম। দিন উনিশ-কুড়ি পরে যখন ফিরলুম তখন মকর-সংক্রান্তি পার হয়ে গিয়েছে, মুঙ্গেরে যাওয়ার কথাও চাপা পড়ে গিয়েছে।

এর মাস-চার পরে আবার কানাইএর সঙ্গে দেখা জামালপুরে।

বললে—ওহে, তোমরা কই গেলে না? তোমাকে খবর দেব ভেবেছিলুম—কি বিপদ গেল যে! জামাইবাবু মারা গেলেন ও মাসের সতেরোই।

সুহাসিনী মাসীমা বিধবা।

বললুম—ওঁরা এখনও কি—

—না না। দেওর এসে নিয়ে গেল শ্বশুরবাড়ী। মস্ত ডাক্তার দেওর—অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-সার্জ্জন, গভর্নমেণ্ট সার্ভিস করে। জামাইবাবুর চেয়ে অনেক ছোট।

এইবার চার-পাঁচ বছরের দীর্ঘ ব্যবধান—যখন সুহাসিনী মাসীমার কথা কারও কাছে শুনি নি। তার পর একদিন আমার মাসীমা কাশী থেকে এলেন। বাল্যকালের সে দিনটি থেকে কতকাল চলে গিয়েছে—যে মাসীমা তখন ছিলেন তরুণী, তিনি এখন কাশীবাসিনী। আমারও বয়স উনচল্লিশ।

মাসীমা বললেন—দশাশ্বমেধ ঘাটে রোজ সুহাসিনীদিদির সঙ্গে দেখা হত কিনা। চমৎকার মেয়ে সুহাসিনী দিদি, ওর সঙ্গে মিশে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত। মস্ত বড় সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে। কি সুন্দর গীতার ব্যাখ্যা করে। ওর মুখে গীতাপাঠ শুনতে শুনতে রাত যে কত হচ্ছে তা ভুলেই যেতুম। আহা, কি মেয়ে সুহাসিনী দিদি!

বহুকাল পরে সুহাসিনী মাসীমার আবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলাম।

সুহাসিনী মাসীমা চিরকাল লোকের প্রশংসা কুড়িয়ে গেল—কপাল এক-একজনের। আমার ঠোঁটের আগায় এ প্রশ্ন কতবার এল—সুহাসিনী মাসীমা আজকাল দেখতে কেমন?··· বহুকাল তাঁর রূপের প্রশংসা কারও মুখে শুনি নি।

কিন্তু আমার মনের সেই বাল্যকালে গড়া মানসী রূপসী সমানই ছিলেন। বাল্যে তিনি ছিলেন শুধু রূপবতী, এখন রূপের সঙ্গে যোগ হল আধ্যাত্মিকতা। সুহাসিনী মাসীমা একেবারে দেবী হয়ে উঠলেন আমার মনে। আর এটাও মনে রাখতে হবে, দেবীদের মধ্যে সবাই তরুণী—বৃদ্ধা দেবী কেউ নেই।

পরের বছরই আমার চাকরির কাজে আমায় কাশী যেতে হল তিন চার দিনের জন্যে। আমার বয়স চল্লিশ। মাসীমা যে বাড়ীটাতে থাকতেন, সেখানে মামার বাড়ীর গ্রামের আর একজন বৃদ্ধা থাকতেন। তাঁর নাম তারকের মা—তিনি জাতে কৈবর্ত্ত, তাঁর ছেলে তারকের নৈহাটিতে বড় দোকান আছে। আমার ওপর ভার পড়ল, তারকের মায়ের কাছ থেকে মাসীমার একটা হাত-বাক্স নিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

বেলা দশটা। মন্দিরাদি দর্শন করার পরে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করতে নামছি। সঙ্গে আছে তারকের মা।

তারকের মা স্নানার্থীদের ভিড়ের মধ্যে কাকে সম্বোধন করে বললে—দিদি ঠাকরুনের আজ যে সকাল সকাল হয়ে গেল ?—যাকে উদ্দেশ করে বলা গেল তিনি কি উত্তর দিলেন আমি ভাল করে শোনার আগেই তারকের মা আমার দিকে চেয়ে বললে—চিনতে পারলে না শচীন ? আমাদের গাঁয়ের কানাই-এর দিদি সুহাসিনী—চেন না ?

বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠে দেখি একজন মুণ্ডিত-মস্তক, স্থূলকায়া বৃদ্ধা, এক ঘটি জল হাতে সিক্ত-বসনে উঠে চলে যাচ্ছেন। ফর্সা রং জলে গেলে যেমন হয় গায়ের রং তেমনই, মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে—নিতান্ত নির্ব্বোধ নিরীহ পাড়াগাঁয়ের বুড়িদের মত মুখের চোখের ভাব।

সেই সুহাসিনী মাসীমা !

আমি কি আশা করেছিলুম এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর পরেও সুহাসিনী মাসীমাকে রূপসী যুবতী দেখতে পাব ? তবে কেন যে ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, কেন যে মন হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল—কে জানে।

বড় ক্লান্ত বোধ করলুম—ভীষণ ক্লান্ত ও নিরুৎসাহ। ভাবলুম কাশীর কাজ তো মিটে গিয়েছে, মাসীমার বাক্সটা নিয়ে ওবেলার ট্রেনেই চলে যাব। থেকে মিছিমিছি সময় নষ্ট।

অভিশাপ

—"এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।"

আমি সবিস্ময়ে সেই ভগ্নস্তূপের পানে চাহিয়া দেখিলাম। এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী ? সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দিনান্তের অস্পষ্ট আলোক যাই যাই করিয়াও আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে তখনও অপেক্ষা করিতেছিল। পরিশ্রান্ত বিহগকুলের অবিশ্রাম কূজনধ্বনি রহিয়া রহিয়া তখনও আকাশ-বাতাস মথিত করিয়া দিতেছিল। গঙ্গার অপূর্ব্ব তরঙ্গভঙ্গ চিত্তলোকে এক অজ্ঞাতচেতনার সঞ্চার করিতেছিল। সেই প্রদোষের ম্লান দ্যুতিবিকাশের অন্তরালে আমি প্রাতঃস্মরণীয় সুবিখ্যাত প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদের পানে চাহিয়া দেখিলাম। গঙ্গার ঠিক তীরভূমিতে অগণিত লতাপল্লবে মণ্ডিত হতশ্রী প্রতাপ-

নারায়ণ চৌধুরীর প্রাসাদ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। নদীস্রোতের অবিরাম আঘাতে সে প্রাসাদের অনেকখানিই ভাঙিয়া চুরিয়া কোন্ অনির্দ্দেশের পথে বহিয়া গিয়াছে। অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ যাহা এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা সেই হৃতগৌরবের কঙ্কালবিশেষ; এখন যেন সেখানে সেই দুর্দ্দান্তপ্রতাপ প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর প্রেতাত্মা বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতি তাহাকে আজ নিজের হাতে সাজাইয়া দিয়াছে, অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য তাহাকে শ্যামল করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গার বক্ষে একটি নৌকা পাল তুলিয়া পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছিল। একটি মাঝি গান গাহিতেছিল। তাহার সেই ক্লান্ত কণ্ঠস্বর সন্ধ্যাপ্রকৃতির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া চিরিয়া কোন্ দুরান্তরের এক অপূর্ব্ব সাড়া বহিয়া আনিতেছিল।

পলাশপুরের প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর নাম শোনে নাই এমন লোক খুব কমই আছে। একদা তাঁহার প্রতাপে সারা পলাশপুর তটস্থ হইয়া থাকিত। কিংবদন্তী আছে যে সেকালে নাকি বাঘে গরুতে নির্ব্বিবাদে একই ঘাটে জল পান করিত। অতবড় ক্ষমতাশালী বর্দ্ধিষ্ণু প্রতিপত্তিশালী জমিদার সেকালে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ-রাজত্বের সূচনার দিন হইতে পলাশপুরের চৌধুরী-বংশের উদ্ভব। ইংরেজ-বাহাদুরকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করার পুরস্কার-স্বরূপ ধূর্জ্জটিনারায়ণ চৌধুরী এই পলাশপুরের জমিদারি লাভ করেন। ধূর্জ্জটিনারায়ণ চৌধুরী চৌধুরী-বংশের আদিপুরুষ। তাঁরই পৌত্র বিজয়নারায়ণ চৌধুরী সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে বারাকপুরের বিদ্রোহদমনে ইংরেজদের যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ক্যাপ্টেন লরেন্স সপরিবারে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ইতিহাসে সেসব কথা নাই বটে তবে সকলেই সে কথা জানিত। ১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাসের শেষদিকে যখন দুর্য্যোগের ঘনঘটা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ কালো করিয়া দিয়াছিল, বিজয়নারায়ণ সে সময়ে বারাকপুরে। সেদিনও এমন ছিল। ক্যাপ্টেন লরেন্স বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর কর্ম্মকুশলতায় তাঁহাকে স্বীয় তরবারি উপহার দিয়াছিলেন। বহুকাল সেই তরবারি চৌধুরী বংশের প্রাচীরে অতি সন্তর্পণে অতীত-গৌরবের চিহ্নস্বরূপ টাঙানো ছিল।

বেলেডাঙার কমল হালদারের সঙ্গে গ্রীষ্মের ছুটিতে তার দেশে গিয়াছিলাম বেড়াইতে। সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পলাশপুরের চৌধুরীবাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িলাম। কমল বলিল, এই সেই প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর বাড়ী।

ইতিপূর্ব্বে চৌধুরীবংশের অতীত কাহিনীর আমি অনেক কিছুই শুনিয়াছি। তাঁহাদের সেই বিরাট প্রাসাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া বাক্‌শূন্য হইয়া গেলাম। এখন মানুষ সেখানে বাস করে না। সেটি এখন হিংস্র পশুর লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজয়নারায়ণ চৌধুরীর পুত্র প্রতাপনারায়ণ চৌধুরীর সময় চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে চৌধুরীবংশের প্রতিপত্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রতাপনারায়ণের সময়ে যেমন চৌধুরীবংশের গৌরব চরমে উঠিয়াছিল, সেই প্রতাপনারায়ণের সময়েই তাহার আবার ভাঙন শুরু হয়। অমানুষিক দুশ্চরিত্রতা ও প্রচুর মকদ্দমার ফলে তাঁহার পতন শুরু

হয় মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগলসাম্রাজ্য যেমন চরম সীমায় উঠিয়াছিল, সেই ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই আবার তাহার পতন শুরু হয়! বৃদ্ধ সম্রাট বহু দুঃখেই দূর দক্ষিণাপথে প্রাণত্যাগ করেন। ঔরঙ্গজেব ছিলেন চরিত্রবান ও ধার্ম্মিক, আর প্রতাপনারায়ণ ছিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাঁহার অভিধানে চরিত্র বলিয়া কোন শব্দ ছিল না। মদ ও মেয়েমানুষ তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্য। আর এ ছাড়া যেটুকু সময় পাইতেন তাহাতে মামলা-মকদ্দমার তদ্‌বির করিতেন। তাঁহার ন্যায় নিঁখুত ভাবে মকদ্দমা তদ্‌বির করিতে সেকালে খুব কম লোকই পারিত। অথচ লেখাপড়ার তিনি ধার ধারিতেন না, আইন তো দূরের কথা। কত সতীরমণীর আর্ত্তক্রন্দনে নিঃশব্দরাত্রে চৌধুরীবংশের সুদীর্ঘ রঙমহল যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহাদের সেই ব্যাকুল কণ্ঠধ্বনি ঝিল্লীরবের সহিত তালে তালে শব্দিত হইয়া মরিতেছে। তাহাদের বিকট অট্টহাস্য হয়তো এখনও ভগ্নপ্রাসাদের প্রাচীরে আঘাত খাইয়া খাইয়া ফিরিতেছে।

তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদাসুন্দরীকে আর ভালবাসিয়াছিলেন পত্নীর বিধবা ভগিনী আভাময়ীকে। ক্ষীরোদাসুন্দরীর প্রতিবাদ করিবার সাহস হয় নাই। আর বালবিধবা আভাময়ী প্রতাপনারায়ণের প্রেমের তরঙ্গে সংক্ষুব্ধ হইয়া আত্মীয়স্বজনের বিষদৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। এ ঘটনার পর প্রতাপনারায়ণ আর ক্ষীরোদাসুন্দরীর মুখদর্শন করেন নাই। সেই অভাগী রমণী চার মাসের শিশুপুত্র সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরীকে বুকে লইয়া স্বামীর দৃষ্টিপথের অন্তরালে জীবন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আর প্রতাপনারায়ণের উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা গেল বাড়িয়া। তিনি বাহির-বাড়ীতেই দিন কাটাইয়া দিতে লাগিলেন। আভাময়ীর প্রতি সমাজের এই অসহনীয় অত্যাচারেব প্রতিকার-স্বরূপ তিনি তাঁহার প্রজাদের শান্তির সংসারে দিতে লাগিলেন আগুন জ্বালাইয়া। গৃহস্থবধূ বা গৃহস্থকন্যা তাঁহার ক্ষুধিত দৃষ্টি হইতে অতিকষ্টে আত্মরক্ষা করিত। সারাদিন পথে পথে পাখীমারা বন্দুক কাঁধে লইয়া পাখী মারিয়া ফিরিতেন। সে পথে কোন স্ত্রীলোকের বাহির হইবার সাহস ছিল না। আর তাঁহার সঙ্গে থাকিত কানা কালু সর্দ্দার। কানা হইলে কি হয়, চক্ষুষ্মানকেও সে হার মানাইতে পারিত। তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধির বলে প্রতাপনারায়ণের ক্ষুধা নিবৃত্ত হইত সহজেই। ইংরেজ-রাজত্বের এমন ধরাবাঁধা আইন তখন ছিল না। প্রতাপনারায়ণের মহল্লায় তাঁহার বিখ্যাত লাঠিয়ালদের দৌলতে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার সামর্থ্য ছিল না। লাঠির জোরেই রাজ্যজয় হইত আর লাঠির জোরেই রমণীর সতীত্বলুণ্ঠন হইত। কিন্তু প্রতাপনারায়ণ স্ত্রীলোকদের ঘৃণা করিতেন সর্ব্বান্তঃকরণে। নারী নরকের দ্বার। এই নারীই তাঁহার জীবনে দিয়াছিল দাবানল জ্বালাইয়া।

সেবার দুরন্ত বর্ষার এক অবিশ্রান্ত ধারাপতনের দিনে কালু কোথা হইতে এক অজ্ঞাতনামা রমণীকে বহিয়া আনিল। রাত্রি তখন দশটা। চারিদিকে সেই বর্ষাপ্রকৃতির গুঞ্জন কোন্ এক বিরহিণীর আর্ত্তক্রন্দনের ন্যায় ধ্বনিত হইতেছিল। কাহাকে হারানোর বেদনা যেন সারা বিশ্ব মথিত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতাপনারায়ণ তখন সুর্ম্মা দিয়া তাঁহার নয়নপ্রান্তে রেখাপাত

করিতেছিলেন। কালু আসিয়া ডাকিল,—মহারাজ!

প্রতাপনারায়ণ হাঁকিলেন, কে?…ও।

—এসেছে।

—বিশ্রাম করতে বল্। কতদূর থেকে আসছে?

—সাত ক্রোশ।

—কেমন?

—আপনার প্রসাদ পাবার উপযুক্ত।

—উত্তম।

প্রতাপনারায়ণ দ্রুত সাজ সমাধা করিয়া প্রমোদগৃহে উপস্থিত হইলেন। অভাগিনী তখন সেই বিলাসগৃহের এক কোণে বস্ত্রখণ্ডে সর্বাঙ্গ আবৃত করিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল। মনুষ্যপদশব্দে সে প্রতাপনারায়ণের পানে চাহিয়াই বিকট শব্দে আঁতকাইয়া উঠিল। তাহার আয়ত আঁখি, সর্বোপরি তাহার সেই ভীতিসুন্দর দেহলতা প্রতাপনারায়ণের প্রাণে এক উন্মাদনা জাগাইয়া দিল। প্রতাপনারায়ণ তাঁহার নিকট গিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম?

কোন উত্তর পাইলেন্ না। পুনরায় বলিলেন, এই যে বিরাট প্রাসাদ, এই অতুল বিত্তব, সবই তোমার। তুমি আজ আমার রানী।

সেই রমণী কহিল,—না—না, আমি রানী হ'তে চাই না। আমায় ভিখিরি থাকতে দিন। আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আপনি আমাকে আমার স্বামী-পুত্রের কাছে ফিরে যেতে দিন।

কথা শেষে সে প্রতাপনারায়ণের পদপ্রান্তে পড়িল। প্রতাপনারায়ণ উৎকট হাসি হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন, অসম্ভব।

জীবনে এমন নিখুঁত রূপ প্রতাপনারায়ণ আর দ্বিতীয়টি দেখেন নাই। তাহার সেই বিনাইয়া বিনাইয়া কান্না প্রতাপনারায়ণের নিকট বড় মধুর বলিয়া বোধ হইল! সেই রমণী কহিল, আমায় ছেড়ে দিন, আপনার ভাল হবে।

প্রতাপনারায়ণ হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—আমার ভাল আমি চাই না।

—আপনি ধ্বংস হয়ে যাবেন! আপনার সর্বনাশ হবে। আমার অভিশাপে এ বাড়ীঘর জ্বলে পুড়ে যাবে।

প্রতাপনারায়ণ শিহরিয়া উঠিলেন। সে পুনরায় বলিল, যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি তবে আমার অভিশাপ কখনও সহ্য করতে পারবেন না। আপনি নির্বংশ হবেন।

অবলা রমণীর যে এমন করিয়া মানুষকে অভিশাপ দিবার ক্ষমতা আছে ইহা ছিল প্রতাপ-নারায়ণের বিশ্বাসের অতীত। কিন্তু তিনি পরিণামদর্শী ছিলেন না আদৌ। তিনি ঐ অবলার সাবধান-বাণী শুনিলেন না। এই তাঁহার জীবনের শেষ শিকার।

পরদিন সারা প্রাসাদে একটা দুরপনেয় বিষাদের ছায়াপাত হইল। সেদিন হইতে সেই রমণী আর উঠিল না বা আহার গ্রহণ করিল না। দুই দিন পূর্ব হইতেই সে উপবাস করিতেছিল। তিল তিল করিয়া সে শুকাইয়া মরিতে লাগিল। সকলে মূক বিস্ময়ে অভাগীর

পানে চাহিয়া রহিল। প্রতাপনারায়ণ ভয়-ব্যাকুলচিত্তে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। উহার বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস সহ্য করিবার সাহস তাঁহার ছিল না! তিন দিন তিন রাত্রি অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে রাণী শ্রীক্ষীরোদাসুন্দরীও তাঁহার দীর্ঘকালের শুচিতা ত্যাগ করিয়া এই নরককুণ্ডে আসিয়াছিলেন অভাগিনীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে স্বামীর কল্যাণ-কামনায়। কিন্তু তাঁহার সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল। 'যদি আমি যথার্থ সতী হয়ে থাকি চৌধুরী-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে'—এই বলিয়া সেই তেজস্বিনী নারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

এই ঘটনার সাত দিন পর প্রতাপনারায়ণ ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। পথে তাঁহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে।

সূর্যনারায়ণও পিতাকে অনুসরণ করিয়া চলিলেন। অল্প বয়সে সম্পত্তির মালিক হইয়া মোসাহেবের সহায়তায় তাঁহার ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় সম্পত্তি ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। পিতার ন্যায় তিনিও ছিলেন অপরিণামদর্শী। ভবিষ্যতের কথা ভাবিবার অবকাশ তাঁহার ছিল না। পর-স্ত্রীতে লোভ তাঁহার ছিল না সত্য, তবে তাঁহারও নেশা ছিল। শহর অঞ্চল হইতে সব বিখ্যাত বিখ্যাত বাইজি আনার নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহার জন্য তিনি মুক্তহস্তে ধনব্যয় করিয়া যাইতেন। লখ্‌নউ, দিল্লী, আগ্রা, বেনারস, লাহোর, বোম্বাই, কলিকাতা ইত্যাদি সকল শহরের সুপ্রসিদ্ধা বাইজিকুলের পদরেণুপাতে তিনি তাঁহার পিতৃ-পিতামহের পবিত্র প্রাসাদ ধন্য করিতে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি দিনরাত তাহাদের সুর-লহরী ও রূপমাধুরীতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। বিবাহ করিয়াছিলের যথাসময়ে। যদিও পিতার ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নীকে ঘৃণা করিতেন না তথাপি তাঁহার দিন কাটিত বাহির-বাড়ীতে। গভীর রাত্রে অতিরিক্ত তাগাদার ফলে মাঝে মাঝে টলিতে টলিতে অন্দর-বাড়ীতে উঠিয়া যাইতেন নিতান্ত অনিচ্ছায়। অধিকাংশ রাত্রিই তাঁহার এই বাহির-বাড়ীতে কাটিত। তাহা ছাড়া দেশভ্রমণ তাঁহার জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। একটির পর একটি করিয়া তিনি দেশ দেখিয়া বেড়াইতেন। কত তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছেন, অথচ দেবতা দর্শন করেন নাই। দেবমন্দিরের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বলিতেন, জীবনে তো অনেক পাপ করেছি, মিথ্যে পবিত্র দেবমন্দির আর কলুষিত করি কেন।

অকস্মাৎ একদিন সূর্যনারায়ণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া না কহিয়া অতি অসময়ে বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার নাবালক পুত্র শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকে দেনার দায়ে আকণ্ঠ ডুবাইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

শঙ্করনারায়ণ যখন সাবালক হইলেন তখন তিনি তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে তাঁহাদের প্রাচীন বসতবাটি ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। বনেদী বংশের ধ্বংসাবশেষ লইয়া চৌধুরীপরিবার বিভীষিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। গহনা বিক্রি করিয়া শঙ্করনারায়ণ মানুষ হইয়া উঠিলেন। তিনি কিন্তু মানুষ হইলেন তাঁহার পিতা বা পিতামহের বিপরীত প্রকৃতি লইয়া। ইংরেজি শিক্ষার তিনি ধার ধারিলেন না। তবে অবিচলিত চিত্তে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যে কেমন যেন ধর্মভাব

জাগিয়া উঠিল ; তিনি অল্প বয়স হইতেই ধার্মিক হইয়া পড়িলেন। সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দ্দনের পূজায় ক্রমে ক্রমে তিনি আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিতেন না। বাড়ীতে থাইতেন আর ত্রিতলের ঘরে বসিয়া থাকিতেন। কোথাও বাহির হইতেন না। রুদ্রাক্ষের মালা গলায় পরিয়া গেরুয়া বসনে সর্বাঙ্গ মণ্ডিত করিয়া তিনি সন্ন্যাস-জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। অবসর সময়ে তিনি তাঁহার প্রিয় বেহালাখানায় বসিয়া ছড়ি ঘষিতেন। রাত্রির নিঃশব্দতার বক্ষ চিরিয়া সেই রাগিণী কোন বন্দিনী বিরহিণীর আর্তক্রন্দনের ন্যায় শুনাইত। ক্ষয়িষ্ণু চৌধুরীবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী যেন ঐ ভাষায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া কাঁদিয়া মরিত।

শঙ্করনারায়ণও তাঁহাদের বংশের ধারা বজায় রাখিয়া অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং খুব অল্প বয়সেই তাঁহার পুত্র হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের ন্যায় তিনি তাঁহার পত্নী কল্যাণীকে ঘৃণা করেন নাই সত্য, তবে তাঁহাকে যে ভালবাসিতেন একথা হলফ করিয়া বলা যায় না। তিনি পত্নীর প্রতি তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন মাত্র। সারাদিন প্রায় তাঁহার গৃহদেবতার ধ্যানধারণায় কাটিত। তিনি নিত্য অত্যন্ত শুচিতা সহকারে দেবতার আরাধনা করিতেন। গম্ভীর রাত্রে পূজায় বসিতেন। যাহা জুটিত সেই সামান্য দুটি শাকান্ন মুখে দিয়া তিনি আবার তাঁহার সেই ত্রিতলের গৃহে যাইতেন। বাড়ী হইতে বাহির হইতেন না আদৌ। দিনদিন চৌধুরীবংশ যে নিশ্চিহ্ন হইবার পথে আগাইয়া যাইতেছে তাহা দেখিয়া তিনিও ধীরে ধীরে শুকাইতে লাগিলেন। আর ততই তাঁহার গৃহদেবতার পূজার মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তিনি পাগলের মত হইয়া গেলেন। তাঁহার জীবনের একমাত্র কামনা হইল—বিত্ত চাই, অর্থ চাই, ঐশ্বর্য চাই। তিনি কেবল প্রার্থনা করিতেন দেবতা আবার যেন চৌধুরীবংশের নষ্টসম্পদ ফিরাইয়া দেন।...

এহেন কালে একদা চৈত্রের এক অমাবস্যা রজনীতে শঙ্করনারায়ণ স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহাদের গৃহলক্ষ্মী চৌধুরীবংশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। তাঁহার অপূর্ব জ্যোতিতে বিশ্বভুবন আলোকিত। একটা সুস্নিগ্ধ সুবাসে দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে। শঙ্করনারায়ণ ত্বরিতপদে উঠিয়া গিয়া দেবীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। দেবী তাঁহার বিষণ্ণ মুখে যেন বলিলেন, বাছা, পথ ছাড়্, আমায় যেতে দে।

শঙ্করনারায়ণ কাঁদিতে লাগিলেন,—মা, আমাদের এমনি করে ছেড়ে যাচ্ছ মা?

দেবী নিষ্ঠুরভাবে হাসিলেন।

—নিত্য না খেয়ে তোমার পূজার আয়োজন করেছি মা, তবু তোমার ক্ষুধা দূর হয় নি?

—না। আমি রক্ত চাই!

—কার রক্ত মা?..

—তোর ছেলের।

দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। অমনি শঙ্করনারায়ণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘামে তাঁহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসি, এ কি পরীক্ষা,

তোর! তখনও তাঁহার সেই গৃহে দেবীর পদ্মগন্ধ বিস্ফুরিত হইতেছিল। শঙ্করনারায়ণ বিচলিত হইলেন না। চৌধুরীবংশ তাঁহার পুত্রের চেয়ে অধিক মূল্যবান। তিনি বলিলেন, তাই হবে মা, তাই হবে। তুমি এ অভাগাকে ত্যাগ করো না।

তার পর তিনি ধীরপদক্ষেপে তাঁহার শয়নগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, অতি সন্তর্পণে। কল্যাণী তখন ঘুমাইতেছিলেন আর তাঁহার পুত্র মাতার স্তন্যপান করিতেছিল ঘুমন্ত অবস্থায়। শঙ্করনারায়ণ অত্যন্ত ধীরে ধীরে সেই খোকাকে মাতার বক্ষ হইতে ছিনাইয়া আনিলেন। কল্যাণী সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইতেছিলেন। তিনি একবার পাশ ফিরিয়া শুইলেন মাত্র। শঙ্করনারায়ণ খোকাকে পরম স্নেহে তাঁহার বুকের মধ্যে করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সোঁ-সোঁ শব্দে সারা প্রকৃতি যেন উন্মাদ তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছিল। খোকা পিতার বাহুমধ্যে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর খোকাকে গৃহদেবীর সম্মুখে নিজ হাতে বলি দিলেন। একবার হয়তো সে কাঁদিয়াছিল; কিন্তু বাহিরের সেই ঝড়জলের মধ্যে সে কান্না হয়তো শোনা যায় নাই। রক্তধারায় সারা-গৃহ ছাইয়া গেল। ভয়ে বিস্ময়ে তিনি কিন্তু দিশাহারা হইলেন না বা বেদনায় মুষড়াইয়া পড়িলেন না। হোমের জন্য যে বালি ছিল তাহা আনিয়া সারারাত্রি তিনি সেই রক্তচিহ্ন মুছিতে লাগিলেন। চৌধুরীবংশ বড় হইবে জীবনের এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা আজ তাঁহার পূরণ হইয়াছে, এই সান্ত্বনার পরম তৃপ্তিতে সেই বালির উপরই রাত্রিশেষের দিকে তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। দিনের আলো ফুটিতে না ফুটিতে কল্যাণী উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্বামীকে জাগাইলেন, ওগো, খোকা কোথা গেল?

শঙ্করনারায়ণ স্ত্রীর পানে চাহিতে পারিলেন না। খোকার মৃতদেহ তখন ভাগীরথীর খরস্রোতে কোন্ দূরান্তরে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই রক্তমাখা বালুকারাশিই তাহার শেষ চিহ্ন। কল্যাণী আবার ডাকিলেন, ওগো, কথা কও, কথা কও! আমার খোকাকে এনে দাও!

শঙ্করনারায়ণ আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। জীবনে আর তিনি খুব কমই কথা বলেন। যাহা হৌক ব্যাপারটা আর চাপা রহিল না। বুদ্ধিমতী কল্যাণী ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারই অবগত হইলেন। সারাদিন তিনি আর উঠিলেন না, খাইলেন না। সেইদিন রাত্রে তিনিও কূলপ্লাবিনী জাহ্নবীর পুণ্যস্রোতে আত্মবিসর্জন দিয়া তাঁহার বড় আদরের খোকার সহিত মিলিত হইলেন।

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

এ ঘটনার কিছুদিন পর শঙ্করনারায়ণ চৌধুরীকেও আর পাওয়া গেল না। আজ পর্য্যন্ত তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই।...

সে আজ পঞ্চাশ বছরের কথা। গৃহলক্ষ্মী এখনও সেই ভগ্নপ্রায় বংশহীন চৌধুরী বাড়ীর অন্তরালে বন্দিনী আছেন কিনা জানি না। তবে মাঝে মাঝে ঐ ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে একটা চাপা হাসি পরম পরিতৃপ্তির সহিত বাহির হইয়া আসে। সেদিনও এমনি ঝড় উঠিয়াছিল; সেদিনও পশ্চিমের আকাশে একটা কালো মেঘ দিগন্ত ছাইয়া রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া মরিতেছিল, সেদিনও হয়তো ঐ শ্মশানঘাটের নিষ্পত্র ঝাউগাছটার মাথায় বসিয়া একটা শকুন আর্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া মরিতেছিল।

ছায়াছবি

ছায়াছবি

এক বন্ধুর মুখে এ গল্প শোনা।

আমার বন্ধুটি অনেক দেশ বেড়িয়েছেন, লোক হিসেবে অমায়িক, রসিক ও শিক্ষিত। কলকাতাতেই থাকেন।

যখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় তখন গল্পে গল্পে অনেক সময় সারারাত কেটে যায়।

প্রকৃতপক্ষে ঠিক মনের মত লোক পাওয়া বড় দুষ্কর। অনেক কষ্টে একজন হয়তো মেলে। অধিকাংশ লোকের সঙ্গে যে আমাদের আলাপ হয়, সে সম্পূর্ণ মৌখিক। তাদের সঙ্গে আমাদের হয়তো ব্যক্তিগত অভ্যাসে, চরিত্রে, মতে, ধর্মবিশ্বাসে, বিদ্যায় যথেষ্ট তফাত। কিন্তু একই আফিসে কি কলেজে কি কোর্টে এক সঙ্গে কাজ করতে হয়, দু-বেলা দেখা হয়—দাদা কিংবা মামা বলে সম্বোধন করতে হয়, কৌটাসুদ্ধ পানের খিলির বিনিময়ও হয়তো হয়ে থাকে—কিন্তু ওই পর্যন্ত। মন সায় দিয়ে বলে না তার সঙ্গে দু-বেলা দেখা হোলে গল্প করে বাঁচি। কোনো নিরালা বাদলার দিনে আফিসের হরিপদ-দার সঙ্গ খুব কাম্য বলে মনে হবে না।

আমার বন্ধুর নাম—থাক গে, নামের দরকারই বা কি ? আবার লোকে তাঁকে বিরক্ত করবে। কৌতূহলী লোকের সংখ্যা সর্বত্রই বেশি। কোনো কাজ নেই—গিয়ে আনন্দ করবে আর বকবক বকাবে। তিনি একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী। হাতে পয়সা এবং কলকাতায় বাড়ী আছে। বাড়ীর গ্যারেজে মোটর গাড়ী থাকবার অন্য কোনো বাধা ছিল না, কিন্তু আমার বন্ধু আড়ম্বর ও বিলাসিতা পছন্দ করেন না।

ভূমিকা এই পর্যন্ত।

সেদিন খুব বর্ষার দিন। একা বাড়ী বসে বসে ভালো লাগলো না। একখানা ট্রেন ধরে কলকাতায় পৌছুলুম। ভীষণ বর্ষায় ট্রাম বন্ধ। বাস কচিৎ দু-একখানা চলচে। জল ভেঙে হেঁটে বন্ধুর বাড়ী গিয়ে পৌছুলাম।

বন্ধু আমায় দেখে অত্যন্ত খুশি হোলেন বলাই বাহুল্য। তখনই গরম চা ও খাবারের ব্যবস্থা হোল। পরস্পরের কুশল-জিজ্ঞাসায় ভদ্রতা বাদ গেল না। তাঁর বৈঠকখানার গদি-আঁটা আরাম কেদারায় ততক্ষণ বেশ হাত-পা এলিয়ে বসে পড়েছি।

সন্ধ্যার পরে আবার সজোরে বৃষ্টি নামলো। বেশি ঠাণ্ডাবোধ হওয়াতে পাখা বন্ধ করতে হোল।

বন্ধুর আতিথেয়তা আমার সুপরিচিত। তিনি বললেন—ঘরে স্টোভ আছে, চলুন দোতলার ঘরে। এই বৃষ্টিতে আর কেউ আসবে না। খিচুড়ি চড়িয়ে দিই। ডিম আছে, আলু আছে—

—চমৎকার।

—মাছ দেখতে পাঠাবো রঘুয়াকে ?

—কোনো দরকার নেই ! আমাদের ওতেই হয়ে যাবে।

—চলুন ওপরের ঘরে। রাতে এখানে খাবেন এবং থাকবেন।

—নইলে আর যাচ্ছি কোথায় ?

—যেতে চাইলেও যেতে দেওয়া হবে না।

ওপরের বসবার ঘরটিতে বন্ধুর লাইব্রেরী। দেওয়ালের গায়ে সারি দেওয়া কাঁচের আলমারি, সাধারণতঃ বিজ্ঞান ও ইতিহাসের বইয়ে ভর্তি। দেওয়ালে বড়-বড় অয়েল-পেন্টিং—প্রতিকৃতি বই—সবই ল্যাণ্ডস্কেপ। ভাল চিত্রকরের হিমালয় অঞ্চলের দৃশ্য। আমার বন্ধু হিমালয়কে অত্যন্ত ভালবাসেন। হিমালয় অঞ্চলের ভৌগোলিক তত্ত্ব তাঁর নখদর্পণে। অনেকদিন রাত্রে হিমালয় ভ্রমণের নানা মনোরম গল্পে রাত্রি কখন কেটে গিয়েচে, টেরও পাই নি।

ওপরের ঘরে যখন গিয়ে বসলুম, তখন টেবিলের ওপর একখানা ছবিওয়ালা বই খোলা পড়ে আছে। বন্ধু হাতে নিয়ে বললেন—এখানা দেখেচেন ? হিমালয়ান জর্নাল ! সোয়েন হেদিনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বেরিয়েচে।

—কোথাকার ?

—কাশ্মীর।

—এমন শৌখীন স্থানে সোয়েন হেদিন বেড়াতেন বলে তো জানতাম না। কোথায় তাক্‌লা মাকান্, কোথায় কারাকোরম—এ সব দূর দুর্গম স্থান ছাড়া তিনি—

—না। চমৎকার দৃশ্যের বর্ণনা করেচেন এ লেখাটায়, দেখবেন।

—দেখবার চোখ ছিল ভদ্রলোকের—যা সকলের থাকে না।

—একশো বার সত্যি।

তারপর আমাদের গল্প আরম্ভ হোল প্রধানতঃ কাশ্মীর নিয়েই। কাশ্মীর আমার বন্ধুটির জীবনের একটি তীর্থক্ষেত্র—অনেকবার তিনি ক্লান্ত নাগরিকের মন ও চক্ষুকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্যে দেশ-বিদেশে ভ্রমণে বেরুতেন আমি জানি। কাশ্মীরেও গিয়েচেন অনেকবার। কাশ্মীরের কথায় সাধারণতঃ তিনি পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন। এবার কিন্তু একটা নতুন বিষয় নিয়ে তিনি কথা পাড়লেন। সেটা হোল তাঁর একটি অতি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা, যেটা কাশ্মীরের পথেই ঘটেছিল।

বন্ধু বললেন :

সেবার পুজোর পরে আমার বাল্য সুহৃদ রতিকান্ত মৈত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে তারই মোটরে দু-জনে কাশ্মীর যাত্রা করা গেল। রতিকান্ত প্রতিবৎসর নিজের মোটর নিয়ে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড ধরে কোথাও না কোথাও যাবে। এবার আমারই কথায় সে কাশ্মীর রওনা হোল। পথের আনন্দ ও কষ্ট ভোগ করতে-করতে আমরা দিল্লী গিয়ে পৌঁছুলাম। সেখানে

দিন দুই বিশ্রাম করে আমরা আবার মোটর ছাড়লুম।

বাকি পথটুকু বেশ কাটলো। সে বর্ণনা বিস্তৃতভাবে করবার কোনো আবশ্যক দেখি না।

কোহালায় পৌঁছুলাম দিল্লী থেকে রওনা হবার তিন দিন পরে সন্ধ্যার দিকে। মোটর থামিয়ে কোহালার বাজারে একটি চায়ের দোকানে চা পান করতে বসলাম দু-জনে। গাড়ীতে রইল ক্লিনার রামদীন ও ভৃত্য নাথু বাগ। শেষোক্ত ব্যক্তির নামটি অবাঙালীর মত শোনালেও প্রকৃতপক্ষে ওর বাড়ী মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় এবং সে বাঙলা ছাড়া অন্য প্রদেশের ভাষা জানে না।

চা পানের সময় দোকানদারকে আমাদের রাত্রির জন্যে একটু বিশ্রামস্থানের সন্ধান দিতে বললাম। সে দু-একটা সন্ধান দিলে। বড় পরিশ্রান্ত ছিলাম সেদিনটা। রাত্রিটাতে একটু ভাল ঘুমের দরকার। নাথুকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে (কারণ তার দ্বারা এ বিষয়ে কোনো সাহায্যই পাওয়া সম্ভব নয়) রামদীন ক্লিনারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বাসার সন্ধানে বার হই।

রতিকান্ত বললে—গাড়ীর একটা আস্তানাও তো খুঁজতে হবে?

আমি বললাম—খুঁজে পেলে ভাল হয়। বাইরে বেজায় ঠাণ্ডা। নাথু তো শীতে জমে যাবে গাড়ীতে থাকলে বাইরে।

—রামদীন বরং পারে।

রামদীন বললে—হামারা ওয়াস্তে কোই পরোয়া নেহি হুজুর—

কিন্তু বাসা কোথাও পাওয়া গেল না। কোহালা বড় জায়গা নয়। বাজারের সরাইগুলো পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভিড়ে পরিপূর্ণ। একখানা দোকানের পেছন দিকে একটা ঘর আছে বটে, দোকানদার দেখালে।—কিন্তু সে ঘর এত অপরিষ্কার ও আলোবাতাস-হীন যে, সে ঘরে রাত্রি কাটানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া সে ঘরে বিশ্রাম করতে গেলে মোটর বাইরে পড়ে থাকে। রামদীন মুখে বলেছে বলেই তাকে হিমবর্ষী রাত্রে বাইরে শুইয়ে রাখা যায় না।

রতিকান্ত বললে—উপায়?

আমি এর আর কি উপায় বলবো!

পরামর্শ করা গেল সেই চায়ের দোকানীর কাছে আবার যেতে হবে। তাকে গিয়ে এমনভাবে ধরা হোল যেন এই পার্বত্য দেশে সে-ই আমাদের একমাত্র রক্ষক ও অভিভাবক। তারই মুখ চেয়ে আমরা বাড়ী থেকে এই দু-হাজার মাইল রাস্তা অতিক্রম করে এসেচি।

দোকানদার লোক ভালো। সে বলে দিলে বাজারের পেছন দিয়ে যে পথটা ছোট্ট পাহাড়টা ডিঙিয়ে চলে গেল, ওরই ওপারে এক বৃদ্ধ জাঠের বাড়ী। সে বাড়ীতে অনেক সময় লোকজনদের আশ্রয় দেয়।

আমরা, দু-জনে দোকানদারের কথামত সেখানে গেলাম।

বাড়ীখানা কাঠের দোতলা। দেখে মনে হয়, এক সময়ে বাড়ীর মালিকের অবস্থা ভালই ছিল।

আমাদের ডাকাডাকিতে একজন বৃদ্ধ দাড়িওয়ালা লম্বা সুপুরুষ ব্যক্তি দোর খুলে রুক্ষস্বরে জিজ্ঞেস করলে—কিস্ লিয়ে হল্লা মচাতে হো? কৌন হ্যায় তুম্ লোক?

আমরা বিনীতভাবে আমাদের আসবার কারণ ব্যক্ত করলাম। আমরা নিরীহ পথিক, কোনো গোলমাল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বৃদ্ধ বললে—কোথা থেকে আসচ তোমরা?

অবশ্য হিন্দীতেই বলেছিল কথা।

আমরা বললাম কলকাতা থেকে।

—ঘরভাড়া আমি দিই না।

—মেহেরবানি করে একটু জায়গা দিতেই হবে।

—কে বললে এখানে জায়গা আছে?

—বাজারে শুনলাম।

—আমি ঘর ভাড়া দিই না।

—ভাড়া না দেন, একটু আশ্রয় দিন।

বৃদ্ধ একটুখানি কি ভেবে বললে—ক-জন লোক?

—চার জন। তবে এক জন মোটরে শুয়ে থাকবে বাজারে।

—একখানা ঘরের বেশি দিতে পারবো না।

—তাই আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করবো।

—আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম লোকটি আমাদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে লাগলো। বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক আছে বলে আমাদের মনে হোল না। সিঁড়ির বাম দিকের কোণের ঘরে সে আমাদের নিয়ে গিয়ে বললে—এই ঘরটা আমি দিতে পারি। আর ঘর নেই। কারপেটখানা পেতে নেবেন। বাইরের টবে জল আছে। গরম জল দিতে পারব না—কিন্তু—বলেই লোকটা চুপ করে গেল।

আমাদের ভয় হোল পাছে সে আবার মত বদলায়।

আমরা উভয়েই জোর করে বললাম—আপনার খুব মেহেরবানি। চমৎকার ঘরটি।

—জিনিস-পত্র কোথায়?

—মোটরেই আছে। আরও দু-জন লোক মোটরে আছে। তাদের একজনকে নিয়ে আসি।

—কি খাবেন রাত্রে? এখানে খাওয়ার ব্যবস্থা হবে না।

—কোন দরকার নেই। আমরা দোকান থেকে আনিয়ে নেবো। চলুন, আমরাও নিচে যাই। বাজারে যাবো।

আধ ঘণ্টা পরে আমরা আবার এসে ঘরে বিছানাপত্র পেতে নিলাম। রামদীন মোটরেই রইলো। বঙ্কিমবাবু অত্যন্ত ক্লান্ত ছিল। তাকেই সহযোগে আমি আলো নিবিয়ে দিয়ে এর শোবার ব্যবস্থা করে দিলাম, তারপর আমি নিজে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম।

বাজারের রাস্তা সামনের ছোট পাহাড়ের মাথা ডিঙিয়ে যে উপত্যকায় নেমেছে, তারই এপারে এই ছোট্ট দোতলা কাঠের বাড়ীটি। অল্প অল্প জ্যোৎস্না উঠেচে, সামনের নিম্নভূমি অর্থাৎ উপত্যকায় বেঁটে ওক, চেনার ও সরল গাছের ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব শোভা। বাতাস বেশ শীতল। আমার যেন চোখে ঘুম আসচে না, এই সুন্দর বনাবৃত উপত্যকায় শান্ত মূর্তিখানি সারারাত্রি জেগে ভোগ করি এই যেন আমার মনের গূঢ় বাণী। কিন্তু শরীর মানলো না। পথশ্রান্ত দেহ এলিয়ে পড়তে চাইছিল শয্যায়। অগত্যা শয্যা আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়লাম।

অনেক রাত্রে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি জেগে উঠে বিছানার ওপরে বসলাম। কি একটা শব্দ যেন আমি ঘুমের ঘোরে শুনেছি, তাতেই ঘুম ভেঙেচে। শব্দটা তখনও হচ্চে, আমি বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বাইরে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়লো নিচের উপত্যকার বনভূমির দিকে। এমন একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়ল যাতে আমি পাথরের পুতুলের মত আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। চাঁদ হেলে পড়েচে পশ্চিম আকাশে, তারই সুস্পষ্ট আলোতে দেখি একটি নারীমূর্তি আমার সামনের কি একটা বড় গাছের ডালে দোলনা বেঁধে দোল খাচ্ছে।

ভাল করে চেয়ে দেখলাম। হ্যাঁ নারীই বটে, সুন্দরী নারী। বাইশ-তেইশের মধ্যে বয়স।

কিন্তু মেয়েটির দোল খাওয়ার স্থান—বিশেষ করে সময়, আমার কাছে বড় আশ্চর্য্য বলে মনে হোল। কাশ্মীরের দিকে কখনো আসি নি। এখানকার মেয়েরা এই হিমবর্ষী রাত্রের শেষ প্রহরে বনে এমন ভাবে দোলনা টাঙিয়ে দোল খায় নাকি?…

দৃশ্যটা যদি শুধু সুন্দর হোতো—সুন্দর সন্দেহ নেই—তাহলে আমি এমন অস্বস্তি বোধ করবো কেন? আমার যেন মনে হোল এই দৃশ্যের মধ্যে একটি জিনিস আছে—যা অশিব, যা নিয়মের বিপরীত, যা অমানুষী!—

তাড়াতাড়ি রতিকান্তকে ডাকলুম। সেও যখন বাইরে এল, তখনও মেয়েটি দোল খাচ্ছে।

রতিকান্তকে বললাম—ও কে ভাই?

সে অবাক হয়ে গিয়েছে। চোখ রগড়ে বললে—তাইতো।

—এখানকার মেয়েরা ওরকম করে নাকি?

—তা কি জানি?

হঠাৎ রতিকান্ত বলে উঠলো—ওকি! দোলনার দড়ি কই? গাছে টাঙিয়েচে কি দিয়ে? ভাল করে চেয়ে দেখলাম সত্যই তো, দোলনার দড়ি অস্পষ্ট এত যে চন্দ্রালোকে দেখা যাচ্ছে না। সরু তার হলেও দেখা যাবে এ আলোতে। কিন্তু তার বা দড়ি কিছু নেই—শূন্যে দুলচে দোলনা! আরও একটা ব্যাপার যা এতক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম—আমাদের দিকে মুখ করেই গাছটার তলায় এ ব্যাপার ঘটচে, অথচ কোন রকম শব্দ আমাদের কানে আসচে না। অদ্ভুত নিঃশব্দে কেন

একটা ছবি।

রতিকান্ত বললে—ভাই, বাড়ীওয়ালাকে ডাকবো ?

—ডাকো।

—আবার এরই কেউ না হয়—তাহলে হয়তো চটে যাবে।

—তুমি ডাকো। যা হয় হবে।

কথা বলতে বলতে একটু অন্যমনস্ক হয়েই পড়েছিলাম দু-জনে বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ড। পরক্ষণেই সামনের দিকে চেয়ে দেখি কোথায় সেই জ্যোতুল্যমানা তরুণী নারীমূর্তি! কিছুই নেই সে গাছের তলায়। ওই তো সেই বাঁকা ডালটা, জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেচে গাছটার শুভ্র কাণ্ড; পাশের বেঁটে ওক গাছটা তেমনি দেখা যাচ্চে—কিন্তু কেউ কোথাও নেই, গাছের তলা একদম ফাঁকা।

রতিকান্ত বললে—ওকি কোথায় গেল ?

—তাইতো!

—আশেপাশে নেই তো ?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কেউ পালাতে পারে না—আমাদের দু-জনের চোখ এড়িয়ে এই জ্যোৎস্নালোকিত উপত্যকা থেকে। যাবার আর কোনো রাস্তা নেই, বাজারে যাবার ওই সরু পায়ে চলার পথ ছাড়া। পেছনে উঁচু পাহাড়টা। বনের নীচে আগাছার জঙ্গল নেই বাংলাদেশের মত—বেশ পরিষ্কার তলা দেখা যাচ্চে জ্যোৎস্নায়। সম্ভব নয়, কোথাও লুকানো বা পালানো আমাদের চোখ এড়িয়ে—এত অল্প সময়ের মধ্যে।

রতিকান্ত বললে—ব্যাপার কি ?

—তাইতো আমিও ভাবচি!

—এ দেখচি একেবারে ম্যাজিক—

—সেই রকমই মনে হচ্চে ?

—কি করা যাবে এখন ?

—শোয়া ও ঘুমুনো।

রাত বড় বেশি ছিল না। ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে উঠে রতিকান্ত ও আমি দেখি নাথুর তখনও নাক ডাকচে। ওকে উঠিয়ে জিনিস-পত্র গুছিয়ে নিতে বলে আমরা আবার এসে বারান্দায় দাঁড়ালুম। ওই সেই গাছটা, ওই সেই বাঁকা ডালটা। সত্যি সত্যি কাল শেষ রাতের দিকে আমরা দু-জনে এই বারান্দায় দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখেচি কিন্তু আমাদের নিজেদের কাছেই মনে হচ্চে ওটা আসলে ঘটে নি, হয়তো রাত্রির স্বপ্ন।

স্বপ্ন ? কি জানি ?

দাড়িওয়ালা বৃদ্ধের নিকট বিদায় নিয়ে আমরা মোটরের পাশে এসে দাঁড়ালাম। আমাদের দোকানী বন্ধু চেরা সরল কাঠের ডাল উনুনে দিয়ে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করচে।

আমাদের দেখে বললে—কি জবর ঘুম হয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—কোনো বিপদ-আপদ ঘটে নি তো ?

আমি যেন দোকানীর কথার সুরে ও দৃষ্টিতে একটি প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন লক্ষ্য করলুম।

আমরা চা দিতে বলে ওর দোকানের সামনে জাঁকিয়ে বসে রাতের ঘটনা সবিস্তারে ওকে বর্ণনা করলাম।

দোকানী ঘাড় নেড়ে হেসে বললে—জানি বাবুজি! এই জন্যেই ও বাড়ীর সন্ধান আপনাদের দিতে ইতস্ততঃ করছিলাম। ওই বনে জ্যোৎস্না রাতে কত লোক ও মেয়েটিকে দুলতে দেখেচে; ও মানুষ নয় জিন, আফ্রিট্, হুরী—

বলে হাত নেড়ে যেন সব জিনিসটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—আপনারা আজই কোহালা ছেড়ে চলে যান। আমি জানি যারা ওই খুবসুরত জিন হুরীর মোহে পড়ে ওই কাঠের ঘর ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন থেকে গিয়েচে—শেষকালে তাদের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে। একবার একটা আত্মহত্যাও ঘটেছিল। বেশিদিন থাকলেই বিপদে পড়ে যাবেন। বাড়ীওয়ালা বুড়ো ওই জন্যেই আজকাল বাড়ী ভাড়া দিতে চায় না।

আমরা বললাম—তোমরা তো স্থানীয় লোক, তোমরা দেখতে পাও ?

—রোজ কি জিন, আফ্রিট্‌দের নজরে পড়ে ? দু-মাস হয়তো কিছুই না, একদিন হয়ে গেল। কানুন কিছু নেই। তবে কানুনের মধ্যে এই, চাঁদনি রাত হওয়া চাই আর রাতের শেষপ্রহর হওয়া চাই। এখানকার লোকেরা সাঁঝ জ্বালার পর ও-পথে বড় একটা যাতায়াত করে না।...

—হ্যাঁ, একরুপেয়া সাড়ে সাত আনা হুজুর। আদাব হুজুর।

বিপদ

সন ১৩০১ সাল। আশ্বিন মাস।

রাধারমণ ভট্টাচার্য্য দুর্গোৎসবের সময় তল্পীবাহক শিবু ঘোষকে লইয়া সোনার গাঁয়ের জমিদার বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ী পূজা করিতে যাইতেছিলেন।

শিবুর কাঁধে একটি বোঁচকা, হাতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কেম্বিসের ব্যাগ। তাঁহার খেলো হুঁকা, দা-কাটা তামাক, কয়লা, সোলা ও চকমকি পাথর সুদ্ধ থলেটি তাঁর নিজের হাতে ঝুলানো। বগলে সাদা কাপড় বসানো ছাতি।

বেলা চড়িয়াছে। সোনার গাঁ পৌঁছিতে বেলা চারটার কম নয়। সতেরো ক্রোশ পথ।

রাস্তাঘাট ভালো নয়, দেশে চালের দাম চড়ার দরুণ দুর্ভিক্ষ দেখা গিয়াছে, আউশ ধান

সুবিধা হয় নাই। অতিরিক্ত বন্যার ফলে বহুস্থানে আউশ ফসল নষ্ট হইবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। চুরি ডাকাতি বাড়িয়াছে।

শিবু আজ বিশ বৎসর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তল্পীবাহক। যে-যে শিষ্য বাড়ী তাঁর সাধারণতঃ যাতায়াত, সে-সব বাড়ীর প্রত্যেকের সঙ্গে সে পরিচিত।

এ-সব রাস্তায় সে গত বিশ বৎসর ধরিয়া এ সময়ে গিয়া থাকে। পথে কোথায় কি আছে সব জানে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিষ্ঠা সে জানে, বাহিরে কোথাও গেলে স্বপাক ভিন্ন তিনি আহার করেন না। যেখানে সেখানে জলগ্রহণ করেন না, সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিনি।

আজ কয়দিন বৃষ্টি বন্ধ হইয়াছে। রাস্তাঘাট কর্দমশূন্য, নদীর জল কমিয়াছে। বন-ঝিঙের ফুল ফুটিয়াছে। ফিঙে ও দোয়েলের গানে বাঁশ-বন আম-বাগান মুখর। ঝোপের মাথায় বন-অপরাজিতার নীল ফুল।

আরামডাঙার বড় বট গাছটা ওই মাঠের মধ্যে দেখা গিয়াছে। শিবু জানে ওই বট গাছের পাশে একটা পুকুর আছে, জলটা খুব ভালো।

—ঠাকুর মশাই, বটতলায় রসুই চড়িয়ে দিতে হবে—নইলে পেসাদ পাওয়া আর এবেলা অদৃষ্টে নেই।

—চাল সঙ্গে আছে ?

—আনা হয় নি তো সঙ্গে ?

—কেন আনিস নি রে গাধা উল্লুক ?

—ঠাকুর মশাই, চাল কি ঘরে ছেল যে আনবো ? মা ঠাকরুণ বললেন, চাল বাড়ন্ত, শিবু।

—তোকে বললে ?

—হ্যাঁ ঠাকুর মশাই। মিছে কথা বলবো না। আড়াই টাকা মনের চাল হয়েচে চার টাকা। মানুষের কি আর কিনে খাবার খ্যামতা আছে ? সব হয়েচে দিন আনি, দিন খাই।

—বিষ্ণুপুরের সে চাল কোথায় গেল ?

—মা ঠাকরুণের কাণ্ড! তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে ভাত রেঁধে পাড়ার ছেলেমেয়েদের ডেকেডেকে সেই পুকুরের ধারে নিয়ে গিয়ে খেতি দেতেন। কতদিন বারণ করে ছাথলাম। তা মা ঠাকরুণ পরের চোখে জল দেখলি আর থাকতি পারেন না। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণ যে!

—যাক, তা সেই লক্ষ্মী-ঠাকরুণকে বলে কয়ে এক বেলার মতো দুটো চাল আনতে পারলে না, মুখ্যু-ভূত ?

—বকবেন না ঠাকুর মশাই। চাল আমি যোগাড় করে দেবানি আরামডাঙার বুনোপাড়া থেকি। কিন্তু ঠাকুর মশাই একডা কথা ভাবচি—

—কি কথা রে ?

—বললে ভয় পাবেন না তো ? আপনি আবার যে ভীতু !

—কি বল না ?

—আরামডাঙার বুনো সব ব্যাটা ডাকাত। ঠ্যাঙাড়ে, খুনী। আরামডাঙার ওধারে যে মনেকপুরের পাঁচকুড়োর বিল, ওই বিলে যে কত মানুষের মুণ্ডু আর দেহ পোতা—তার লেখা জোখা নেই!

—তাতে কি ? আমাদের কাছে কি আছে যে নেবে ? আমি ভীতু, না তুই ভীতু ! কর্মফল আর প্রাক্তন,–এ দুটো ছাড়িয়ে কোন্ মানুষটা কবে উঠেচে বলতে পারিস ?

—হুঁ !

—এ সব কথা তোকে বলা আর বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো।

ভট্টাচার্য্য মশাইকে বটতলায় বসাইয়া শিবু ঘোষ চাউল আনিতে গেল এবং কিছুক্ষণ পরে তিন জন জোয়ান লোককে সঙ্গে করিয়া ফিরিল।

তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল—ঠাকুর মশাই, দু-কাঠা চাল্ এনেলাম আর দু-কাঠা সোনামুগির ডাল। আপনি রাঁধুন। আমরা পেসাদ পাবো। ঘি, তেল, মশলা, মাছ, আলু, পটল, বেগুন সব আসচে। আমাদের গাঁ থেকে সিধে দিচ্চি আপনাকে।

রাধারমণ ভট্টাচার্য্য চমকাইয়া উঠিলেন।

সর্বনাশ! বলে কি ? তিনি শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ নহেন, জীবনে কখনো শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নি—তাহা হইলে রানী রাসমণির বাড়ী হইতে সেবার দান লইয়া তিনি বড় মানুষ হইতে পারিতেন। শিবু ঘোষ সব জানে, জানিয়া শুনিয়া ইহাদিগকে জুটাইয়া আনিবার হেতু কি ?

শিবুর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, শিবু উহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—তাহার মুখে এক অদ্ভুত ভাব, চোখে যেন ভয়ের দৃষ্টি।

রাধারমণ ভট্টাচার্য্য বলিলেন—বাপু সকল, আমি তোমাদের সিধে নিতে পারবো না। প্রসাদ পেতে চাও, আমি যা রাঁধবো, তাই খেয়ো এখন। এই চাল থেকে সের খানেক পয়সা নিয়ে আমায় দিয়ে যাও—

ওদের পিছন দিকে দাঁড়াইয়া শিবু চোখ টিপিতেছে কেন ? ভট্টাচার্য্য মশাই কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

আগের জোয়ান লোকটি এবার বুক ফুলাইয়া এক পা সামনে আসিয়া বলিল—ওসব হবে না ঠাকুর। তোমাকে রাঁধতে হবে, আমাদের সিধে নিতে হবে। আমার নাম শোনা আছে কি ? আমার নাম ভৈরব সর্দার।

সর্বনাশ! ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। ভৈরব ডাকাতের নাম এ অঞ্চলে কে না জানে ? সেদিনও হলুদপুকুরের মজুমদারদের বাড়ী চিঠি দিয়া ডাকাতি করিতে গিয়া গ্রামের

লোকের সঙ্গে লড়াই করিয়া দুটিকে খুন করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

ভৈরব ডাকাতের নাম করিয়া এদেশে মায়েরা দুষ্ট ছেলেদের ঘুম পাড়ায়। ভৈরব ডাকাত যে কোথায় থাকে তাহার কোনো নিশ্চয়তা নাই। আজ এ গ্রাম, কাল ও গ্রাম। গ্রামবাসীদের সাধ্য কি যে তাহারা পুলিশে খবর দেয়? কে অকারণে প্রাণ হারাইতে চায়?

ভট্টাচার্য্য মশাই নিরীহ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ। কখনো কোনো গোলমালের মধ্যে থাকেন নাই জীবনে। শুধু শাস্ত্রপাঠ ও পূজার্চনায় দিন কাটাইয়া আসিয়াছেন।

একি বিপদ তাঁহার জীবনে আজ অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত, তিনি কোনো কথা বলিলেন না। চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিলেন লোকটার দিকে। বাঘের সামনে হরিণের চোখের মত সম্মোহিত দৃষ্টি তাঁর চোখে।

দস্যু আবার বলিল—বলি কানে গেল না কথা ঠাকুর মশাই; সিধে নিতে হবে তোমাকে—রাঁধতে হবে।

ঠিক এই সময় দু-জন লোক একটি বৃহৎ কাঠের বারকোশে সিধা বহন করিয়া বটতলায় আনিয়া হাজির করিল। একটি রুই মাছ, আলু, পটল, বেগুন, পাকা কলা, সন্দেশ, দই প্রভৃতি বারকোশে সাজানো। অগ্রবর্তী লোকটা ট্যাঁক হইতে দশটি টাকা বাহির করিয়া বারকোশে রাখিয়া বলিল—তোমার দক্ষিণে ঠাকুর মশাই। এই সব নাও। নিয়ে রাঁধো, খাও, আমাদের একটু পেসাদ দিলেই চলবে। টাকা দশটা চাদরের মুড়োয় বেঁধে নাও, ঠাকুর।

ভট্টাচার্য্য মশায় বোকার মত চাহিয়া রহিলেন মাত্র। কোনো কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। লোকটা বলিল—কি, কথা কইচ না যে? এ-সব নেবে না?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মুখে কোনো কথা নাই।

লোকটা এবার রাগিয়া উঠিল। তাহার চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মুখ-চোখের ভাব কঠিন ও ভীষণ। বলিল—তবে রে বিটলে বামুন, তুমি ঘুঘু দেখেচ, ফাঁদ ভাখো নি?

সে হঠাৎ হাঁক দিয়া বলিল—আবদুল জব্বর—

যমদূতের মত একজন আগাইয়া বলিল—কি হুকুম, সর্দার—

—এই বামুনকে এককোপে কেটে বিলের জলে ভাসিয়ে দাও। ধরো এর হাত—তুলো ধর্ এসে এর পা—

—এখুনি মুণ্ডু ঝটকে দেবো? দা দিয়ে?

—এখ্খুনি। ওর বামনাগিরি এখ্খুনি ঘুচিয়ে তবে আমার নাম ভৈরব সর্দার—

তারপর সে হাঁকিয়া বলিল—কেমন? এইবার শেষ। ঠাকুর, শেষ বারের মত জিজ্ঞেস করচি—সিধে নেবে? নিতে রাজি হও। কেমন তো? আবদুল জব্বরও রাজি হলেই ছেড়ে দেবে। কেমন রাজি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় উহাদের কথা শুনিতে পাইতেছিলেন না। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের শুভ নবমীতে তাঁহার জন্ম। রামচন্দ্রের মত।

মাঘমাসে সিতে পক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে।
কৌশল্যা জনয়াম্রামং বিষ্ণুতুল্যং পরাক্রমং ॥

শেষ কালে এই তাঁর শুভ জন্মতিথির পরিণাম? শূদ্র-যাজন তিনি করেন না,–এই অপরাধে এই দস্যুদের হাতে অপমৃত্যু ছিল তাঁর ললাট-লিপি? কত দুর্গা-ষষ্ঠীর বোধনে চণ্ডীপাঠের সময় তিনি নিজেই আবৃত্তি করিতেন যজমানের বাড়ী—

যা দেবী সর্বভূতেষু মৃত্যুরূপেণ সংস্থিতা—

যদি করালবেশিনী নৃমুণ্ডমালিনী, কৃপাণহস্তা সেই দেবীর আবির্ভাব তাঁহার জীবনে আসন্ন হইয়াই থাকে, তাঁহাকে তিনি আবাহন করিয়া লইবেন। খোকার মুখ মনে পড়িল। সে আসিবার সময় বলিয়াছিল—বাবা, আমার জন্যে কি আনবে?

—কি আনবো—তুই বল?

—বাসোতা এনো—

অর্থাৎ বাতাসা।

কাদম্বিনীকে আর দেখিবেন না, খোকাকে না, শৈল, জবা, মানদাকেও নয়।

আবদুল জব্বর আসিয়া রাধারমণ ভট্টাচার্য্যের হাত চাপিয়া ধরিল, আর একজন কালো জোয়ান মত লোক তাঁহার পা দুইখানা ধরিল এবং তাঁহাকে চ্যাংদোলা করিয়া বিলের জলের ধারে লইয়া চলিল।

তাহার পর একটা উঁচু ছোট টিবির ওপর তাঁহার গলাটা রাখিল। কে একজন বলিল—গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে দাও—

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গলার পাশে চোরকাঁটা লাগিয়া কুটকুট করিয়া উঠিল।

একবার তিনি ভাবিলেন, চোর কাঁটার মধ্যে কেন এরা এনে ফেললে! গামছা দিয়া ততক্ষণ তাহারা তাঁহার চোখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। অন্ধকার…চারিদিকে অন্ধকার…অন্ধকারের মধ্যে শুধু খোকার মুখ দেখা যাইতেছে…

মনে পড়িল ঈশোপনিষদের পুঁথিখানার নকল করার কাজ এখনো বাকি।

—পুঁথিখানা আর শেষ হলো না।

অন্ধকার…সব অন্ধকার…

কবিরাজের বিপদ

চন্দ্রনাথবাবু কবিরাজ এবং শিশির সেন তরুণ ডাক্তার। রামদাসের ছোট্ট বাজার পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। রোগীর চেয়ে ডাক্তারের সংখ্যা বেশি! তবে দেশটায় রোগ-বালাই নিতান্ত কমও নয়, তাই সবাই দু-মুঠো ভাতের যোগাড় করতে পারতো কোনোরকমে। চন্দ্রনাথবাবুর বয়েস পঞ্চান্ন-ছাপান্ন, শিশির

সেনের বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ। ওদের ডাক্তারখানা রাস্তার এপার-ওপার। রোগীপত্তর প্রায়ই থাকে না, দু-জনে বসে গল্প-সল্প করে। বয়সের তারতম্য যতই থাকুক, দু-জনে খুব বন্ধুত্ব। চন্দ্রনাথবাবু এসেচেন খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া থেকে আর শিশিরবাবু যশোর শহর থেকে।

কাজকর্ম না থাকলে যা হয়ে থাকে, দু-জনে বসলেই তর্ক আর দ্বন্দ্ব। তর্কের বিষয়-বস্তু প্রধানতঃ মানুষের মৃত্যুর পর কি হয়, এই নিয়ে।

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তাঁদের গ্রামের একজন সাধু ছিলেন, তিনি ভূত নামাতেও পারতেন। অনেকবার তিনি ভূতনামানো-চক্রে উপস্থিত ছিলেন, নিজের চোখে ভূতের আবির্ভাব দেখেচেন, ভূতের কথা শুনেচেন নিজের কানে। সাধুটি একজন বড় মিডিয়ম, তাঁর মধ্যে নাকি ভূতের দল পৃথিবীতে নিজেদের প্রকাশ করে।

শিশির সেন বলিল—রাবিশ!

চন্দ্রনাথবাবু বলেন—তোমার বলবার কোনো অধিকারই নেই এখানে! তুমি ছেলেমানুষ, কতটুকু তোমার অভিজ্ঞতা?

—অভিজ্ঞতার কোনো দরকার হয় না, কমন-সেন্সের প্রশ্ন এটা।

—কাকে বলচো কমন-সেন্স?

—মানুষ মরে গেলে আর বেঁচে থাকে না, কমন-সেন্স। মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করা।

—মরা মানেই না-বাঁচা।

—মরা মানে জীবনটা বড় করে পাওয়া।

—একদম বাজে।

—দু-পাতা সায়েন্স পড়ে ভাবচো খুব সায়েন্স শিখে ফেলেচো? আসল সায়েন্সের কিছুই জানো না, শেখো নি।

বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহ। এ বছরের মত এমন গরম এখানকার বৃদ্ধ লোকেরাও সেখানে কোনোদিন দেখে নি।

শিশির সেন বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় এসে ডাক্তারখানা খুললেন। নাঃ, টিনের বারান্দা তেতে আগুন হয়েচে, এখনো ঘরের ভেতর বসা সম্ভব নয়।

সামনের পানের দোকানীকে বললেন—রাস্তাটাতে একটু জল ছিটিয়ে দিও অন্তত—এখুনি লরী গেলে ধুলোয় চারিদিক অন্ধকার করে দেবে।

—ও কোবরেজ মশায়!

—কি?

—বাইরে আসুন না!

—যাই।

—কতক্ষণ এলেন?

—আমি আজ বাসায় যাই নি—দুপুরে এখানেই শুয়েছিলাম।

—খেলেন কোথায় ?

—রামজীবন তরফদারের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ গেল আজ কিনা। নেমন্তন্ন ছিল।

—হুঁ। আসুন আমার বারান্দায়, চা খাবেন ?

—না মশায়। এই গরমে চা ? দুপুরে লুচি ঠেসে ?

—দালদা ঘি-এর তো ?

—নইলে আর কোথায় পাচ্ছে গাওয়া ঘি ?

—না মশাই, ও নেমন্তন্ন না খেয়ে ভালোই করেচি। খেলে অম্বল, না হয় পেটের অসুখ। আর এই গরমে !

চন্দ্রনাথবাবু ডাক্তার সেনের বারাণ্ডায় এসে বসলেন এবং চাও খেলেন। পরে যথারীতি ভূতের গল্প শুরু হয়ে গেল।

চন্দ্রনাথবাবুর মধ্যে একটি সমরপটু আত্মা বাস করে, অবিশ্বাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাঁর তৃপ্তি। শিশির সেন ভূতে বিশ্বাস করুক, না করুক, তাতে চন্দ্রনাথ কবিরাজের কি ? জিনিসটা যদি সত্যিই হয়, তবে শিশির সেনের অবিশ্বাস সেটার কি হানি করতে পারে ?

চন্দ্রনাথবাবু সেটা বোঝেন না যে এমন নয়, বোঝেন সবই। তবু যদি একজন অবিশ্বাসীকেও একদিন আলোতে এনে হাজির করা যায় ! ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের দিগ্বিজয়ী প্রচারকদের আশা যেন তাঁর মধ্যে এসে বাসা বেঁধেচে। সত্যের আলোতে এসব অসৎ মূর্খ ছেলে-ছোকরাদের আনতেই হবে, তবেই প্রকৃত শাস্তি দেওয়া হবে এই দাম্ভিকদের। স্বার্থবাদী ছোকরা দাম্ভিকের দল ! দু-পাতা সায়েন্স পড়ে সব শিখে ফেলেচে।

চন্দ্রনাথবাবু জানতেন না শিশির সেনের মত ছোকরা তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করে। ওরা আড়ালে মুখ টিপে হেসে বলে—বুড়ো একদম সেকেলে। কুসংস্কারে ভরা। ইংরাজি তো তেমন জানে না। কবরেজি করতো, সংস্কৃত জানে একটু-আধটু। দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর। কি করি, মেশবার কোনো লোক নেই এসব জায়গায়। কার সঙ্গে দুটো কথা বলি, নইলে ওই বুড়ো হাবড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব আমার ? রামঃ !

একটু পরেই হঠাৎ পশ্চিম দিগন্তে অন্ধকার করে একখানা বড় কালো মেঘ উঠলো এবং কিছুক্ষণ পরে কালবৈশাখীর ঝড় শুরু হয়ে গেল। চন্দ্রনাথ কবিরাজ নিজের কবরেজখানার জানলা দরজা বন্ধ করতে ছুটে গেলেন। ধুলোয় চারিদিকে অন্ধকার হয়ে উঠলো, বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু হলো বটে কিন্তু বৃষ্টি বেশি না হয়ে ঝড়টাই হলো বেশি।

ডাক্তারখানার সামনের অশত্থ-গাছের একটা ডাল ভেঙে উড়ে এসে পড়লো শিশির সেনের ডাক্তারখানার দরজার সামনে। বৃষ্টি-ভেজা সোঁদা মাটির গন্ধ বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে বাতাস ঠাণ্ডা—গরম একদম কমে এল।

চন্দ্রনাথ বললেন—আঃ বাঁচা গেল ! শরীর জুড়িয়ে গেল যেন ! কতদিন পরে একটু বৃষ্টি পড়লো আজ মাটিতে।

—চা খাবেন একটু ?

—তা হলে মন্দ হয় না। আনাও আর একটু।

এই সময় বৃষ্টিটা বেশ জোরেই এল। বর্ষাকালের বৃষ্টির মত।

চন্দ্রনাথ কবিরাজের কবরেজখানার ঘরের চালের ছাঁচ বেয়ে অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। রাস্তায় জল জমে উঠলো আধ-ঘণ্টার ভেতর।

—বেশ বৃষ্টি হলো, মুষলধারে না হলেও এ বছরের পক্ষে মন্দ নয়। চন্দ্রনাথবাবু বললেন—কই তোমার চা কোথায় গেল হে ?

—নবীন তো গিয়েচে, বৃষ্টিতে আটকে পড়লো রামুর দোকানে। ছাতি আছে আপনার ?

—নাঃ।

—তবে আর কি হবে ? বসুন, জল ছেড়ে যাক।

—আপনার ভূতুড়ে আলোচনা আরম্ভ করুন না !

—নাঃ।

—কেন, আজ এত বিরাগ কেন ? আজই বরং ঠাণ্ডা বাদলার সন্ধেতে ও-কথা জমবে ভালো।

—না হে, তোমরা অবিশ্বাস কর হাসাহাসি কর, গভীর সত্যকে এভাবে বেনা-বনে ছড়াতে নেই।

—আপনার কথার প্রতিবাদ করতে বাধ্য হতে হচ্চে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে। গভীর সত্য কাকে বলচেন আপনি ?

—মানুষের জীবন ও মৃত্যু অদ্ভুত রহস্যময়। গভীর রহস্য দিয়ে ঘেরা আমাদের এই জীবন। মানুষ মরে না। ভগবান অনন্ত করুণার আকর। এই হলো গভীর সত্য। আরো সংক্ষেপে শুনতে চাও ? মানুষ অমর।

শিশির সেন হেসে বলে উঠলেন—তবে আপনি কবরেজি করেন কেন ? মানুষ যদি অমর তবে ?

—তার এই দেহটা অমর নয়, তাই কবিরাজি করি। আর এতদিন পরে কথাটা বলি, কবিরাজি করতে গিয়েই এই সত্যটা টেরও পেয়েচি।

—কি ভাবে ?

এই সময় নবীন চাকর ভিজতে-ভিজতে চা নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখলে।

শিশির সেন বললেন—বিস্কুট কই রে ? আনিস নি ? যা নিয়ে আয় চারখানা।

—আসুন ! দুটো সিগারেট নিয়ে আয় অমনি। এইবার বলুন কি ভাবে ?

চন্দ্রনাথ কবিরাজ চা খেতে খেতে গম্ভীর মুখে বললেন—নাঃ, ও সব নিয়ে ঠাট্টা নয়। বাদ দাও।

—না না, রাগ করবেন না। কি করে সত্যটা টের পেলেন কবরেজি করতে গিয়ে বলুন না ? বেশ বাদলার সন্ধ্যেটা—

—না, আমি বলবো না। ঠাট্টার ব্যাপার নয় সেটা। তোমরা হাসবে আর আমি ভেবেচ আমার জীবনের অত বড় একটা অভিজ্ঞতা—

—আমি কবে আপনাকে ঠাট্টা করেছি এ নিয়ে? সত্যি বলুন!

চন্দ্রনাথ কবিরাজের মনটা যেন একটু নরম হয়ে এল। তিনি চা খেতে-খেতে শুরু করলেন নিজের গল্পটি।

—আমি নিজে যা দেখেচি তা অবিশ্বাস করি কি করে? ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। পাকিস্তানে আমার বাড়ী ছিল খুলনা জেলার হলদিবুনিয়া গ্রামে। আমার বাবার নাম ছিল ৺ত্রিপুরাচরণ শাস্ত্রী, সেকালের বড় নামডাকওয়ালা কবিরাজ ছিলেন তিনি।

বাবা বড় কবিরাজ ছিলেন, তাঁর পসার পেলাম আমি। বাবা তখনো বেঁচেই আছেন, তবে কাজকর্ম করেন না। ইদানীং পক্ষাঘাত রোগে এক দিকের অঙ্গ অচল হয়ে গিয়ে শয্যাগত ছিলেন একেবারে। নাম-করা সেকেলে কবিরাজের ছেলে হিসেবে বড়-বড় বাঁধা ঘর ছিল, যারা অসুখ-বিসুখে আমাকে ছাড়া আর কোনো চিকিৎসককে ডাকতো না।

মালমাজীর পাকড়াশী জমিদার ছিলেন এমন একটি বাঁধা ঘর। সেবার কার্তিক মাসের শেষে জমিদার হরিচরণ পাকড়াশী ডেকে পাঠালেন—তাঁর ছেলের অসুখ।

আমি গিয়ে দেখলাম ছেলেটির বিষম জ্বর, যাকে আপনারা বলেন টাইফয়েড। পনেরো-ষোল বছর বয়েসটা ও রোগের পক্ষে তত সুবিধাজনক নয়। আমাকে জমিদারবাবু হাতে ধরে অনুরোধ করে বললেন—আপনাকে এখানে থাকতে হবে কবিরাজ মশায়, যা লাগে আমি তাই আপনাকে দেবো। ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন।

আমি রোগীর অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। পেট-ফাঁপা, বুকে সর্দি-কাশি, নাড়ির গতি আপনারা যাকে বলেন ইণ্টারমিটেণ্ট, ভুল বকা—সব খারাপ লক্ষণই বর্তমান। বাঁচানো বড়ই কঠিন।

ভগবান ধন্বন্তরীকে স্মরণ করে কাজে লেগে গেলাম। সেদিন সন্ধ্যার পর নাড়ির অবস্থাটা ভালো করে আনলাম। পেট-ফাঁপাও অনেকটা কমে গেল। ভুল বকুনি খানিকটা কমলো। আমি খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করতে গেলাম রাত্রি এক প্রহরের পর।

পাকড়াশী জমিদারদের বাড়ী দো-মহলা। বাইরে একদিকে দোলমঞ্চ, নাটমন্দির আর গোবিন্দ-মন্দির। ডাইনে সদর-কাছারি আর মহাফেজখানা। মহাফেজখানার দক্ষিণে আমলাদের থাকবার কুটুরি সারি-সারি অনেকগুলি। আমলাদের বাসার পূর্বদিকে বড় পুকুর। এই পুকুরের তিন দিকে বাঁধানো ঘাট। পুব পাড়ের ঘাট বাইরের লোকদের জন্যে, বাকি দুটি ঘাট আমলাদের জন্যে।

বাইরের মহলের মাঝখানে সদর দেউড়ি, এই দেউড়ির দু-পাশে দুই বৈঠকখানা।

আমার বাসা নির্দিষ্ট হয়েছিল বাঁদিকের বৈঠকখানার পাশের বড় কুঠুরিতে।

সাদা ধবধবে চাদর পাতা, দুটো বড় তাকিয়া, মশারি খাটানো, চমৎকার বিছানা করে

দিয়ে গিয়েচে বাড়ীর ঝি। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমি বাইরে বসে অনেকক্ষণ রোগীর বিষয় চিন্তা করলাম, কাল সকালে কি কি অনুপান দরকার হবে, সেগুলো মনে-মনে ঠিক করে রাখলাম। তারপর এসে শুয়ে পড়তে যাবো, এমন সময়ে দেখি জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ দিয়ে কে একজন সাদা-কাপড় পরা স্ত্রীলোক এদিকে আসচে।

রাত তখন অনেক! এত রাতে একা কে মেয়ে এদিকে আসচে বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি এসে দেউড়ি দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো। পনেরো মিনিটের মধ্যেই আবার সে বার হয়ে মাঠের দিকে চলে গেল। আমি ভাবলাম, আমলাদের বাড়ী থেকে যদি কোনো স্ত্রীলোক রোগীকে দেখতে আসে, তবে এত রাত্রে আসবে কেন? একাই বা আসবে কেন?...ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজলো দেউড়িতে।

এমন সময়ে বাড়ির ভেতর থেকে আমার ডাক এলো—রোগীর অবস্থা খারাপ, শীগগির যেন যাই।

আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম রোগীর শয্যার পাশে।

সত্যি রোগীর অবস্থা এত খারাপ হলো কি করে? দেড় ঘণ্টা আগেও দেখে গিয়েচি রোগী বেশ আরামে ঘুমুচ্চে, এখন তার জ্বর বড্ড নেমে গিয়েচে, অথচ চোখ দুটো জবা-ফুলের মত লাল, নাড়ির অবস্থা খারাপ। জ্বর এত কম দেখে ঘাবড়ে গেলাম। বেজায় ঘামতে শুরু করেচে রোগী। মস্ত বড় সঙ্কটজনক অবস্থার মুখে এসে পড়লো কেন এভাবে হঠাৎ?

তক্ষুনি কাজে লেগে যাই। আমিও ত্রিপুরা কবিরাজের ছেলে, উপযুক্ত গুরুর শিষ্য; দমবার পাত্র নই।

ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে রোগীকে চাঙ্গা করে তুলে শেষ রাত্রে ক্লান্ত দেহে বাইরের ঘরে বিশ্রাম করতে গেলাম।

এক ঘুমে একেবারে বেলা আটটা। উঠে রোগী দেখে এলাম, বেশ অবস্থা, কোনো খারাপ উপসর্গ নেই।

সারাদিন এক ভাবেই কাটলো। রোগীর অবস্থা দেখে বাড়ীর সকলে খুব খুশি। আমার সারাদিনের মধ্যে বিশেষ কোনো খাটুনি নেই। দুপুরবেলা খুব ঘুম দিলাম। বিকেলে—এমন কি বড় পুকুরে মাছ ধরতে গেলাম আমলাদের মধ্যে একজন ভালো বর্শেলের সঙ্গে। সেরখানেক একটা পোনা মাছও ধরলাম। মনে খুব ফুর্তি।

সেদিন রাত্রে বাইরের ঘরে শুয়ে আছি, এমন সময়ে দেখি দূরে মাঠের দিক থেকে যেন সেই স্ত্রীলোকটি এদিকে আসচে!

আজ সারাদিনের মধ্যে মেয়েটির কথা একবারও আমার মনে হয় নি। এখন আবার তাকে আসতে দেখে ভাবলাম ইনি নিশ্চয় এদের কোনো আত্মীয় হবেন, দূর গ্রাম থেকে দেখতে আসেন ঘরের কাজকর্ম সেরে। কিন্তু একা আসেন কেন?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, কাল এই মেয়েটি রোগীকে দেখে চলে যাবার পরেই রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি দেউড়ি দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো দেখে আমার বুকের মধ্যেটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো কেন কি জানি! কান খাড়া করে রইলাম বাড়ীর দিকে।

আরামে ঘুমুতে যাচ্ছিলাম কিন্তু বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম। ঘড়িতে ঠিক সে সময় বারোটা বাজলো।

হঠাৎ দরজার কাছে কি শব্দ হলো! মুখ তুলে দেখি, সেই স্ত্রীলোকটি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচেন।

বেশ সুন্দরী, ধপধপে শাড়ী-পরা, চল্লিশের মধ্যে বয়েস, কপালে সিঁদুর।

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুবার আগেই তিনি আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে হুকুমের সুরে বলতে আরম্ভ করলেন—শোনো, তুমি এই ছেলেকে বাঁচাতে পারবে না, তুমি বাড়ী যাও।

আমার মুখ দিয়ে অতি কষ্টে বেরুলো—কেন মা? আপনি কে?

আমার শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করে উঠলো! সমস্ত ঘরটা যেন ঘুরচে। কেন এমন হলো হঠাৎ কি জানি!

তিনি এক দৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে বললেন—শোনো, আগুন নিয়ে খেলা কোরো না। একে আমি নিয়ে যাবো। এ আমার ছেলে। ওর বাবা আবার বিয়ে করেচেন আমার মৃত্যুর পর। সৎমা ওকে দেখতে পারে না। বহু অপমান হেনস্থা করে। আমি সব দেখতে পাই। আমার স্বামী অনেক কথা জানেন না, কিন্তু আমি সব জানি। আমি আমার ছেলেকে নিশ্চয় নিয়ে যাবো। কাল রাত্রেই নিয়ে যেতাম, তোমার জন্য পারি নি। তুমি চলে যাও এখান থেকে। ওকে বাঁচাতে পারবে না।

আমার সাহস ফিরে এল।

হাত জোড় করে বললাম—মা, আমি বৈদ্য। আমার ধর্ম প্রাণ বাঁচানো। আমার ধর্ম থেকে আমি বিচ্যুত হবো না কখনোই। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার। একটা প্রস্তাব আমি করি মা। জমিদারবাবুকে সব খুলে বলি। অসুখ সারবার পরে তিনি ছেলেকে যাতে কোনো ভালো স্কুলের বোর্ডিং-এ রেখে দ্যান, এ ব্যবস্থা আমি করবো। এ যাত্রা আপনি ওকে নিয়ে যাবেন না। যদি আবার ওর ওপর অত্যাচার হতে দ্যাখেন, তখন নিয়ে যাবেন আর আমিও আসবো না। দয়া করুন জমিদারবাবুকে। তিনি বড় ভালবাসেন এই ছেলেকে।

তিনি বললেন—বেশ তাই হবে। তবে যদি কোনো ভালো ব্যবস্থা না হয়, তবে এবার আমি ওকে নিয়ে যাবোই, মনে থাকে যেন।

তখনই যেন সে মূর্তি মিলিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে আমার ডাক এল অন্দর থেকে, রোগীর অবস্থা খারাপ।

আমি তখনি ছুটে গেলাম। কাল যেমন অবস্থা ছিল, আজও ঠিক তাই। বরং একটু বেশি

খারাপ। ভোর পর্য্যন্ত পরিশ্রম করতে হোলো রোগীকে চাঙ্গা করতে।

সকালবেলা বাইরে যাওয়ার আগে জমিদারবাবুকে আমি নিভৃতে ডেকে বললাম—কিছু মনে করবেন না জমিদারবাবু, আপনি এই ছেলেটিকে বাঁচাতে চান তো?

জমিদারবাবু অবাক হয়ে বললেন—তার মানে?

তার মানে হচ্চে এই। আপনি জানেন না ওই ছেলেটির ওপর ওর সৎমা বড় অবিচার করেন। কাল ওর মা আমার কাছে এসেছিলেন—শুনুন তবে।

সব কথা খুলে বললাম। জমিদারবাবু প্রথমটা অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেললেন।

পরে বললেন—আমি কিছু কিছু জানি। বেশ এবার ও বেঁচে উঠুক, এর ব্যবস্থা আমি করবো, আপনাকে আমি কথা দিলাম। ও সেরে উঠুক, জানুয়ারি মাস থেকে যশোর জেলাস্কুলের বোর্ডিং-এ ওকে আমি রাখবো।

— কেমন ঠিক তো? এবার কিছু হলে আমি কেন, কেউ আর ওকে বাঁচাতে পারবো না।

—আমি কথা দিচ্চি কবরেজ মশাই।

—বেশ। নির্ভয়ে থাকুন, আপনার ছেলে সেরে গিয়েচে। আগামী মঙ্গলবার ওকে পথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। আপনি পুরনো চাল কিছু এর মধ্যে যোগাড় করুন।

—পরের দিন জ্বর ছেড়ে গেলো রোগীর।

শিশির সেন এক মনে গল্প শুনছিলেন।

বললেন—সেরে উঠলো!

—নিশ্চয়।

—আর কোনদিন দেখেছিলেন তার মাকে?

—কোনদিন না। সে ছেলে এখন কলকাতায় থাকে, কিসের ভাল ব্যবসা করে শুনেচি। জমিদারবাবু মারা গিয়েচেন। চললুম আমি, বৃষ্টি থেমেচে—ঘরে আলো জ্বালি গে।

চন্দ্রনাথ কবিরাজ উঠে চলে গেলেন।

আমোদ

রামধন সকালে উঠে ঝিঙের ক্ষেত নিড়ুচ্ছিল। হঠাৎ তার কাছে তার ছেলে ফণি এসে বললে—বাবা, আজ বড় মজা হবে বাজারে। শুনেচ কিছু?

—কি রে?

—ভালো যাত্রা আসবে কলকেতা থেকে। বড় দল। যাবা নাকি দেখতি?

—যাবো না! বলিস কি রে? তুই আমি দু-জনেই যাবা নি। কলকেতার দলের গাওনা কতদিন শুনি নি বলতো?

—পান্তাভাত খেয়ে নিয়ে চলো সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি। নইলে জায়গা পাওয়া যাবে না। জানো তো কি রকম ভিড় হয়?

মহা উৎসাহে রামধন ঝিঙের ক্ষেতের উত্তর আলের বেড়া বেঁধে বললে—আজ দশ বারো দিন হোল বেড়াটা ভেঙেচে, বাবলা কাঁটা আর কুল কাঁটা দিয়ে বাঁধতে হবে কিন্তু সম্প্রতি সে খুব অপমান হয়েচে হৃদয় বিশ্বাসের জমির বাবলা কাঁটা কাটতে গিয়ে।

হৃদয় বিশ্বেসের জামাই মাখন ওকে বলেছিল।—বলি, এবার কিন্তু ফৌজদারি হবে মনে রেখো। মোরা বাবলা গাছ রেখিচি তোমার বেড়ায় কাঁটা দেবার জন্যি নয়। মনে রাখবা।

সে বলেছিল—দুটো ডাল নেবানি তোমার গাছ থেকে। নইলে বেড়া দেবানি কি করে?

মাখন রেগে বলেছিল—এ তো বড্ড আবদার দেখি,—তোমার? ঘাড় ধরে বার করে দেবো জমি থেকে বলে দিচ্চি। তোমার বাবার জমি তো নয় এটা?

—বাবা তোলবার দরকার কি জামাইবাবু? না হয় চলে যাচ্চি।

—তাই যা—

ভালো বলতে হয় সীতেনাথ পোদের ভাই হরিকে। সে পাশের কলাবাগান থেকে নিম্নস্বরে ওকে ডেকে বললে—বলি, বড় লোকের জমিতে কেন যাও দাদা? আলের মাথায় আমাদের বড় বাবলা গাছটা থেকে যত ইচ্ছে ডাল কেটে নিয়ে যাও।

—ছাখো দিকি ভাই, কি অপমান সকালে করলে মোরে?

—বাদ ছাও। সাত খাদা জমিতে ধান বুনে মাথা একেবারে স্বগ্‌গে উঠে গিয়েচে ওদের। বড় লোকের দোরে যাওয়ার দরকার কি তোমার দাদা? নিয়ে যাও ডাল যত ইচ্ছে।

সেই ডাল দিয়ে আজ দশ পনেরো দিন পরে বেড়া বাঁধলো রামধন। সেও জাতে পোদ, নিতান্ত গরিব। একটা ধানের ছোট্ট আউড়িও নেই বাড়ীতে। এমন লোকের কি আর খাতির হয় গাঁয়ের বড় লোকদের মধ্যে?

কাছারীর নায়েব ঘনশ্যাম সরকারকে অনেক খোশামোদ করে বাঁধাল জমা দিয়ে গত আশ্বিন মাসে মাছ ধরে সামান্য কিছু পেয়েছিল। তাই দিয়ে ধান কিনে এতদিন চলেচে। এইবার ভরসা এই ঝিঙের ক্ষেত। ঝিঙের দাম আছে বাজারে এবার। ষোল টাকা মণ। ফি হাটে একমন ঝিঙে বিক্রি হলেও ওদের সংসার হেসেখেলে চলবে। এ জমিতে ঝিঙে ফলবেও ভালো।

দুপুরের পর ভাতটাত খেয়ে রামধন আর তার ছেলে ফণি পাঁচঘরার বাজারে যাত্রা দেখতে যাবার জন্যে তৈরি হোল। এখান থেকে ছ-কোশ পথ। পথে বামুনদহর বিল পার হতে হবে।

কোদালে নদী পার হতে হবে, রাস্তা নেই, শুধু মাঠের আলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে। মস্ত বড় শ্মশান পড়বে নকফুল-রামনগরের। কষাড় বন তিন পোয়া পথ।

ফণি বললে—বাবা, রাত্তিরি কি খাবো?

—চিঁড়ে সঙ্গে নিয়ো। তাই ভিজিয়ে বাপ-পোতে খেয়ে নেবো।

—চল সকাল-সকাল বেরিয়ে যাই।

গেল ওরা বেরিয়ে দুপুরের পর।

রামধন পোদ একসময়ে যাত্রার বড় ভক্ত ছিল। একবার তার ছোট্‌বেলায় মতি রায়ের বিখ্যাত যাত্রা-দল এসে 'তরণীসেন বধ' পালা গান করে সাহাপুরের বিশ্বাসদের বাড়ী। অমন গান কখনো এদেশে কেউ শোনেনি নাকি। রামধন সেই থেকে যাত্রা গাওনার কত বড় বড় দল সে দেখলে জীবনে।

মতি রায়ের দল গেল, তাঁর ছেলে ধর্মদাস রায়ের দল হোল। ধর্মদাস নারদ সেজে কি সুন্দর অ্যাক্‌টো করতো, শুনলে চোখে জল আসতো।—গান কি একখানা।…

কতকগুলো গান তার চিরকাল মনে থাকবে।

সাঁতরা কোম্পানির দলের পাঁচুলাল বাগদার কথা সে কখনো ভুলবে? অমন জুড়ির গান, 'অজামিলের বৈকুণ্ঠলাভ' পালায় মুমূর্ষু অজামিলের সামনে দাঁড়িয়ে 'চেয়ে দেখো ঐ মহাপ্রস্থান' গানখানা!—সেই দুই হাত ওপরের দিকে তুলে একটা আঙুল দিয়ে বার বার অচেতন অজামিলের দিকে দেখিয়ে দেখিয়ে, বার বার মাথা দুলিয়ে—নাঃ, সে সব জুড়িও আজকাল আর যাত্রাদলে নেই, তেমন গানও কেউ আর গায় না।

যাদব বাঁড়ুয্যের দলের রাজার অ্যাক্‌টো করতো সেই একটি লোক—ঠিক একেবারে কি রাজা-মশাই? আচ্ছা কোথায় ওসব লোক যোগাড় করে যাত্রা-দলের লোকেরা? হাত-পা নেড়ে কি তার কথাবার্তা। হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো রামধন পোদ…এই রকম না হলি রাজা? রাজা এরেই বলে। কি তরোয়ালের ঝনঝনানি। মাথায় মুকুটের একটা সাদা পালক উঁচু হয়ে থাকতো, যেন ময়ূরের পেখম!

একবার একটা স্বদেশী গান হয়েছিল, ভূষণ দাসের 'মাতৃপূজা'। রামধন ভাল বুঝতে পারে নি, দেববালকগণ যখন সবাই হাত বাড়িয়ে অসুররাজের সেনাপতিকে বলতে লাগল—'আমায় বাঁধ, আমায় বাঁধ'…বৃদ্ধ ব্রহ্মাকে যখন অপমান করলে অসুররাজের কর্মচারীরা—খুব ভালোই লেগে-ছিলো। আসরের ভদ্দর লোকেরা ঘন ঘন হাততালি দিচ্ছিল—রামধন পোদ তখন চুপ করে বসেছিল, জিনিসটা তার মাথায় ভালো ঢোকে নি যেন। বাইরে এসে সে একজনকে জিগ্যেস্ করেছিল—সুরেন্দর বলচে কাকে ওরা?

—আহা, জানো না। সুরেন বাঁড়ুয্যে। মস্ত স্বদেশী। সাহেব মেরেছিল, ধরে নিয়ে গিয়েছিল বরিশালের সভায়।

—কেন গো বাবু?

স্বদেশী করবার জন্যে, আবার কেন ?

—ব্রহ্মা কে ?

—বরিশালের অশ্বিনী দত্ত।

—তিনি কে গো ?

—নাম শোনো নি ? মস্ত বড় স্বদেশী ? মহাপুরুষ লোক।

পুবদিকে ফরসা হয়েচে। কাক কোকিলের ডাক শুরু হোল ডালে-ডালে। রামধন পোদ্দ এইটুকু তথ্য সংগ্রহ করেই মহা হৃষ্ট মনে গঞ্জের বাজার থেকে চলে এসেছিল। তখন ভুবলহাটের গঞ্জে কলকাতার ফড়ে মহাজনেরা বেগুন মাপাতো আড়াই টাকা মন—কিন্তু জিনিস-পত্তর সস্তা কত, একসের একটা কাতলা মাছ দু-আনা দিয়ে কিনে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এল ভুবলহাটির বাজার থেকে।

কোথায় গেল সে সব দিন।

তারপর এল নতুন ধরনের যাত্রার যুগ।

জুড়ি উঠে গেল, গান হোত নতুন ধরনের, সাবেক ধরনের পালাও আর নেই। পালার শেষে আজকাল রাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলন একদম উঠে গিয়েচে -রামধনের যেন কেমন কেমন লাগে। ঠাকুর-দেবতার পালা আর হয় না—

এখন কি সব এসেচে—তার মানে ভালো বুঝতেই পারে না রামধন। সাজ-পোশাকেরও তেমন জাঁক-জমক নেই।

বেলা তিনটের সময় বামুনদ'র বড় বিলের পাড়ে এসে পৌঁছলো দু-জনে। ওপারে বড় একটা বটগাছ, কষাড় ঘাসের ঝোপ সবুজ হয়ে উঠেচে, টোপাপানা আর কলমীর দাম ডাঙার কাছে, বেশি জলে পদ্মফুলের খেলা, ঘন বর্ষা এ বছর, তারও পরে ধারা শ্রাবণ, দিনরাত বৃষ্টির কামাই নেই।

ফণি বললে—বাবা, একদিন ঘুনি পাতবা বামুনদ'তে ত্যাখো মাছের বহর।

—কি মাছ রে ?

—জলের ধারে এসে ত্যাখো। ঐ ত্যাখো পানার দামের তলায় !

রামধন সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে দেখে বললে—মাগ্না আর ঘেঁয়া—

—দু-একটা বড় গজাড় দু-বার এ্যালানি দিয়েচে—

—কত বড় ?

—দু-সেরের ওপর হবে।

—তা এখন আর করি কি বল। তেতজ্বর হয়ে গেল। যাত্রা শুনতে গেলি মাছ আর ধরা হয় না আজ।

—পার হবা কি করে ? বড্ড জল বেড়েচে বিলের।

—তালের ডোঙা-টোঙা ত্যাখ দিনি। কোনোদিকে আছে কি না ?

বিলের ধার দিয়ে দিয়ে প্রায় একপোয়া পথ গিয়ে তবে নাজির মালতের কলাবাগানের নিচে

তাদের তালের ডোঙা পাওয়া গেল।

হাতে হুঁকো, সত্তর বছরের ওপর বয়েস। তাঁকে ডেকে বললে—ও মালতে ভাই ডোঙাটা নেবো?

—কনে যাবা?

—যাবো যাত্রা শুনতি রামনগরের বাজারে।

—মাছ ধরবা না এ বছর বিলি? বড্ড মাছ উঠচে।

—জ্যাখলাম। তা খাজনা বড্ড বেশি করেচে এ বছর জমিদার—চোদ্দ ট্যাকা দিয়ে নাকি লাইকিনি করতে হবে। মোরা গরিব লোক, অত ট্যাকা কনে।

—ধরো না মাছ। আমি আছি, কেউ কিছু বলবে না।

নাজির মালতে এ অঞ্চলের মধ্যে অবস্থাপন্ন ধনী গৃহস্থ।—চল্লিশ-পঞ্চাশটা ধানের গোলা বাড়ীতে। ছোট-ছোট ছেলে মেয়েদের চুল কেটে নিলে কি 'পরঘাট' করলে মালতে বাড়ী জানান দিতে আসে দূর দূরান্তর থেকে—তা থেকেও বেশ দু-পয়সা উপার্জন হয় ওদের। লোকও খুব ভালো। অনেক নিরন্ন দরিদ্র পরিবার গত পঞ্চাশের মন্বন্তরে ওদের গোলার ধান নিয়ে গিয়েচে।

মালতে বললে—তামাক খাবা না রামধন?

—না মালতে ভাই, সময় হবে না। এখুনি পার না হলি জায়গা করতি পারবো না।

ওরা শক্ত হাতে ডোঙা চালিয়ে বিলের মাঝখানের কষাড় দ্বীপে এবং তারপর সেখান থেকে সবুজ উলুঘাস ভরা ওপারে চলে গিয়ে একটা হিজল গাছের গায়ে ডোঙার দড়ি বেঁধে মাঠের পথ বেয়ে হেঁটে চললো—আমিনপুরের দিকে। আমিনপুরের হরিহর সর্দার জাতে বুনো, রাস্তার ধারে বসে আউশের ক্ষেতে চৌকি দিচ্চে, ওদের দেখে বললে—যাত্রা শুনতি?

—রামধন বললে—তামাক আছে?

—বোসো। খাওয়াই।

—যাত্রা শুনতি যাবা না?

—কি করে যাই? গরুর এখনো ম্যালা মাঠ। যদি ছেড়ে যাই, সব বেটাদের গরুতি শেষ করে দেবে। একে তো এবার ধানই হবে না দেশে, তার ওপরে ম্যালা মাঠ করে বসেচে এই ছেরাবন মাসেও। ভাবো দিকি।

তামাক খেয়ে আবার ওরা রওনা হোল। ক্রোশখানেক গিয়ে ছোট্ট নদী কোদলা। ওপারে কাজি সাহেবদের বাড়ী। কাজি সাহেবদের নিজের খেয়া, বিনি পয়সায় পারাপার করে। রামধন ডাক দিতে ওদের লোক নৌকো নিয়ে এসে পার করে দিয়ে গেল।

বেলা একেবারে যায়।

পশ্চিম দিকে মস্ত কালো মেঘ উঠচে।

ফণি দেখেই বললে—বাবা, হেঁড়ে চোমরা মেঘ! বিষ্টি হবে।

—চল, নকফুলের জেলেপাড়ার সামনে। ওখানে বসবো।

—শ্মশান পেরিয়ে গেলে হোত না সন্ধেবেলা?

—ভিজে যাবি যে।

—তা হোক বাবা। শ্মশানে বড্ড ভয় করে। এবিয়ে যতটা নেওয়া যায়। সর্দারদের ওখানে তামাক খেতি দেরি করে ফেললে যে!

ভীষণ মেঘ উঠেচে, ঝড়ে একপাল মিশকালো মেঘ ওদের দিকে উড়ে এসে সারা আকাশ অন্ধকার করে মাঠময় তার কালো ছায়া ফেললে। সোঁ সোঁ শব্দ হচ্ছে। সজল বাতাস বইচে। উলুখড়ের মাথা দুলছে—রামধন বললে—দৌড়ো বাবা ফণি, দৌড়ো—

কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় বৃষ্টি না হয়ে মেঘ উড়ে শ্মশানের বড় বটগাছটার উঁচু মাথা পেরিয়ে উত্তর পুব কোণের দিকে উড়ে বেরিয়ে গেল। ফণি খুব জোরে জোরে হাঁটতে লাগলো সন্দের অন্ধকারের আগে শ্মশান পেছন ফেলতেই হবে। ও বড় যে-সে শ্মশান নয়।

এ অঞ্চলের নামডাকী শ্মশান। কি নেই ওখানে।

ভূত আছে, গোদান আছে, বেঁকি আছে, পেত্নী আছে, এত ভূত আছে দিনমানেই প্রাণ হাতে করে যেতে হয়।

রামধন বললে—ফণি ভয়ডর কিছু নেই। আমার তাগায় বাবার মাদুলি।

—আমার কাছের ফুলে-নবলার কবচ।

—কোনো ভয় নেই। এগিয়ে পড়ো।

—কারা বোধহয় মড়া পোড়াতে এসেচে।

রামধন বললে—কে রে ফণি?

ফণি ভয়ে ভয়ে বললে—ওরা কারা? কি জানি কি করচে?

রামধন বললে—কেডা গো তোমরা?

চার-পাঁচটি লোক শ্মশানে কি খুঁজচে যেন।

কে একজন বললে—নড়াল বাড়ী। পাকিস্তানের লোক।

—ওখানে কি করচে?

—হাঁটা দাও ফণি। আমাগোর সে পৌচাতে দরকার কি?

ফণি বললে—বাবা, আমি জানি ওরা কি খুঁজচে। মরার কাপড় নিয়ে গিয়ে তাই কেচে পরবে। ওদের বড্ড কষ্ট। কি করবে বলো।

—নাঃ নাঃ মড়ার কাপড় খুঁজবে কেন?

—হ্যাঁ বাবা মড়ার কাপড় খুঁজচে আমি জানি। সেদিন খয়রামারির শ্মশান থেকে দু-জন লোক কাপড় নিয়ে গিয়েচে। অনেকে অমন করচে—

আকাশে নক্ষত্র উঠেচে। বড় বটগাছটায় বাদুড় ঝটপট করচে। দূরে শেয়ালের পাল প্রহর ঘোষণা করলে। ঝিঁকুড় ফুলের বদ গন্ধ বেরুচ্ছে বর্ষার জোলো বাতাসে। ফণির গা কেমন

করতে লাগলো, ওই তেতো, কড়া, বোটকা গন্ধ নাকে এলে, যেন মনে হল-তার জন্ম হলো। আরও ক্রোশ খানিক পথ হাঁটলো ওরা।

এবার রামনগরের বাজার পড়বে সামনে।

রাস্তার ধারে ঝুলনের বাজার বসেচে, পাঁপড় ভাজা, মাটির ছোবা, পুতুল। পিঁপিঁ বাঁশি। মুড়ি-মুড়কি, ফুলুরি, তালের বড়া। হাঁড়ি, কলসী, সরা। তালপাখা, ঘুনসি, ফিতে চিরুনি। বিড়ী পান দেশলাই।

লোকে লোকারণ্য। রামনগরের ঝুলনের মেলা এদেশের বিখ্যাত ব্যাপার। আশেপাশের অনেক গ্রাম থেকে লোক এসে জুটেচে।

রামধন ও ফণি তাড়াতাড়ি আসরের দিকে চললো।

দূর থেকে একটা হট্টগোল শোনা যাচ্চে, আর শুধু দেখা যাচ্চে লোকের মাথা।

বড় বড় হ্যাজাক লণ্ঠনের আলো জ্বলচে আসরে।

রামধন বললে—ও বাবা ফণি, ক্যামন আসর সাজিয়েচে দেখ। চল শীগগির এগিয়ে চল।

কিন্তু যাত্রার আসরের গেটে ওদের দু-জন শার্ট-পরা ভদ্রলোক আটকে ফেলে বললে—কোথায় যাচ্চ?

রামধন ভয়ে ভয়ে বললে—আসরে।

—হবে, না, ফিরে যাও—

—আজ্ঞে, অনেক দূর থেকে আসচি—বড্ড কষ্ট করে।

—যাও যাও। একি মামার বাড়ীর আবদার—ভাগো—

রামধন হাত জোড় করে বললে—বাবু একটু জায়গা পাবো না?

ওদের মধ্যে একজন রেগে বললে—না না। হবে না। ভদ্দর লোকের আর মেয়েদের আগে—তারপর তোমাদের।

—বাবু—

—গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দাও তো পরেশ? ওকে বসতে না দিলে চলচে না আর—ভাগো এখান থেকে।

তার চেয়েও দুর্ঘটনা ঘটে গেল।

রামধনের ছেলে যুবক এবং তার রক্ত গরম। সে প্রতিবাদের উত্তরে কি বোধ হয় বলেছিল গেটের ওপাশে।

হঠাৎ কিল চড়ের শব্দে মুখ ঘুরিয়ে দেখলে রামধন, ওর ছেলেকে ঘিরে ফেলে কারা মারধর করচে। সে ছুটে গিয়ে, লোকজনের পায়ে পড়ে ভিড় থেকে বার করে নিয়ে এলো।

ফণির চোখের কোণ দিয়ে রক্ত পড়চে। মাথার চুল উসকো-খুসকো—বড্ড মার খেয়েচে সে।

রামধন ছেলেকে নিয়ে একটা দোকান থেকে জল চেয়ে নিয়ে ওকে খেতে দিলে, ওর চোখে-মুখে দিলে। কিছু সুস্থ হোলে ওকে গরম এক পেয়ালা চা দু-পয়সা দিয়ে খাওয়ালে।

বললে—দুটো চিঁড়ে ভিজিয়ে দি বাবা—

—না এখন কিছু খাবো না। চলো যাত্রা দেখি।

—কি করে যাবি ওখানে? আর যাবো না। ঢের হয়েচে।

—চলো দূর থেকে দেখবানি—

আসর থেকে বহুদূরে লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওরা সতৃষ্ণ নয়নে আসরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কলকাতার দলের যাত্রা। গান করছিলো একটা ছোকরা হাত-পা নেড়ে। সাহেব সেজে কে একজন দাঁড়িয়ে খুব চেঁচিয়ে কি বলছিলো, রানী দাঁড়িয়ে ছিলেন সামনে। কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

মাঝে মাঝে সামনে এসে লোকের দল দাঁড়িয়ে যায়, আর কিছুই নজরে পড়ে না। আবার একচমক হয়তো দেখা যায়—রানী চোখে আঁচল দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদচেন।

সারারাত ওদের এভাবেই কাটলো। স্রেফ দাঁড়িয়ে।

ভোর বেলা যাত্রা ভাঙলে রামধন ছেলেকে নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। সমস্ত রাস্তা বলে বলে এল—কি পঙ্কার! যাত্রার মতন যাত্রা! দেখলি চোখ জুড়িয়ে যায়! সত্যি। না হয় আর কলকেতার দল বলেচে কি সাধে?

সতীশ

আজ বছর চারেক আগে সতীশ আমাদের স্কুলে ছাত্র ছিল।

টেস্ট পরীক্ষায় উপরি-উপরি দু-বছর ফেল করে সে স্কুল ছেড়ে দেয়। এর পর আর অনেক দিন ওকে দেখি নি।

একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি, কে একজন এসে পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করে বলল—ভাল আছেন স্যার?

মুখ তুলতেই দেখলুম সতীশ। অনেকদিন পরে দেখা, খুশি হলুম। কুশল-প্রশ্নাদির আদান প্রদানের পর বললুম—কি কর আজকাল?

সতীশ বিনয়ে মুখখানা কাঁচুমাচু করে বললে—আজ্ঞে, আজকাল দমদম এরোড্রোমে পাইলটের কাজ শিখচি।

আশ্চর্য্য হলুম, খুব খুশিও হলুম। একজন বাঙালী তরুণ যুবক টাইপিস্ট কেরানিগিরি, টেলিগ্রাফ বা হোমিওপ্যাথি শিক্ষার গতানুগতিক পথ ছেড়ে দিয়ে এরোপ্লেন চালানো শিখচে—এ সত্যিই আনন্দের বিষয়। তার ওপরে সে আবার আমাদেরই স্কুলের ছাত্র! মনে মনে

ভাবলুম—ছেলেটার মধ্যে তো বেশ জিনিস আছে! যা ভাবতুম তা নয়!··· .

স্কুলে গিয়ে মাস্টারদের মধ্যে বললুম ব্যাপারটা।

সেদিন টিফিনের সময় টিচারদের 'কমন রুমে' সতীশের কথা ছাড়া আর কোনো আলোচনাই নেই। কেউ বললে—দেখুন, কিসের মধ্যে কি থাকে!

—সেই সতীশ! এখন কি না—

অঙ্কের মাস্টার বিপিনবাবু বললেন—আমার হাতে কুড়ির বেশি নম্বর ওঠে নি টেস্টে—দু-বারই—

যদুবাবু বললেন—আর ইংরিজি ফার্স্ট পেপারেই কি, সেকেণ্ড পেপারেই কি—পঁচিশের বেশী কখনো পেতে দেখি নি—আর কি দুষ্টুই ছিল! সরস্বতী পুজোর সময় ভাঁড়ার থেকে একটিন রসগোল্লা সরিয়ে—

ইতিহাসের ছোকরা টিচার অরুণবাবু বললেন—তাই হয় মশাই। হিস্ট্রিতে যারা-যারা বড় হয়েচে—নেপোলিয়ান বলুন, আলেকজাণ্ডার বলুন, লর্ড ক্লাইভ বলুন, ও গিয়ে ইয়ে বলুন—সব গিয়ে দেখুন বিবেচনা করে—

সেকেণ্ড পণ্ডিত বৃদ্ধ অঘোরবাবু বললেন—মাইনে কত হবে পাস করতে পারলে?

অরুণবাবু বাইরের খবর টিচারদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী রাখতেন। তিনি বললেন—তা সেকেণ্ড ক্লাশ পাইলটের সার্টিফিকেট পেলেও ধরুন গিয়ে দেড়শো টাকা থেকে শুরু।

—লুফে নেবে মশাই—তিন শো চার শো···আর ফার্স্ট ক্লাশ সার্টিফিকেট পেলে তো কথাই নেই—চারশো থেকে আরম্ভ সাত শো, হাজার, দেড় হাজার—

অঘোরবাবু আপন মনে ঘাড় দুলিয়ে বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন—ওঃ কত বেত ভেঙেচি ওর পিঠে···যেমন ছিল গাধা, তেমনি দুষ্টু!···সেই সতীশ কি না—

বোধ হয় সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তাঁর মনে হোল যে আজ সাতাশ বছর ধরে তিনি এই স্কুলে নাম-সই করার ডাক টিকিটের দাম বাদ দিয়ে, চৌত্রিশ টাকা পনেরো আনা মাইনেতে কাটিয়ে গেলেন।

এর পরে আর একদিন সতীশের সঙ্গে দেখা, মাসখানেক পরে রাস্তার ধারে একটা রোয়াকে বসেছিল আমায় দেখে নেমে এল।

বললুম—সার্টিফিকেট পেতে আর কত দেরি?

সতীশ পূর্বের-মত বিনয়ের সঙ্গে বললে—আজ্ঞে, এখানে তো হয়ে গেল। এইবার করাচী গিয়ে ছ-মাস ট্রেনিং-এ থাকতে হবে। তা হোলেই আপনাদের আশীর্বাদে—

বলেই সে খপ্ করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। তারপর আমার সঙ্গে কিছুদূর গল্প করতে করতে এল। এরোপ্লেনের ব্যাপার নিয়েও দু-একটা কথা বললে।

আমি বললুম—আচ্ছা, পাইলটের কাজে বিপদও তো আছে, কি বলো?

—স্যার, আর কিছু বিপদ না, এরোপ্লেন চালাতে চালাতে মাঝে মাঝে লাইটনিং পড়তে পারে—ঐ এক ভয়—

—বল কি ! এ রকম তোমার হয়েচে নাকি কখনো ?

—হয় নি স্যার ? কতবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েচি।

—আচ্ছা একটা ঘটনা বল দিকি ? বড় ভাল লাগচে তোমার কথা—

—আর একদিন বলবো স্যার, আজ মামা বসে আছেন দাড়ি কামাবেন বলে, আমায় নাপিত ডাকতে পাঠিয়েচেন—বেলা হয়ে যাচ্চে—

মধ্যে মাস কয়েক আর ওর সঙ্গে দেখা হয় নি।

তারপর একদিন হঠাৎ আমহার্স্ট স্ট্রীটের সেই গলির মোড়ে দেখা।

আগ্রহের সহিত বললুম—এই যে সতীশ, করাচী থেকে কবে এলে ?

সতীশ আমার পায়ের ধুলো নিয়ে আগে প্রণাম করলে। ভারী বিনয়ী ছোকরা। তারপর বললে—ছুটিতে আছি, স্যার। এরোড্রোমের কাজ ছেড়ে দিলুম করাচী গিয়ে। দেখলুম ও আমাদের পোষায় না। সঙ্গে সঙ্গে বম্বেতে একটা ভাল চাকরি পেয়েও গেলাম কিনা ?—এই রেলে। এই তো মঙ্গলবারে এসেচি ছুটি নিয়ে। আবার সামনের হপ্তাতেই যাবো।

বললুম—তা বেশ। কত টাকা মাইনে হোল ?

—আজ্ঞে আশি টাকা।

—ও তোমার ভালই হয়েচে।

—আর স্যার উন্নতিও আছে খুব। আশি থেকে শীগগিরই একশো হবে, দুশো পর্যন্ত গ্রেড। তবে বড় খাটুনি। সকালে উঠে যাই, আর বেলা বারোটা—ওদিকে তিনটে থেকে রাত আটটা। তবে উপরি আছে।

—কিসের কাজ ?

—আজ্ঞে গুড্‌সের। যত ফরেন পার্শেল—

তারপর সে পার্শেলের কাজের নানা খুঁটিনাটি বর্ণনা করে গেল। ওদের বড় সাহেব খুব ভালবাসে ওকে। বড় সাহেব একদিন ওকে ডেকে বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেছিল। বাঙালীর খুব খাতির সেখানে, বাঙালী বেশী নেই কিনা ?

এর পরে মাসখানেক ধরে সতীশের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। দেখা হোলেই তাকে বোম্বাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করি, সেখানে কেমন থাকার সুবিধে ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথাই হয়।

তারপরে পড়লো পুজোর ছুটি।

ছুটির পরে এসে মাস দুই পরে আবার সতীশের সঙ্গে দেখা। বললুম—কি হে, আবার ছুটি নিলে নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, কাল সবে এসেচি, মার অসুখ কিনা ? আবার যাবো একটু ভাল দেখলেই—

মাসখানেক রোজই সতীশকে দেখি। ওর মায়ের অসুখ নাকি এখনও সারে নি।

আবার কিছুকাল দেখলুম না। তাহলে ও বোম্বাই চলে গিয়েচে।

হঠাৎ শীতকালের দিকে একদিন দেখি সতীশ ময়লা একখানা ছিট কাপড় পরণে, পাঁচড়ায় পঙ্গু অবস্থায় গলির মোড়ে সেই চায়ের দোকানের সামনে উবু হয়ে বসে রোদ পোয়াচ্চে।

ওকে এ অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলুম। পাঁচড়ার জন্যে ছুটি নিয়ে বোম্বে থেকে চলে এসেচে নাকি?

ও আমায় দেখে যেন থতমত খেয়ে গেল। আমি কোনো কথা বলবার আগেই চায়ের দোকান ও গলির মোড়ের সান্নিধ্য থেকে আমার সঙ্গে খানিকটা দূর পর্যন্ত এল।

বললে—হাওড়ায় ট্রান্সফার হয়েচি স্যার—ওই গত মাস থেকে। বোম্বাই বড্ড দূরে, মা অতদূর থাকতে···তাই এখানেই—আজ্ঞে হাঁ, স্যার।

তারপর সে বোম্বাইয়ের নানা নিন্দাবাদ আরম্ভ করলে। সে দেশের লোকের সঙ্গে বাঙালীর পোষায় না। জিনিসপত্র আক্রা। থাকার অসুবিধে।

বললুম—থাকতে কোথায়?

—আজ্ঞে রেলওয়ে কোয়ার্টারে।

এলোমেলো গল্প করতে করতে হঠাৎ কথায় কথায় প্রশ্ন করলুম—সমুদ্র তোমাদের বাসা থেকে কতদূরে?

ও বলে—সমুদ্র! সে তো অনেক দূর। বোম্বাইয়ের কাছে তো সমুদ্র নেই—ওখান থেকে পনেরো কুড়ি মাইল রাস্তা। মোটর বাস্ করে যেতে হয়।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলুম। বলে কি? বোম্বাই শহর থেকে সমুদ্র কুড়ি মাইল মোটর বাসে যেতে হয়?

ভাবলুম, হতেও পারে—ও কাজে ব্যস্ত থাকতো, কখনো সমুদ্রে যাওয়ার সুবিধে হয় নি হয় তো। কিন্তু কারো কাছে শোনেও নি কি?

বললুম—তুমি কি সমুদ্রে যাও নি?

—কেন যাবো না স্যার? ছুটির দিন হলেই রেলকোম্পানীর মোটর বাসে কতবার সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েচি। দু-ঘণ্টা লাগে শহর থেকে মোটরে।

আমি কোনোদিক থেকেই কোনো হদিস্ না পেয়ে চুপ করে রইলুম। আমার মনে অনেক রকম সন্দেহ দেখা দিলে।

পাঁচড়া অবস্থাতেই দিনকতক দেখলুম ওকে—তারপর পাঁচড়া সেরে-টেরে গেলে সুস্থ অবস্থাতেও বেলা সাড়ে দশটার পর ফুটপাথে রোদ পোয়াতে দেখলুম কয়েকদিন।

একদিন আমায় বললে—স্যার, মার বড় অসুখ কিনা, তাই আপিসে যাই নে। সেদিন আমাদের ডিপার্টমেন্টের বড় সাহেব মাকে দেখতে এসেছিলেন যে! আমায় বললেন—মুখুয্যে, তুমি মায়ের অসুখ না সারা পর্য্যন্ত ছুটি নাও। কোনো ভয় নেই। আমি ছুটি দিচ্ছি। বড় ভালবাসেন আমাকে।

মাঘ মাসের প্রথম থেকেই ওকে আর দেখলুম না প্রায় দিন কুড়ি।

একদিন সেই চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করলুম—সতীশ কি আবার বোম্বাই চলে গেল নাকি?

ওরা বললে—কোন্ সতীশ? এ গলির মধ্যে থাকে? রোগাপানা, কর্সামুর্ত্তি? সে বোম্বাই যাবে কেন বুঝতে পারলাম না।

বললুম—না, সে বোম্বাইয়ে চাকরি করতো কিনা। হাওড়ায় আসে—বদলি হয়ে—তাই বলচি।

চায়ের দোকানী অবাক হয়ে বললে—সতীশ বোম্বাইয়ে চাকরি করতো?

—করতো না? হাওড়ায় আসবার আগে?

—হাওড়ায় বা সে কি করতো, কবে মশাই? কি সব বলচেন আপনি? আপনার কাছে টাকাকড়ি নেয় নি তো? সতীশ তো এখানে মামার বাড়ী থাকতো। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ী বসে খেতো। চাকরি-বাকরি করতো না বলে ওর মামা তিনকড়িবাবু প্রায়ই ওকে বকতেন। অতি কুঁড়ে আর বাজে বকুনির জাহাজ। এই চায়ের দোকানে দিনরাত বসে থাকবে আর বক্ বক্ করবে। আমি বলতাম—সতীশবাবু, আমার খদ্দের আসবে, তুমি অতো বকো নি, এখন বাড়ী যাও। সে আবার বোম্বাইয়ে চাকরি করবে?

—আচ্ছা সে করাচীতে গিয়েছিল না এরোপ্লেনের কাজ শিখতে?

—তার মাথা! কোথাও নড়ে নি মশাই, এই তিন বছরের মধ্যে, কোথাও যেতে দেখি নি। তবে দিন কতক আমার দোকানে চা তৈরির কাজ করতো—মাসে জলপানি পাঁচটাকা করে দিতাম।

—এখন সে কোথায়?

—মামা ঝগড়াঝাঁটি করে সেদিন বাড়ী থেকে ওকে তাড়িয়ে দিয়েচে। মা তো নেই, অমন ভাগ্নেকে জায়গা দিয়েছিল মামারা এই ঢের। আজ আট-দশ বছর ওর মা মারা গিয়েচে—এই আট-দশ বছর মামারা বসিয়ে খাওয়াচ্ছিস তো, এখন বড় হয়েচে। আর বসে খেলে তারা শোনে কি? আপনি বলুন না মশাই!

আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না।

অভিনন্দন-সভা

এবার দেশে গিয়ে দেখি, গৌর পিওন পেনসন্ নিয়েচে। কতকাল পরে? বহুদিন··· বহুদিন।

বায়ুমণ্ডলে যখন প্রজ্জ্বলন্ত উল্কা ছুটে চলে, তখন গোটা ফটোগ্রাফ প্লেটটা সে এক সেকেণ্ডে পার হয়ে যায়। কিন্তু ছ-ঘণ্টা কি সাত ঘণ্টা ঠায় আকাশের দিকে ক্যামেরার মুখ ফিরিয়ে রাখলেও, নীহারিকা একচুল নড়ে না।

গৌর পিওন (গৌরচন্দ্র হালদার, জেলে) আমাদের জীবনে সেই বহুদূরবর্তী নীহারিকার মতো অনড় ও অচল অবস্থায় এক ডাকঘরে, এক ডাকের ব্যাগ ঘাড়ে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ডাক-হরকরার কাজ করে আসচে। মধ্যে তিন বছরের জন্যে সে কেবল কোটচাঁদপুর গিয়েছিল, তাও তার মন সেখানে টেকে নি। ওভারসিয়ারের কাছে কান্নাকাটি করে আবার চলে এসেছিল আমাদের এই ডাকঘরে।

১৯১২ সালের ৭ই জুলাই সে প্রথম ভর্তি হয়েছিল এখানকার ডাকঘরে।

তার মুখেই শুনেচি, আমি তখন স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা বিদেশ থেকে টাকা পাঠাতেন, ও আমাদের বাড়ী এসে বলতো—টাকা নিয়ে যান বাবাঠাকুর!

আমি বলতাম—ক-টাকা?

—ন-টাকা।

—কোন্ ডাকঘর থেকে?

—বহরমপুর।

একবার এক বুড়ো-পিওন আমাদের গাঁয়ের বিটে বদলি হোলো, গৌর পিওনের পড়লো অন্য বিট। বুড়ো বাড়ী এসে আগেই বলতো—কট্‌হর নিয়ে এসো। সড়া কট্‌হর দেবে না, আচ্ছা কট্‌হর নিয়ে এসো—খাবো।

তার নাম পাড়েজি। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। অনেকদিন এদিকে ছিল। অমনিধারা বাংলা বলতো! কিন্তু তার দোষ ছিল, দূরের গাঁয়ের চিঠি থাকলে হাঁটবার ভয়ে যেতো না।

একবার বাঁওড়ের ধারের ঝোপ থেকে এই রকম অনেক চিঠি কুড়িয়ে পাওয়া যায়। বুড়ো পাড়েজির নামে নালিশ গেল ওপরে। তাকে এখান থেকে বদলি করে দিলে।

গৌর পিওন এলো এরই পরে। সেই থেকেই ও এখানে আছে, মাত্র তিন বছর ছাড়া।

গৌর পিওন তিন-চার বছর কাজ করবার পরই আমি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলাম। পুনরায় ফিরলাম, দীর্ঘ আঠারো বছর পরে।

সেদিনই বিকেলে দেখি, গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এলো আমাদের বাড়ী।

সত্যি আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমি আশা করি নি, এতকাল পরে সেই বাল্যের গৌর পিওন পুরনো দিনের মত চিঠি বিলি করতে আসবে।

গৌর উঠোন থেকে রোয়াকে উঠে এসে বললে—প্রাতঃপেন্নাম বাবাঠাকুর।

—গৌর যে! ভালো আছো? এখনো তুমি এখানে ডাক বিলি করচো?

—আপনাদের আশীর্ব্বাদে এক রকম চলে যাচ্চে বাবাঠাকুর। বাড়ী ঘর আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছিল যে, না থাকার জন্যে।

গৌর কিন্তু অবিকল সেই রকম আছে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হোলো হিসেব মত।

গবর্ণমেণ্টের খাতায় যে-বয়েসই লেখা থাকুক না কেন মাথার একটি চুলও পাকে নি। তবে সামান্য একটু কুঁজো হয়ে পড়েচে। গলায় তুলসীর ত্রিকন্ঠী মালা বার্ধক্যের একমাত্র সুস্পষ্ট চিহ্ন।

—কতদিন চাকরি হোলো গৌর-কাকা?

—তা, একত্রিশ-বত্রিশ বছর।

—রোজ ক-খানা গাঁ বেড়াতে হয়?

—পাঁচ-ছখানা গাঁয়ে বিট থাকে রোজ। পাঁচ-ছ কোশ হাঁটতে হয় দৈনিক। জলে কাদায় হানিভাঙা, দুগ্‌গোপুর, সরভোগ, দেকাটি এসব জায়গায় যেতে বড্ড কষ্ট। পা হেজে যায়, পাঁকুই হয়।

কতদিন পরে ওকে ডাক বিলি করতে দেখে এমন এক আনন্দ হোলো।

এতদিন পরে দেশে এলাম, বাইরের জগতে কত পরিবর্তন ঘটে গেল, আমার নিজের জীবনেও কত কি ওলট-পালট হোলো—কিন্তু সেই পুরাতন গ্রামে ফিরে এসে দেখি, সমস্ত এখানে অচঞ্চল। বাঁশ আম বনের ছায়ায় ছায়ায় পুরাতন জীবন সেইরকমই বয়ে চলেচে—গৌর পিওন সেই পুরনো দিনের মতই চিঠি বিলি করচে!

গৌর পিওন রোজ আসে, রোজ খানিকটা বসে গল্প করে। কোনোদিন একটা নারকোল, কোনোদিন বা একটা কাঁঠাল চেয়ে নিয়ে যায়।

মাস আট-নয় সেবার বড় আনন্দেই কেটেছিল গ্রামে।

তারপরই আবার চলে যেতে হোলো বিদেশে। কাটলো সেখানে কয়েক বছর।

এইবার আষাঢ় মাসে দেশে ফিরে এলাম আবার।

এসে দেখি, বাড়ীর কি ছিরিই হয়েছে। না থাকলে যা হয়। কয়েক বছরের বর্ষার জলে পুষ্ট হয়ে আগাছার জঙ্গল বাড়ীর ছাদ পর্যন্ত নিবিড় ঝোপের সৃষ্টি করেচে। সিমেণ্ট উঠে গিয়ে রোয়াকে কাঁটানটের জঙ্গল গজিয়েচে। ঘরের মধ্যে কড়িকাঠে মৌমাছিরা চাক বেঁধেচে। কলা-বাদুড় কড়িতে-বরগাতে ঝুলচে। চামচিকের নাদি দু-ইঞ্চি পুরু হয়ে জমেচে মেঝের ওপর।

পরদিন সকালে গৌর পিওন চিঠি বিলি করতে এলো। এসে সে বললে—আজই আমার চাকরির শেষ দিন বাবাঠাকুর। বাড়ী এসেচেন, তবুও শেষ দিনটা আপনাকে চিঠি দিয়ে গেলাম।

—আজই শেষ দিন ?

—আজই বাবাঠাকুর। পঁয়ত্রিশ বছর তিনমাস পূর্ণ হোলো। আর কতদিন রাখবে গবর্ণমেণ্ট !

—বোসো। একটা পাকা আনারস নিয়ে যাও। বাঁশবাগানে জঙলি আনারস অনেক হয়ে আছে, বেশ মিষ্টি।

গৌর কিছুক্ষণ বসে গল্প করে চলে গেল।

পরদিনও দেখি সে ডাকব্যাগ ঝুলিয়ে চিঠি বিলি করে বেড়াচ্ছে, সঙ্গে একজন ছোকরা বয়সের পিওন।

বললাম—কি গৌর, আজ আবার যে ?

গৌর প্রণাম করে বললে—নতুন লোক এসেচে, ও-তো বাড়াঘর চেনে না, তাই ওকে দেখিয়ে দিয়ে বেড়াচ্চি।

কিছুদিন কেটে গেল।

গৌর পিওনের বাড়ীতে ওর স্ত্রী অনেকদিন মারা গিয়েচে। একটি মেয়ে আছে, সেই রান্না-খাড়া করে। অবস্থা অতি দীনহীন।

একদিন ওর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখি ও পরের বাড়ীতে দুধ দুয়ে বেড়াচ্চে।

গৌর বললে—বাবাঠাকুর, সামান্য পেনসনে কি চলে ? আজকাল এই বাজার। তাই দেখি, দুধ দুয়ে কিছু যদি উপরি পাই।

—একটা ছোটখাটো ব্যবসা করো না কেন ?

—বাবাঠাকুর যথেষ্ট বয়েস হয়েচে। হাতে টাকা-পয়সাও নেই যে ব্যবসা করবো। এই রকম করে আপনাদের আশীর্বাদে একরকম চলে যাবে।

সত্যিকার দীনতামাখা মুখ ওর। দীনতা যদি বৈষ্ণবসুলভ গুণ হয়, তবে ও একজন খাঁটি বৈষ্ণব।

তারপর একটি মজার ঘটনা ঘটে গেল।

ব্যাপার এই : মহকুমা হাকিম বদলি হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর বিদায় অভিনন্দনের সভায় আমার ডাক পড়লো। খুব বক্তৃতা ও প্রচুর জলযোগের আয়োজন ছিল সেখানে। এমন সজ্জন রাজকর্মচারী জীবনেও নাকি কেউ দেখেন নি। তিনি মহকুমার যে উপকার করে গেলেন, এখানকার অধিবাসীরা কখনো তা বিস্মৃত হবে না (কি উপকার ? আজকের দিনটি

ছাড়া কারো মুখে এতদিন সেই মহদুপকারের বার্তা শোনা যায় নি। কেন ?) বীরেনবাবু বক্তৃতা করতে উঠলে—কানে কানে বললাম, আর কেন বেশি কথা খরচ করেন অস্তগামী সূর্যের পিছনে, সংক্ষেপে সারুন। লুচি ঠাণ্ডা করেন কেন অকারণে !

বিদায়ী মহকুমা-হাকিম তাঁর বক্তৃতায় বলিলেন—তিনি এই মহকুমার জন্যে বিশেষ কিছু করেন নি (খাঁটি সত্য), তাঁর বন্ধুরা তাঁকে স্নেহ করেন বলেই এত ভালো উক্তি তাঁর সম্বন্ধে করলেন (মিথ্যে কথা হয়ে গেল, স্নেহ করেন বলে নয়)। তিনি এখানকার কথা কখনো ভুলতে পারবেন না, ইত্যাদি।

সেখান থেকে ফেরবার পথে বার-বার মনে হলো, এসব বিদায় অভিনন্দন ব্যাপারটা আগাগোড়া মিথ্যে ও অসার। মহকুমা হাকিমকে তোষামোদ করতে হবে বলেই এর আয়োজন। আমি গৌর পিওনকে অভিনন্দন দেবো না কেন ? সত্যিকার সমাজসেবক সে, পঁয়ত্রিশ বছর ধরে গ্রামে-গ্রামে চিঠি বিলি করে এসেচে জলঝড়কে তুচ্ছ করে—শীত মানে নি, গ্রীষ্ম মানে নি। বিনয়ের সঙ্গে, দানতার সঙ্গে, মুখে কখনো একটা উঁচু কথা শোনা যায় নি তার।

গ্রামে তরুণ-সঙ্ঘের ছেলেদের কাছে কথাটা পাড়তেই তারা তখুনি রাজী হয়ে গেল। সঙ্ঘের কর্মী নিতাই বললে—খুব ভালো কথা কাকা। নতুন জিনিস আমাদের দেশে।

বিনয় আর একজন ভালো কর্মী, সঙ্ঘের সেক্রেটারি। তার খুব উৎসাহ দেখা গেল এতে ; সে বললে—রসিক চক্কত্তি দারোগাকে আমরা ও-বছর অভিনন্দন দিইচি কাকা, বাহাত্তর টাকা চাঁদা তুলে। আপনি জানেন না, সে অতি ধড়িবাজ লোক ছিল, ঘুষ খেতো দু-তরফ থেকেই। তাকে যখন অভিনন্দন দিয়েচি !

—সে সভার সভাপতি কে ছিল ?

—বরেন দা, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট।

—ঐ যার দোকান ?

—আজ্ঞে, যে এ-বাজারে কাপড়ের চোরা-বাজারে লাল হয়ে গেল। সে একাই পঁচিশ টাকা চাঁদা দিয়েছিল।

—দেবেই তো। দারোগার সঙ্গে ভাব না থাকলে চোরাবাজার হয় কি করে।

সন্ধ্যার সময় তরুণ-সঙ্ঘের কর্মীরা এসে জানালে, কাজ তারা আরম্ভ করে দিয়েচে। তবে বাজারের অনেকেই হাসচে। বরেন দা সবচেয়ে বেশি। বরেন দা চাঁদা দেবে না। সে বলে—গৌর পিওনের অভিনন্দন ? এ মতলব কার মাথায় এলো ? দূর ! তোমরা বাবা লোক হাসাচ্চ দেখচি। লোকে কি বলবে ? কে কবে শুনেচে, ডাকহরকরা পেনসন পেলে তাকে আবার ফেয়ার-ওয়েল-পার্টি দেওয়া হয় ? হাকিমদারোগাদের দেওয়া হয় জানি।

বিনয় বলেচে—আপনাদের কাল চলে গিয়েচে বরেন জ্যাঠা। একালে গরিব লোকেরাই অভিনন্দন পাবে। দিন চাঁদা। আমরা শুনবো না। দশ টাকা দেবেন আপনি। কেন দেবেন না?

এই নিয়ে উভয় পক্ষের তর্ক হয়ে গিয়েছে। বরেন চাঁদা দেয় নি, শেষ পর্যন্ত নাকি বলেছিল, আট আনা নিয়ে যাও। বিনয় না নিয়ে চলে এসেচে।

তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। বিনয়কে বললাম—বুধবার অভিনন্দন সভা, বাজারের বড় চাঁদনীতে সবাইকে জানিয়ে দাও—

বিনয় বললে—আপনি শুধু পেছনে থাকুন, আমাদের ওপর কাজ করবার ভার রইলো।

দু-তিন দিন খুব বর্ষা হোলো। আমি আর কোথাও বেরুতে পারি নি। ব্যাপারটা কতদূর এগিয়েচে তার খোঁজ নিতে পারলাম না। বুধবার দিন বিকেলের দিকে সেজেগুজে বাজারের দিকে বেরুলাম।

জিনিসটা কি আমিই নষ্ট করে দিলাম? একবার দেখা দরকার।

বাজারে যেতেই দেখি, কেম্বিসের জুতো পায়ে, গায়ে জামা, গৌর পিওন আমার আগে আগে চলেচে।

বড় চাঁদনিতে গিয়ে দেখলাম, ছোকরার দল দিব্যি সভা সাজিয়েচে। রঙিন কাগজের মালা, দেবদারু পাতা, মায় কলাগাছ—কিছু বাদ যায় নি। স্কুল থেকে চেয়ার-বেঞ্চি আনিয়েচে। ভেঁপু মুখে দিয়ে তারা বলে বেড়াচ্চে—'আজ বেলা পাঁচটায় অবসর প্রাপ্ত পিওন—শ্রীগৌরচন্দ্র হালদারের বিদায়-অভিনন্দন-সভা হবে বড় চাঁদনিতে—আপনারা দলে-দলে যোগদান করুন।'

স্কুলের ছেলেরা ভিড় করে এলো সভায়। মাস্টারদের মধ্যে কেউ বাদ রইলেন না। বাজারের লোকও সকলে এলো—কি হয় দেখতে। ফলে সভা আরম্ভ হবার আগেই বসবার আসন সব ভর্তি হয়ে গেল। লোকে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে আরম্ভ করলে।

বিনয় নিয়ে এলো বরেন দাঁকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করে। স্মিতমুখে বরেন দাঁ সভায় ঢুকে আমাকে দেখে একটু যেন দমে গেল।

তাহলে কি সভাপতি তাকে করা হবে না? আমাকে বললে—ভায়া যে! কবে এলে?

—আমি তো এসেচি, চার-পাঁচদিন হোলো।

—তাই।

—তার মানে বরেন-দা?

—এখন সব বুঝলাম ভায়া। তুমি যে এসেচো জানতাম না। এখন বুঝলাম।

—কি বুঝলে?

—তোমারই কাজ। নইলে, গৌর পিওনের অভিনন্দন! এমন উদ্ঘুটি কাণ্ড আবার কার মাথায় আসবে? তা ভায়া, আজকের সভাপতিত্বটা তুমিই করো।

আমি পল্লীগ্রামের ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের মনের ভাব বুঝি নে? এত বোকা আমি নই।

তৎক্ষণাৎ বললাম, ক্ষেপেচ বরেন-দা? তুমি হাজির থাকতে আমি? কিসে আর কিসে। তা হয় না। চলো দাদা, তোমাকে আজকের দিনের—

—না না, শোনো ভায়া…

বরেন দাঁর মুখে খুশির ঔজ্জ্বল্য। আমি ওকে হাত ধরে টেনে সভাপতির চেয়ারে এনে বসালাম।

আমার ইঙ্গিতে গৌর পিওনকে সভাপতির আসনের পাশে বসানো হোলো। একেবারে প্রেসিডেন্টের পাশের চেয়ারে…জনমণ্ডলীর উন্মুক্ত দৃষ্টির সামনে।

এ-ও আজ সম্ভব হোলো। গৌর পিওনের দিকে চেয়ে দেখলাম। ওর মুখও খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে।

গৌর চারিধারে চেয়ে-চেয়ে দেখচে, একি ব্যাপার? সে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারে নি যে, তার সভা এমন চেহারার হবে, বা তাতে এত লোকের সমাগম হবে। বরেন দাঁর মত বিশিষ্ট ব্যক্তি, স্কুলের হেডমাস্টারের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি, আড়তদার নৃপেন সরকারের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি সে-সভা অলঙ্কৃত করবেন তাঁদের মহিমময় উপস্থিতির দ্বারা। ছেলেরা সভায় দলবেঁধে এলো, প্রত্যেকের হাতে একগাছা করে ফুলের মালা, একজনের হাতে চন্দনের বাটি। উদ্বোধনী-সঙ্গীত শুরু হোলো:

'শরতে আজ কোন্ অতিথি এলো প্রাণের দ্বারে'

রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেই হবে, যার যা জানা আছে, সভার উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল হোলো বা, না হোলো। পাড়াগাঁয়ে কে কটি রবীন্দ্রনাথের গান জানে? যা জানে ওই ভালো। লাগাও—

আমি সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করবার সময় বললাম—

আজকেই এই জনসভায় বিশিষ্ট সমাজ-সেবক শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার মহাশয়ের অভিনন্দন উৎসবে পৌরোহিত্য করবার জন্য দেশের অলঙ্কার স্বরূপ (কিসে?) উদার হৃদয় (একদম বাজে) কর্মী আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের সুযোগ্য (নির্জলা মিথ্যে) প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে (মার্কিন-প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আর কি) অনুরোধ করচি, তিনি দয়া করে অত্র (দয়া করবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছেন)—ইত্যাদি ইত্যাদি।

একটি ছোট মেয়ে সভাপতির গলায় ফুলের মালা দিলে। কার্যসূচীর প্রথমেই আমি লিখে রেখেচি, 'সভাপতি কর্তৃক শ্রীগৌরচন্দ্র হালদার মহাশয়কে মাল্য-চন্দন দান। অতএব সভাপতিকে গৌর পিওনের কপালে চন্দন মাখিয়ে দিতে হোলো (কেমন মজা, বরেন দা) এবং মালা পরিয়ে দিতে হোলো। সে কি হাততালির বহর চারিদিকে। বেচারি গৌর পিওন বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। একে একে বক্তাদের নাম ডাকা হোতে লাগলো। আমিই নাম-তালিকায় একের পর এক বক্তার নাম লিখে দিয়েচি। যথা—

১। স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার—গদাধরবাবু।

২। স্কুলের শিক্ষক, মহাদেববাবু।

৩। স্টেশন মাস্টার।

৩। পোস্ট মাস্টার।

৫। আড়তদার নৃপেন সরকার।

৬। কবিরাজ মশাই।

৭। প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত মশাই।

৮। চামড়ার খটিওয়ালা রজবালি বিশ্বাস।

৯। বস্ত্র-ব্যবসায়ী রামবিষ্ণু পাল।

১০। আমি।

১১। সভাপতি।

এদের মধ্যে অনেকে সভায় বক্তৃতা কখনও দেয়নি। সভায় দাঁড়িয়ে উঠে, মুখ শুকিয়ে গলা কাঠ হয়ে চোখে সর্ষের ফুল দেখে বক্তারা আর কিছু বলবার না পেয়ে, গৌর পিওনকে একেবারে আকাশে তুলে দিলে।

না, গদাধর ডাক্তার মন্দ বললেন না। মহাদেববাবু বৃদ্ধ হোলেও শিক্ষিত ব্যক্তি, মোটা-মুটি গুছিয়ে দু-চার কথা যা হোক একরকম হোলো। স্টেশন মাস্টার হাত-পা কেঁপে অস্থির। পোস্ট মাস্টার খুব ভালো বললেন, তবে অনভ্যাসের দরুণ একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

বক্তৃতার শেষে তিনি ঝোঁকের মাথায় একেবারে ছুটে এসে—'ভাই রে গৌর? আজ আর তুমি ছোট আমি বড়ো নই, আজ তুমি আমার ভাই।'—বলে একেবারে নিবিড় আলিঙ্গনে গৌর পিওনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দস্তুরমত 'সীন' যাকে বলে। লোকে মজা দেখে খুব হাততালি দিয়ে উঠলো।

তারপরই আড়তদার নৃপেন সরকার। বেচারি অত হাততালির পরেই বক্তা। জীবনে এই সর্বপ্রথম তিনি সভায় দশজনের উৎসুকদৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েছেন। বেচারী প্রথমেই বলে ফেললেন, 'আমরা একজন মহাপুরুষের বিদায়-উৎসব সভায় একত্র হোয়েচি।' যাকে বলা হচ্ছে সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

কবিরাজ মশাই সংস্কৃত শ্লোক-টোক আবৃত্তি করে সভাটাকে কুশণ্ডিকার আসর করে তুললেন। মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম বাস করেন, অতএব গৌর পিওন ছোট কাজ করতো বলে ছোট নয়, সেও ব্রহ্ম। উপনিষদের ঋষিদের তপোবনের এই আবহাওয়া বইয়ে দেবার পরে প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত বেচারি মহা ফাঁপরে পড়লেন, কিন্তু তার চেয়েও ফাঁপরে পড়লো চামড়ার খটিওয়ালা—রজবালি বিশ্বাস।

স্কুলের পণ্ডিত ভালোমানুষ লোক, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের গুণ ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা শেষ করলেন।

নানা কারণে তাঁকে বরেন দাঁর মুখের দিকে চাইতে হয়।

রজবালি বিশ্বাস বললে, এ পর্য্যন্ত তার চিঠিগুলো ঠিকমতো বিলি করেচে গৌর, অমন পিওন আর হয় না। এইখানেই ইতি।

আর কোনো কথা বার হয় না তার মুখ দিয়ে। ঘেমে উঠলো আর অসহায় ভাবে এদিক ওদিক চাইতে লাগলো। পরে হঠাৎ ধপ করে বসে পড়ে বক্তৃতার উপসংহার করলে।

রামবিষ্ণু পাল বৃদ্ধ ব্যবসায়ী, সৎলোক, গৌরকে তিনি বন্ধু বলে সম্বোধন করলেন। বাল্যে গৌর পাঠশালায় তাঁর সহপাঠী ছিল, এইটুকু মাত্র বললেন। আমি এক মানপত্র লিখে এনেছিলাম, তাতে গৌর পিওনের সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা বলা ছিল। মানপত্র পড়ে আমি গৌরের হাতে দিলাম।

সভাপতি বরেন দাঁ ঘুঘু লোক, সভার গতি কোন্‌দিকে সে অনেকক্ষণ বুঝেচে।

সভাপতির অভিভাষণে সে গৌর পিওনের এমন সব গুণের বর্ণনা করে গেল, যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গৌর পিওন প্রকৃতই দেখলাম লজ্জিত হয়ে উঠেচে ওর সব কথা শুনে এবং বিস্মিত সে নিশ্চিতই হোতো, কিন্তু তার বিস্ময়-বোধের শক্তি আজ অনেকক্ষণ সে হারিয়ে ফেলেচে।

গৌর পিওন কিছু বলতে উঠে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললে। শুধু সে হাত জোড় করে সভার সকলের দিকে চেয়ে দু-তিনবার বললে—বাবুরা—বাবুরা···

তারপর সবাইকে করজোড়ে বারবার প্রণাম করে সে ধপ্‌ করে বসে পড়লো।

এবার সভা ভঙ্গ হবে। ছোকরার দল অমনি গেয়ে উঠলো:

'তোমার বিদায় বেলার মালাখানি আমার গলে'

—না, রবীন্দ্রনাথের গান চাই।

বিনয়কে বললাম—খাইয়েচো?

চাঁদনীর পাশে হরি ময়রার দোকানে হাত ধরে গৌর পিওনকে নিয়ে যাওয়া হোল।

গেল সে। সে চলে যাচ্ছিলো বাড়ীর দিকে। আমিও গেলাম ওদের পেছনে পেছনে।

তা ছেলেরা আয়োজন করেচে ভালো।

দুটো ফজলি আম, দই, সন্দেশ, নিমকি। বড় রাজভোগ যে-কটা পারে গৌর খেতে। খেয়ে কি খুশী বেচারি। চোখে তার প্রায় জল এসে গেল আবার।

আমার দিকে চেয়ে সে বললে—এমন দিনডা যে হবে, তা ভাবি নি। সব আপনার কাণ্ড। আমি তা বুঝিচি। কি খাওয়াডাই খাওয়ালেন, কি ভালো কথাই বললেন আমার সম্বন্ধে। বড্ড গুরুবল আমার।

বললাম—খুশী হয়েচো গৌর?

—ওই যে বললাম বাবাঠাকুর। এমনধারা দিনডা যে আমার আসবে তা···

ওর গলায় এখনো সেই ফুলের মালা।

নির্মলার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে যেদিন ঢুকি সেদিনই প্রথম দেখা। আমি আই-এসসি পাশ করে মেডিকেল কলেজে ঢুকেচি, বয়েস উনিশ।

চোখে প্রথম যৌবনের রঙীন নেশাটেশা একেবারেই ছিল না বললে ভুল বলা হবে, যতই কেন অধ্যয়নপরায়ণ ভালো ছেলে হই না কেন। সেই নেশার ঘোরেই বোধহয় নির্মলাকে স্বর্গের দেবী বলে মনে হোল প্রথম দর্শনেই। ছিপছিপে সুন্দর মেয়ে, টানা-টানা চোখ, জোড়া ভুরু, দিব্যি দেখতে মুখখানি। নীল রংয়ের শাড়ী পরণে, গায়ে ফুল-হাতা ব্লাউজ, সরু চুড়ি ক-গাছা হাতে। চোখে মুখে একটা দীপ্ত বুদ্ধির ছাপ। নারীসুলভ লজ্জা তার মধ্যে মোটেই নেই। আছে বিদ্রোহিনীর উগ্র চ্যালেঞ্জ। আমার মনে হোত ওর সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি পুরুষজাতকে চ্যালেঞ্জ করচে যে, আমার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা করতে এসো না, আমি সে ধরনের মেয়ে নই। খবরদার!

সেইজন্যেই যত দিন যেতে লাগলো তত আমি ওর দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে লাগলাম। তখন জানি নে, যে, আমার জীবনটা একেবারে মাটি করে দেবার জন্যে ও এসেচে। কার জন্যে আজ আমি এই পঁয়তাল্লিশ বছরের প্রৌঢ়তায় পদার্পণ করেও অকৃতদার, সন্তান-সন্ততিহীন, ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া মানুষ? কার জন্যে সারা জীবন তৃপ্তি পেলুম না, সুখ পেলুম না, আপনার বলতে কাউকে পেলুম না, টাকা রোজকার করতে হয় করে যাচ্ছি, খেতে হয় খেয়ে যাচ্ছি, কলেজে অধ্যাপনা করতে হয়, করে যাচ্ছি, জীবনের না আছে কোনো উদ্দেশ্য, না আছে কোনো অবলম্বন।

শুনেছি অনেকের এরকম হয়, প্রেমের নেশায় পড়ে অল্প বয়সে, সে নেশা কাটিয়েও ওঠে। কিন্তু আমার মত এমন উচ্ছন্ন যায় কে?

যাক সে সব কথা।

কেমন করে কি হোল বলি।

আমাদের ক্লাসে অনেকগুলি মেয়ে ছিল। কেউ বি-এসসি কেউ আই-এসসি পাস করে এসে মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিল। পাঁচটি মেয়েকে আমার আজও বেশ মনে আছে। একজনের নাম শকুন্তলা সেন, শ্যামবর্ণ, দোহারা চেহারা, বড়-বড় চোখ ও মুখশ্রী মন্দ নয়—হাতের কব্জির কাছটা বড্ড মোটা বলে মনে হোত। শকুন্তলা ছিল বড় শান্ত মেয়ে, কোনোদিকে চাইতো না, একমনে প্রোফেসরের বক্তৃতা শুনে নোট করে যেতো। একজনের নাম সুনীতি, তার উপাধি আমার মনে নেই, ওর রং ছিল খুব ফর্সা গোল চাঁদের মত মুখখানা, স্মার্ট টাইপের মেয়ে, ক্লাসের ছেলেদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতো। একটির নাম ছিল মহামায়া বন্দ্যোপাধ্যায়—সেকেলে নাম কিন্তু বড্ড একেলে মেয়ে—সুন্দরী হিসেবে মন্দ নয়, অতি চমৎকার গঠন-পারিপাট্য শরীরের, খুব শৌখীন, চোখে চশমা, কথায় কথায় হেসে

লুটিয়ে পড়তো, এটিও স্মার্ট টাইপের মেয়ে। মহামায়ার সঙ্গে একসঙ্গে আসতো, ওরই কি রকম বোন হয়, চপলা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখতে শুনতে মহামায়ার চেয়েও ভালো, কিন্তু বড় নিরীহ, ভালমানুষ, দাঁত চড়ে কথা বের হোত না। আর একটি গরীব ঘরের মেয়ে ছিল, ওর নাম বেলা চক্রবর্তী। মোটাসোটা, ফর্সা সাদাসিদে সুতীর শাড়ী পরে আসতো, সাদা ব্লাউজ ফুল হাতা—সকলের সঙ্গে মিশতো সকলের সঙ্গেই হেসে কথা বলতো—বুদ্ধিশুদ্ধি একটু কম বলেই মনে হোত! এদের সকলের বয়স উনিশ-কুড়ির মধ্যে। সেদিক থেকে আমরা প্রায় সকলে সমবয়সী, এক-আধ-বছরের বেশি বা কম, শকুন্তলা ছাড়া, তার বয়েস ছিল আমাদের চেয়ে তিন-চার বছর বেশি। আমরা আড়ালে নিজেদের মধ্যে বলতাম -শকুন্তলাদি।

যেমন হয়ে থাকে। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে ঝুঁকে পড়লো মেয়েদের দিকে। যে যার সঙ্গে জমিয়ে নিতে পারে, প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলো। মাস দুই অগ্রসর হয়নি, ফার্স্ট ইয়ার এম-বি ক্লাস। এরই মধ্যে বেধে গেল প্রণয়ের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঝগড়া, রেষারেষি। এক এক মেয়ের পেছনে চার-পাঁচটি বা ততোধিক ছেলে। থার্ড ইয়ার ক্লাসে সেবার বিখ্যাত সুন্দরী ফিরিঙ্গি মেয়ে মিস ইভন্সাম পড়তো—আমরা কলেজে ঢুকেই শুনি, মেডিকেল কলেজ-সুদ্ধ ছাত্র তার জন্য পাগল। এই ফিরিঙ্গি মেয়েটির নাম চিরকাল লেখা থাকা উচিত মেডিকেল কলেজের অলিখিত ইতিহাসে। অন্ততঃ দুটি আত্মহত্যা ও বহু সংখ্যক উচ্ছন্ন যাওয়ার জন্যে এই মেয়েটি দায়ী। চার-পাঁচটি পিতার বিষয় পুত্র কর্তৃক সমর্পিত হয়েচে এই দেবীর বেদীমূলে অর্ঘ্যস্বরূপ। তবুও এঁর আকাঙ্ক্ষা মেটে নি!

আমি মিস ইভন্সামকে দেখলুম কলেজের বার্ষিক উৎসবে ছাত্রীদের গ্যালারিতে। এই প্রথম তাকে দেখি—খুব চটকদার সুন্দরী বটে। বয়েস বাইশের বেশি নয়। বিদ্যুৎলতা। তবে আমি দূর থেকে দেখেছি এই পর্যন্ত। আরও অনেকবার দেখেচি, লম্বা করিডরের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে—কিন্তু ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেদের সঙ্গে কথা কইবার বা নড্ করবার মত সহৃদয়তা মিস্ ইভন্সামের ছিল না। ফার্স্ট বা সেকেণ্ড ইয়ারের কোনো ছেলেকে সে পুছতো না। কেনই বা পুছবে? তার স্তাবকবর্গের মধ্যে পাস-করা হাউস-সার্জনরাও ছিল, উঁচু ক্লাসের ধনী ছাত্র ছিল, শোনা যায় দু-একজন অধ্যাপকও ছিলেন।

আমি ছিলাম লাজুক ও গম্ভীর প্রকৃতির। আই এসসিতে স্কলারশিপ পাওয়া ছাত্র। লেখা-পড়া ছাড়া আর কিছু বুঝতামও না, মেয়েদের সসঙ্কোচে পাশ কাটিয়ে যেতেই চিরদিন অভ্যস্ত। লজ্জায় চোখ তুলে অপরিচিতা মেয়েদের দিকে চাওয়া ছিল আমার পক্ষে সুকঠিন ব্যাপার। আজকার দিনের কথা নয়, কথা হচ্ছে আজ থেকে ছাব্বিশ বছর আগের। তখন মেয়েরা বেথুন কলেজ ছাড়া অন্য কোনো কলেজে পড়তো না—আর পড়তো মেডিকেল কলেজে। মেয়েরা তখন অনেক ছাত্রের কাছেই অন্য জাতের জীব বা দেবী-টেবী বলে গণ্য হোত।

মেডিকেল কলেজে ঢুকে প্রথম সহপাঠিনীরূপে ওদের পেয়ে—ছাত্রদল যদি ঝুঁকে পড়েই

ওদের দিকে, ওদের নিয়ে যদি বাধিয়ে দেয় হুড়োহুড়ি—তবে আশ্চর্যের কথাটা এমন কি ?

এই আবহাওয়ার মধ্যে আমি ভালোছেলে রূপে ফার্স্ট ইয়ারের তিন-চার মাস দিলাম কাটিয়ে। এর মধ্যেই নির্মলাকে নিয়ে ক্লাসে অনেক কিছু হয়ে গিয়েছে। ধনী ছাত্র শশধর মুহুরী নির্মলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেই চ্যালেঞ্জপূর্ণ উগ্র দৃষ্টির সামনে এতটুকু হয়ে গিয়েচে। আরও কয়েকটি ছাত্র চোখরাঙানি খেয়েচে রীতিমত। অথচ ওরাই মহামায়াকে বা সুনীতিকে নিয়ে মোটরবিহার করতো, কলেজ রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে খেতো, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সঙ্গে করে ট্রামে উঠতো।

আমার কি ছিল, ক্লাসে এসে নির্মলার দিকে চেয়ে থাকতাম যখনই সুবিধা হোত চেয়ে দেখবার। ভয় হোত, বুক টিপ টিপ করতো, পাছে নির্মলা কিছু মনে করে। একদিন আমি ওর দিকে চেয়ে আছি, ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সেও এক অপ্রত্যাশিত ধরনের আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি ওর দিকে চাইতে গিয়ে দেখি ও-ও আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার আগে থেকেও ও আমার দিকে চেয়ে আছে! আমার সারা শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। কেন নির্মলা আমার দিকে চেয়ে আছে ?

আমাকে কি ওর ভাল লাগে ?

নইলে কেন আমার দিকে চাইলে ও!

আমার চেহারা বলতো সকলে ভালো। চিরকাল শুনে এসেছি এই কথা আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের মুখ থেকে। আয়নায় নিজের চেহারা দেখেও খারাপ মনে হয় নি কোনোদিন। দেখতে ভালো বলে বিয়ের সম্বন্ধও দু-একটি আসতে আরম্ভ করেছিলো বড় ঘর থেকে। আমাদের অবস্থাটাও ভালো, কলকাতায় তিন-চারখানা বাড়ী, ভাড়া থেকে মাসিক আয় হোত মন্দ নয়। তারপর আমিও স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। পড়াশুনোয় নামকরা ভালো ছেলে। বিয়ের সম্বন্ধ আসবার অপরাধ কি ?

একদিনের কথা আমার মনে আছে।

শ্রাবণ মাসের দিন। কেমিষ্ট্রি ক্লাস থেকে বেরিয়ে মাঠে নেমেচি, উদ্দেশ্য কলেজ রেস্টুরেণ্ট থেকে এক পেয়ালা চা খেয়ে নেবো, এমন সময়ে হঠাৎ আমার পেছনে কে মৃদুস্বরে ডাকলে—

—শুনুন—

আমি চমকে উঠে পেছনে চাইলুম।

নির্মলা!

নির্মলা আমায় ডাকচে!

আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখলাম। না আর কেউ কোনোদিকেই নেই তো ? আমাকেই ডাকচে বটে।

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—আমাকে ডাকচেন!

নির্মলা বোধ হয় আমার আনাড়ি ও আড়ষ্ট ভাব দেখে হাসতে যাচ্ছিল, হাসির রেখা ওর মুখে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল।

বললে—আপনাকেই ডাকচি—

—ও, বলুন—

—আপনি প্রফেসর গুপ্তের নোট টুকেচেন?

—হ্যাঁ, টুকেচি।

—খাতাখানা কাইণ্ডলি দেবেন একদিনের জন্যে? কালই ফেরত দেবো।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এই নিন। আপনি যে ক'দিন ইচ্ছে রাখতে পারেন।

—না, আমি কালই ফেরত দেবো। থ্যাঙ্কস্।

আমি যে সময় ওর হাতে খাতা দিচ্ছি, ঠিক সেই সময় আমাদের ক্লাসের বিশ্ব বখাটে ছোকরা সোমেশ্বর গুহঠাকুরতা অদূরে আভির্ভূত হোল, কোথা থেকে কি জানি।

পায়ের শব্দে নির্মলা খাতা নিতে নিতে যেন চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকালো। পরক্ষণেই খাতা নিয়ে আর কোনো কথা না বলে হন হন করে চলে গেল।

সোমেশ্বর আমার কাছে এসে দাঁত বের করে হেসে বললে—কি বাবা ভাল ছেলে, ডুবে ডুবে জল খাওয়া?

আমার রাগ হোল, লজ্জাও হোল। সোমেশ্বরের সঙ্গে আমার এমন কিছু ঘনিষ্ঠতা নেই। অত ঘন-ঘন সিগারেট খাওয়া দেখে আমি ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করতে ঘৃণা করতাম। ওরাও ভালো ছেলে বলে আমায় ঘৃণা করতো। সব কলেজেই বখাটে ছেলেরা ভালো ছেলেদের ঘৃণা করে থাকে।

আমি বললাম—কি?

—মানে, ধরে ফেলেচি। নির্মলা সরকারের সঙ্গে জমালে কবে থেকে তলায়-তলায়? —হুঁ হুঁ বাবা—হাতে-হাতে ধরে ফেলেচি আজ—

—কি বলচেন বাজে কথা? উনি আমার কাছে আজই কেমিষ্ট্রির নোট চেয়ে নিলেন।

—আজই?* মানে আজই? সোমেশ্বর শর্মা যেদিন দেখে ফেলেচে সেই দিনই?

—সত্যি বলচি।

—বেশ বাবা বেশ। তবে বলে দিচ্চি, বেশি ওদিকে নজর দিও না। হরিপ্রসাদকে চেনো তো? হরিপ্রসাদ ডুয়েল লড়বে তোমার সঙ্গে। সে বড়লোকের ছেলে, নির্মলার জন্যে সে নিজের জমিদারী বিলিয়ে দেবে বলেচে। পয়সা খরচ করতে সে হটবে না।

—বাপের জমিদারী আমারও আছে জেনে রাখবেন।

কথা শেষ করে আমি রেস্টুরেন্টের দিকে চলে গেলাম। ওদের মত ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা-কাটাকাটি করতে আমি ঘৃণা বোধ করি। কলেজ থেকে বের হয়ে একটা নির্জন স্থান খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলুম গড়ের মাঠে! চিনেবাদাম চিবুতে-চিবুতে কতক্ষণ ভাবলাম আজকার কথাটা। নির্মলা সরকার কি ধরনের মেয়ে আমি জানি। সে দেবী,

আমার চোখে অতি পবিত্র। তার নামে কেউ কিছু বললে আমার সহ্য হয় না। এতো মেয়ে তো আছে কলেজে কিন্তু ওকে আমার অত ভাল লাগে কেন? এর জবাব নেই।

সেই নির্মলা আজ আমার সঙ্গে কথা বলচে? নিজের থেকে? নোট চেয়ে নিয়ে গেল? কেন আমারই নোট নিয়ে গেল, কলেজে তো কত ছেলে রয়েচে? ভালো ছেলে বলে নিয়ে থাকে যদি। মধুপ্রসাদ বা মাধোপ্রসাদ বলে একটি জৈন ছাত্র নাকি আমার চেয়ে ভালো—অবিশ্যি এটা শুনেচি আমি তাদের কাছে, যারা ক্লাসে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারলে খুশী হয়। যাই হোক সে রয়েছে তো?

আজ কি সুন্দর দিনটি আমার! কার মুখ দেখে না জানি উঠেছিলাম।

পরদিন রবিবার নেশার ঘোরে সারাদিন কেটে গেল। আমার মনে সেই এক ভাবনা—নির্মলা আমার সঙ্গে ডেকে কথা বলেচে। ওর সঙ্গে আর দেখা হবে না। চলে যাবো বহুদূর বিদেশে। অনেকদিন পরে ফিরে আসবো। ওকে দেখিয়ে দেবো আমি কত বড় ত্যাগী। হঠাৎ আমায় দেখে ও অবাক হয়ে যাবে।

এ সব সঙ্কল্প অবশ্য সঙ্কল্পই থেকে গেল! সোমবার ক্লাসে আবার ওর সঙ্গে দেখা হোল। সহজভাবেই ও আমার খাতা ফেরত দিলে এবং আমিও সহজভাবে নিলুম।

এর পরে মাঝে মাঝে ও আমার কাছ থেকে খাতা নিয়ে যায়। আবার ফেরত দেয় দু-তিন দিন পরে। আমি ভাবি ওকে একদিন নির্জনে দেখা করতে বলবো। কিন্তু খাতা ফেরত নেবার সময় মুখ শুকিয়ে যায়, বুক টিপ টিপ করে, কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরোয় না। কোনো একটি কথাও বেরোয় না। সহজভাবে আমি ওর সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি নে দেখলুম। সহজভাবে চলতে চেষ্টা করি, বাইরে দেখাই সম্পূর্ণ সহজভাবেই চলচে—কিন্তু ভেতরে ভেতরে ভয়ানক আড়ষ্ট ও মুখচোরা হয়ে যাই। জিভ শুকিয়ে আসে কেন কে বলবে? বুকের টিপ টিপ শব্দ যেন ও শুনতে পাবে মনে হয়। কিসের একটা ঢেউ গলা পর্যন্ত পৌঁছে গলার স্বর আটকে দেয়।

গোটা ফার্স্ট ইয়ার এভাবে কেটে গেল।

অন্য কোনো মেয়ের দিকে আমার মন নেই, তাদের মধ্যে অনেকে কথা বলে আমার সঙ্গে। অত্যন্ত সহজভাবে তাদের সঙ্গে মিশি। দু-একজনকে চা-ও খাওয়াই কলেজের মধ্যে ও বাইরে। কিন্তু নির্মলার বেলা সব গোলমাল হয়ে যায়।

কিন্তু এসব তো সাধারণ কথা।

আসল ব্যাপার হচ্ছে আমার প্রতিদিনের ভীষণ বেদনা ও মনোকষ্ট। সে যন্ত্রণা দিন দিন আমার বাড়চে। ভেতরে-ভেতরে শুকিয়ে যাচ্চি। অথচ কাউকে বলতে পারি নে সে দারুণ যন্ত্রণা। সকাল থেকে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি সে সময়টির, যখন আবার ওর সঙ্গে আমার দেখা হবে।

আটটা বাজলো। এখনো তিন ঘণ্টা। এগারোটায় ক্লাস।

দশটা বাজলো অমনি শুরু হলো। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারি নে।

প্রতিদিন ভাবি, আজ কলেজে গিয়ে ওর সঙ্গে সব কথা খুলে বলবো। কিংবা আশা করি ও আজ হয়তো আমাকে বলবে, চলুন আপনি ও আমি বেড়িয়ে আসি। কিছুই ঘটে না কোনো দিন।

কি সব যন্ত্রণার দিন আমার গিয়েচে, এখনো মনে করলে আমার হৃৎকম্প হয়। ভগবানের কাছে বলি, অমন অবস্থা যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়। পুরো দেড়বৎসর সহ্য করলাম সে যন্ত্রণা।

সেকেণ্ড ইয়ারে উঠে ঠিক করলাম মেডিকেল কলেজ ছেড়ে দেবো। এরকম যন্ত্রণা আর বেশি দিন সহ্য করতে পারবো না। অসহ্য হয়ে উঠেচে আমার পক্ষে। সত্যই অসহ্য হয়ে উঠেচে।

বাড়ীতে বলে সব রাজি করলুম। বললুম ডাক্তারি পড়ায় মন নেই আমার। এবার মড়া-কাটা শুরু হবে। মড়া-কাটা আমার দ্বারা হবে না। ছেড়ে দেবো মেডিকেল কলেজ। বি-এসসি পড়বো।

এই সময় একটা ঘটনা ঘটলো একদিন।

আমার একটা নোট-বই চার-পাঁচদিন হোল নির্মলার কাছে ছিল। হঠাৎ ভাবলুম ওর হোস্টেলে গিয়ে খাতাখানা নিয়ে আসবো। খুব দুঃসাহসিক সঙ্কল্প। মেডিকেল কলেজের কম্পাউণ্ডের মধ্যেই মেয়েদের হোস্টেল।

বেলা সাড়ে চারটে। কিছুক্ষণ আগে য়্যানাটমির ক্লাস শেষ হয়েচে। দেওয়ান বাহাদুর হীরালালবাবুর নাম-করা ক্লাস, টুঁ শব্দটি করবার যো ছিল না কোনো ছাত্র বা ছাত্রীর। ফিরিঙ্গি ছাত্রগুলো পর্যন্ত চুপ করে থাকতো।

গার্লস হোস্টেলের দরজায় যেতেই দরোয়ান বললে—কাকে খুঁজচেন বাবু?

আমি বললাম—মিস নির্মলা সরকার, সেকেণ্ড ইয়ার।

—নামঠো লিখ দিজিয়ে বাবু ইস স্লিপ মে। মেট্রনকো পাস লে যানে হোগা।

দরোয়ান স্লিপ নিয়ে চলে গেল মেট্রনের কাছে। আমার বুকের মধ্যে ততক্ষণ বিরাট তোলপাড় শুরু হয়ে গিয়েচে। মুখ শুকুতে আরম্ভ করেচে। মনকে বোঝালুম, কেন! আমি তো ছেড়েই যাচ্চি কলেজ। নির্মলার জন্যে আসি নি। আমি এসেচি আমার নোট-বই নিতে। নির্মলার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? বা রে, আমার নোট-বই আমি চেয়ে নেবো না? এতে আর কি হয়েচে? নির্মলা কিছু মনে করে করুক।

একটু পরে দরোয়ান দেখি ফিরে আসচে। আমার বুকের মধ্যে যেন গর্ত হয়ে খানিক বসে গিয়ে একটা ভ্যাকুয়ামের সৃষ্টি হোল হঠাৎ। দরোয়ান কি বলবে? নির্মলা বিরক্ত হয়ে হয়তো বলে পাঠিয়েচে, এখানে কেন? কাল ক্লাসে দেখা করবেন। ভাবি বিরক্ত হয়েচে আমার ওপর। আমার নোট-বইয়ে আমার দরকার থাকতে পারে না? জরুরি দরকার থাকতে পারে না? তুমি

এনেছিলে কেন আমার নোট-বই ? বেশ তো ?

দরোয়ান এসে বললে—আইয়ে বাবু। ভিজিটার্স রুমমে বৈঠিয়ে।

ভিজিটার্স রুমে বসতে বলে যে ! তাহোলে নির্মলা চটে নি। না, তা কেন চটবে। চটবার কি আছে এর মধ্যে।

ভিজিটার্স রুমে গিয়ে বসবার একটু পরেই একখানা ফিকে নীলরঙের শাড়ী পরে স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে নির্মলা হাসিমুখে ঘরে ঢুকলো। পিঠে চুল খুলে এলিয়ে দেওয়া। ক্লাস থেকে ফিরে স্নান করেচে।

ও ঘরে ঢুকে বললে—কি ব্যাপার ? আপনি যে হঠাৎ ?

আমার মনের অবদমিত আবেগ যেন উত্তাল হয়ে উঠলো বুকের মধ্যে। এখানে তো কেউ নেই। নির্মলা—নির্মলা সরকার আমার সামনে। শুধু দু-জন এই ঘরের মধ্যে। কেউ নেই। কোথাও কেউ নেই। বলে ফেলি। এমন সুযোগ জীবনে আর আসবে না। দেড় বৎসরের মধ্যে মহা প্রতীক্ষিত সেই পরম শুভ মুহূর্তটি আজ সমাগত এই মেয়েদের হোস্টেলের নির্জন ভিজিটার্স রুমে। ছেড়ো না এ সুযোগ। যা হয় হবে। হয় এসপার—নয় ওসপার।

আমি ওর চোখের দিকে চাইলাম। নির্মলাও আমার চোখের দিকে দেখি চেয়ে আছে। আমার মনে হোল, অবশ্য আমার ভুল হোতে পারে তবে আমার আজও তাই ধারণা—যে ওরই চোখে সেদিন প্রতীক্ষার দৃষ্টি দেখেছিলাম। অতি অল্পক্ষণের জন্যে একথা আমার মনে হয়েছিল। তার পরেই ওর দিকে চেয়ে আমি বললাম—নোট-বইখানা নিতে এসেচি—

—ও !

—কাল একবার ভেবেছিলুম আসবে.—

নির্মলা আবার যেন প্রতীক্ষা ও আহ্বানের দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলে। দেবীর মত রূপ। কি উজ্জ্বল মুখ-চোখ, কি ঢেউ খেলানো কালো মেঘের মত একরাশ চুল। অপূর্ব রূপ ফুটেচে ওর। আমি চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। কেন চোখ নামিয়ে নিলাম ? আজ আমার মনে হয় আমি ভুল করেছিলাম। মেয়েদের রূপ পুরুষের পূজোর জন্যে নয়। তাকে আকৃষ্ট করবার জন্যে। নির্মলা আশা করে এসেছিলো সেদিন। ওর আশা আমি ভঙ্গ করেছিলুম সেদিন—নিজের ভীরুতার জন্যে।

ও বললে—তবে এলেন না কেন !

—আসতে পারি নি শেষ পর্যন্ত, কাজ ছিল।

আর একটি আশ্চর্য কথা ও বললে। সে কথা ও যে আমাকে বলবে এমন আশা করি নি। তবুও বলি, এ কথার গুরুত্ব তখন তত বুঝি নি, পরে যত বুঝেছিলাম।

ও বললে—কাজ থাকলে বুঝি আমার কাছে আসা যায় না ?

আমি শুধু বোকার মত হাসলাম।

নির্মলা আবার বললে—বলুন না ?

—না-না-না—তাই দেরি হয়ে গেল কি-না ?

আমার উত্তরের বিশেষ কোনো মানে হয় না। অসংবদ্ধ প্রলাপ।

—কিসের দেরি হয়ে গেল ?

—না, দেরি হয় নি। এমনি বলচি।

—আপনি অদ্ভুত লোক।

—কেন ?

—কেন ? আপনাকে কি বোঝাবো। নিজে বুঝতে পারেন না ? বসুন, আমি খাতাখানা আনি।

আমি তো বুঝতে পারলুম না, কিসে আমি অদ্ভুত লোক হোলাম। নির্মলার এ কথার মানে কি ?

একটু পরে ও ফিরে এলো। এসে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করলে। খাতাখানা আমার হাতে দিয়ে হঠাৎ ঈষৎ নিচু হয়ে যেন আমার দিকে এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের ওপর দৃষ্টিপাত করে মুখ সরিয়ে নিলে। আর মুখ ফিরিয়ে নিয়েই সরে গেলো এবং খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

আমার মাথা ঘুরে উঠলো। গম্ভীর ও সংযত মেয়ে নির্মলা ক্লাসের মধ্যে। তার একি লীলা ! আমি খাতা হাতে নিয়ে উঠে বললুম—তবে আজ আসি।

নির্মলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বললে—বসুন না ?

—যাই। বেলা গিয়েচে। কাজ আছে বাড়ীতে।

—চললেন তা হোলে ? ডিসেকৃশন রুমে দেখা হবে কাল তো ?

—হ্যাঁ, যাই।

—কাল ডিসেকৃশন রুমে আসবেন তো ঠিক ?

—আসবো।

নির্মলা ফটক পুর্যন্ত এগিয়ে এল। আমি টলতে-টলতে বাইরে এলাম। বাইরে এসে বাড়ী যাবার পথে কতবার ভাবলাম নির্মলার এ অদ্ভুত আচরণের অর্থ কি ? ও তো অতি গম্ভীর মেয়ে। অন্য কারো সঙ্গে তো কথাই কয় না ভালো করে। আমাকে কি অন্য চোখে দেখে ? কি জানি।

বাড়ীতে তখন আমার বিয়ের জন্যে খুব পীড়াপীড়ি চলচে। বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

নির্মলা আমার চোখে ও মনে জল্ জল্ করচে। অন্য মেয়েকে ওর আসনে বসাতে হবে ?

নির্মলা খুব বড় লোকের মেয়ে। অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ও। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেচি। ওকে পেতে যাওয়া মানে বামন হয়ে চাঁদে হাত। আমার মত একজন নগণ্য ছেলেকে মেয়ে দেবে—ওর মা-বাপ ?

আমি কলেজ ছেড়ে দিলাম…

কলেজে ভিলে ভিলে দক্ষ হোতে পারবো না আমি। মেডিকেল কলেজে মড়া-কাটা আমার দ্বারা হবে না।

বি-এসসি পড়লুম, প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেলুম। এম-এসসিতে দ্বিতীয় শ্রেণী বটে, কিন্তু সেবার আমার বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে কেউ ছিল না।

কলকাতায় একটা কলেজের অধ্যাপকের চাকরি জুটে গেল সহজেই। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া কঠিন হোত না, কিন্তু আমি নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে চাই জীবন। পয়সার অভাব নেই আমার ভগবানের ইচ্ছায়। কার জন্যেই বা অত খাটতে যাবো? না বিয়ে-থাওয়া, না ছেলেপুলে, বেশ আছি।

নির্মলার কথা ভুলি নি। তার জন্যেই বিয়ে করতে পারলুম না। এ যে কি টান, কি মোহ, কি করে বলবো। মন থেকে কিছুতেই তাড়াতে পারলাম কই?

নির্মলার বিয়ে হয়েছিল একজন বিলেত-ফেরত ডাক্তারের সঙ্গে। নিজে সে একজন লেডি ডাক্তার। একবার তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিভাবে তা বলি।

লেডি ডাফরিন হাসপাতালে নির্মলা তখন কাজ করে, আমি জানতাম।

রোজ কলেজ থেকে বেরিয়ে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের কাছে এসে মুখ উঁচু করে করে দাঁড়াই। সম্পূর্ণ অকারণে, কেন দাঁড়াই নিজেই তা জানি নে। কলেজের ছুটির পর পা দু-খানার গতি হয় লেডি ডাফরিন হাসপাতালের দিকে—আপনিই হয়।

যে সময়ের কথা বলচি, তখনও নির্মলার বিবাহ হয় নি।

একদিন ওই রকম অভ্যাসমত এসে দাঁড়িয়েচি স্কট্স্ লেনে, হাসপাতালের ঠিক নিচে। এমন সময়ে এল বর্ষা। সেটা ছিল আশ্বিন মাস। আমার কাছে ছাতি নেই—ছাতি বওয়া আমার অভ্যাস নেই। দাঁড়িয়ে ভিজচি, সরে যেতে ইচ্ছে করচে না, ভিজে যাচ্ছি তবুও কিসের আশায় চাতক-পাখীর মত আকুল আগ্রহ নিয়ে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়েই অসাড়ে ভিজচি—বোধহয় সাধনার কঠোরতায় সিদ্ধি আসে সর্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কাছ থেকে। তিনিই দক্ষিণ পাণি প্রসারিত করে অকপট সাধনার ফল হাতে হাতে দেন। তাই শব-সাধনার এত নাম আমাদের দেশে। রাতারাতি সিদ্ধিলাভ।

শব-সাধনা টব-সাধনা যাক গে।

আমার ফল এল সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত ভাবে। এখনও তা ভেবে অবাক হয়ে যাই।

হঠাৎ রাস্তার দিকের জানলা খুলে গেল হাসপাতালের দোতলায়। একটি মেয়ে উঁকি মেরে রাস্তায় আমার দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখলে। আমি চিনলাম, সে নির্মলা।

নির্মলা কিন্তু আমাকে একবার দেখেই হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেই জানলা থেকে তখুনি সরে গেল।

আমি তো অবাক। আমার রক্ত তখন দ্রুত স্রোতে বুকের দিকে ঠেলে উঠচে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। হাসপাতালের গেটের কাছে নির্মলা দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা ছাতি। আমি এগিয়ে গেলাম, কতকাল পরে দেখা। ও হাত জোড় করে বললে—নমস্কার, কোথায় আছেন, কি করচেন? কতদিন পরে দেখা—

—হ্যাঁ—ইয়ে—তাই—

—কি করচেন আজকাল?

—কলেজে প্রোফেসরি করি। ছুটির পরে এ পথে আসছিলাম, তাই, বৃষ্টি এল হাসপাতালের কাছে, ওই জায়গায়—তাই—

—এম-এসসিতে তো ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছিলেন। বিলেত গেলেন না কেন? আপনি তো স্টেট স্কলারসিপ পেতেন—

—না, কি হবে গিয়ে?

পরক্ষণেই সংশোধন করে নিয়ে বললাম—বাবার শরীর খারাপ। আপনি এখানে কি করচেন?

—রেসিডেন্ট হাউস সার্জেন। আমি তো আর বছর পাস করে বেরিয়েচি—

নির্মলার দিকে চেয়ে দেখলাম ভাল করে। বালিকার চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নেই ওর মধ্যে, এসেচে সুন্দরী পূর্ণ-যৌবনের দীপ্তি ও গাম্ভীর্য। একটু যেন মোটা হয়ে পড়েচে—তবে আমারই চোখে পড়লো, অন্য কেউ হঠাৎ দেখলে ওকে মোটা বলবে না। মধুশ্রীতে পূর্ণিমার চন্দ্রের পূর্ণতা।

নির্মলাও দেখি আমার দিকে চেয়ে আছে। নির্মলা কি বুঝতে পেরেচে আমি রোজ ওর হাসপাতালের পাশে দাঁড়িয়ে থাকি? আরও কোনোদিন দেখেচে নাকি?

আমি বললাম—ভালো আছেন?

—মন্দ নয়। আপনি মেডিকেল কলেজ ছাড়লেন কেন? ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে ভাল ছেলে ছিলেন তো।

আমি ওর কথা উড়িয়ে দেওয়া সূচক হেসে বললাম—ও কিছু না। কত ভাল ছেলে ছিল। আপনিও তো খুব ভাল ছাত্রী ছিলেন। আমার মড়া-কাটা পছন্দ হোল না।

ও খপ করে একটা প্রশ্ন করে বসলো। এ প্রশ্নের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বড় ব্যথা দিলে প্রশ্নটা করে। বললে—বিয়ে করেচেন?

—না। আচ্ছা—নমস্কার—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান—ছাতিটা নিয়ে যান। ভিজচেন দেখে ছাতিটা নিয়ে এলাম। কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেই হবে।

চলে এলুম ছাতি নিয়ে। নিজে যাই নি। ছাতি অন্যের হাত দিয়েই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

এর পরের বছরই কি সেই বছরই নির্মলার বিবাহের সংবাদ পাই। এর পরে নির্মলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল আর একটিবার।

আমহার্স্ট স্ট্রীট বেয়ে আমি হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ একটা মোটর দাঁড়িয়ে গেল পাশে।

নারীকণ্ঠে কে বললে—এই যে, নমস্কার—। চেয়ে দেখি নির্মলা। বেশ মোটা হয়েচে। আমার লজ্জা হোল হঠাৎ এভাবে ওর সঙ্গে দেখা হওয়াতে। কারণ আমিও মেদবৃদ্ধির পথে কম অগ্রসর হই নি। ওর চেয়ে দুজনের পাল্লাপাল্লিতে বোধহয় আমিই জিতবো।

—কোথায় যাচ্চেন? আসুন গাড়ীতে—উঠুন—

ও একাই ছিল গাড়ীতে।

—না, আর গাড়ীতে উঠবো না। ধন্যবাদ। এই তো সুকিয়া স্ট্রীটে যাবো—

—গাড়ীতে আসুন না? নামিয়ে দেবো ওখানে—সুকিয়া স্ট্রীটের কোথায় বলুন।

—না না থাক, থ্যাঙ্কস্—ওই তো পাশের গলি, মোড়ের মাথায়। কতটুকু—নমস্কার—

নির্মলা আমার দিকে কেমন যেন একপ্রকার করুণা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে চাইছিল, সেটাই আমার অসহ্য হোল। আর দাঁড়াতে পারলুম না। নিজে মোটা হয়েচি বলে লজ্জাও হোল ওর সামনে দাঁড়াতে।

এর পর আর ওর সঙ্গে দেখা হয় নি।

* * *

সে আজ বহু বৎসরের কথা। সতেরো-আঠারো বছর আগের কথা। দিন যায় যত, নির্মলার কথাও তত ভুলি। ক্রমে নির্মলার ছবিও অস্পষ্ট হয়ে এসেচে।

এমন সময় সেদিন এক ব্যাপার হয়ে গেল। মাস-খানেকও হয় নি।

আমাদের কলেজে বি-এসসি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা হচ্চে। অন্য কলেজের কয়েকটি মেয়ে পরীক্ষা দিচ্চে। মেয়েদের পরীক্ষা আমি তত্ত্বাবধান করচি ও পাহারা দিচ্চি সেই রুমে।

একটি মেয়েকে দেখেই আমার মন ছাঁত করে উঠলো। আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। এর মুখ আমার সুপরিচিত। মনে হোল অনেকদিন আগে একে চিনতাম। আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে ভাবচি একে কোথায় দেখে ছিলাম প্রথম যৌবনের কোনোদিনে।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙলো। কি মনে করবে। আমি প্রৌঢ় অধ্যাপক। ওরা অন্য কলেজের মেয়ে, আমাকে চেনে না, কি ভাবতে পারে।

মেয়েটির ব্যাপার দেখে বুঝলুম সে ফাঁপরে পড়েচে। দুটি প্রশ্ন আছে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের। একটি হিস্টোলজির, অপরটি মরফোলজির। মেয়েটি একটি লতার অংশ সরু করে কেটেচে। কিন্তু কিছুতেই সেটাকে সাজাতে পারচে না। তিনবার, চারবার ধরে চেষ্টা করলে। ওর হাত কাঁপচে, চোখে জল টলমল করচে।

আমি দেখলুম মেয়েটি এ কাজ কখনো মন দিয়ে করে নি। সিনেমা দেখে বেড়িয়েচে, ক্লাসে ফাঁকি দিয়ে এসে এখন নিজেই ফাঁকে পড়ে গিয়েচে।

কাছে গিয়ে বললুম—কি হচ্চে খুকী ?

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো সুরে বললে—সেকশানটা স্টেইন্ নিচ্চে না—জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে—

আমি হেসে বললাম—তুমি কোন্ কলেজের স্টুডেন্ট ?

—স্কটিশচার্চ।

—সেকশন কাটতে শেখো নি তো ? অত মোটা করে সেকশন কাটে ? তাছাড়া দেখচো না এ লতায় লাল হড়হড়ে আঠা রয়েছে। ওটা অ্যালকোহলে ধুয়ে না নিলে কখনো স্টেন নেয় ? ওটা অ্যালকোহলে ওয়াশ করে নাও।

মেয়েটি আমার কথায় অ্যালকোহলে ধুতে গেল। কিন্তু মা লক্ষ্মী দেখলুম সিনেমা দেখেই কাটিয়েচেন। লেখাপড়া কিছুই করেন নি।

বললাম—ও কি হচ্চে ? তুমি অ্যালকোহলে ধুতে জানো না ? গ্রেডে তোলো—নইলে সেকশানটা গুটিয়ে যাবে যে ! আগে কুড়ি, তারপরে পঞ্চাশ, তারপরে সত্তর, তারপরে নব্বুই—তারপর অ্যাবসলুট অ্যালকোহলে তোলো—

—কেন, লাইজল দিয়ে ধুয়ে ফেলবো না ?

—পাগল, লাইজল দিয়ে এখন ধোবে কেন ? অ্যাবসলিউট অ্যালকোহলে আগে তোলো।

ওর হাত কাঁপচে। কখনো একাজ করে নি। গ্রেডে তোলা কাকে বলে তাই ভালো করে শেখেনি হাতে-কলমে করতে, আমার মায়া হোল। বললুম—ছেড়ে দাও খুকী—তুমি মরফোলজির কোশ্চেনটা ট্রাই করো—আমি দেখচি—

আমি ল্যাবরেটরীর হেড অ্যাসিস্টান্ট নরেনকে ডাকলুম। নরেন আমারই ছাত্র, প্র্যাকটিক্যাল কাজে ঘুণ। তাকে বললাম—নরেন, এই সেকশানটা মাউন্ট করে নিয়ে এসে দাও তো ?

নরেন আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে সেকশানটা হাতে নিয়ে চলে গেল। হয়তো ভাবলে প্রৌঢ় অধ্যাপকের এ দুর্বলতা কেন ? সুন্দরী মেয়ে দেখে তাকে পরীক্ষায় বে-আইনি সাহায্য করচেন।

একটু পরে নরেন বেশ চমৎকার ভাবে নিপুণ হস্তে সেকশানটা স্লাইডের ওপর বসিয়ে কানাডা বালসম্ দিয়ে বন্ধ করে আমার হাতে এনে দিলে। আমি নিয়ে গিয়ে বললাম—এই নাও খুকী।

তার প্রশ্নের উত্তর বে-আইনি ভাবে পেয়ে মেয়েটি কৃতজ্ঞতামূলক হাসলে। অনেকদিন আগে এ হাসি কোথায় দেখেচি। এ হাসি আমার কুয়াসাচ্ছন্ন জীবন-দিনের প্রথম অরুণরাগের হাসি। বিস্মৃত অরুণরাগের সে শুভ ক্ষণটি আজও কি ভুলেচি ?

মৃদু কৌতূহলের সুরে প্রশ্ন করলুম—তোমার নাম তো নীলিমা বসু লেখা রয়েচে—তোমাদের

বাড়ী কোথায় ?

—লোয়ার সারকুলার রোডে, ডাক্তার বিশ্বাস বসুকে চেনেন ?

—ডাক্তার বি. বসু—আই স্পেশালিস্ট ?

—হ্যাঁ, তিনি আমার বাবা।

—ও।

—আমার মাথা ঘুরে উঠলো। ডাক্তার বিশ্বাস বসু নির্মলার স্বামী।

মেয়েটি হেসে বললে—আসবেন আমাদের বাড়ী। বাবা বড় খুশী হবেন।

ডালুর বিপদ

মস্তবড় কাঠের নৌকাটা সারা গ্রামের বালক-বালিকাদের নিকট একটি বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে গত কয়েকদিন হইতে। চালানি কাঠের নৌকা, বড় বড় গুঁড়ি পড়িয়া আছে নদীর ধারে, হাতির মত বড় বড় গুঁড়ি। কয়েকদিন হইতেই দেখিতেছে ডালু। মা হাঁক দেয়—ও ডালু, সান্টু, মুড়ি খেয়ে যা—উহাদের দু-জনের পাত্তা নাই।

মা বলে—ওরা বসে আছে গিয়ে ছাখো সেই নদীর ধারে। শুধু খাবো আর গাঙের ধারে টো-টো করবো। কি বিপদেই পড়েচি এদের নিয়ে !

কিন্তু নৌকার মোহ হঠাৎ এদের পরিত্যাগ করে না। নদীর ধারে যেখানে ঝিঙের ক্ষেতে বর্ষাকালের সন্ধ্যায় ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া আছে, সেখানেই বড় নৌকাখানা বাঁধা।

দেখিয়া দেখিয়া ডালু-সান্টুর আশ মেটে না। অতবড় নৌকা গড়ায় কি করিয়া ? কারা গড়ায় ? নৌকার গলুই-এর দু পাশে দুটি বড় বড় পেতলের চোখ। তার একটু ওপরে সিঁদুর লাগানো। ডালু সান্টুকে বলে—নৌকো দেখলি ?

—মস্ত বড়—আচ্ছা, ঐখানে চোখ কেন ? নৌকো কি দেখতে পায়, দাদা ?

—দূর বোকা ! ও অমনি করে রেখেচে ! সব নৌকোর কি চোখ থাকে ? থাকে না।

—কি করে জানলি ?

—আমি তোর চেয়ে বড় যে ! তুই কবে জন্মেচিস, আর আমি কবে জন্মিচি !

সেদিন নদীর নিচু পাড়ে বসিয়া দুই ভাই হাঁ করিয়া দুই চক্ষু ভরিয়া নৌকা দেখিতেছে। নৌকার মাঝি ডালুকে জিজ্ঞাসা করিল—কি নাম ?

—ডালু।

—উটি কেডা ?

—আমার ভাই সান্টু।

—কি জাত ?

—ব্রাহ্মণ।

—বাড়ী কনে?

—এই গ্রামে।

—এসো, মোদের নৌকো দেখতি আসবা না?

ভালুর খুব ইচ্ছা নৌকা দেখিবার, কিন্তু মা যদি বকে! সাহস করিয়া উঠিতে পারিলে মজা হইত বটে, কিন্তু সাহস হয় না। এখন ঘাটে লোকজনের যাতায়াত, ইহাদের মধ্যে কেহ গিয়া মাকে বলিয়া দিতে পারে। এমন সময়ে আসিতে হইবে যখন ঘাটে কেউ থাকে না। ভালু উদাসীন সুরে বলিল—চল্ রে সান্টু, বাড়ী যাই।

ভাইয়ের হাত ধরিয়া ভালু বাড়ী চলিয়া গেল।

পথের বাঁদিকে উঁচু ডাঙামত জায়গা, তাতে বড় বড় আম কাঁঠালের গাছ। কোনকালে এখানে ডিঙি-নৌকা আর বড় নৌকার কারখানা ছিল। অর্জুন মাঝির কারখানা। কত ধরনের ছোট নৌকা, বড় মহাজনী নৌকা এখানে তৈরি হইত আগে—ভালু কারখানা দেখে নাই, দেখিয়াছে অর্জুন মাঝিকে। মাজাভাঙা বাঁকাচোরা বুড়ো তেঁতুলতলার ঘাটে বসিয়া তামাক খায় আর মাছ ধরিবার দোয়াড়ি বোনে। কত ধরনের নৌকার গল্প ও নৌকা-ভ্রমণের গল্প করে অর্জুন বুড়ো। ওর মুখে গল্প শুনিয়া পর্যন্ত নৌকার উপর অত্যন্ত মোহ। বড় মহাজনী নৌকা দেখিলে সে যেন কেমন হইয়া যায়!

সান্টু বলিল—দাদা, যাবি নে নৌকো দেখতে?

—এখন না, সবাই চলে যাক্ ঘাট থেকে।

—ওরা নৌকোতে উঠতে বললে—উঠলি নে?

—মা বকবে।

—আমাকে নিয়ে আসবি তো?

—তুই আর আমি দু-জনেই তো আসবো। সন্দেবেলা।

সান্টুর ভাল লাগিল না প্রস্তাবটা। সন্দেবেলা এই নদীর ধারে আসা যায়? চিন্তে বাগ্‌দির ভিটের ঝাঁকড়া-তেঁতুল গাছটাতে হাঁড়াকাটায় যা থাকে, ছোট ছোট ছেলেকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গাছের মগডালে তোলে। সময়টা বড় খারাপ। সান্টু ভয়ের কথাটা দাদাকে বলিয়াই ফেলিল।

ভালু ধমক দিয়া বলিল—তুই বড্ড বোকা!

—কেন দাদা? আর তুমি বুঝি বোকা নও?

—তোর মত না।

দিনের বাকি সময়টা কোনোরকমে কাটিল। ভালু ভাবে কখন যে সন্ধ্যা হইবে, কখন নৌকা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা আর হয় না, ভালুর মন ছট্‌ফট করিতে থাকে। সান্টু অতশত বোঝে না। দাদা যেখানে, সেও সেখানে।

ভালু দু-গাছা ছিপ লইয়া সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক আগে নদীর ধারে গেল। সঙ্গে চলিল সান্টু।

বড় নৌকাখানা সেখানে বাঁধা ছিল।

কাঠের নৌকার মাঝি বলিল—খোকা, নৌকো দেখবে নাকি ?

ডালুকে দু-বার বলিতে হইল না। সাণ্টুকে লইয়া তখনি নৌকায় উঠিল।

নৌকার মধ্যে কত কি যে জিনিস! মস্ত নৌকার খোলে লোকেদের বসিবার ও শুইবার জায়গা। রান্নার জন্যে উনুন আছে, হাঁড়ি আছে। বড় একটা বিলিতি কুমড়ো দড়ির শিকেতে ঝুলানো।

মাঝিকে ডালু বলিল—তোমরা এখানে থাও ?

—হ্যাঁ।

—কি রাঁধো ?

—যা পাই খোকা। আমরা গরীব লোক, কিনবার ক্ষ্যামতা নেই তো!

—আচ্ছা, তোমরা কত জায়গায় গিয়েচ ?

—তুমি চিনবে না সে সব জায়গা। বরিশাল জেলার নাম শুনেছ ? সেই বরিশাল জেলা।

—কি আছে সেখানে ?

—হাঙর আছে, কুমির আছে, দু-মুখো সাপ আছে। কত রকমের জানোয়ার আছে। লালমুখো বানর আছে। দু-মাথাওয়ালা তালগাছ আছে।

সাণ্টুর চোখ বিস্ময়ে ও কৌতূহলে ডাগর-ডাগর হইয়া উঠিল। এমন কথা সে কখনো শোনে নাই। লালমুখো বানর ও দু-মাথাওয়ালা তালগাছ না জানি দেখিতে কি রকম!

সে বলিল—তালগাছে হাঁড়াকাটার মা আছে ?

—অ্যাঁ!

—হাঁড়াকাটার মা আছে তালগাছে ?

—সে আবার কি ?

ডালু বিজ্ঞের মত মুখখানা করিয়া বলিল—ও ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। কি বাজে কথা বলচে।

মাঝি বলিল—মস্তবড় কুমির আছে সেখানে, বুঝলে ? তেমন কখনো দেখো নি।

ডালু বা সাণ্টু কোনোদিন একটি অতি ক্ষুদ্র গিরগিটির মত কুমিরও দেখে নাই; মস্তবড় কুমির তো দূরের কথা! দু-জনেই চুপ করিয়া রহিল।

একজন বুড়ো মাঝি নৌকার গলুইতে বসিয়া বেগুন কুটিতেছিল। সে বেগুন-কোটা ফেলিয়া রাখিয়া এদিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—ও কি শুনচো খোকা-বাবুরা ? আমি নিজের চোখে যা সাপ দেখেছি সুঁদর-বনের—

ডালু ও সাণ্টু উভয়েই অধীর আগ্রহে বলিল—কত বড় ?

—তালগাছের মত মোটা।

ডালু বিস্ময়ের সুরে বলিয়া উঠিল—উঃ রে! আর কত লম্বা ?

—হাত ত্রিশ-চল্লিশ।

ডালু বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল। এতবড় সাপ হয়, কেউ কখনো শোনে নাই। সুন্দরবনের কাণ্ডই আলাদা! সত্যই কি আশ্চর্য দেশ!

বুড়ো মাঝি গল্প করিতে লাগিল—সেবার সুন্দরবনে সুঁদরি কাঠ আনতি গিয়েছিলাম। চোরামুখোর কাছারি থেকে তিন ভাটি গেলে তবে ভাঙনভাঙার জঙ্গল, রানীতলার জঙ্গল, বড্ড ভারি জঙ্গল।

—তারপর—

এখানে বৃদ্ধ গল্প বন্ধ করিয়া তামাক সাজিতে আরম্ভ করিল। ডালু-সান্টুর আর সহ্য হয় না, তামাক খাইবার কি এই সময়?

ডালু অধীর আগ্রহের স্বরে বলিল—তার পর?

—তারপর আমরা খালে নৌকো নোঙর করে ভাঙনভাঙার জঙ্গলে গিইচি মৌচাক ভাঙতি। একটা তালগাছের গুঁড়ির মত জিনিস এক জায়গায় পড়ে আছে। তার ওপর লতাপাতা। আমরা হেঁটে হেঁটে গিইছিলাম। যেমন বসলাম, অমনি দেখি নড়ে উঠেচে! ও মা, তারপরে দেখি সরে সরে যাচ্চে গাছের গুঁড়িটা! তখন দেখি গুঁড়ি নয়। মস্তবড় সাপ নড়চে। তখনি দেলাম ছুট। হাঁ করে নিশ্বেস ফেলে সেই সাপে। নিঃশ্বেস টানার জোরে ছোট ছোট জানোয়ার এসে ওর মুখের মধ্যি ঢুকে যায়।

—তারপর কি হোল হ্যাগো?

—আবার কি হবে! পালালাম মোরা সোজা। আর কি সেখানে দাঁড়াই? বাঘও দেখিচি বড় বড়—কিন্তু বাঘের চেয়েও সাপ বড্ড ভীষণ জানোয়ার, খোকাবাবুরা।

—কেন? বাঘের চেয়েও ভয়ানক?

—সাপ যে নিঃশ্বেসে টেনে নেয় কিনা? ঘাপটি মেরে থাকে জলের ধারে—ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কেউ টের পায় না আগে থেকে, হঠাৎ টেনে নেয়। পাকে-পাকে জড়িয়ে ওর হাড়গোড় গুঁড়ো-গুঁড়ো করে ফেলে বাবু! পিণ্ডি পাকিয়ে দেয় একেবারে।

বাহিরে রাত্রির অন্ধকার নামিয়া আসিল। কেরোসিনের টেমিটা টিম-টিম করিয়া জ্বলিতেছে। ধোঁয়ায় নৌকার খোল প্রায় ভরিয়া আসিল। ডালুর গা যেন শিহরিয়া উঠিল। তাহার কেমন ভয়-ভয় করিতেছে, এখানে এ সন্ধ্যায় না আসিলেই হইত! হঠাৎ সে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

যখন ঘুম ভাঙিল, সে দেখিল নদীর ধার হইতে কিছু দূরে একটা আম-কাঠের বড় গুঁড়ির উপর শুইয়া আছে। ডালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। এখানে সে কেমন করিয়া আসিল?

সে দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া লইল। রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে, মাথার উপর বাদুড় ঝটপট করিতেছে, তারাভরা আকাশ। সে এখানে কেন? নৌকা কোথায়? সান্টু কোথায়? ডালু ছুটিয়া গেল নদীর ধারে। ওই তো সেই বেনার ঝোপ নদীর পাড়ে। ওইখানেই ওই বেনার ঝোপের মধ্যেই তো লোহার বড় নোঙর ফেলিয়া নৌকাটা দাঁড়াইয়া ছিল! সে নৌকা

তো নাই! সান্টু কোথায়? ভালু ভাইয়ের নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—সান্টু—উ-উ-উ—ও-ও সান্টু—উ-উ—কেহ উত্তর দিল না। নৌকাই নাই, উত্তর দিবে কোথা হইতে! ভালুর বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়িতে লাগিল।

নৌকাওয়ালা সান্টুকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে নামাইয়া দিয়া ভাইটিকে লইয়া পলাইয়াছে। ছোট ভাইটিকে মারিয়া ফেলিবে হয়তো! ভালু ছুটিতে ছুটিতে আসিল। ভালুর মা রান্নাঘরে কি কাজ করিতেছেন। ভালুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—এসো তোমার পিঠের ছালচামড়া তুলি। বের করচি তোমার পাড়া বেড়ানো। সান্টু কই?

ভালু বলিল সব কথা। কাঁদিয়া বলিল—মা, সান্টুকে ওরা চুরি করে নিয়ে গিয়েচে। মেরে ফেলবে। সে কি ভীষণ কান্না! কান্নার বেগে ভালু ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। মাও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

এমন সময় বুকের পাঁজরে ঘা খাইয়া ভালুর কান্না থামিয়া গেল।

সে চাহিয়া দেখিল, বুড়ো মাঝিটা তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি বলিতেছে। সেই দাড়িওয়ালা বুড়ো মাঝিটা। ভালু বলিয়া উঠিল—সান্টু—আমার ভাই সান্টুকে কোথায় নিয়ে গিয়েচ?

—অ্যাঁ?

—চালাকি করো না! আমার ভাই সান্টু—কোথায় সে? মেরো না ওকে।

—আরে খোকাবাবু বলে কি? ঘুমের ঘোরে কি রকম গোঙাচ্চে আর বিড়বিড় করচে। এখনো ঘুমের ঘোর কাটেনি দেখচি!

নৌকার ও-খোল হইতে একজন মাঝি বলিয়া উঠিল—চকি জল দাও। ছেলেমানুষ স্বপন দেখেচে।

ভালু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।—সেই নৌকা! সেই নৌকার খোল। সেই বৃদ্ধ মাঝি তাহার সামনে। ওই তো সান্টু ঘুমাইতেছে! সান্টুই তো! সে ডাকিল—এই সান্টু, ওঠ্—ওঠ্! দুই ভাই নৌকা হইতে নামিল। মাঝিরা বলিল—কি ঘুম রে বাবা! ছেলেমানুষ সব। যাও খোকাবাবুরা। সাবধানে বাড়ী যাও। বড্ড অন্ধকার।

পথে আসিয়া ভালু ঠাস করিয়া ছোট ভাইকে এক চড় কষাইয়া বলিল—কেবল ঘুম, কেবল ঘুম! বাঁদর কোথাকার! আবার তোমাকে কোনোদিন সঙ্গে নিয়ে আসবো, এসো আবার!—ঘুগুলি কি বলে নৌকার মধ্যে তুই?